অবেলায়

ব্রতীন

খুব ভোরবেলায় আমি ঘুম থেকে উঠেছিলাম। ঘুম থেকে ওঠা বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয় অবশ্য। আসলে রাতে আমার সত্যিকারের ঘুম একটুও হয়নি। একটু একটু তন্দ্রা এসেছিল হয়ত বা, আর সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিকর সব স্বপ্ন। পাগলাটে, অযৌক্তিক সব স্বপ্ন। ভয় পেয়ে বার বার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে বিছানা ছাড়লাম। ঘড়িতে দেখি সোয়া পাঁচটা প্রায়। শীতকাল বলে আলো ফোটেনি। পাছে মায়ের ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে নিঃসাড়ে উঠে কলঘরে গিয়ে চোখে জল দিয়ে এলাম। না-ঘুমানো-চোখ কর-কর করে উঠল। স্নায়ু শিরা সব উত্তেজিত হয়ে আছে, মাথার মধ্যে এলোমেলো অস্থির চিন্তা। আমি পাথরের মতো, ঠাণ্ডা বাসি জল ঘাড় মাথার তালু কনুই আর পায়ে ঘষে থাবড়ে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। হাড়ের ভিতরে চলে গেল শীতের ভাব তবু একটুও সতেজ লাগল না নিজেকে।

ভোর রাতের দিকেই মার একটু ঘুম হয়। সকালের দিকে আমার ডিউটি থাকলে আমি মার সেই সামান্য ঘুমটুকুও কেড়ে নিই। অত সকালে বিশেষত শীতকালে বড় কষ্ট হয় মার। খদ্দরের একটা পুরনো খাটো চাদর জড়িয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে মা যখন আমাকে চা করে বাসি রুটি তরকারি সাজিয়ে দিতে থাকে, তখন প্রায়ই মনে হয়, মাকে সারাজীবন বড় কষ্ট দিলাম। মার গলায় কিছু একটা অসুখ আছে, সকালে সারাক্ষণ মা কাশতে থাকে। শুকনো কাশি, কিন্তু সেই শব্দে আমার বুকের ভিতরটা কেমন গুলিয়ে ওঠে। মনে হয় আমারও ওই রকম কাশি শুরু হয়ে যাবে।

আজ মাকে আমি ঘুমোতে দিলাম। জানলাটা খুলে দিয়ে একটু বাইরের বাতাসে শ্বাস টানতে ইচ্ছে করছিল। ঘরের মধ্যে কেমন এক টা ভেজা চুলের গন্ধ, পুরনো কাপড়-চোপড়ের গন্ধ। স্যাঁতসেঁতে ঘর, অস্বাস্থ্যকর। ইচ্ছে করলেও জানালা খুললাম না। মায়ের কাশিটার কথা মনে পড়ল। গতকাল রাতে এক প্যাকেট সিগারেট কেনা ছিল। তোশকের তলায় লুকিয়ে

Shahnaz

রেখেছিলাম। বের করে দেখি প্যাকেটটা চেপ্টে গেছে। কোনও দিনই অভ্যাস ছিল না, কিন্তু কয়েক দিন খাচ্ছি সিগারেট। খুব যে কিছু হয় খেলে তা বুঝি না। অন্তত মন বা শরীরের কোনও পরিবর্তন টের পাই না, গলাটা কেবল খুশখুশ করে, আর ধোঁয়া লেগে চোখে জল আসে। তবু সিগারেট ধরালে নতুন খেলনার মতো একটা কিছু নিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

পাশের ঘরে যাওয়ার দরজাটা খোলা। ঘরটা আমার দাদা মতীনের। পাগল মানুষ। ঘরটায় আমার আজকাল আর ঢোকাই হয় না। আমি আর মা ঘরটা দাদাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি দাদার মাথার কাছে জানালাটা খোলা। সারা রাত ধরে হিম এসে ঘরটাকে ঠাণ্ডা করে রেখেছে। মেঝেয় অনেক সিগারেটের টুকরো। আমার দাদা মতীন সত্যিই সিগারেটের স্বাদ জানে। সস্তা বাজে সিগারেট, তবু কতগুলো খায় দিনে। কতবার মাকে ঘর ঝাঁট দিতে হয়। অনেক দিন পরে এ ঘরে এলাম। তাও সিগারেট খাওয়ার জন্য। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমি একটা সিগারেট খাব। কোনও দিন দাদার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে এরকম সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবা যায়নি। ঘুমন্ত দাদার শিয়রে দাঁড়িয়েও না। আমার দাদা মতীনকে ছেলেবেলা থেকেই আমি ভয় করি। সাত-আট বছরের তফাত তো ছিলই। তাছাড়া ছিল আমাদের সবাইকে আড়াল করে রেখে দাঁড়ানোর অদ্ভুত গুণ। তাই সিগারেট ধরাতে আমার বাধো-বাধো লাগছিল একটু। একবার চেয়ে দেখলাম। গা থেকে লেপ সরে গেছে, মশারির চারটে খুঁট ছিঁড়ে সেটাতে জড়িয়েছে সারাটা শরীর। মুখটা দেখা যায় না। বালিশের ওপর চুলের ভারে প্রকাণ্ড একটা মাথা পড়ে আছে। আসবাব বলতে চৌকি বাদ দিলে একটা টেবিল আর চেয়ার, একটা শেলফে বই। এ সবই দাদার মাস্টারির চাকরির সময় কেনা। তখন সামান্য আসবাবেরই কত গোছগাছ ছিল, যত্ন ছিল বইয়ের। মাঝে মাঝে টেবিলের ফুলদানিতে নিজেই ফুল এনে সাজাত, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিতে সন্ধেবেলায়। দেখলাম সুন্দর পাতিলেবুর রঙের ফুলদানিটার গায়ে সন্ন্যাসীর শরীরের মতো ছাই মাখা। বোধ হয় ওতে এখন সিগারেটের ছাই ফেলা হয়। ভাল করে দেখলে দেখা যাবে সারা ঘরেই সন্ন্যাসীর শরীরের সেই ছাই রঙ। উদাসীন ঘরখানা। সারা ঘরে ছড়ানো চিঠির প্যাডের নীল কাগজ। সুন্দর কাগজ। প্রতি কাগজেই ক্ষুদে ক্ষুদে কী যেন লেখা। সারা দিন লেখে আমার দাদা মতীন। চিঠি লেখে। কাকে লেখে কে জানে। শুনেছি বালিগঞ্জে কোথায় যেন পাথরের কড়িওয়ালা একটা প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল, তার চারধারে ছিল ঘের-পাঁচিলে ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান, আর সেই বাড়িতে ছিল একটি মেয়ে। না, তাদের সঙ্গে কোনও কালে বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না দাদার। দাদা কেবল দূর থেকে তাকে মাঝে মাঝে দেখেছিল। আমার দাদা মতীনকে সে মেয়েটি বোধ হয় দেখেওনি। বোধ হয় দুর্বল লোকেদেরই অসম্ভব কিছু করার দিকে ঝোঁক বেশি থাকে। আমার দাদারও ছিল। কথাটা হয়তো একটু কেমন শোনাবে। একটু আগেই বললাম দাদা আমাদের সবাইকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। তবু কথাটা কিন্তু সত্যি। আমার বিশ্বাস দাদা দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। অতি বেশি টান ভালবাসা মানুষকে দুর্বল করে দেয়। আমার এবং মায়ের প্রতি দাদার অসম্ভব ভালবাসা দেখে বরাবর মনে হয়েছে দাদা বড় দুর্বল মানুষ। মার সঙ্গে রাগারাগি করে আর ভাব করার জন্য চিরকাল ঘুরঘুর করেছে মায়ের আশেপাশে। যা বলছিলাম, অসম্ভব কিছু করার দিকে এই দুর্বল মানুষটির হয়ত প্রবল একটা ঝোঁক ছিল। নইলে আমাদের মতো ঘরের সাধারণ ছেলে হয়ে কেউ ওই বড় বাড়ির মেয়ের জন্য পাগল হয়! তাও পরিচয় নেই, নাম জানা নেই, ভাল করে চোখাচোখি অবধি হয়নি। সঠিক ঘটনাটা আমি জানি না। শুনেছি ওই অসম্ভব সুন্দর নির্জন পাড়ার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আমার দাদা মতীন তার অবসরের সময় বইয়ে দিত।

সম্ভবত মা ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। মায়েরা পায়। মাঝে মাঝে মাকে বলতে শুনেছি, 'কি জানি কোন্ ডাইনি ধরেছে।' আমি তখন সদ্য বেহালার একটা কারখানায় ঢুকেছি, প্রথম মাসের মাইনে পাইনি। সে সময়ে একদিন দাদা ফিরলে দেখলাম তাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। অবাস্তব। জ্বলজ্বল করছে চোখ, মুখখানা লাল, আর ক্ষণে ক্ষণে হাসির লহর তুলে সে যে কত কী কথা! খেতে বসেছি পাশাপাশি, সামনে মা, দাদা হঠাৎ হেসে বলল, 'একটা ব্যাপার হয়ে গেল মা।' বলে নিজেই খুব হাসল। 'একটা মেয়ে বুঝলে—বেশ সুন্দর চেহারার পবিত্র মেয়ে—সন্ন্যাসিনী হলে মানাত—তাকে দেখলাম স্কুটারের পিছনে বসে বিচ্ছিরি গুণ্ডা টাইপের একটা ছেলের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল!' বলেই ভীষণ হাসল দাদা। 'সমাজটা যে কী হয়ে যাচ্ছে না মা! কার বউ যে কার ঘরে যাচ্ছে! কী ভীষণ যে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সব, তোমরা ঘরে থেকে বুঝতেই পারছ না।' বলতে বলতে বিষম খাচ্ছিল দাদা। মা মাথায় ফুঁ দিয়ে বলল, 'কথা বলিস না আর। জল খা। কার বউ কার ঘরে যাচ্ছে! আমার দাদা মতীনের ওই কথাটা আমার আজও বুকের মধ্যে লেগে আছে। আমরা তখন পাশাপাশি চৌকিতে দু-ভাই শুই, অন্য ঘরে একা মা। সে রাতে দাদাকে দেখলাম খুব হাসিখুশি মনে শুতে এল। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে শোয়ার আগে কী যেন লিখছিল। চিরকালই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা কম হয়। সে রাতে দাদা জিজ্ঞেস করল হঠাৎ, 'তুই যেন কত মাইনে পাস?' বললাম। শুনে দাদা একটু ভেবে আপন মনে বলল, 'চলে যাবে।' নতুন চাকরির পরিশ্রমে খুব নিঃসাড়ে ঘুম হত তখন। মাঝরাতে সেই চাষাড়ে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে দেখি আমার শরীরের ওপর দুখানা হাত ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উঠে বসলাম। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে দাদা, মাথাটা চৌকির ওপর রাখা, হাত দুখানা দিয়ে আমাকে জাগানোর শেষ একটা চেষ্টা করছে সে। আমি উঠতেই তার অবশ শরীর মাটিতে পড়ে গেল। তখনই আমাদের পরিবারের একজন কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু কমল না। ছারপোকা মারার যে বিষ দাদা খেয়েছিল হাসপাতালের ডাক্তারেরা সেটা তার শরীর থেকে টেনে বের করে দিল। বের করল কিন্তু পুরোটা নয়। খানিকটা বোধ হয় দাদার মাথার মধ্যে রয়ে গেল।

ওই তো এখন বিছানায় মশারি জড়িয়ে শুয়ে আছ আমার দাদা মতীন। পাগল মানুষ। দাদা কিছুই দেখে না, লক্ষও করে না আমাদের। ঘুমিয়ে আছে। তবু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে কেমন বাধো-বাধো লাগে। ভেবে দেখলে আমার সেই দাদা মতীন তো আর নেই। তবু না থেকেও যেন আছে।

সিগারেট ধরিয়ে আমি খোলা জানালার কাছে দাঁড়ালাম। অমনি হি-হি বাতাস নাক গলা চিরে ভিতরে ঢুকে অবশ করে দিল। চোখে জল এসে গেল। শরীরে উত্তেজিত অসুস্থ ভাবটা সামান্য নাড়া খেল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আছে, তবু একটুও ঘুম হয় না আজকাল। কারখানা বন্ধ না থাকলে শীতের এই ভোরে সামনের ওই রাস্তাটা দিয়ে আমি কাজে যেতাম। এই ভোরবেলায় চারপাশ কী সুন্দর থাকে। ঠিক কতখানি সুন্দর তা বলে বোঝানোই যায় না। একমাত্র এই ভোর-রাত্রেই কলকাতাকে নিঃঝুম মনে হয়। অন্ধকারে পাখিরা ডাকাডাকি করে বাসা ছাড়ে না। রাস্তায় পা দিয়ে মনে হয় গ্রামের রাস্তায় চলেছি। বাতাস খুব পরিষ্কার থাকে, জীবানুশূন্য। একটু অন্ধকার আর একটু কুয়াশা থাকে বলে চারপাশে নানা রহস্যময় ছবি ভেসে ওঠে, চেনা জায়গার গায়ে অচেনার প্রলেপ পড়ে যায়। চারদিকের বাড়িগুলো আবছা আর ঝুপসি গাছের মতো দেখায়। প্রকৃতির সঙ্গে তারা এক হয়ে যায়। দাদার ঘরে একখানা বই আছে, সংবাদপত্রে সেকালের কথা। তাতে পুরনো কলকাতার দুটো চারটে ছবি আমি দেখেছি। কাঁচা রাস্তা, পুকুর

Shahnaz

আর গাছগাছালিতে ভরা কলকাতা, শেয়াল ঘুরে বেড়ায়; পুরনো আমলের গোল গম্বুজ আর থামওয়ালা বাড়ির সামনে ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বাঙালিবাবুদের মাথায় টোপরের মতো টুপি, পায়ে নাগরা, আর পরনে কাবাকুর্তা। ভোর-রাত্রের কলকাতা সেই পুরনো কলকাতা। পুকুর আর গাছগাছালির গ্রাম্য শহর। আমি সেই পুরনো শহর ধরে হেঁটে যাই কসবা থেকে বালিগঞ্জ স্টেশনের ট্রাম ডিপো পর্যন্ত। ভোরের প্রথম ট্রাম ধরি।

কারখানার মধ্যে বিলিতি শহর। ফুলগাছে আধো-ঢাকা কাচের বাড়ি, যত্নে লাগানো ঝাউ আর ইউক্যালিপটাসের সারির লন। স্বয়ংক্রিয় লন-মোয়ার বটবট করে সারা দিন ঘুরে বেড়ায়। দয়ালু পাদরির মতো সুন্দর হাসিমাখা মুখে সাহেব-ম্যানেজার ডিলান সারা দিন আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ভাবতেই এখন বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। আমি মুখ ঘুরিয়ে ঘরের দেয়াল খুঁজলাম। দাদার ঘরে কোনও ক্যালেন্ডার নেই। না থাক। গতকাল ছিল ষোলো, আজ ধর্মঘটের সতেরো দিন। মনে হচ্ছে আমরা একটা হারা-লড়াই লড়ে যাচ্ছি। প্রবেশন পিরিয়ডে বিশ্বনাথকে ছাঁটাই করা হল। সেটা কোম্পানির ইচ্ছে। শিক্ষানবিশের চাকরির কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। বিশ্বনাথের হাতের জব বারবার স্ক্রাপ হয়ে যেত। কোম্পানির দোষ ছিল না। তবু ইউনিয়ন রুখে দাঁড়াল। তিনদিন ধর্মঘটের পর কোনও বিজ্ঞ লোক এসে বলল—এটা বে-আইনী হচ্ছে। স্ট্রাইক টিকবে না। তোমরা বরং চার্টার অব ডিমান্ড দাও। রাতারাতি চার্টার অব ডিমান্ড তৈরি হল। চোদ্দো দফা দাবি। তবু বোঝা যাচ্ছিল হারা-লড়াই। ট্রাইব্যুনালে চলে গেল দাবিপত্র। কোথাকার কোন্ আনাড়ি কারিগর বিশ্বনাথের জন্য সুন্দর মনভোলানো বিলিতি শহর থেকে আমি চললুম নির্বাসনে। যেমন নাম-না-জানা অচেনা একটা বড় বাড়ির মেয়ের জন্য আমার দাদা মতীন চিরকালের জন্য হয়ে রইল পাগল মানুষ। কেমন যেন অদ্ভুত যোগাযোগ। বললে অবিশ্বাস্য শোনাবে। তবু এটা সত্য যে, সেই অচেনা মেয়েটার জন্য দাদা পাগল না হলে আমি ইউনিয়নে নামতামই না। সে ছিল বড় বাড়ির মেয়ে, আমার খ্যাপা দাদা মতীন তার কাছাকাছিই যেতে পারল না। বলতেই পারল না, 'তোমাকে চাই।' কেবল ঘুরে বেড়াল রাস্তায় রাস্তায়। তারপর একদিন তার চোখের ওপর দিয়ে চালাক একটি সাহসী ছেলে মেয়েটিকে স্কুটারের পেছনে নিয়ে চলে গেল। কেন এরকম হবে? কেন এরকম দুষ্প্রাপ্য হয়ে থাকবে একটি মেয়ে আমার দাদার কাছে? কেন থাকবে তাদের এরকম দামি বাগানের চারদিকে ওই অত উঁচু ঘের-পাঁচিল, যার মধ্যে আমরা কোনও দিনও যেতে পারব না? মেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারও কারও থাকবে স্কুটার, যা কেন আমাদেরও নেই? নিজের ঘরসংসার বজায় রেখে, পাগল ভাই আর বিধবা মায়ের দায় নিয়ে সমাজের সেই অব্যবস্থা আমি কি করে পালটে দেব? তেমন কোনও উপায় আমার ছিল না হাতের কাছে। টিমটিম করে অফিসের ইউনিয়নটা চলছিল তখন। আমার মাত্র একুশ কি বাইশ বছর বয়স। রাগে আক্রোশে ক্ষোভে আমি সেই ইউনিয়নের মধ্যে ফেটে পড়লাম। যদি তা না পড়তাম তবে আজ আমার পিছিয়ে যাওয়ার রাস্তা থাকত। আমি ইউনিয়নের চিহ্নিত কর্মী, দাঙ্গাবাজ, আক্রমণকারী মনোভাবসম্পন্ন লোক; আমার পিছনে ঘুরছে চার্জশীট আর তিনটে পুলিশ কেস। ভেবে দেখলে আমার দাদা মতীনের জন্যই আজ আমার এই রাত জাগার ক্লান্তি, অনভ্যাসের সিগারেট আর ভয়। হাইস্কিল্ড অপারেটরের সুন্দর বেতন থেকে শূন্যতা। কিংবা এই সবের জন্য সেই মেয়েটাই দায়ী, যাকে আমি চিনি না, যাকে চিনত না আমরা দাদা মতীনও। তা হোক। তবু সমাজের ব্যবস্থা পালটে যাওয়াই ভাল। আজ বরং আমি একটা হারা-লড়াই না-হয় হেরেই গেলাম। মেয়েটিকে ধন্যবাদ।

চিঠির একটা নীল কাগজ সামান্য উড়ে এসে আমার পায়ের গোড়ালিতে লাগল। কৌতূহলে তুলে নিলাম। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা—'কেউ ঠিকঠাক বেঁচে নেই। পুরোপুরি মরেও যায়নি কেউ। ওরকম কিছু কি হয় কোনও দিন? ঠিকঠাক বেঁচে থাকা, কিংবা পুরোপুরি মরে যাওয়া?'... আমি আর পড়লাম না। কী যে লেখে পাগল। মাঝে মাঝে ঠিকানা-না-লেখা খাম আমাকে দিয়ে বলে,'ডাকে দিয়ে দিস।' কখনও নিজেই গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে আসে ভাঁজ করা কাগজ। পিওনেরা হয়তো ফেলে দেয়, কিংবা হয়তো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়ে হাসাহাসি করে। সারা ঘরময় ছড়ানো এই কাগজ আর সিগারেটের টুকরো। পয়সা নষ্ট। হঠাৎ রাগ হয়ে গেল বড়। তোমার জন্যই, তোমার জন্যই এত সব গণ্ডগোল।

আমি মশারির ঢাকাটা রুক্ষ হাতে সরিয়ে নিলাম। রোগা একখানা মুখ। চমকে চোখ খুলল। জুলজুল করে ভীত সন্ত্রস্তভাবে আমাকে দেখতে থাকল। মশারির মুঠ ধরে থাকা আমার লোহাকাটা প্রকাণ্ড হাতখানার দিকে তাকিয়েই আমি লজ্জা পেলাম। আবার ঢাকা দিয়ে দিলাম দাদার মুখ। ও তো খুব বেশি কিছু চায় না। কেবল চিঠির কাগজ আর সস্তা সিগারেট। দেখলাম ওর ময়লা ঘেমো গন্ধের গেঞ্জি, গালে না-কামানো দাড়ি, আ-ছাঁটা চুল। বড় যত্নে নেই আমার দাদা মতীন। ঘুম ভেঙে ও এখন সন্দেহের চোখে ভীত মুখে আমাকে দেখছে। না, আমি ওর স্বপ্নের কেউ না। আমি বাস্তব, যার সঙ্গে ওর পাট অনেক দিন চুকে গেছে। আমি তাই আস্তে আস্তে ও ঘর থেকে এ ঘরে চলে এলাম।

থাক, আমার দাদা মতীন ওরকমই থাক। আমরা যা দেখতে পাই না, ও হয়তো তাই দেখে। বনের পাখিপাখালিরা এসে হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলে যায়, হয়তো মায়ারাজ্য থেকে আসে ওর চেনা পরীরা, ওকে ঘিরে আছে স্বপ্নের সুন্দর সব মানুষ। মনে হয় আমার দাদা মতীনের এখন আর কোনও দুঃখ নেই। সেই অচেনা মেয়েটি যদি এসে এখন সামনে দাঁড়ায়, যদি বলে, 'আমাকে চাও?' তা সে ওইরকম ভয় পাওয়া চোখে জুলজুল করে চেয়ে দেখবে। চিনবেই না; সেও তো এখন আর দাদার সেই স্বপ্নরাজ্যের কেউ নয়। কী হবে ওকে আর সুখ-দুঃখের বাস্তবের মধ্যে টেনে এনে? তার চেয়ে এই বেশ আছে আমার দাদা মতীন। পাগল মানুষ।

মা

কাল রাতে যেন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল। ঘুমের মধ্যেই শুনছিলাম টিনের চালের ওপর খই-ফোটার মিষ্টি শব্দ। করমচা গাছের ডালপালায় বাতাস লাগছে। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! সেই বৃষ্টির মধ্যে দেখি কর্তা খোলা জানালা বন্ধ করবার চেষ্টা করছে। বৃষ্টির ছাটে ভিজে যাচ্ছে মানুষটা। সেদিকে খেয়াল না করে আমি রাগে দুঃখে মানুষটাকে জিজ্ঞেস করছি—তুমি বেঁচে থাকতেও আমার বিধবার দশা কেন। সেই শুনে খুব হাসছিল মানুষটি। বেঁচে থাকতে একটা হাড়জ্বালানো শ্লোক বলত প্রায়ই—'সেই বিধবা হলি আমি থাকতে হলি না।' দেখলাম জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বিড়বিড় করে সেই শ্লোকটাই বলছে। এই দেখতে না-দেখতেই ঘুম ভেঙে গেল। ওমা, কোথায় বৃষ্টি। আর কোথায়ই বা সেই মানুষ। টিনের চালই বা কোথায়, কোথায়ই বা সেই করমচার গাছ। মরা মানুষের স্বপ্ন দেখা ভাল না। তবু আমি প্রায়ই দেখি। তাঁর মরার পর বারো বছর হয়ে গেল। ধর্মকর্মের দিকে ঝোঁক ছিল খুব। বলত—'যদি জন্মান্তর থাকে—বুঝলে, তবে আমি বত্তুর ছেলে হয়ে আসব। বোধ হয় সেইজন্যেই এখনও পৃথিবীতে জন্মায়নি মানুষটা।

Shahnaz

আত্মাটা আমাদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। দেখে যায় তাঁর আসার রাস্তা কতদূর তৈরি হল। ঘুম ভেঙে উঠে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছিলাম। কর্তার স্বপ্ন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওদের তো বাড়িঘর নেই, আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ানো। হয়তো শীতে বৃষ্টিতে বড় কষ্ট পেতে হয়। ওম পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে চলে আসেন। ইচ্ছে করে, কয়েকজন ব্রাহ্মণ ডেকে ছাতা আর কম্বল দান করি। অনেক টাকার ঝক্কি! মাঝরাতে বসে কত কথা ভাবছিলাম। শুনি বাইরে কাক ডাকছে। রাতে কাক ডাকা ভাল নয়। হয়তো জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। তবু বড় বুক কাঁপে। মঙ্গলের কোনও চিহ্ন তো দেখি না। টের পেলাম বতু তার বিছানায় পাশ ফিরল। আগে এক কাতের ঘুম ছিল ওর। ভোরবেলা তুলে দিতে গেলে ময়দার দলার মতো বিছানার সঙ্গে লেগে থাকত। বাচ্চা বেলার মতো খুঁতখুঁত করে বলত—আর একটু মা, আর একটু। ডান কাতের ঘুম হল, এবার বাঁ কাতে একটু ঘুমোতে দাও। পাঁচ মিনিট। কষ্ট হত তুলতে। তবু চাকরি উন্নতি এসব ভেবে মায়া করতাম না। তুলে দিতাম। যখন চা করে রুটি তরকারি খেতে দিতাম তখনও দেখতাম, ওর দু'চোখে রাজ্যের ঘুম লেগে আছে। আর, এখন কয়েক দিন হল রাতে ওর পাশ ফেরার শব্দ পাই। সারা রাত কেবলই পাশ ফেরে। ঘুম হয় না বোধ হয়। ও এখন জামিনে খালাস আছে। পরশু দিনও পুলিশের লোক এসে বলে গেল—ও যেন বাড়িতে থাকে, কোথাও না যায়। কারখানার ব্যাপারটা আমি একটু একটু জানি। বেশি জানতে ভয় করে। তবু একদিন সাহস করে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'তোরা কি জিতবি?' ও ঠোঁট ওলটাল। বুঝি অবস্থা ভাল নয়। বললাম—'কি দরকার ওসব হাঙ্গামা করে! মিটিয়ে ফেল।' ও শুকনো হেসে একটা কবিতার লাইন বলল—'যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান...!' ভাল বুঝলাম না। কারখানা থেকে ওর বন্ধুরা আসে। আমি রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকি, এ ঘরে ওরা মিটিং করে। মাঝে মাঝে একটু চেঁচামেচি হয়, এ ওকে শাসায়। বুঝি ওদের মধ্যে মিল হচ্ছে না। সবাই এককাট্টা নয়। বতু গোঁয়ার। তবু জানতে ইচ্ছে করে ও এখন কোন্ দলে। ওর অবস্থাটা কী! আবার ভাবি বাইশ বছর বয়স থেকে সংসার ঘাড়ে নিয়েছে। ও কি আর ওর দায়িত্ব বোঝে না! আমার চেয়ে বরং ভালই বোঝে। আমি তো মাত্র রান্না করি আর ঘর আগলাই। ওকে কত কষ্ট করতে হয়, হয়তো অপমান সহ্য করে বকাঝকা খায়, শীতে বৃষ্টিতে কতটা পথ পার হয়ে যাতায়াত করে। খুঁটে এনে আমাদের খাওয়ায়। গত আশ্বিনে আঠাশে পা দিল বতু। কারখানায় যখন ঢুকল তখনও দাড়িতে ভাল করে ক্ষুর পড়েনি, কচি মুখখানি। এখন বয়েসকালের গোটাগুটি মানুষ হয়ে উঠেছে। মতু যদি ঠিক থাকত তবে বতুর বিয়ে দিতাম। এটাই ঠিক বয়স। কর্তাকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার রাস্তা তৈরি হয়ে যেত। বতুর ছেলে হলে রোদে বসে তেল মাখাতাম, চুপচুপে করে। ঠাট্টা করে বলতাম, 'হ্যাঁ রে, সত্যিই কি আর জন্মে তুই আমার ভাতার ছিলি?' ভাবতেই গায়ে কেমন শিরশির করে কাঁটা দেয়। বতুর ছেলে হয়ে কর্তা যদি সত্যিই আসত তবে নতুন সম্পর্কে কেমন লাগত আমার!

আজকাল কেমন যেন ভুলভাল হয়ে যায়। পুরনো কথার সঙ্গে আজকালের কথা গুলিয়ে ফেলি। তাল থাকে না। বোধ হয় পরশু দিন দুপুরে একটু ঘুমিয়েছি। ঘুম ভাঙল যখন তখন শীতের বেলা ফুরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে সুদর্শন চাকরের নাম ধরে ডাকছিলাম। মনে হয়েছিল শ্বশুরমশাই কাছারি থেকে ফিরে এলে বড়ঘরের বারান্দায় পুবমুখো ইজিচেয়ারটায় বসে আছেন, এখনও তাঁকে তামাক দেওয়া হয়নি। সুদর্শনকে ডাক দিয়ে আমি মাথার ঘোমটা ঠিক করে উঠতে যাচ্ছি, শ্বশুরমশাইয়ের পা থেকে জুতো খুলে দেব বলে। ভুল

বুঝতে পেরে কেমন যেন অবশ অবশ লাগল। কতকালকার কথা, সব তবু যেন মনে হয় গতকালের দেখা। সুদর্শন সাতাশ বছর চাকরি করে শ্বশুরবাড়ির কাছারিঘরে মারা গেল। তখন বতুর বয়স বোধহয় চার কি পাঁচ। সুদর্শনের কাঁধে চড়ে সে অনেক ঘুরেছে। সুদর্শন মরে গেলে বাড়িসুদ্ধ লোক কেঁদেছিল। সাতাশ বছরে ও তো আর চাকর ছিল না। যে কথা বলছিলাম, যে ভুল পেয়ে বসেছে আমাকে। বতু মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, সারাক্ষণ বিড়বিড় করে কি বকো মা? চমকে উঠি। বিড়বিড় করি। হয়তো করি। সারাদিন বড় কথা বলতে ইচ্ছে করে। মাথার মধ্যে ঠাসা সব পুরনো দিনের কথা। শোনার লোক নেই। তাই বোধ হয় আকাশ বাতাসকে শোনাই। তোরা তো কাছে থেকেও নেই। বতুর চাকরি আর ইউনিয়ন, সারা দিনে কথা দুরে থাক, আমার দিকে ভাল করে তাকায় না পর্যন্ত। আর মতু! সে আমাকে চেনেই না; সারা দিন নীল চিঠির মধ্যে ডুব থাকে। কর্তা বলত, 'তোমার দুটো ঘোড়া, গাড়ি চলবে ভাল।' গাড়ি বলতে আমাকেই বোঝাত, যেন আমার চলার ক্ষমতা নেই ছেলেরা না চালালে। কাছে তাকে পেলে এখন বলতাম—ঘোড়া দুটো কেমন দু'মুখো ছিটকে গেল দেখ। খাদের মুখে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, একটু জোর বাতাস এলেই গড়িয়ে পড়বে। আর উঠবে না।

মরতে অবশ্য আমার একটুও দুঃখ নেই। কিন্তু মতু-বতুর কথা ভাবলে মরার ইচ্ছেটাই চলে যায়। ওরা দুজন দুরকমের পাগল। আবার ভাবি, ওদের জন্যই যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে তো আরও বহুকাল বেঁচে থাকতে হবে। সে যে বড্ড একঘেয়ে। আবার যদি মরে যাই তবে ওদের দেখবে কে? বিশেষ করে মতুকে! হয়তো ততদিনে বতুর বউ এসে যাবে। কিংবা এমনও তো হতে পারে যে, মতু ভাল হয়ে গেল আবার আগের মতো চাকরি-বাকরি করল! হতে পারে না কেন! এরকম কি হয় না।

সামনের শনিতে একটু বারের পুজো দেব। আর প্রতি বিষ্যুৎ বারে একটা বামুন ছেলেকে ডেকে এনে পাঁচালি পড়াব। নিজে কয়েক দিন পড়বার চেষ্টা করেছি। চোখে বড় জল এসে যায়। তিনটে মানসিক করা আছে আমার মতুর জন্য। অনেক দিন হয়ে গেল। মনের ভুলে একটা মানসিক করে রেখেছি ময়মনসিংহের কালীবাড়িতে। কালীর সোনার চোখ গড়ে দেব। এখানে বসেই করেছি সেই মানসিক, এখন ভাবি মতু ভাল হলে কী করে ওখানে পুজো পাঠাব? ওরা কি দেবে আমাকে যেতে? বতুই কি ছাড়বে? কিন্তু বুঝি না, গেলে কি হয়! ওসব তো আমাদেরই দেশ জায়গা ছিল। বতু-মতু দুজনেই, জন্মেছে ওখানে। কত যে বালাই তৈরি করছে মানুষ।

বতুর বউ এসে মতুকে দেখবে—এইরকম একটা বিশ্বাস আঁকড়ে আছি। মরার সময় হলে—যদি বতু ততদিনে বিয়ে না করে—

তবে ওই বিশ্বাস নিয়েই আমাকে যেতে হবে। তবু বড় ভয় করে। যদি বতুর বউ তেমন লক্ষ্মীমন্ত না হয়! যদি মায়াদয়া না থাকে তার! মাঝে মাঝে এসব কথা ভেবে উতলা হয়ে বলে ফেলি। বতু রাগ করে—সমাজ-সংসারের কথা ভাবো মা, কেবল নিজেরটুকু চিন্তা করে করেই গেলে। দেখ না, সমাজের চেহারা এমন পাল্টে দেব যে, মানুষকে আর নিজের সংসারের কথা ভাবতেই হবে না। তখন সবাইকেই দেখবে সমান। বতুটাও একরকমের পাগল। সমাজ কি আমার ঘরে এসে হাঁড়ির খোঁজ নেবে! কিংবা হয়তো ও ঠিকই বলে। সমাজ-সংসারের আমি কতটুকু দেখেছি? ঘোমটার মধ্যেই তো আদ্দেক বয়স কেটে গেল। যখন সহজভাবে চারদিকে তাকাতে পারলাম তখন চোখে ছানি আসছে। তবু আমি বতুর সমাজের ওপর ভরসা না করে ওর বউয়ের ভরসাই করে আছি। যদি সে মেয়েটার মনে একটু মায়ের ভাব থাকে তবে মতুর জন্য

Shahnaz

চিন্তা নেই। ওকে বালাই বলে না ভাবলেই হল। ও তো কাউকে জ্বালায় না, চেঁচামেচি করে না। খুব শান্ত থাকে। সারাদিন কেবল চিঠি আর সিগারেট। আমি মাঝে মাঝে ঘরটা পরিষ্কার করি। চিঠির কাগজ জড়ো করে টেবিলে গুছিয়ে দিই। ওই কাগজগুলো ফেলতে গেলেই ভীষণ রাগ করে মতু। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু 'উঃ' 'উঃ' বলে ওপর দিকে হাত ছুড়তে থাকে। তবু জোর করে যদি ফেলি তবে মাথার চুল ছেঁড়ে, দুম দুম করে দেয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদে। নিজের মাথাটার ওপরেই ওর চিরকালের রোখ। চুল ছেঁড়া, মাথা ঠোকা সেই ছেলেবেলার মতোই আবার ফিরে এসেছে। ছেলেবেলায় আমার ওপর রাগ হলে ও মাথা দিয়ে আমাকে ঢুঁ মারত। একবার বুকের মাঝখানে ঢুঁ মেরেছিল। এমনিতেই অম্বলের ব্যথা আমার, সেই ঢুঁ খেয়ে দম বন্ধ হয়ে চোখ কপালে উঠল। এখনও বুকের হাড়ে পাঁজরায় সেই ব্যথা একটুখানি রয়ে গেছে। আর কোনওদিন কি মতু আদর করতে গিয়ে আমার বুকে মুখ গুঁজবে কিংবা রেগে গিয়ে মারবে ঢুঁ? না, মতু আর সে মতু তো নেই। তাই বুকের সেই ছোট্ট ব্যথাটুকু আমার চিরকাল থাক। সেই ব্যথাটুকুই মতু হয়ে আমার কাছে আছে।

খুব ভোরবেলাতেই বতু উঠে তার দাদার ঘরে গিয়েছিল আজ। এমনিতে বড় একটা যায় না। কি জানি আজ বোধহয় দাদার জন্য মায়া হয়েছিল একটু। তাই দেখে এল। কিংবা হয়তো রাতে কোনও স্বপ্ন দেখেছিল দাদাকে নিয়ে। বতুর ভালবাসা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মতুরটা যেমন যেত। তবু বতুর মনেও বড় মায়া—আমি জানি। মানুষের জন্য ও ভাবে, সমাজ-সংসারের জন্য ভাবে। পাড়ার লোকেদের দায়ে দফায় ও দেখে। মতুরও ভালবাসা ছিল, তবে সেটা অন্য রকমের। অন্যের দুঃখ দেখলে মন খারাপ করে থাকত, হয়তো লুকিয়ে কাঁদতও, কিন্তু বুক দিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত না, বতু যেমন করে। হয়তো মতুর লজ্জা সংকোচ বেশি ছিল। তা ছাড়া ছিল ওর কুনো স্বভাব, মাথার মধ্যে ছিল চিন্তার কারখানা। তাই ওর ভালবাসা ছিল ভাবের।

চা খেয়েই সকালেই বতু বেরিয়ে গেল। বলে গেল—'ভাত ঢাকা দিয়ে রেখো, ফিরতে দেরি হবে।' ওর মুখ চোখের অবস্থা ভাল না। কী জানি কী হবে। ওর বন্ধুরা আমাকে বলে যায়—ওর কিছু হবে না। চাকরি গেলেও ও আবার চাকরি পাবে। পুলিশের কথা ভাবি। ওরা নাকি বড্ড মারে।

অনেক বেলা পর্যন্ত মতু শুয়ে আছ। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম—ওঠ রে। উঠল। পারতপক্ষে অবাধ্যতা করে না। চায়ের কাপ হাতে দিলাম। বাসি মুখে চা খেতে লাগল। অনেক করেও ওকে দাঁত মাজাতে পারি না, স্নান করাতে পারি না। গায়ে চিট হয়ে ময়লা বসেছে। ওকে যে জোর করে ঘরে টেনে নিয়ে যাব এমন আমার সাধ্যে কুলোয় না। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে বতু জোর করে স্নান করিয়ে দেয়। ওই জোর করাটা দেখতে আমার ভাল লাগে না। বুকের মধ্যে একটু কেমন করে। বেশ কয়েক দিন হল বতু দাদাকে স্নান করায় না।

মেঝে থেকে সিগারেটের টুকরোগুলো তুলে বাঁ হাতে তেলোয় জমা করছিলাম। শিউলি ফুল কুড়োনোর কথা মনে পড়ে। সামান্য একটু শ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে গেল। আস্তে আস্তে অথর্ব হতে চললাম। অথচ খুব বেশি দিন আগে জন্মেছি বলে মনে হয় না। বে-ভুল মনে কেবল পুরনো দিনের কথা কালকের কথার মতো মনে হয়। কিন্তু সেটা তো সত্যি নয়। মতুরই বয়স ছত্রিশ পার হয়ে গেল। ওর আগেও একটা হয়েছিল। বাঁচল না। ভালই হয়েছে। সেটা আবার কোন্ রকমের পাগল হত কে জানে।

মতু একটুক্ষণ আমাকে দেখল। যেন চেনে না। তবু আমি জানি মতু মাঝে মাঝে খুব

স্বাভাবিক হয়ে যায়। একদিন মাঝরাতে ওর ডাক শুনলাম—মা, ওমা, আমার টেবিলে জল রাখোনি কেন? ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। আনন্দে ধক্ করে উঠল বুকের ভিতরটা। জল খাওয়ার পর কিন্তু আর চিনল না আমাকে। তারপর মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে জল না রেখে দেখেছি আবার 'মা' বলে ডাকে কি না। ডাকত মাঝে মাঝে। কিন্তু জল খাওয়ার পরই ভুলে যেত। জল না রেখে কষ্ট দিয়ে ওকে পরীক্ষা করতে আর ইচ্ছে হয় না। বেশি সিগারেট খায় বলেই বোধ হয় ওর জলতেষ্টা খুব। তেষ্টার জলের চেয়ে কি মা ডাকটা বেশি? তাই আমি জল রাখতে ভুলি না।

ওর এ অবস্থা হওয়ার সময়ে প্রথমদিকে বন্ধুরা খুব আসত। এখন আর আসে না। লজ্জার মাথা খেয়ে তাদের কাছে মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করতাম। কেমন মেয়ে, কীরকম বয়স, কোন্ জাত! তারাও কেউ দেখেনি। মতুর কাছেই শুনেছে বেশি বয়স না তার, খুব পবিত্র সুন্দর চেহারা, আর খুব অহংকারী। কোনওদিকে নাকি তাকাতই না। তার নাম, জাত কেউই জানে না। এসব শুনে আমি একদিন বতুকে বলেছিলাম—'কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দে। তাতে মেয়েটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে লেখ যে, আপনার জন্যই আমার দাদার এই অবস্থা, আপনি এসে তাকে বাঁচান। আমরা আপনার কাছে কেনা হয়ে থাকব।' বতু রাজি হল না, ঝাঁকি দিয়ে বলল—'সে মেয়েটা কী করে বুঝবে যে, এটা তাকেই লেখা? তা ছাড়া আমরা এত হীন হতে যাবই বা কেন?' তারপরেই বতু মেয়েটাকে গালগাল দিতে লাগল, সে বড় লোকের মেয়ে বলে। আমি কিন্তু বতুর মতো করে বুঝি না। মেয়েটাকে চিনতে পারলে আমি গিয়ে তাকে সাধ্যসাধনা করতাম, দরকার হলে পায়ে ধরতাম। সম্মানের চেয়েও যে ছেলেটা আমার বেশি। হয়তো বিজ্ঞাপন মেয়েটা দেখত না, হয়তো দেখলেও বুঝত না, তবু চেষ্টা করলে দোষ কি ছিল? তা না করে বতু গেল সমাজের ব্যবস্থা পাল্টাতে। দূর থেকে যে এত ভালবাসা যায় আর পাগল হওয়া যায় তা বতু বোঝেই না। আমি কিন্তু একটু একটু বুঝি। বতু-মতুর বাবা তো এখন বহুদূরের লোক, তার শরীর নেই, ডাকলেও তার সাড়া পাওয়া যাবে না। তবু আমার এই বুকটাতে ওই লোকটার জন্য ভালবাসা টলটলে হয়ে আছে। যদি ভগবানকে দেখতে চাই তবে হয়তো বলব—'তুমি ওই চেহারা ধরে এসো।' কি জানি হয়ত মতুর ভালবাসা সেরকম নয়। আমি তো তাকে পেয়েছিলাম কোনওদিন, মতু তো পায়ইনি। কিংবা হয়তো মতুও সেই মেয়েটিকে তার নিজের মতো করে মনে মনে পেয়েছে। ঠিক জানি না। আমার ভাবনা-চিন্তায় অনেক গণ্ডগোল। মতুর মনের ভিতরটা তো আমরা কেউ দেখতে পাই না।

একটা নীল কাগজ কুড়িয়ে টেবিলে রাখতে গিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। ছানিকাটা চোখ, মোটা চশমা, তাই ভাল পড়া গেল না। মনে হল যেন লেখা আছে যে, পৃথিবীতে কেউই ঠিকঠাক বেঁচে নেই, পুরোপুরি মরেও যায়নি কেউ। সুন্দর কথাটা। মতুর মাথায় চিরকালই সুন্দর সুন্দর কথা আসে। মনে মনে বললাম—'ঠিকই লিখেছিল মতু। পৃথিবীতে কেউই ঠিকঠাক বেঁচে নেই, আবার পুরোপুরি কেউই মরে যায়নি। তোর অনেক জ্ঞান, তুই বড় ভাল বুঝিস।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখি মতু তাকিয়ে আছে। ঠিক যেমন ছেলে মায়ের দিকে তাকায়। মনে হল এক্ষুনি 'মা' বলে ডাকবে, বলবে, 'খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রইলাম ওর একটু কথা শোনার চেষ্টায়। ও চোখ ফিরিয়ে নিল।

সেই মেয়েটার ওপর মাঝে মাঝে বড় রাগ হয় আমারও। কেন রে পোড়ারমুখী, কোন্ কপালে আমার ছেলের চোখে তুই পড়েছিলি? হ্যাঁ, ঠিক ওইরকম গ্রামের ভাষায় মেয়েটার সঙ্গে আমি মনে মনে ঝগড়া করি। আবার ভাবি, আমার মতু যাকে অত ভালবেসেছিল তাকে আমি কি

Shahnaz

করে এরকম ঘেন্না করব! তাই আবার মনে মনে বলি, 'তোমাকে চিনি না, তবু বলি, মা, সুখে থাকো।'

মতীন

কেউ ঠিকঠাক বেঁচে নেই। পুরোপুরি মরেও যায়নি কেউ। ওরকম কিছু কি হয় কোনওদিন? ঠিকঠাক বেঁচে থাকা, কিংবা পুরোপুরি মরে যাওয়া?

তবু দেখ মাঝে মাঝেই মানুষেরা মরে যায়। হঠাৎ সময় চলে আসে। অসময়ে। কেউ বুঝতেই পারে না। সখেদে বলে—বহু কাজ বাকি রয়ে গেল। বাস্তবিক মানুষের, পিঁপড়ের, পাখিদেরও বহু কাজ বাকি থেকে যায়। ঠিক সময়ে সময়ে হয় না।

আবার একটু পুরনো হলে সকলেই নতুন জীবন চায়, নতুন শরীর কিংবা চায় দুঃখ-দূর, কিংবা চায় তাকে, যাকে এবার পাওয়া হল না।

তাই নির্বাসনে কেউ যায় না, কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে। কেউ একজন করপুটে ধরে নেয়। আবার ফিরিয়ে দেয় খেলার ভিতরে।

ফিরে এলে আবার সেই অবিরল মাটি কাটার শব্দ। ধুপ ধুপ ধুপ। দিনরাত। খুব দূরে নয়। মাঝে মাঝে অন্য সব শব্দের সঙ্গে মিশে যায়। তবু শোনা যায়, ঠিকমত কান পাতলে। যেন গভীর মাটির নীচে নেমে যাচ্ছে একজন মাটি-মজুর। পরিশ্রমী সে। সারাক্ষণ তৈরি করছে বিচিত্র সুড়ঙ্গ, সুঁড়িপথ। হয়তো তুচ্ছ কাজ, অকাজের। তবু তার কত মনোযোগ! সে ফিরেও দেখে না কতখানি কাটা হল, হিসেবও করে না আর কতখানি বাকি। সারা দিন রাত অবিশ্রান্ত তার কাজ চলতে থাকে। শব্দ উঠে আসে, গর্ত গভীরের দিকে নেমে যায়।

মনে হয় ওটা বুকের শব্দ! কিন্তু তা নয়।

কিংবা হয়তো ওটা বুকের শব্দই! আমারই ভুল হয় কেবল।

কোনও কাজ নেই। তাই মাঝে মাঝে মিঠিপুর ঘুরে আসি। তুচ্ছ শহর। জানালার তাকের ওপর। এক দুই দানা চিনি ফেলে দিই। শূন্য শহরের লুকনো জায়গা থেকে অমনি উঠে আসে পরিশ্রমী পিঁপড়ের সারি। মিঠিপুরে সচ্ছলতা দেখা দেয়। ওরা কি জানে পরিশ্রমই সচ্ছলতা? কিংবা মনে করে সচ্ছলতা ঈশ্বরের দয়া?

হামাগুড়ি দিয়ে আমি জেলেদের গ্রামে চলে আসি। আমার টেবিলের তলায় ঘন ছায়ায় নিবিড় সেই গ্রাম। জাল ছড়িয়ে অপেক্ষা করছে তিনজন জেলে। শান্ত, ধৈর্যশীল, আশাবাদী তিন মাকড়সা। কখনও মুড়ির টুকরো ছুড়ে মারলে জালে একটু আটকে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তারা নড়ে ওঠে। শান্ত ধৈর্যশীল তিনজন আশাবাদী মাকড়সার কাছে জ্ঞানলাভের জন্য বসে থাকি।

খনিশ্রমিকের মতো আঁকাবাঁকা পথ কাটছে উইপোকা আমার বইয়ের তাকে। তাক থেকে বইয়ের ভিতরে। আমার বইগুলো ঝুরঝুরে হয়ে এল। তবু আমি বাধা দিই না। তাদের ক্লান্তিহীন কাজ দেখি। দেখ, কেমন তৈরি করছে গভীর জালিপথ, নকশা ছাড়াই মিলিয়ে দিচ্ছে এ ধারের সঙ্গে ওধারের সুড়ঙ্গ। যশোলোভ নেই, বাহবার ধারও ধারে না।

দেখে যাই। আশ্চর্য এইসব শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে খনির কাছাকাছি। সুন্দর ভ্রমণ। লোভ বেড়ে যায়। দেখতে ইচ্ছে করে আরও কত গ্রাম, গঞ্জ, পাহাড় ও প্রান্তর পড়ে আছে এইখানে, রয়েছে নিস্তব্ধ জীবাণুদের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র, ধুলোর কণার মধ্যে নিহিত রয়েছে পরমাণুর দিক-প্রদক্ষিণ। দেখ আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা কত কম। সব আছে চারধারে, দেখা যায় না।

দুঃশীল রত্নাকর বসে আছে গাছতলায় পথিকের অপেক্ষায়। এ পথে এখন আর কোনও পথিক আসে না। সম্ভবত ঈশ্বর তাদের নিরাপদ ঘুরপথ চিনিয়ে দিয়েছেন। তবু অপেক্ষায় বেলা যায়। জীর্ণ হয়ে আসে ঘরদুয়ার, বয়স বেড়ে যায়, ক্ষুধা বাড়ে। রত্নাকর বসে থাকে গাছতলায় পথিকের অপেক্ষায়। বহুকাল কেটে যায়। অভ্যাসবশত রত্নাকর বসে আছে, পাশে রাখা বশংবদ খাঁড়া, হঠাৎ দূরে শোনা গেল পথিকের গান, সর্বাংস্তত্রবানুরঞ্জয়ানি...।' অমনি শরীরে রক্ত ছল্‌কে ওঠে। রত্নাকর খড়্গ তুলে নেয় শূন্যে, দৌড়ে যায়। তারপরই ঢলে পড়ে, ভয়ঙ্কর ভারী খড়্গ তাকে টেনে রাখে। ঝাপসা চোখে রত্নাকর চেয়ে দেখে অদূরে পথিক। তরুণ, ঐশ্বর্যবান। রত্নাকর কেঁদে ওঠে। পথিক সামনে এসে দাঁড়ায়, 'কী চাও রত্নাকর?' রত্নাকর হাত জোড় করে বলে, 'আমার পরিবার উপোস করে আছে, দয়াময়, দয়া করো। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।'

মাঝে মাঝে তাকে ডাক দিই, 'রত্নাকর, ওহে রত্নাকর।' বুড়ো ভিখিরিটা জানালার কাছে চলে আসে। আমি তাকে একটা দুটো পয়সা দিই। জিজ্ঞেস করি, 'কখনও কি ডাকাত ছিলে?' সে মাথা নাড়ে। হাসে। চলে যায়।

প্রায়ই তাকে দেখি বসে আছে গাছতলায়। পথিকের অপেক্ষায়। একমাত্র সঙ্গী তার কর্মফল।

কোনও মানে নেই। তবু দেখি ভাঙা, ছেঁড়া, অবান্তর দৃশ্য ভেসে যায়। কিছুতেই মেলানো যায় না।

কখনও দেখি একটা বল গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের ওপর। খেলুড়ির দেখা নেই। তবু বল গড়িয়ে যাচ্ছে। একা, সাদা, রৌদ্রের ভিতরে।

কখনও দেখি প্রকাণ্ড ভাঙা একটা মসজিদ বাড়ি, আগাছায় ভরা, পরিত্যক্ত, দেউলিয়া। তবু পড়ন্ত বেলায় তার উঠোনে কে একজন নীরবে নমাজ পড়ছে।

দেখি আল্লা বুড়ো দরজি। আল্লার বুকের ভিতরে হঠাৎ জেগে উঠছে ধানভানার তোলপাড় শব্দ। ফসলের মতো উঠে আসছে ভালবাসা। তাই তাঁর ছুঁচের মুখে সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে বারবার। আল্লা বুড়ো দরজি অন্যমনে চেয়ে আছে। কিছুই মেলানো যায় না। কিছুতেই মেলানো যায় না। তবু চেয়ে দেখি আমার ছেলেবেলায় হারানো বল তার কোলের কাছে পড়ে আছে।

একদিন সুসময়ে তিনি সব ফিরিয়ে দেবেন।

চায়ে চিনি কম হয়েছিল, খুম কম। হয়তো দেওয়াই হয়নি। কদাচিৎ কখনও টের পাই চায়ে চিনি কম কিংবা বেশি। আজ পেলাম। তার মানে আজ আমি স্বাভাবিক আছি। অন্য অনেক দিনের চেয়ে ভাল।

আমি ভাল আছি। তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। তুমি কেমন আছ?

মনে হয় তুমি এক রকমের ভাল আছ। আমি আর এক রকমের। তবু হয়তো চেনা মানুষেরা একে অন্যকে ডেকে মতীনের দুঃখের কথা বলে, 'দেখ হে, এতদিন সুখেই মতীনদের দিন কেটে যাচ্ছিল! সবই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু তারপর একদিন মতীনের চোখে পড়ে গেল সুন্দর একটি মেয়ে...।' এইভাবেই মতীনের দুঃখের কথা ছড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তো তোমার কানেও যাবে একদিন। চিন্তা কোরো না। আমি ভাল আছি। ভাল থাকা এক-এক রকমের।

চায়ে চিনি কম হয়েছিল। কেন? কোথাও কি কোনও গণ্ডগোল হচ্ছে খুব! দূরে কোথাও যুদ্ধ বাধলে আমাদের চায়ে মাঝে মাঝে চিনি কম হয়ে যায়। মনে হয় কী যেন একটা টানাপোড়েন চলছে চারপাশে। হয়তো এটা এ বাড়িতে, হয়তো সেটা বাইরের জগতে কোথাও।

Shahnaz

সংসারে কি খুব অভাব চলছে! কে জানে! বাইরে কোথাও কি হচ্ছে কোনও গণ্ডগোল? কে জানে! আমি শুধু জানি, আজ চায়ে চিনি কম হয়েছিল।

সকালের দিকে কে একজন ঘরে এসেছিল। আমার মুখের ঢাকা সরিয়ে তাকাল। চোখে চোখ। মনে হল তার চোখে বড় আক্রোশ। হয়তো মারবে। কিন্তু মারল না। আবার আমার মুখ ঢেকে দিল। যখন চলে যাচ্ছে লোকটা, তখন পিছন থেকে দেখে চিনতে পারলাম। বতু। আমার ভাই ব্রতীন। ঘরে পোড়া সিগারেটের গন্ধ। বতু কি সিগারেট খায়? আগে তো খেত না। কেমন যেন দেখলাম ওর মুখ চোখ! ইচ্ছে হল ডেকে জিজ্ঞেস করি, 'তোর কিছু হয়নি তো বতু? ভাল আছিস তো?' কিন্তু কেমন লজ্জা করল।

একটু পরেই ঘরে এল মা। চিনতে পারলাম। দেখলাম মা মেঝে থেকে আমার সিগারেটের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে; চিঠির একটা কাগজ পড়ার চেষ্টা করল ভ্রূ কুঁচকে। কী যেন বিড়বিড় করল একটু। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, 'চোখে আজকাল কেমন দেখছ মা?'

মায়েরা হয়তো কিছু টের পায়। দরজায় দাঁড়িয়ে মা ফিরে তাকাল। যেন তক্ষুনি বলবে, 'মতু, তুই কি কিছু বলবি?' লজ্জা করল। চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

জানালার রোদ এসে লেগে আছে। জানালার কাছে এসে দাঁড়াই। খুবই স্বাভাবিক দেখি চারপাশ। রাস্তার তেমাথায় বকুল গাছ, চৌধুরীদের বাগানের ঘেরা-পাঁচিলের ইঁট বেরিয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে একটা চৌখুপী জমি—বাড়ি উঠবে বলে ইঁট সাজানো হয়েছে, পাল্লাখোলা লরি থেকে বালি খালাস করছে কয়েকজন কুলি, ইলেকট্রিকের তারে লটকে আছে পুরনো ছেঁড়া সাদা একটা ঘুড়ি। চিন্তিত মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। উঁচুতে নীল ছাদের মতো আকাশ, কয়েকটা কাক চিল উড়ছে।

খুবই স্বাভাবিক আছে চারপাশ। তবে কেন চায়ে চিনি কম হয়েছিল? দূরে কিংবা কাছে কোথাও কি যুদ্ধ হচ্ছে খুব? সংসারে কি খুব অভাব চলছে? অতি তুচ্ছ ঘটনা। চায়ে চিনি কম। মাঝে মাঝেই তো এরকম ঘটে। ভুল হতে পারে। তবু দেখ, সারা দিন বিস্বাদ চায়ের স্বাদ মুখে লেগে আছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি থেমে আছি। বড় বেশি থেমে। মৃত্যু এরকমই হয়। নিস্তব্ধতার মতো। অথচ দেখ সারা দিন আমার চারদিকে চলছে কাজ। পরিশ্রমী পিঁপড়েদের, ধৈর্যশীল মাকড়সার, উইপোকার। সারা পৃথিবীময় জঘন্য জীবাণুরাও ঘুরছে কাজের সন্ধানে, কিংবা আশ্রয়ের। আমিই থেমে আছি কেবল। ইচ্ছে করে জাল ফেলে বসে থাকি, গর্ত খুঁড়ি, কিংবা চাষ করে ফসল নিয়ে আসি ঘরে। এরকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন আমার ভিত নড়ে যায়। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠি। প্রশ্ন করি, 'আমি এরকম হয়ে আছি কেন? কেন আর সব জীবন্ত প্রাণীর মতো আমারও নেই সুখ দুঃখ? আমি কি মরে গেছি? কিংবা, আমার জন্মই হয়নি? আমি কি সব পাওয়া পেয়ে গেছি? কিংবা কিছুই পাইনি?' আস্তে আস্তে কারণমুখী হতে চেষ্টা করি। অমনি জীবন বড় জটিল বলে বোধ হয়। আমি সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াই, দেয়ালে হাত চেপে ধরি, ঢকঢক করে মাথা ঠুকি। বেরিয়ে পড়ব বলে দরজার কাছে চলে যাই। তখনই মনে পড়ে—আমি অস্ত্রহীন। যথেষ্ট পোশাক নেই গায়ে। অবহেলা সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি নেই। যাওয়া হয় না। ফিরে আসি ঘরের ভিতরে। স্বপ্নের ভিতরে।

পাশের ঘরে কারা কথা বলছে! বিকেলে ঘুম থেকে উঠে শুনি খুব গণ্ডগোল। চিৎকার। আস্তে আস্তে উঠি। ঘরের মাঝখানে ঘরে বেড়াই। চিৎকার খুব বেড়ে যায়। বিরক্তি বোধ হয়।

মাঝখানের দরজা বন্ধ। সেই বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে বলি—'চুপ করো।' কেউ চুপ করে না। মাঝে মাঝেই ওই ঘরে কারা যেন আসে। গোপনে কথা বলে। হয়তো পরস্পরকে ভালবাসার কথা। কিন্তু আজ বড় গণ্ডগোল। আমি আবার চিৎকার করে বলি—'চুপ করো।' কেউ চুপ করে না; হতাশ লাগে বড়। শুনতে পাই মোটা ভাঙা বিশ্রী গলায় কে যেন চিৎকার করে বলছে—'আমারও পাগল ভাই, বিধবা মা আছে, আমি স্বার্থত্যাগ করছি না?' কথাটা শুনে লোকটার জন্য আমার সামান্য দুঃখ হয়। আহারে, লোকটা! পাগল ভাই আর বিধবা মা নিয়ে দুঃখে আছে বড়। ইচ্ছে করে ওকে এই ঘরে ডেকে আনি, একটি দুটি সান্ত্বনার কথা বলি। বলা হয় না। ওরা ভয়ংকরভাবে চিৎকার করে ওঠে। ইমপস্টার। সোয়াইন। তোমার জন্যই আমরা ডুবে যাচ্ছি।...বাঁচার জন্য...সংগ্রামের জন্য...। তুমি আমাদের খুন করছ, খুন...। ...স্বার্থত্যাগ করতে শেখো...।

আমি ঘরের মাঝখানে যাই, কোণে চলে যাই, কিন্তু গণ্ডগোল সমানভাবে কানে আসতে থাকে। জানালার কাছে যাই, বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরিয়ে নিই। গণ্ডগোল, বড় বেশি গণ্ডগোল। হঠাৎ মনে পড়ে সকাল চায়ে চিনি কম হয়েছিল। বিকেলে চা দেওয়াই হয়নি। ইচ্ছে করে পাশের ঘরে গিয়ে ওদের ধমক দিয়ে বলি—'আমি জানতে চাই আমাকে কেন চা দেওয়া হয়নি? কেন আমার চায়ে চিনি কম হবে?'

বোধ হয় অনেক দিন বৃষ্টি হয়নি। আখের চারা গাছগুলি অসময়ে মরে গেছে। আমাদের দেশে তাই চিনি তৈরি হল না এবার। আমি মনে মনে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে থাকি। বিস্বাদ চায়ের স্বাদ মুখে লেগে থাকে।

টের পাই মাথার চুলের ভিতরে বিলি কেটে দিচ্ছে একখানা হাত। বুঝি, মা। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, আমার চায়ে চিনি দাওনি কেন মা? কোথাও যুদ্ধ বেধেছে খুব? চিনি আজকাল পাওয়া যায় না!' কিন্তু সে প্রশ্ন করা হয় না। টের পাই পাশের ঘর থেকে দুড়দাড় লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। গালাগালি শুনতে পাচ্ছি। দাঁত ঘষার শব্দ। কোনও উত্তেজনা বোধ করি না। কেবল মাকে বলতে ইচ্ছে করে, 'চিন্তা করো না মা। দূরের যুদ্ধ থেমে গেলে আবার সব ঠিকমত পাওয়া যাবে। আগের মতোই।' কিন্তু সে কথাও বলা হয় না। শুনি মা বিড়বিড় করে বলছে, 'তুই কেন এমন হয়ে রইলি মতু! তুই থাকলে সব ঠিক হয়ে যেত।' অমনি আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যাই। চারপাশেই বড় গণ্ডগোল চলেছে। দুঃসময়। তাই বসে থাকি। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকি। চাল-ধোয়া হাতের গন্ধ পাই। অন্ধকারে ঘরে বসে টের পাই চারিদিকে যোজন জুড়ে অনাবৃষ্টি নিষ্ফলা মাঠ পড়ে আছে। আখের চারাগুলি মরে গেল। দুঃসময়।

ভয় করে। চায়ে চিনি কম। পাশের ঘরে গণ্ডগোল। কোথাও যাওয়ার নেই। যেতে ইচ্ছে করে। অথচ যথেষ্ট পোশাক নেই গায়ে। অবহেলা সহ্য করার মতো শক্তি নেই। অস্ত্রহীন যাওয়া যায় না তাই। বসে থাকি। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকি।

পাশের ঘরে গণ্ডগোল থেমে গেল। লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। সবাই। নিস্তব্ধতা। শুনতে পাই মা কাঁদছে। অস্থির লাগে বড়। আমার মাথার ওপর একখানা হাত কাঁপে। বড় শান্ত ও সুন্দর বিশ্রামের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে শহর মিঠিপুর, জেলেদের গ্রাম, কিংবা সেই আশ্চর্য খনিগুলির বসতি। শান্ত ও সুন্দর বিশ্রামের রাত্রি আমার চারপাশে। তার মধ্যে মার কান্নার শব্দ হয়। খুব শব্দ হয়। বলে, 'বতুকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল? কী করবে ওকে? বতু কেন গেল?' আমি চুপ করে থাকি। নিস্তব্ধতার মধ্যে মা কাঁদতে থাকে। বুঝতে পারি না। দূরে বোধ হয় খুব যুদ্ধ চলছে। আর

Shahnaz

অনাবৃষ্টি। দুঃসময়। অস্থির লাগে। সিগারেট ফেলে দিয়ে আবার ধরাই। কিছুই মেলাতে পারি না। শুধু দেখি সিংহাসশূন্য স্থবির ও অক্ষম রত্নাকর বসে আছে গাছতলায়, পথিকের অপেক্ষায়। আবার দেখি পশ্চিমের প্রকাণ্ড খোলা বারান্দায় একটি শিশু একা একা হাঁটতে শিখছে। বতু না? হ্যাঁ, বতুই। আমার ছেলেবেলায় হারানো বল কোলে করে বসে আছে আল্লা বুড়ো দরজি, দেখতে পাই দুপুরের ঘুমে শুয়ে আছে মা, এলো চুলের ওপর প্রকাণ্ড খোলা মহাভারত উপুড় করে রাখা। শুনতে পাই কাছেই কোথাও যেন দিন রাত চলছে এক মাটি-মজুরের গর্ত খোঁড়ার কাজ। দেখি কুয়াশার মধ্যে তুমি দূরে চলে যাচ্ছে। মনে পড়ে চায়ে চিনি কম হয়েছিল। দূরে কোথাও খুব যুদ্ধ চলছে। আর অনাবৃষ্টি। কিছুই মেলাতে পারি না। বতুর নাম ধরে কাঁদছে মা। ইচ্ছে করে বলি—'ঈশ্বর প্রতিটি রাস্তাকেই নিরাপদ রাখছেন। কোনও ভয় নেই।' পরমুহূর্তেই বোধ করি, এই কথার পিছনে আমার বিশ্বাস বড় কম। মা কাঁদে। মেলাতে পারি না। কিছুতেই মেলাতে পারি না।

চোখে জল চলে আসে। আমি আস্তে আস্তে তোমার জন্য কাঁদতে থাকি।

আত্মপ্রতিকৃতি

আমার ছেলে অন্তু—মহা শয়তান ছেলে—ছাদ থেকে আমাকে ডাকছিল। চেয়ে দেখি আলসে থেকে ঝুঁকে সে বাইরের দিকে বাড়ানো হাত নাচিয়ে বলছে, 'বাবা, বৃষ্টিং পততি। মিটমিটে ডান-এর মতো হাসছিল—খানিকটা ইয়ার্কির ভাব। কখন মেঘ করেছে আমি টের পাইনি। সারা দুপুর ঝুলবারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়ে থেকে থেকে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন দেখি সামান্য বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নিচু মেঘ। গলির মুখের রাস্তা থেকে কুয়াশার মতো ভাপ উঠে আসছে। অন্তু ঝুঁকে আমাকে দেখছিল। বললাম, 'ওখানে কী করছ তুমি?' তেমনি ঠাট্টার মতো করে বলল, 'ঘুড়ি ওড়াচ্ছি।' সন্দেহ হল ও আমাকে নিয়ে খেলছে। বললাম, 'নেমে এসো।' উত্তর দিল না। তেমনি হাসছিল। অন্তুর ছাদে যাওয়া বারণ। এটা পুরনো বাড়ি—আলসেগুলো তেমন জোরালো নয়—তা ছাড়া বৃষ্টিতে এখন সবকিছুই খুব পিছল। কিন্তু যেদিকে বারণ অন্তু সব-সময়ে ঠিক সেই দিকে চলে যাবে। আমি দেখেছি ওকে ঠেকানো যায় না। প্রায় আপনমনে বললাম, 'তবে থাকো। তোমার জ্বর হবে।' ও এবার শব্দ করে হাসল, 'তুমি ঘুমোচ্ছিলে। আমি দেখলাম তোমার নাল গড়াচ্ছে।' অন্তুর মাথার উপরে মেঘ বড় উজ্জ্বল। তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল বলে আমি খবরের কাগজে চোখ আড়াল করে ওর দিকে দেখলাম 'অন্তু নেমে এসো বলছি! কথা কানে যাচ্ছে!' ও গম্ভীর মুখ করে আলসের ধার থেকে মুখ লুকিয়ে বলে 'আমি তো বলে এসেছি।' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কাকে'! ওর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায় 'তোমাকে।' আমি ইজিচেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে গিয়েও থমকে গেলাম। মনে পড়ল না আধোঘুমের ভিতরে আমি ওকে যেতে বলেছিলাম কিনা। নিজেকে আমার ঘোর সন্দেহ হয়। হতাশ হয়ে আমি আবার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসি। মুহূর্তের মধ্যেই বৃষ্টির জোর বাড়ল। অন্তুর পায়ের শব্দ শোনা গেল ছাদময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অন্তুর জন্য নয়—প্রতিভার কথা ভেবে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রতিভা অফিস থেকে এসে যদি শোনে—অন্তু ছাদে গিয়েছিল—ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকাবে, দু'একটা বাঁকা কথা বলতে পারে। কিন্তু রাস্তা থেকে ধোঁয়ার মতো ভাপ ঝুলবারান্দায় উঠে আসছিল, আমার পায়ের কাছে চূর্ণ বৃষ্টির ছাট, জলকণা ও ভারী বাতাস আস্তে

Shahnaz

আস্তে আমার মাথার ভিতরে জট পাকিয়ে দিল। চোখের পাতায় ঘুমের আঁশ ঝুলে আছে—নাকি বৃষ্টি! চোখ বুজতে মুহূর্তেই ঘুম ও স্বপ্ন আমাকে টেনে নেয়। দেখি প্রবল বৃষ্টির ভেতর অন্তর মুখ আলসে থেকে ঝুলে আছে। মাথা মুখ ধুয়ে জল পড়ছে। আমি ওর দিকে চেয়ে হাসলাম। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম রাস্তায় কেউ নেই, বাড়িগুলোর জানলা বন্ধ। আমি অন্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'অন্ত, দ্যাখো তো কার্নিসটা কি খুব পিছল?' ও একটু হেসে কার্নিসে হাত বুলিয়ে বলল, 'খুব। কেন?' আমি হাসি ঠাট্টার ভাব বজায় রেখে বলি, 'আমি ছেলেবেলায় কার্নিসের ওপর কত হেঁটেছি। প্রথম প্রথম ভয় করে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা সোজা—' ও তেমনি সকৌতুকে আমাকে দেখছিল। উত্তর দিল না। আমি কোনওক্রমে উত্তেজনা চেপে রেখে বললাম, 'তুমি পারো?' ও কথা না বলে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল—পারবে। বললাম, 'তোমাকে একটা প্রাইজ দেব, যদি উঠতে পারো।' অন্ত খুব জোরে হেসে উঠল, 'পাগল! মা টের পেলে—'। আমি খুব হতাশ হলাম। অন্ত জানে আমি প্রতিভাকে একটু ভয় করি। অন্ত এমন অনেক কিছু জানে বলে আমার সন্দেহ হয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ সন্দেহ হয় ও ওর নকল হাসির আড়ালে ভ্রূ কুঁচকে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছে—ওর মা ও বাবার সম্পর্ক কতখানি আন্তরিক। সন্দেহ হয়—অন্তকে আমার খুব সন্দেহ হয়। খানিকক্ষণ আমাকে দেখে নিয়ে অন্ত হঠাৎ বলল, 'বাবা, দ্যাখো—' তাকিয়ে দেখি অন্ত হালকা শরীরে টপ করে আলসের ওপর উঠল। 'শাবাশ—' চাপা গলায় বললাম। ঝাপসা বৃষ্টির মধ্য দিয়েও দেখা গেল অন্ত চার-তলার কার্নিসের ওপর দিয়ে হাঁটছে—টালমাটাল ওর শরীর, দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দেওয়া—মুখে সেই ঠাট্টার হাসি। একেবারে কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল ও, একটা পা শূন্যে বাড়িয়ে দিয়ে অন্ত হঠাৎ মুখ ফেরালে। আমি অত বৃষ্টির ভিতরেও ওর অসম্ভব গম্ভীর মুখ দেখতে পাই। ও বলল 'বাবা', একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে একটা আঙুল তুলে আমাকে নির্দেশ করে বলল, 'তুমি...একটা পাগল...।' সেই মুহূর্তেই হাওয়া এসে ওকে ভাসিয়ে নিতে পারত, বৃষ্টি ধুয়ে দিতে পারত ওকে। কিন্তু ও নিজেই লাফ দিল। বাইরের দিকে নয়, ছাদে লাফিয়ে পড়ল অন্ত। ওর হাহা হাসির শব্দ সারা ছাদময় ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনে আমি হিম হয়ে গেলাম।

অসম্ভব ঘাম ও গরমের ভিতর ঘুম ভাঙতেই টের পাই অন্ধকার হয়ে এল। প্রতিভা অফিস থেকে ফিরেছে, শাড়ি বদলে এখন আঁচল দিয়ে মুখ মুছছে, এক্ষুনি বাথরুমে যাবে। এই সময়ে আমি প্রতিভাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি। এই সময়ে ও খুব শান্তভাবে কথা বলে। স্নান করে ও যথানিয়মে রান্নাঘরে যাবে। বেচারা!

অন্ত কোথায় থাকতে পারে আমি মনে মনে খুঁজে দেখছিলাম। ঝুঁকে দেখলাম রাস্তায় নেই। আমি ঘরে এলাম। প্রতিভা সঙ্গে সঙ্গে খাট ছেড়ে উঠল, তোয়ালে আর সাবান তুলে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। খাটের ওপর ওর ব্যাগ-ট্যাগ ছড়ানো রয়েছে। দেখি অফিস-লাইব্রেরি থেকেও ও একটা বাংলা বই এনেছে—উপন্যাস। প্রতিভা বইটই পড়ে না—সময়ও পায় না। এটা আমার জন্য। বেশ মোটা বই—মনে হল হালকা বিষয় নিয়ে লেখা। এমন মোটা ও হালকা বই আমার পছন্দ—অনেকদিন ধরে পড়া যায়, আর মনের ওপর তেমন চাপ পড়ে না। আমি পত্রিকায় রাহাজানি, সুখ-দুঃখ পলিটিক্সের খবর বাদ দিই, সিনেমার পাতা রোজ পড়ি। তেমন বেলেল্লা হালকা ধরনের ছবি হলে আমি মাঝে মাঝে প্রতিভাকে অন্তকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাই। না, ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিতে পারে এমন কোনও কিছুই আমি আর চাই না।

প্রতিভা স্নান সেরে এসে দেয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলে 'অন্তকে তুমি একটু সামলে রেখো। আজকেও ছাদে গিয়েছিল।'

'কই!'

'গিয়েছিল। বলল, তুমি যেতে বলেছ। আমি ওকে ভিতরের বারান্দায় নীলডাউন করে রেখেছি।'

আমি হাসলাম, 'আমি ছাদে যেতে বলিনি তো!'

'কি জানি, বলছিল তো। প্রতিভা ভ্রূ কোঁচকায় 'হয়তো—তুমি অন্যমনস্ক ছিলে।

আমি একটু ভেবে দেখবার ভান করি। যেন কিছু একটা মনে পড়বে আমার। নিজেকে আমার ঘোর সন্দেহ হয়।

'আর ফিরে এসে দেখি—' প্রতিভা গালের ওপর একটা ব্রণকে টিপে দিতে দিতে বলল 'ওপরের বারান্দার রেলিঙে দাঁড়িয়ে নীচের তলায় থুথু ফেলছে। ঠিক সান্যালদের চৌবাচ্চার ওপর। ওরা দেখতে পেলে—' প্রতিভা নিস্পৃহভাবে পাউডারের পাফ তুলে নিল।

'অন্ত?'

'তা ছাড়া আবার কে!' বলে বোধ হয় সন্দেহ হওয়াতে ও হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তুমি হাসছ?' পরমুহূর্তেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের ছায়ার দিকে তাকাল। চেয়ে চেয়ে দেখি আধ-ভেজা ঘাড়ে গলায় ব্লাউজের ফাঁকে পাউডার ছড়াচ্ছে। হঠাৎ ধীর গলায় কেটে কেটে বলল, 'এ সব স্বভাব ভাল নয়।' ওর ভ্রূ কোঁচকানো। হয়তো চশমা ছাড়া দেখতে ওর অসুবিধে হয়। একজোড়া চশমা প্রতিভার ছিল। ওর চোখ ভাল নয়। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর থেকে ও চশমা পরা ছেড়ে দিয়েছে। আমি ওকে আজকাল তেমন লক্ষ করি না—কে জানে হয়তো, চশমায় ওকে একটু বুড়ো বুড়ো দেখায়।

তা হোক। প্রতিভাকে আমি সুন্দর দেখি—অন্তত এখন দেখছি। ধোয়া মোছা কপালের ওপর এখন ও মনোযোগ দিয়ে সিঁদুরের টিপ বসিয়ে দিচ্ছে। ঘাড়টা নোয়ানো, পিঠ বাঁকা, দুটো চোখ আয়নার ভিতরে জ্বল জ্বল করছে। সিঁথিতে সিঁদুর দিল ও। ওর এই সব ছেলেমানুষী অভ্যাস আমি পছন্দ করি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জোর নিশ্বাস ছাড়ল প্রতিভা। একটু হেসে বলল, 'দুপুরে খুব ঘুমিয়েছ তো? চোখমুখ ফুলে গেছে।' উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে প্রায় একই স্বরে বলল, 'অফিসে আজ ওরা তোমার কথা বলছিল।'

'কী রকম?'

'এই যেমন, তুমি সোশ্যালে একবার ক্যারিক্যাচার করেছিলে আমায় নিয়ে—আমাকে বলোনি।' ও বিছানার ওপর থেকে ওর ছড়ানো ব্যাগট্যাগ কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'ক্যারিক্যাচারটা আমায় একবার দেখাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'আর কিছু বলেনি?'

'বলছিল।' হাসি সামলে ভ্রূ কোঁচকাল প্রতিভা 'সে অনেক কথা। সব মনে থাকে?' প্রায় একই রকম অনুচ্চ স্বরে অন্তকে ডাকল প্রতিভা। '...ঘরে এসো।'

অন্ত ঘরে আসতেই ওর হাসিটা আমার চোখে পড়ল। দেখে কে বলবে যে, ঘণ্টাখানেক ও নিলডাউন হয়ে ছিল! কোনও শারীরিক কষ্টের চিহ্ন ওর চোখে মুখে কোথাও ছিল না। আমার মনে হয় ওকে শাসন-টাসন করে কোনও লাভ নেই। ওর ইস্কুলের মাস্টাররাও পারেনি। ওর বয়স মাত্র দশ—কিন্তু এই বয়সেই অন্যান্য ছেলেকে নষ্ট করে দিচ্ছে সন্দেহে ওকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রতিভার সন্দেহ ছিল যে, স্কুলটাই ওকে নষ্ট করছে। কিন্তু আমার

Shahnaz

মনে হয় অন্তর এসবে কিছু আসে যায় না। নিজের ভালমন্দ সে নিজেই বুঝতে শিখেছে।

প্রতিভা অন্তুকে কাছে ডেকে ওর কানে কানে কোনও কথা বলল, তারপর রান্নাঘরের দিকে চলে গেল প্রতিভা। অন্তু আমার দিকে চেয়ে হাসল, 'বৃষ্টি থেমে গেছে বাবা।'

আমি ওর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বললাম, 'হুঁ।'

'মা বলল তোমাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে।' ওর হাসিটা একটু বেঁকে গেল, 'অত বসে থাকলে তোমার বাত ধরে যাবে।'

কোমরে হাত রেখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে হাসির কোনও চিহ্ন নেই তাই মুখের হাসিটা হঠাৎ নকল বলে মনে হয়। বোধ হয় ও সবসময়ে একইরকম হাসে—কিন্তু আমার কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়।

কিছুক্ষণ আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম—চোখে চোখ রেখে। তারপর অন্তু দেয়ালের হুক্-এ ঝোলানো তার শার্ট পেড়ে নিয়ে মাথা গলাতে গলাতে বলল 'দুপুরবেলা আমি ছাদ থেকে ঠিক যেন টেলিফোনের শব্দ পেলাম।' শার্টের বুক চিরে ওর রুক্ষ চুলওয়ালা মাথাটা বেরিয়ে এল 'আর মনে হল তুমি একা কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছ।'

আমাদের টেলিফোন নেই। আশেপাশে কোথাও নেই। কিন্তু মনে হয় অন্তু ঠিক বলছে—দুপুরে আমিও টেলিফোন বেজে যাওয়ার শব্দ শুনেছি! ঠিক জানি না—আবছাভাবে মনে পড়ে আমি হাতের খবরের কাগজটা মুড়ে এক হাতে ঘরে এসে অন্য হাতে অন্যমনস্কের মতো টেলিফোন তুলে কার সঙ্গে কথা বলেছি!

অন্তু হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বলল 'আজ তুমি আবার পাগলামি করছিলে বাবা।'

'না, অন্তু—' আমি প্রাণপণে দুপুরবেলার কথা মনে করবার চেষ্টা করে বললাম, 'কিন্তু টেলিফোনের শব্দ...?'

'তুমি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলে।'

আমার মনে পড়ল না। বললাম, 'মনে পড়ে না তো! বোধ হয় না।'

'তবে মা দিয়ে রেখেছিল। ঠিক তিনটের সময় তোমাকে নতুন ওষুধটা দেওয়ার কথা ছিল। আমি ভুলে গেছি।' শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, 'তুমি মাকে বলে দেবে নাতো!'

'ঠিক আছে!'

'আমিও বলব না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে অন্তু—' আমি কথা চাপা দেওয়ার জন্য বলি, কিন্তু তুমি চলেছ কোথায়?'

'দোকানে। এলাচ কিনে আনব।'

আমার ঘোর সন্দেহ হয় অন্তু ঠিক আমার দলে নয়। আবছাভাবে হঠাৎ মনে হয় আমাদের তিনজনের ভিতরে একটা অদৃশ্য জোট বাঁধবার চেষ্টা আছে। ঠিক ধরা-ছোঁয়া যায় না, কিন্তু বোঝা যায়। প্রতিভা আর অন্তু সবসময়েই এক দলে, আমি আলাদা। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল করে মনে হয়, আমি আর অন্তু এক দলে, প্রতিভা আলাদা; কিংবা আমি আর প্রতিভা এক দলে, অন্তু আলাদা।

অন্তু বেরিয়ে গেলে আমি আবার বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসি। একা। এ জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। আবছা অন্ধকার। দুপুরবেলা আমি কার সঙ্গে কথা বলেছি—মনে পড়ল না। আমি আবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করি।

আজকাল আমি ভাবনা চিন্তা করবার অনেক সময় পাই। ঠিক ন'মাস আগে আমার একটা অসুখ হয়েছিল। তেমন কিছু নয়—কয়েকদিন খুব জ্বর হয়ে সেরে গেল। কিন্তু সেই অসুখটার ভিতরে কোনও কারসাজি ছিল যা আমি এখনও বুঝতে পারি না—কেননা, তারপর একদিন অফিসে গিয়ে দেখি আমাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কেন—আমি ভেবে পেলাম না। কেউ কিছু বলতে পারল না—ইউনিয়ন থেকে কোনও হইচই হল না—ঠিক একমাস পরে আমার চাকরি গেল। আমি তাতে খুব দুঃখিত হইনি। চিঠিতে লেখা ছিল, আমাকে আর কাজের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হচ্ছে না। সে কথা আমিও স্বীকার করি। বরাবরই, আমি চাকরির অনুপযুক্ত ছিলাম—আমি জানি। কর্তৃপক্ষ সেটা এতকাল টের পাননি কেন—এই প্রশ্ন করে ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ওপরওয়ালাদের একটা চিঠি দিই—কখনও যার উত্তর পাওয়া যায়নি। আমার চাকরি গেলে সেই একই ফার্মে প্রতিভা চাকরি পেল। কী করে প্রতিভা কাণ্ডটা করল—নাকি ওপরওয়ালাদের দয়া—তা আমার একদম জানা নেই। আমি জানতে চাইও না। এই জেনে সুখে আছি যে, আমাকে আর চাকরি করতে হচ্ছে না—কোনও কাজ দেওয়া হচ্ছে না আমাকে। এমন সম্মানজনক অবসর-যাপনের জন্য সত্যি কথা বলি—একটা গোপন ইচ্ছা আমার বরাবর ছিল।

আমাদের ছেলেবেলার কলকাতায় জিওল হালদারকে দেখেছি এই রকম অবসর যাপন করতে। যতদূর মনে হয় জিওল হালদারের চেষ্টা ছিল কী করে বৃক্ষের মতো রাগে ও বিরাগে সমান বিকারহীন থাকা যায়! আমিও ভেবে দেখছি এমনভাবে আত্মপর বোধ লুপ্ত করে দেওয়া যায় কি যখন প্রতিভার জন্যে, অন্তুর জন্য, নিজের জন্য আর কিছুই করবার ইচ্ছে থাকে না। এইরকম বোধ থেকেই কি কেউ কেউ সন্ন্যাস নিয়েছিল—সংসার ছেড়ে গিয়েছিল কেউ কেউ?

জিওল হালদারের লৌকিক নাম ছিল গীতার বাবা। আমাদের ছেলেবেলার সেই গীতাকে একদিন যারা স্কুল থেকে ফেরার পথে চুরি করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, এক রাত্রির পর তারা পরম বৈরাগ্যের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়মের কাছের মাঠে তাকে ফেলে যায়। এই ঘটনার পর গীতা নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেল। গীতা মারা গেলে গীতার বাবা জিওল হালদার এই ব্যাপারে তার কী করণীয় ছিল, কর্তব্য ছিল, তা রাস্তার লোককে ধরে ধরে জিজ্ঞেস করে বেড়াল। এইভাবে গীতার গল্পটা চারদিকে ছড়িয়ে যায়। তারপর একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরল জিওল হালদার, শাবল আর কোদাল নিয়ে গম্ভীরভাবে নিজের বাড়ির উঠানে একটা গর্ত খুঁড়ল, তার ওপর লতাপাতার ছাউনি দিল রোদ-জল আটকাবার জন্য, তারপর একদিন সেই গর্তের ভিতরে ঢুকে গেল গীতার বাবা। ছেলেবেলার সেই গুহার অন্ধকার ও রহস্য আমাকে খুব টানত। কিন্তু গুহার ঠিক মুখের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকত 'সীতু'—জিওল হালদারের বছর ছয়েকের মেয়ে—আমাদের পথ আটকে বলত 'ভিতরে যাওয়া বারণ।'

'কেন?'

ফিক করে হেসে বলত 'বাবা যে ন্যাংটো!

আধপাগল জিওল হালদারের সেই গুহার কাছে আমি মাঝে মাঝে গেছি। কখনও দেখা হয়নি। ওখানটা কেমন? অন্ধকারে জিওল হালদারকে দেখা যেত না—মাঝে মধ্যে তার গলা পাওয়া যেত। আমি জিওল হালদারকে কখনও কখনও জিজ্ঞেস করেছি 'ওখানটা কেমন, ভয় করে না?' উত্তর পাওয়া যেত 'বেশ বাবা, বেশ জায়গা এটা।' 'আপনি কি ধ্যান করছেন?' '—না বাবা, আমি বিকারহীন হওয়ার চেষ্টা করছি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সহজ বৃক্ষের মতো

Shahnaz

প্রাকৃতিক হতে পারে কিনা দেখছি। কেননা প্রকৃতি বিকারহীন ও উদাসীন, তার কোথাও এতটুকু আবেগ নেই।' ছেলেবেলায় দেখা সেই গুহা আমাকে এখনও মাঝে মাঝে টেনে ধরে। জিওল হালদারের সেই অন্ধকার ও অবসর কতকাল আমার মাথায় বাসা বেঁধে ছিল। আমি এখনও সেই গুহা খুঁজে পাইনি, না সেই অন্ধকার, না সেই অবসর। এ কি সহজে পাওয়া যায় না!

ঘরের ভিতর থেকে একটা মানুষের ছায়া বারান্দায় আমার পায়ের কাছে পড়ে ছিল। আমি প্রথমটায় লক্ষও করিনি, হঠাৎ চোখ পড়তেই চমকে উঠে দেখি—প্রতিভা। বললাম, 'কী হল?'

'কিছু না।' ও বলল 'আমি শুনছিলাম তুমি আপনমনে কী যেন বলছ!' অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাল প্রতিভা।

আমি বাধো বাধো গলায় বললাম, 'কী বলছিলাম?'

'কী জানি। জিওল হালদার না কি যেন!' ও বলল, 'অন্ধকার না অবসর কি যেন বলছিলে!'

আমি হাসলাম। প্রতিভা আমার কাছে এসে বলল,'আমি বলি কি তুমি অত ভেবো না। বরং মাঝে মাঝে ঘুরে-টুরে এসো।' ও খুব সহৃদয়ভাবে বলল, 'অন্তুকে নিয়ে মাঝে মাঝে পড়াতে বোসো।'

আমি উঠে পড়লাম।

আমি আর অন্তু পাশাপাশি খেতে বসলে প্রতিভা মাঝে মাঝে এটা ওটা আনতে রান্নাঘরে যাচ্ছিল। তারই এক ফাঁকে অন্তু বলল, বাবা, আমি টেলিফোনের কথাটা মাকে বলে দিইনি।'

'ঠিক আছে।' আমি সন্তর্পণে বললাম, 'তুমি শুনেছ আমি কার সঙ্গে কথা বলছিলাম?'

'হ্যাঁ-অ্যা!' অন্তু হাসল 'আমি দেখলাম তুমি টেবিল থেকে তোমার ফাউন্টেন পেনটা তুলে নিয়ে ঠিক ফোনের মতো কানের কাছ ধরে রন্টু না কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলে!'

রন্টু! কতকাল এই নামে আমাকে কেউ ডাকেনি! রন্টু! হঠাৎ আনন্দে আমি কানায় কানায় ভরে উঠলাম। এ আমার ডাক নাম। আমার ছেলেবেলার নাম!

অন্তু আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, 'আমিও মাঝে মাঝে তোমার মতো টেলিফোনে কথা বলি।'

'কার সঙ্গে!'

অন্তু সকৌতুকে হেসে বলল, 'কারও সঙ্গেই নয়। ওপাশে কাউকে ভেবে নিই। ঠিক তোমার মতো।'

আমি হেসে উঠলাম। অন্তু হেসে উঠল। প্রতিভা দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল। পর মুহূর্তে হেসে বলল, 'কী হচ্ছে তোমাদের? এত আনন্দ কিসের!'

অন্তু আমার দিকে তাকাল। আমি তাকালাম ওর দিকে। অন্তু দুহাত ওপর দিকে ছুড়ে বলে উঠল : 'উঃ, আমার পেট ভরে গেছে, মা। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

আমি খাটের ওপর আলাদা শুই। অন্তু আর প্রতিভা মেঝেয় বিছানায় আলাদা শোয়। গত ন'মাস এই রকম চলে আসছে। আমি প্রতিভাকে ডাকি না। কাছে ডাকি না। ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে আমি নিঃসাড়ে পড়ে থাকি। ঘুমের ভান করি। ঘুম আসে না। আর ঘরের সেই অন্ধকার জুড়ে আমার ছেলেবেলার বান ডেকে যায়। আশ্চর্য! একি প্রত্নতাত্ত্বিক—যা কিছু প্রাচীন যা কিছু মূল্যবান সব সেই ছেলেবেলায়! যত বুড়ো হচ্ছি আমি তত সেই ছেলেবেলার অর্থ জানছি, আরও জানতে চাইছি! আমি কি বড় হয়ে আর নতুন কিছুই শিখিনি, যা কিছু শিখেছিলাম—সব সেই ছেলেবেলায়? তাই মনে হয় আমি মাঝে মাঝে অলীক টেলিফোন বেজে উঠবার শব্দ শুনি।

দেয়ালের ভিতরে, কিংবা জানলার শার্সিতে লুকনো গোপন টেপরেকর্ডার হঠাৎ কথা বলতে শুরু করে। অন্ধকারে বুকের ভিতরে কড় কড় করে টেলিফোন আমাকে ডাক দেয় 'রন্টু, রন্টু, এই যে—' আমি পাগলের মতো উঠে বসি, হাত বাড়াই, অদৃশ্য অলীক টেলিফোন তুলে নিই, আমার স্বয়ংক্রিয় ঠোঁট কথা বলে যায়, 'এই যে, রন্টু, এই যে—।'

না, আমার প্রতিভাকে প্রয়োজন বলে মনে হয় না। এমন অনেক কিছুকেই প্রয়োজনহীন বলে মনে হয়। মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমাদের গলির মুখেই ছিল বুড়ো অল্লুর দর্জির দোকান। সেখানে ছড় ছড় করে চারটে ভাঙা মেশিন চলত। বুড়ো অল্লু বসত মেঝেয় মাদুরের ওপর—নমাজ পড়বার মতো পবিত্র ভঙ্গিতে। উলটো দিকেই ছিল একটা হাজামজা পুকুর। সেখানে গাড়োয়ান আর গয়লারা তাদের গরু-মোষ চান করাত। 'এই এক ফোঁড়...এই আর এক ফোঁড়...' বুড়ো অল্লু হাত-সেলাই করতে করতে বলত 'দে তো সাজ্জাদ, একটা বিড়ি...।' সাজ্জাদ বিড়িটা অল্লুর ঠোঁটে লাগিয়ে দিলেই অল্লু বলত 'রমজান ধরিয়ে দে...।' এই সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে চাঁদির চশমার ওপর দিয়ে অল্লু পুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখত। কতদিনের সেই পুকুর! কতদিনের সেই বুড়ো অল্লু! আমরা যেতাম রঙিন কাপড়ের টুকরো কুড়িয়ে আনতে। সুতো ফুরিয়ে যাওয়া কাঠের রিল, ভাঙা ছুঁচ—এই সব খুঁজে দেখতাম। হঠাৎ বুড়ো অল্লু 'ধর...ধর...' বলে চেঁচিয়ে উঠলে আমরা পালাতাম। অল্লু ফোকলা মুখে হেসে উঠত হঠাৎ। আস্তে আস্তে ক্রমশ সেই রঙিন কাপড়ের টুকরো, কাঠের রিল, ভাঙা ছুঁচ আমার কাছে প্রয়োজনহীন হয়ে গেছে—যেমন সেগুলো প্রয়োজনহীন ছিল বুড়ো অল্লুর কাছে। ভেবে পাই না আমি কখনও এত বড়, এত বুড়ো হব কি যখন সেই রঙিন কাপড়ের টুকরোর মতো, কাঠের রিল ও ভাঙা ছুঁচের মতো সব—সব কিছুকেই—অন্তুকে, প্রতিভাকে, আমার চলে-যাওয়া চাকরিকে প্রয়োজনহীন বলে মনে হবে?...ভালবাসার ছিল, ভয়ের ও রহস্যের ছিল আমার ছেলেবেলা। কত তুচ্ছকেই প্রয়োজন ছিল আমার!

অনেক রাতে হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে শুনি এক্কাগাড়ির আওয়াজ। অনেক দূর পর্যন্ত সেই আওয়াজ শোনা গেল নিশুতি রাত চিরে চলেছে। ক্রমশ সেই আওয়াজ আমার মাথার ভিতরে গভীর থেকে গভীরে চলে গেল। প্রতিভা ঠিকই সন্দেহ করে—আমি ঠিক স্বাভাবিক নই। আমিও সন্দেহ করি, বড় সন্দেহ করি আমাকে।

অসুখের পর থেকেই আমার ভিতরে কয়েকটা ছোটখাটো ভাঙচুর হয়ে গেছে—আমি টের পাই। ব্যাপারটা আমি প্রথম বুঝতে পারি অসুখের পর একদিন। কাকে যেন চিঠি লিখবার ছিল। পোস্ট অফিসে গিয়ে আমি পোস্টকার্ড কিনলাম, তারপর চিঠি লিখবার জন্য স্ট্যান্ডের ওপর হেলানো বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা লিখলাম। তখনও সব কিছু ঠিকঠাক স্বাভাবিক ছিল। যতদূর মনে পড়ে আমার ডান হাতে কলমটা ছিল, বাঁ হাতে ছিল পোস্টকার্ড। চিঠিটা পড়তে পড়তে ডাকবাক্সের কাছে এসে মুখ তুলেই সেই ঘোর লাল রঙের ডাকবাক্স, সার্জেন্টদের মতো কালো টুপি পরা, তার নীচে কালো হাঁ-এর মতো গর্ত দেখে—আমি স্পষ্ট টের পেলাম আমার ভিতরে কী একটা গোলমাল হয়ে গেল। আমার এক হাতে কলম ছিল, অন্য হাতে পোস্টকার্ড—দু হাতে দুটো জিনিস। কিন্তু আমি কোন্‌টা ডাকবাক্সে ফেলবার জন্য এসেছি কিছুতেই ঠিক করা গেল না। কোন্‌টা কী—এই বাক্সের সঙ্গে কোন্‌টার সম্পর্ক রয়েছে ভেবে না পেয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, অল্প পরেই এ ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু কাটল না—আমি কলম ও পোস্টকার্ড—দুটো জিনিসের কোনওটাকেই চিনি বলে

Shahnaz

মনে হল না। ভাবছিলাম কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় কিনা, 'মশাই, দেখুন তো আমার দু' হাতে দুটো জিনিস—এর মধ্যে কোন্‌টা ওই বাক্সে ফেলা উচিত!' কেউ পাছে আমার ওই অবস্থা লক্ষ করে এই ভয়ে আমি লটারি করে—একটা হাত তুলে ডাকবাক্সে জিনিসটা ফেলে দিলাম।

এর ফল আমাকে ভুগতে হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে তারপর অনেকক্ষণ ওই ডাকবাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে পিওনের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম আমি। চেনা পিওন ছিল, জিজ্ঞেস করল, 'কী করে পড়ল?' আমি বানিয়ে বললাম, 'দুটোই এক হাতে ধরা ছিল, চিঠিটা ফেলতে গিয়ে হাত ফস্কে—' পিওনটা আর কিছু বলল্লে না, ডাকবাক্স খুলে, কলমটা পেয়ে দিয়ে দিল। আমার সেই কালো কলমটা—যেটা আমি মাঝে মাঝে টেলিফানের মতো ব্যবহার করি—অন্তু দেখেছে।

এরকম কেন হয়, কেন হচ্ছে? মাঝে মাঝে সব কিছু একাকার হয়ে যায়। কাচের গ্লাস টেবিল ও দেয়ালের পার্থক্য কিছুক্ষণের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়। কোন্‌টা কী, কোন্‌টা কেন—আমি বুঝে উঠি না। বুঝে উঠতে পারি না দামিনী ঝির সঙ্গে প্রতিভার পার্থক্য কোথায়। ভয় হয় ভিড়ের ভিতর থেকে যদি চিনে বার করতে হয় আমি কিছুতেই প্রতিভাকে, অন্তুকে আলাদা করে বলে দিতে পারব না 'এই আমার বৌ প্রতিভা, এই আমার ছেলে অন্তু।'

এই আমার বৌ প্রতিভা, এই আমার ছেলে অন্তু! আমি অন্ধকারে হেসে উঠি। নিজেকে আমার পাকা ঘুঘুর মতো মনে হয়—সব জানে-শোনে অথচ ভান করে।

পরদিন কী উপলক্ষ্যে যেন ছুটি ছিল। আমি জানতাম না। প্রতিভার গড়িমসি ভাব দেখে বুঝতে পারলাম। আশ্চর্য, আগে সব ছুটির দিন আমার মুখস্থ ছিল। আজ ছুটি কেন ভেবে পেলাম না?

ছুটির দিনে প্রতিভা ঘরে থাকলে আমি ঘুমোই না ছোটখাটো কাজ করি, দাড়ি কামাই, বই পড়ি কিংবা ঘরময় পায়চারি করি। প্রতিভা সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ল। কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনবে, আর সময় পেলে সিনেমায় যেতে পারে—অফিসের কোনও বান্ধবীর সঙ্গে, সেই রকম কথা হয়ে আছে।

আমি প্রতিভাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার সময় লক্ষ করলাম অন্তু একটা চেয়ারের সঙ্গে লাঠি কাঠি বেঁধে কী একটা তৈরি করছে। আমাকে দেখে বলল, 'বাবা, আমি টেবিল-ঘড়িটা একবারটি নেব', একটু চোরা হাসি হেসে বলল, 'খুব সাবধানে নেব, ভাঙব না! নেব?'

আমি ওর তৈরি করা জিনিসটা দেখছিলাম 'কী এটা!'

'টাইম মেশিন।' অন্তু উত্তর দিল।

'কী হবে এটা দিয়ে?'

ও লঘু ঠাট্টার সুরে বলল, 'এটাতে চড়ে আমি আমার বুড়ো বয়সটা দেখে আসব।' বলেই ঘরের দিকে দৌড় লাগাল অন্তু। ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'ঘড়িটা নিচ্ছি কিন্তু, বাবা!'

আমি অন্যমনস্কের মতো বললাম, 'ভেঙো না।' তারপর আস্তে আস্তে ঝুলবারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসলাম, হাতে প্রতিভার আনা মোটা ডপন্যাসটা ছিল। কয়েক পাতা পড়ে দেখা গেল একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, নানা সামাজিক কারণে এবং দারিদ্র্য ইত্যাদি দুঃখের ভেতর দিয়ে গল্পটা শুরু হয়েছে। আমার ঘুম পেয়ে গেল। আমি যদি ভালবাসতে চাই কখনও, তবে প্রতিভাকেই ভালবাসার চেষ্টা করে দেখব। যদি দশ মিনিটের জন্যও ভালবাসতে পারি তবে কেন সেই দশ মিনিটই আমার সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট নয়! দশ

মিনিট—মাত্র দশ মিনিট কেন যথেষ্ট নয় এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে একদিন আমরা সবাই বিবাহহীন সমাজে পৌঁছে যাব। ভার নেই, দায় নেই—সহজিয়া সেই দশ মিনিটের শুদ্ধ ভালবাসার জন্যে পৃথিবীর সবাই অপেক্ষা করে আছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ডাক শুনি 'রন্টু, এই যে, রন্টু—'। আপাদমস্তক ভয়ংকর চমকে উঠে ঘুমচোখে চেয়ে দেখি বাচ্চা রন্টু বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ধড়ফড় করে উঠবার চেষ্টা করে বলি, 'রন্টু?...কী করে এলে?

একটা হাত তুলে ও বলল, চেয়ে দ্যাখো।'

'কী?'

'টাইম মেসিন।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল রন্টু। আমি দুহাতে চোখ রগড়ে ঘুম ছাড়িয়ে দেখলাম—অন্তু। অন্তু হাসিমুখে বলল, 'তুমি ভয় পেয়েছিলে, বাবা?'

'না।' আমি হাসলাম, ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম, 'তোমার মেশিনটা তৈরি হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ—অ্যাঁ।' অন্তু বলল, 'আমি একটা টেলিফোনও তৈরি করেছি। দ্যাখো—' চেয়ে দেখি দুটো দুটো দেশলাইয়ের খোল, অনেকটা সুতো জড়ানো। অন্তু বলল, আজ তোমরা সঙ্গে কথা বলব বাবা, তুমি এখানে থাকবে, আমি থাকব ছাদে।'

'বেশ তো!' আমি হেসে বললাম।

'তুমি মাঝে মাঝে রন্টু না কার সঙ্গে কথা বলো। আজ আমি হব সেই রন্টু—' অন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আর তুমি কী হবে বাবা!'

বলতে গিয়েও আমি বললাম না। অন্তু জানো না রন্টু আমারই ডাক নাম। সামলে নিয়ে বললাম, 'আমাকেও রন্টু বলে ডেকো।'

'আচ্ছা। আজ মজা হবে।' তারপর তাড়াহুড়া করে আমাকে ওর টেলিফোন সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিল, এখানে একজোড়া টেলিফোন আছে। আমি যেটা দিয়ে কথা বলব তুমি সেটাতে শুনবে, আর তুমি যেটাতে কথা বলবে সেটাতে আমি শুনব। ভুল কোরো না যেন?

'না।' আমি মাথা নেড়ে জানালাম।

'আমার সুতো কম, ঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।' অন্তু সুতো খুলতে খুলতে বলল, 'বরং তুমি এ পাশ দিয়ে আলসের ওপারে খোল দুটো ছুড়ে দাও। আমি ছাদে গিয়ে ধরব।'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

অন্তু ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে আবার পিছু ফিরে বলল, 'ও দুটো ছুড়ে দাও বাবা!' বলে চলে গেল। আমি দেশলাইয়ের সুতো-বাঁধা খোল দুটো আলসের ওপারে ছুড়ে দিলাম, ঠক্ করে সে দুটো ছাদের শানের ওপর পড়ল।

অন্তু ঘরের ভিতর দিয়ে ভিতরের বারান্দায় যাবে, তারপর সিঁড়ি ভেঙে ছাদের ওপর উঠবে। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা না করে দেশলাইয়ের একটা খোল—যেটা কানে দেওয়ার—সেটা কানে চেপে ধরলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কার ধীর গম্ভীর গলা ভেসে এল রন্টু এই যে রন্টু—খুব ক্লান্ত স্বর—এ তো আমার অন্তু নয়। রোমকূপ শিউরে উঠল, তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল মাথার ভিতর দিয়ে। এ কি রন্টু? না কি অন্তুর. এই টেলিফোন আমারই গলার স্বর আমাকে ফেরত দিচ্ছে? পর মুহূর্তেই স্রোতের মতো সেই স্বর আমাকে আক্রমণ করে 'রন্টু, হ্যালো রন্টু—'

আমি কেঁপে উঠি, কাঁপা গলায় বলি, 'এই যে এখানে আমি—'

Shahnaz

'তুমি সেই পাগল রন্টু তো—প্রতিভা যার বৌ—অন্তু যার ছেলে?'

'আমিই সে। আমি সেই রন্টু। আমি অন্তুর বাবা। প্রতিভার স্বামী।'

'তবে?' প্রশ্ন ভেসে এল।

তবে কী? তবে কী?

'তুমি ভেবেছিলে এরা কেউ তোমার নয়? কোনও কিছুতেই তোমার আর প্রয়োজন নেই?'

'কিন্তু—' আমি স্খলিত স্বরে ব্যগ্রভাবে বলি 'এরা ছাড়া কী আমার পরিচয় আমি জানি না।'

'তুমি যা চেয়েছিলে তোমাকে তাই দেওয়া হল—সেই অবসর আর সেই অন্ধকার তুমি পাবে।

ফোন কেটে গেল।

হতচকিত আমি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নিলাম। আরও ধীর, আরও দুঃখী ও শান্ত হয়ে গেলাম আমি।

অন্তু দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে এল 'তুমি আমার কথা শুনতে পাওনি বাবা?'

'পেয়েছি।' আমি ধীর গলায় বলি।

'তবে তুমি কি সব উল্টোপাল্টা বলছিলে! আমার কথার জবাব দিলে না!'

আমি ওকে কাছে টেনে আনলাম। হাত কেঁপে গেল। কিছুই বললাম না আমি। জানি, ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি এমন কোনও ভাষা আমার জানা নেই। আমি জানি না, এখন আর আমার কথা কেউ কখনও বুঝবে কি না!

না, আমি আর ফিরে যেতে পারি না।

আমার মেয়ের পুতুল

গাড়িটা থেমে আসছে।

আমরা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। এতক্ষণ ক্লান্ত একটানা শব্দের তালে তালে অলস নাচের ছন্দে গাড়িটা কোমর দোলাচ্ছিল। নাচের ছন্দটা ছড়িয়ে পড়ছিল আমার রক্তের মধ্যে। আমি জেগে ছিলাম। শুধু আমার মনটা নেশার ঘোরে থিতিয়ে যাচ্ছিল।

গাড়িটা থেমে আসছে। শান্তা আমার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ পর ও চোখ মেলল। খুব ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বলল, 'জানালাটা বন্ধ করে দাও না।'

আমি হাত বাড়িয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে ওর কাছে বসলাম। বললাম, 'শীত করছে তোর?'

'না, শীত করছে না। আমি একটু বসব এবার। বাবা, তুমি আমার মুখোমুখি বসছ না কেন!'

আমি ওর গায়ে কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে দিতে দিতে একটু হাসলাম। ওর চুলগুলো রুক্ষ লালচে। আমি ওর মাথায় হাত রাখলাম। গরম। উত্তাপটা আমার হাতটাকে কাঁপিয়ে দিল, আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আমি ওর মুখোমুখি বসলাম।

'এটা কী স্টেশন বাবা? গাড়িটা থেমে আসছে যে!'

আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে বললাম, 'রংটং।'

'বাঃ, কী মজার নাম। রংটং, রংটং,' ও টেনে টেনে বলল, 'ঠিক যেন মনে হয় ঢং ঢং ঢং ঢং।'

শব্দ হচ্ছে ঢং ঢং। ঘণ্টার শব্দ। নিস্তব্ধ, জংলি স্টেশনটার চার পাশে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা ফিরে এল। আবার পিছিয়ে গেল। গাড়ি ছাড়বার সংকেত। বিদায়ের সংকেত। শান্তা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার হাসি পাচ্ছে না। রজতশুভ্রর কথা আমার মনে পড়ছে।

'কার্সিয়াং আর কতদূর বাবা?'

'এখনও অনেক দূর।' আমি আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে বললাম। আমার গলার স্বরটা কাঁপল। জানালায় কাঠের ওপর আমার হাতটা শক্ত। আমি মনে মনে কথা বলছি। সে-কথা কেউ

Shahnaz

শুনছে না। আমি মনে মনে বলছি, শান্তা, তুই ঘুমো। এই স্টেশনগুলোকে পার হয়ে যেতে দেখিস না, এই জঙ্গলকেও না, এই পাহাড়কেও না। বড় বিস্বাদ আজকের দিনটা। তোর জ্বর বেড়েছে। আরও বাড়বে। তুই ঘুমিয়ে পড়। খুব শান্ত ছোট্ট পুতুলের মুখের মতো তোর মুখটা কম্বলের ওপর জেগে থাক। তুই ঘুমিয়ে পড়। আমি জেগে থাকি।

'লুডোটা একটু বার করো না বাবা। একটু খেলব।'

আমি চমকে উঠলাম। তাকালাম। হাসলাম। শান্তা কাচের সার্সির বাইরে তাকিয়ে আছে। আমার হাসিটাকে ও দেখল না।

আমি উঠে বাস্কেট থেকে লুডোটা বের করলাম। গাড়ির দেওয়ালের আয়নায় আমার ছায়া পড়ল। অতি প্রবীণ একটি মুখ। এই মুখটা আমার। আমি কী আশ্চর্যভাবে বুড়ো হয়ে গিয়েছি। একটা নিশ্বাসকে চেপে রাখি বুকের ভিতর। আমার সতেরো বছরের মেয়ে এই নিশ্বাসটার শব্দ শুনলে চমকে উঠবে। কিন্তু নিশ্বাসটা আছে। প্রতি মুহূর্তেই সেটা বেরিয়ে আসতে চায়। আমি তাকে যত অনুভব করি, তত যন্ত্রণার ছাপ আমার মুখে বার্ধক্যের চাবুক মেরে কতগুলো নতুন রেখা এঁকে দেয়। শান্তার মতো আমিও রজতশুভ্রকে ভুলতে চেষ্টা করি।

আমরা লুডো খেলতে শুরু করেছি। আমি হারছি। শান্তার চোখ দুটো আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। ও হাসছে, 'বাবা, তুমি হেরে যাচ্ছ যে। ওমা, এক ছয়-তিন দিয়ে তুমি আমার গুটিটা খেতে পারতে না?'

আমি কিছু শুনছি না, কিছু দেখছি না। অলস নাচের ছন্দে গাড়িটা কোমর দোলাচ্ছে, টাল খাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে, আবার সোজা হচ্ছে। শান্তা হাসছে। আমার বুকে নির্জন যন্ত্রণা। একক, অসহনীয়।

'থাক বাবা, খেলতে আর ভাল লাগছে না। এসো, একটু গল্প করি।' শান্তা বলল। ওর মুখটা আমি দেখছি। সুন্দর, কোমল, কিন্তু শুষ্ক। শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

আমি বললাম, 'কেন, বেশ তো খেলছিলি।'

'কিন্তু তুমি মন দিয়ে খেলছ না। তার চেয়ে আমাকে গল্প বলো। ভাল গল্প বলো, সুন্দর গল্প, যে গল্প শুনে মন খারাপ হয়ে যায় না।'

আমি একটু হাসলাম, 'কিন্তু এখন যে তোর ওষুধ খাওয়ায় সময় হল শানু।'

'ওষুধ থাক বাবা। আর ভাল লাগে না ওষুধ খেতে।'

'কিন্তু যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যে তোমাকে আরও নিয়মে থাকতে হবে মা, ছেলেমানুষি করলে অসুখ সারবে কী করে?'

'অসুখ আমার সারবে না বাবা। আমি জানি।' কথাটা বলেই শান্তা আমার দিকে তাকাল। হাসল। আমার বুকের ভিতরটা পাক খাচ্ছে।

'আমি জানি বাবা, আমি জানি।' খুব হালকাভাবে একটুও না ভেবে কথাগুলোকে উচ্চারণ করল শান্তা। আমি আমার নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। শান্তা দেখছে। ও হাত বাড়িয়ে আমাকে স্পর্শ করল, 'বাবা, ডাক্তার সেনের কথাগুলো আমি শুনেছি। আমি নিজেও টের পাই যে, আমি বাঁচব না। তোমাকে আমি দিন দিন শুকিয়ে যেতে দেখছি, বুড়ো হয়ে যেতে দেখছি। আমার জন্যে ভেবে ভেবেই তোমার এমনটা হচ্ছে। থাক বাবা, তুমি কষ্ট পাচ্ছ। থাক, আমি এই চুপ করলাম। দাও, আমাকে ওষুধ দাও।'

ওষুধ খেতে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল ওর। তারপর চুপ করে রইল। এ-কামরায় আর কেউ

নেই। আমি ডাকলাম, 'শানু, একটু শুয়ে থাকবি?'

ও হাসল, বলল, 'না।'

'কার্শিয়াঙে আমাকে রেখে আসতে তোমার কষ্ট হবে বাবা?'

আমি চুপ করে রইলাম। শান্তা হাঁটু দুটো বুকের কাছে জড়ো করে নিয়ে সকৌতুকে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখ দুটো হাসছে। থিরথিরে, হালকা চপল হাসি। ওর থুতনিটা হাঁটুর ওপর। আমি কথা বলছি না। আমি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। শান্তা এবার শব্দ করে হাসল, 'তুমি যে আমাকে এত ভালবাস বাবা, অসুখ হওয়ার আগে কিন্তু বুঝতেই পারতাম না।'

এ-কামরায় আর কেউ নেই, থাকলে ওর কথা শুনে সে নিশ্চয়ই হেসে উঠল। আমি ওর দিকে তাকালাম। ওর সুন্দর ঠোঁটে একটা কোমল হাসি প্রজাপতির মতো কাঁপছে। আমি মনে মনে বলছি, শানু, তুই ওভাবে হাসিস না। তুই ওভাবে হাসলে আমার ভয় করে। তোর হাসির অর্থ আমি বুঝি। তুই সব জেনে গেছিস। তোর অসুখের খবরটা আর তার শেষ পরিণতিটা তোর কাছে লুকোন এই। ওরকম হাসি হাসতে তোর কষ্ট হয় না? আমাকে দয়া কর শানু, তুই ঘুমিয়ে পড়। সব কিছু বুঝে কোনও সুখ নেই। সব কিছু বুঝে গেলে শুধু দুঃখ।

'আমরা এখানে আসবার আগের দিন সুকুমারী শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরল।' শান্তা আস্তে আস্তে যেন আপনমনেই বলল, 'কী মোটাসোটা আর ফর্সা হয়েছে সুকুমারী, যেন আর চেনাই যায় না।'

'সুকুমারী কে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'বাঃ রে, কলকাতায় আমাদের পাশের বাড়ির পরেশবাবুর মেয়ে! তুমি সব ভুলে যাও বাবা, সুকুমারী তোমাকে এসে প্রণাম করল না সেদিন।'

'ওঃ হো, মনে পড়েছে, সেই রানাঘাটে যার বিয়ে হয়েছে, সেই তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তো ওর ছেলেটাকে দ্যাখোনি। কী মোটাসোটা আর সুন্দর ছেলেটা, এক গা গয়না, ঠিক ডল পুতুলের মতো। ছেলেটা খুব হাসে, শুধু হাসেই, কাঁদতে যেন জানেই না। আমার ইচ্ছে করছিল ছেলেটাকে একটু কোলে নিই, কিন্তু—'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'এখন নিশ্চয়ই তোর খিদে পেয়েছে শানু, একটা আপেল কেটে দিই?'

শান্তা করুণ চোখে আমার দিকে তাকাল। কথা বলল খুব ক্লান্ত, অবসন্ন কণ্ঠে,'না, খিদে পায়নি। খিদে আমার পায় না। বোধহয় জ্বরটা বাড়ছে, জিভটা তেতো তেতো। আমাকে একটু [illegible] দাও। থার্মোমিটারটা দিয়ে জ্বরটা দেখবে একটু?'

'না,' আমি বললাম, 'না থাক। জ্বর আসছে না নিশ্চয়ই। অনেকক্ষণ বসে আছিস কিনা। আবার একটু শুয়ে থাক।'

শান্তা হাসল। বেড়ালের মতো গুটিসুটি হয়ে শুল। গাড়িটা থামল। আবার চলল। গাড়িটা [illegible]। বাইরে নিস্তব্ধ, নির্জন পাহাড়ের ধূসর অনড় শরীর। শীত আর কুয়াশা। ঠাণ্ডা বাড়ছে। গাড়িটা ঘুরে ঘুরে আপনমনে ওপর দিকে উঠছে।

'বাবা, ছেলেবেলায় আমি খুব পুতুল খেলতে ভালবাসতাম।' শান্তা বলছে। যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে ও, 'তুমি আমাকে কত পুতুল কিনে দিয়েছ যে তার হিসেব নেই। আমার কাচের বাক্সে পুতুলগুলো সাজানো আছে, কিছু আমি চন্দ্রাকে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু একটা পুতুলের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। তুমি জন্মদিনে আমাকে দিয়েছিলেন। পুতুলটা মস্ত বড়, ঠিক

Shahnaz

সুকুমারীর ছেলেটার মতো বড়। সেই পুতুলটাকে তোমার বোধহয় মনে নেই বাপি?'

'কোন পুতুলটা? শোবার ঘরের আলমারিতে যে ডল-পুতুলটা আছে, সেইটে?'

'হ্যাঁ, সেইটেই। বড় হয়ে আমি আর পুতুল খেলি না। কিন্তু মাঝে মাঝে খেলতে ইচ্ছে করে। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, সুকুমারীর ছেলেটাকে আমি আদর করতে পারিনি। কিন্তু তার বদলে সেই পুতুলটাকে নিয়ে আমার বিকেলটা কেটেছিল।'

বাঁ দিকের পাহাড় মুছে গিয়েছে। ট্রেনটা এখন অনেক ওপরে। পাহাড়গুলো মাথা নিচু করে আছে। কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। ধূসর সমতলটা কী বিষণ্ণ। ট্রেনটার গতি শ্লথ। শান্তা আস্তে আস্তে উঠে বসল। ওর মুখের কাছে জানালাটাকে ঘয়া কাচের মতো অস্বচ্ছ মনে হচ্ছে। ওর নিশ্বাস কাচটার ওপর বারবার একটা বাষ্পের বৃত্ত এঁকে দিয়ে মুছে দিচ্ছে। ওর মুখটা অন্ধকার।

আমার মনে পড়ছে খুব ছোটবেলায় যখন সবেমাত্র একটু একটু লিখতে শিখছে শান্তা, তখন ওই পুতুলটার কপালে পেনসিল দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখে রেখেছিল—'আমার ছেলে।' সেই কথাটা এখন আর নেই। বড় হয়ে ও নিজেই সেটা মুছে ফেলেছে। আমার চোখের সামনে পাতলা একটা জলের পর্দা দুলছে। কামরাটাকে আঁকাবাঁকা বন্ধুর মনে হচ্ছে। আমি মনে মনে শান্তাকে যেন বলছি, তোর পুতুলগুলোকে তুই ফেলে এসেছিস, কিন্তু পুতুলখেলাকে ফেলে আসিসনি। শানু, আমরা সবাই অমনিভাবে পুতুল খেলি। তোর পুতুলগুলোকে আমি চিনি। রজতশুভ্র তেমনি পুতুল। তাকে তুই মেরে ফেলেছিস। কলকাতা ছাড়বার পর গাড়িতে তুই গম্ভীর দৃষ্টিতে অ্যালার্ম চেনটাকে দেখছিলি। ওটা টানলেই গাড়িটা থেমে যাবে। রজতশুভ্র নিজেকে অমনিভাবে থামিয়ে দিয়েছিল, অমনিভাবে চেনটার মতো দুলতে দুলতে, তোর আঙুলগুলো বেঁকে যাচ্ছিল, তোর মুখটায় জলরঙের কতকগুলো রেখা খেলা করে গেল। আমি জানি, ওরকমই হয়। রজতশুভ্ররা মরবার জন্যেই জন্মায়। রজতশুভ্র আর সুকুমারী—অনেক তফাত। একজনের জন্য প্রেম, আর একজনের জন্য ঘৃণা। একজনকে সাজিয়ে গুছিয়ে আলমারিতে তুলে রাখিস, আর একজনকে তীব্র ঘৃণায় দূরে ছুড়ে ফেলে দিস। কিন্তু তোর ভাগ্য তাকে কুড়িয়ে এনে তোর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আলমারির পুতুলটা বার বার চুরি হয়ে যায়।

ধোঁয়ার মতো কুয়াশা জানালার কাছে পিঠ ঘষছে। আলো আর অন্ধকার আমাদের ঘিরে ঘিরে খেলছে। শান্তা আমার দিকে তাকাল।

'তুমি কাঁদছ বাবা?'

'না, না তো। ও এমনিই।'

'আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম বাবা? সবাইকেই আমি কষ্ট দিই।'

'দূর পাগলি!'

শান্তা নিশ্বাস ফেলল। শব্দটা ছোট্ট একটা পাখির মতো ডানা দিয়ে বাতাস তাড়াতে তাড়াতে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। শান্তা, তোর নিজেকে ঘিরে একটা অদৃশ্য বৃত্ত আছে। সেই বৃত্তের পরিসরে তোর দুঃখটা তোকে ঘিরে ঘিরে পাখির মতো ওড়ে। তুই নিজের দুঃখে কাঁদিস, তুই নিজের সুখে হাসিস। রজতশুভ্র, সুকুমারী, আমি, আমরা সবাই রংচং-এ পুতুলের মতো সেই অদৃশ্য বৃত্তটার বাইরে থেকে তোকে দেখি। আমাদের জন্যে তোর ক্রোধ, ঘৃণা, প্রেম, স্নেহ কিছুই নেই। আমরা পুতুলের মতো মিথ্যে। তোর কান্নাটা, তোর আনন্দটা তোর আপন। আমরা সবাই এই রকম শানু। আমাদের অনুভূতিগুলো সব একরকম, সব অদ্ভুত।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের রং ছাইয়ের মতো। সুদীর্ঘ, সরল পাইনের বনে গম্ভীর

নির্জনতা। শানু তোর শেষ কথাটা শোনবার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি। তুই কি কাঁদতে ভুলে গেছিস?

'কার্শিয়াং আর কতদূর বাবা?'

'এখনও দেরি আছে। এবার কিন্তু তোর কিছু খাওয়া উচিত শানু।'

'কী দেবে দাও।' ও ডান হাতটা আমার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে ছেলেমানুষের মতো একটু হাসল।

কার্শিয়াং এসে গেল প্রায়। আর দুটো বাঁক ঘুরলেই কার্শিয়াং। আমি অপেক্ষা করে আছি শান্তার সেই কথাটা শোনবার জন্য। ও বলবে, বাবা, আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। রজতশুভ্র আমার ভালবাসাটাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল। সুকুমারীকে আমি ঘৃণা করি সেই কারণেই। অথচ ওর কী দোষ! রজতশুভ্র মরে গেল, আমি রইলাম। সুকুমারীও বেঁচে রইল, অথচ ওর কিছুই হারাল না। ওর ছেলেটা মোটাসোটা, সুন্দর—ওর মুখের মতো সুন্দর, ওর ভবিষ্যতের মতো সুন্দর। সুকুমারীর সবটুকু দেখবার জন্য আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। এই তীব্র ইচ্ছাশক্তি আমাকে বাঁচিয়ে তুলবে।

'শানু, কী দেখছিস?'

'যা চোখে পড়ছে তাই। বাবা, আমি সবকিছুকে দেখতে চাই।'

আমি হাসলাম। তারপর চুপি চুপি হাসিটাকে গিলে ফেললাম। আমি অপেক্ষা করে থাকব। কিন্তু শান্তা সেই কথাটা বলবে না। আমি জানি, ও বলবে না। এ-সব কথা বলতে নেই। কিন্তু আমি তবু অপেক্ষা করে থাকব।

শানু, তোকে একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে। জানালার ঠাণ্ডা কাচে গালটা চেপে তুই বাইরের দিকে তাকিয়ে আছিস। তোর চোখে গাম্ভীর্যের গভীরতা। গল্পটা তুই শুনবি না। আমার ইচ্ছে করছে, তবু আমি কোনও দিন তোকে গল্পটা বলব না। শুধু মনে মনে ভাবব, শানু, তুই বড় হয়ে গেছিস। মস্ত বড়। একপাল ছেলেমেয়ে ঘরভর্তি। সংসারটা উপচে পড়ছে সম্পদের আধিক্যে।

শানু, কার্শিয়াং আর কয়েক মিনিটের পথ। তোর মুখের পাশে জানলার কাচে তোর নিশ্বাস বার বার একটা বাষ্পের বৃত্ত এঁকে দিয়ে মুছে দিচ্ছে। তোর মুখটা অন্ধকার। করুণ, গভীর অন্ধকার।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মে ১৯৫৯

Shahnaz

আমরা

সেবার গ্রীষ্মকালের শেষদিকে দিন চারেক ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগে উঠলেন আমার স্বামী। এমনিতেই তিনি একটু রোগা ধরনের মানুষ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর তাঁর চেহারাটা আরও খারাপ হয়ে গেল। দেখতাম তাঁর হনুর হাড় দুটো গালের চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, গাল বসা, চোখের নীচে গাঢ় কালি, আর তিনি মাঝে মাঝে শুকনো মুখে ঢোক গিলছেন—কণ্ঠাস্থিটা ঘন ঘন ওঠা নামা করছে। তাঁকে খুব অন্যমনস্ক, কাহিল আর কেমন যেন লক্ষ্মীছাড়া দেখাত। আমি তাঁকে খুব যত্ন করতাম। বীট গাজর সেদ্ধ, টেংরির জুস, দু'বেলা একটু একটু মাখন, আর রোজ সম্ভব নয় বলে মাঝে মধ্যে এক-আধটা ডিমের হাফবয়েল তাঁকে খাওয়াতাম। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার এক মাস পরেও তাঁর চেহারা ভাল হল না, বরং আরও দুর্বল হয়ে গেল। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে তিনি ভয়ঙ্কর হাঁফাতেন, রাত্রিবেলা তাঁর ভাল ঘুম হত না, অথচ দেখতাম সকালবেলা চেয়ারে বসে চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি ঢুলছেন, কষ বেয়ে নাল গড়িয়ে পড়ছে। ডাকলে চমকে উঠে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যেত যে তিনি স্বাভাবিক নেই। বরং অন্যমনস্ক এবং দুর্বল দেখাচ্ছে তাঁকে।

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোমার কী হয়েছে বলো তো!

তিনি বিব্রতমুখে বললেন—অনু, আমার মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা আমার এখনও সারেনি। ভিতরে ভিতরে আমার যেন জ্বর হয়, হাড়গুলো কট্ কট্ করে, জিভ তেতো-তেতো লাগে। তুমি আমার গাটা ভাল করে দেখো তো!

গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা। সে কথা বলতেই তিনি হতাশভাবে হাত উল্টে বললেন—কী যে হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার বোধহয় একটু একসারসাইজ করা দরকার। সকাল বিকেল একটু হাঁটলে শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন থেকে খুব ভোরে উঠে, আর বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তিনি বেড়াতে বেরোতেন। আমি আমাদের সাত বছর বয়সের ছেলে বাপিকে তাঁর সঙ্গে দিতাম। বাপি অবশ্য বিকেলবেলা খেলা ফেলে যেতে চাইত না, যেত সকালবেলা। সে প্রায়ই এসে আমাকে

বলত—বাবা একটুও বেড়ায় না মা, পার্ক পর্যন্ত গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে, আর রেলিঙে ঠেস দিয়ে ঢুলতে থাকে। আমি বলি, চলো বাবা, লেক পর্যন্ত যাই, বাচ খেলা দেখে আসি, আমাদের স্কুলের ছেলেরাও ওখানে ফুটবল প্র্যাকটিস করে, কিন্তু বাবা রেললাইন পারই হয় না। কেবল ঢুল-ঢুল চোখ করে বলে, তুই যা, আমি এখানে দাঁড়াই, ফেরার সময়ে আমাকে খুঁজে নিস।

আমাদের স্নান ঘরটা ভাগের। বাড়িওয়ালা আর অন্য এক ভাড়াটের সঙ্গে। একদিন সকালবেলা অফিসের সময়ে অন্য ভাড়াটে শিববাবুর গিন্নি এসে চুপি চুপি বললেন—ও দিদি আপনার কর্তাটি যে বাথরুমে ঢুকে বসে আছেন, তারপর আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। আমার কর্তাটি তেল মেখে কখন থেকে ঘোরাফেরা করছেন, এইমাত্র বললেন—দেখি তো, অজিতবাবু তো কখনও এত দেরি করে না—

শুনে ভীষণ চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি বাথরুমের দরজায় কান পাতলাম। কিন্তু বাথরুমটা একদম নিশ্চুপ। বন্ধ দরজার ওপাশে যে কেউ আছে তা মনেই হয় না। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম—ওগো, কী হল—

তিনি বললেন—কেন?

—এত দেরি করছ কেন?

তিনি খুব আস্তে, যেন আপনমনে বললেন—ঠিক বুঝতে পারছি না—তারপর হুড় মুড় করে জল ঢেলে কাক-স্নান সেরে তিনি বেরিয়ে এলেন।

পরে যখন জিজ্ঞেস করলাম, বাথরুমে কী করছিলে তুমি? তখন উনি বিরসমুখে বললেন, গাটা এমন শিরশির করছিল যে জল ঢালতে ইচ্ছে করছিল না। তাই চৌবাচ্চার ধারে উঠে বসে ছিলাম।

—বসে ছিলে কেন?

—ঠিক বসে ছিলাম না। জলে হাত ডুবিয়ে রেখে দেখছিলাম ঠাণ্ডাটি সয়ে যায় কিনা।

বলে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে এক সময়ে বললেন—আসলে আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না। বাথরুমের ভিতরটা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, জলে ভেজা অন্ধকার, আর চৌবাচ্চা ভর্তি জল ছলছল করে উপচে বয়ে যাচ্ছে খিলখিল করে—কেমন যেন লাগে!

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেমন?

উনি ম্লান একটু হাসলেন, বললেন—ঠিক বোঝানো যায় না। ঠিক যেন গাছের ঘন ছায়ায় বসে আছি, আর সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে—

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন—বুঝলে, ঠিক করলাম এবার বেশ লম্বা অনেকদিনের একটা ছুটি নেব।

—নিয়ে?

—কোথাও বেড়াতে যাব। অনেকদিন কোথাও যাই না। অনু, আমার মনে হচ্ছে একটা চেঞ্জের দরকার। শরীরের জন্য না, কিন্তু আমার মনটাই কেমন যেন ভেঙে যাচ্ছে। অফিসে আমি একদম কাজকর্ম করতে পারছি না। আজ বেলা তিনটে নাগাদ আমার কলিগ সিগারেট চাইতে এসে দেখে যে আমি চোখ চেয়ে বসে আছি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছি না। সে ভাবল, আমার হার্ট-ফার্ট কিছু একটা হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে সবাইকে ডেকে আনল। কী কেলেঙ্কারী! অথচ তখন আমি জেগেই আছি।

—জেগেছিলে। তবে সাড়া দাওনি কেন?

Shahnaz

—কী জানো! আজকাল ভীষণ অলস বোধ করি। কারও ডাকে সাড়া দিতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। এমন কি মাঝে মাঝে অজিত ঘোষ নামটা যে আমার তা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। কেউ কিছু বললে চেয়ে থাকি কিন্তু বুঝতে পারি না। ফাইলপত্র নাড়তে ইচ্ছে করে না, একটা কাগজ টেবিলের এধার থেকে ওধারে সরাতে, পিনকুশনটা কাছে টেনে আনতে গেলে মনে হয় পাহাড় ঠেলার মতো পরিশ্রম করছি। সিগারেটের ছাই কত সময়ে জামায় কাপড়ে উড়ে পড়ে—আগুন ধরার ভয়েও সেটাকে ঝেড়ে ফেলি না—

শুনে, আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্ করে উঠল। বললাম—তুমি ডাক্তার দেখাও। চলো, আজকেই আমরা মহিম ডাক্তারের কাছে যাই।

—দূর! উনি হাসলেন, বললেন—আমার সত্যিই তেমন কোনও অসুখ নেই। অনেকদিন ধরে একই জায়গায় থাকলে, একই পরিবেশে ঘোরাফেরা করলে মাথাটা একটু জমাট বেঁধে যায়। ভেবে দেখো, আমরা প্রায় চার পাঁচ বছর কোথাও যাইনি। গতবার কেবল বিজুর পৈতেয় ব্যান্ডেল। আর কোথাও না। চলো, কাছাকাছি কোনও সুন্দর জায়গা থেকে মাসখানেক একটু ঘুরে আসি। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন জায়গায় যাব যেখানে একটা নদী আছে, আর অনেক গাছগাছালি—

আমার স্বামী চাকরি করেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে। কেরানি। আর কিছুদিন বাদেই তিনি সাবর্ডিনেট অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের পরীক্ষা দেবেন বলে ঠিক করেছেন। অঙ্কে তাঁর মাথা খুব পরিষ্কার, বন্ধুরা বলে—অজিত এক চান্সে বেরিয়ে যাবে। আমারও তাই বিশ্বাস। কিছুদিন আগেও তাঁকে পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত দেখতাম। দেখে খুব ভাল লাগত আমার। মনে হত, ওঁর যেমন মনের জোর তাতে শক্ত পরীক্ষাটা পেরিয়ে যাবেনই। তখন সংসারের একটু ভাল ব্যবস্থা হবে। সেই পরীক্ষাটার ওপর আমাদের সংসারের অনেক পরিকল্পনা নির্ভর করে আছে। তাই চেঞ্জের কথা শুনে আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—এখন এক দেড় মাস ছুটি নিলে তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না?

উনি খুব অবাক হয়ে বললেন—কিসের পড়াশুনো?

—ওই যে এস-এ-এস না কী যেন!

শুনে ওঁর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল! ভীষণ হতাশ হলেন উনি। বললেন—তুমি আমার কথা ভাবো, না কি আমার চাকরি-বাকরি, উন্নতি এইসবের কথা? অনু, তোমার কাছ থেকে আমি আর একটু সিমপ্যাথি আশা করি। তুমি বুঝতে পারছ না আমি কী একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আছি!

আমি লজ্জা পেলাম, তবু মুখে বললাম—বাঃ, তোমাকে নিয়ে ভাবি বলেই তো তোমার চাকরি, পরীক্ষা, উন্নতি সব নিয়েই আমাকে ভাবতে হয়। তুমি আর তোমার সংসার এ ছাড়া আমার আর কি ভাবনা আছে বলো?

উনি ছেলেমানুষের মতো রেগে চোখ-মুখ লাল করে বললেন—আমি আর আমার সংসার কি এক?

অবাক হয়ে বললাম—এক নও?

উনি ঘনঘন মাথা নেড়ে বললেন—না। মোটেই না। সেটা বোঝো না বলেই তুমি সব সময়ে আমাকে সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে দেখো, আলাদা মানুষটাকে দেখো না।

হেসে বললাম—তাই বুঝি!

উনি মুখ ফিরিয়ে বললেন—তাই। আমি যে কেরানি তা তোমার পছন্দ না, আমি অফিসার হলে তবে তোমার শান্তি। এই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমি চিরকাল, এইরকম কেরানিই থাকব, তাতে তুমি সুখ পাও আর না পাও।

—থাকো না, আমি তো কেরানিকেই ভালবেসেছি, তাই বাসব।

কিন্তু উনি এ কথাতেও খুশি হলেন না। রাগ করে জানালার থাকের ওপর বসে বাইরের মরা বিকেলের দিকে চেয়ে রইলে। বেড়াতে গেলেন না। দেখলাম, জ্বর আসার আগের মতো ওঁর চোখ ছলছল করছে, মাঝে মাঝে কাঁপছে ঠোঁট, হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে তুলে এমন ভাবে বসে আছেন যে রোগা দুর্বল শরীরটা দেখে হঠাৎ মনে হয় বাচ্চা একটা রোগে-ভোগা ছেলেকে কেউ কোলে করে জানালার কাছে বসিয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা পাগল। আমাদের ছেলের বয়স সাত, মেয়ের বয়স চার। আজকালকার ছেলেমেয়ে অল্প বয়সেই সেয়ানা। তার ওপর বাসায় রয়েছে ঠিকে ঝি, ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার ছেলেমেয়ে—এতজনের চোখের সামনে ভরসন্ধেয় কী করে আমি ওঁর রাগ ভাঙাই! তবু পায়ের কাছটিতে মেজেতে বসে আস্তে আস্তে বললাম—লক্ষ্মী সোনা, রাগ করে না। ঠিক আছে; চলো কিছুদিন ঘুরে আসি। পরীক্ষা না হয় এবছর না দিলে, ও তো ফি-বছর হয়—

উনি সামান্য একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন—তবু দেখো, পরীক্ষার কথাটা ভুলতে পারছ না। এ বছর নয় তো সামনের বার। কিন্তু আমি তো বলেই দিয়েছি কোনওদিন আমি পরীক্ষা দেব না—

—দিয়ো না। কে বলেছে দিতে। আমাদের অভাব কিসের। বেশ চলে যাবে। এবার ওঠে তো—

আমার স্বামীর অভিমান একটু বেশিক্ষণ থাকে। ছেলেবেলা থেকেই উনি কোথাও তেমন আদর যত্ন পাননি। অনেকদিন আগেই মা-বাবা মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই মামাবাড়িতে একটু অনাদরেই বড় হয়েছেন। বি.এসসি. পরীক্ষা দিয়েই ওকে সে বাড়ি ছেড়ে মির্জাপুরের একটা মেসে আশ্রয় নিতে হয়। সেই মেসে দশ বছর থেকে চাকরি করে উনি খুব নৈরাশ্যবোধ করতে থাকেন। তখন ওঁর বয়স তিরিশ। ওঁর রুম-মেট ছিলেন আমার বুড়োকাকা। তিনিই মতলব করে ওঁকে একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এলেন। তারপর মেসে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে? উনি খুব লজ্জা-টজ্জা পেয়ে অবশেষে বললেন—চোখ দুটি বেশ তো! তারপরই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমরা উঠলাম এসে লেক গার্ডেনসের পাশে গরিবদের পাড়া গোবিন্দপুরে। যখন এই একা বাসায় আমরা দুজন, তখন উনি আমাকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখতেন দুরন্ত অভিমানে—এই যে আমি অফিসে চলে যাই, তারপর কি তুমি আর আমার কথা ভাবো! কী করে ভাববে, আমি ত্রিশ বছরের বুড়ো, আর তুমি কুড়ির খুকি। তুমি আজ জানালায় দাঁড়াওনি...কাল রাতে আমি যে জেগেছিলাম কেউ কি টের পেয়েছিল! কী ঘুম বাবা!

ওঁর অভিমান দুরন্ত হলেও সেটা ভাঙা শক্ত না। একটু আদরেই সেটা ভাঙানো যায়। কিন্তু এবারকার অভিমান বা রাগ সেই অনাদরে বড় হওয়া মানুষটার ছেলেমানুষী নেই-আঁকড়ে ব্যাপার তো নয়। এই ব্যাপারটা যেন একটু জটিল। হয়তো উনি একেবারে অমূলক কথা বলছেন না। আমি সংসারের ভালমন্দর সঙ্গে জড়িয়েই ওঁকে দেখি। এর বাইরে যে একা মানুষটা, যার সঙ্গে আসলে বাইরের জগতের একটা অদৃশ্য বনিবনার অভাব চলছে তার কথা তো আমি জানি না।

Shahnaz

নইলে উনি কেন লোকের ডাকে সাড়া দেন না, কেন চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন, তা আমি বুঝতে পারতাম।

রাত্রিবেলা আমাদের ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে উনি হঠাৎ চুপি চুপি আমার কাছে সরে এলেন। মুখ এবং মাথা ডুবিয়ে দিলেন আমার বুকের মধ্যে। বুঝতে পারলাম তাঁর এই ভঙ্গির মধ্যে কোনও কাম-ইচ্ছা নেই। এ যেমন বাপি আমার বুকে-মাথা গোঁজে অনেকটা সেরকম। আমি কথা না বলে ওঁকে দুহাতে আগলে নিয়ে ওঁর রুক্ষ মাথা, আর অনেকদিনের আ-ছাঁটা চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গভীর আনন্দের একটা শ্বাস টেনে নিলাম। বুক ভরে গেল। উনি আস্তে আস্তে বললেন—তোমাকে মাঝে মাঝে আমার মায়ের মতো ভাবতে ইচ্ছে হয়। এরকম ভাবাটা কি পাপ?

কি জানি! আমি এর কী উত্তর দেব? আমি বিশ্ব সংসারের রীতি-নীতি জানি না। কার সঙ্গে কী রকম সম্পর্কটা পাপ, কোনটা অন্যায় তা কী করে বুঝব! যখন ফুলশয্যায় রাতে প্রথম উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, সেদিনও আমার শরীর কেঁপে উঠেছিল বটে। কিন্তু সেটা রোমাঞ্চে নয়—শিহরনেও নয়, বরং মনে হয়েছিল—বাঁচলাম। এবার নিশ্চিন্ত। এই অচেনা, রোগা কালো কিন্তু মিষ্টি চেহারার দুর্বল মানুষটির সেই প্রথম স্পর্শেই আমার ভিতরে সেই ছেলেবেলার পুতুলখেলার এক মা জেগে উঠেছিল। ছেলেমেয়েরা যেমন প্রেম করে, লুকোচুরি করে, সহজে ধরা দেয় না, আবার একে অন্যকে ছেড়ে যায়—আমাদের কখনও সেরকম প্রেম হয়নি।

উনি বুকে মুখ চেপে অবরুদ্ধ গলায় বললেন—তোমাকে একটা কথা বলব কাউকে বোলো না। চলো জানালার ধারে গিয়ে বসি।

উঠলাম। ছোট্ট জানালার চৌখুপিতে তাকের ওপর মুখোমুখি বসলাম দুজন। বললাম—বলো।

উনি সিগারেট ধরালেন, বললেন—তোমার মনে আছে, বছর দুই আগে একবার কাঠের আলমারিটা কেনার সময় সত্যচরণের কাছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার করেছিলাম?

—ওমা, মনে নেই! আমি তো কতবার তোমাকে টাকাটা শোধ দেওয়ার কথা বলেছি! আমার স্বামী একটা শ্বাস পেলে বললেন—হ্যাঁ, সেই ধারটার কথা নয়, সত্যচরণের কথাই বলছি তোমাকে। সেদিন মাইনে পেয়ে মনে করলাম এ মাসে প্রিমিয়াম ডিউ-ফিউ নেই, তাছাড়া রেডিওর শেষ ইনস্টলমেন্টটাও গতমাসে দেওয়া হয়ে গেছে, এ মাসে যাই সত্যচরণের টাকাটা দিয়ে আসি। সত্যচরণ ভদ্রলোক, তাছাড়া আমার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ওরই কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে—বড়লোক বলা যায় ওকে—সেই কারণেই বোধহয় ও কখনও টাকাটার কথা বলেনি আমাকে। কিন্তু এবার দিয়ে দিই। তাছাড়া ওর সঙ্গে অনেককাল দেখাও নেই, খোঁজখবর নিয়ে আসি। ভেবে-টেবে বিকেলে বেরিয়ে ছ'টা নাগাদ ওর নবীন পাল লেনের বাড়িতে পৌঁছলাম। ওর বাড়ির সামনেই একটা মস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল যার কাচের ওপর লাল ক্রশ আর ইংরিজিতে লেখা—ডক্টর। কিছু না ভেবে ওপরে উঠে যাচ্ছি সিঁড়ি বেয়ে হাতে স্টেথস্কোপ ভাঁজ করে নিয়ে একজন মোটাসোটা ডাক্তার মুখোমুখি নেমে এলেন। সিঁড়ির ওপরে দরজার মুখেই সত্যর বৌ নীরা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। ফর্সা, সুন্দর মেয়েটা, কিন্তু তখন রুখু চুল, ময়লা শাড়ি, সিঁদুর ছাড়া কপাল আর কেমন একটা রাতজাগা ক্লান্তির ভারে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল ওকে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই ফুঁপিয়ে উঠল—ও মারা যাচ্ছে, অজিতবাবু। শুনে বুকের ভিতরে যেন একটা কপাট হাওয়া লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি সত্যচরণ পূর্বদিকে

মাথা করে শুয়ে আছে, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে সিঁদুরের মতো লাল টকটকে রোদ এসে পড়েছে ওর সাদা বিছানায়। ওর মাথার কাছে ছোট টেবিলে কাটা ফল, ওষুধের শিশি-টিশি রয়েছে, মেঝেয় খাটের নীচে বেডপ্যান-ট্যান। কিন্তু এগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। ঘরের মধ্যে ওর আত্মীয়-স্বজনও রয়েছেন কয়েকজন। দুজন বিধবা মাথার দুধারে ঘোমটা টেনে বসে, একজন বয়স্কা মহিলা পায়ের দিকটায়। একজন বুড়ো মতো লোক খুব বিমর্ষ মুখে সিগারেট পাকাচ্ছেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, দুজন অল্পবয়সী ছেলে নিচু স্বরে কথা বলছে। দু-একটা বাচ্চাও রয়েছে ঘরের মধ্যে। তারা কিছু টের পাচ্ছিল কিনা জানি না, কিন্তু সেই ঘরে পা দিয়েই আমি এমন একটা গন্ধ পেলাম—যাকে—কী বলব—যাকে বলা যায় মৃত্যুর গন্ধ। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না কিন্তু আমার মনে হয় মৃত্যুর একটা গন্ধ আছেই। কেউ যদি কিছু নাও বলত, তবু আমি চোখ বুজেও ওই ঘরে ঢুকে বলে দিতে পারতাম যে ওই ঘরে কেউ একজন মারা যাচ্ছে। যাকগে, আমি ওই গন্ধটা পেয়েই বুঝতে পারলাম নীরা ঠিকই বলেছে, সত্য মারা যাচ্ছে। হয়তো এখুনি মরবে না, আরও একটু সময় নেবে। কিন্তু আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আমি ঘরে ঢুকতেই মাথার কাছ থেকে একজন বিধবা উঠ গেলেন, পায়ের কাছ থেকে সধবাটিও। কে যেন একটা টুল বিছানার পাশেই এগিয়ে দিল আমাকে বসবার জন্য। তখনও সত্যর জ্ঞান আছে। মুখটা খুব ফ্যাকাশে রক্তশূন্য আর মুখের চামড়ায় একটা খড়ি-ওঠা শুষ্ক ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—কে? বললাম—আমি রে, আমি অজিত। বলল—ওঃ অজিত! কবে এলি? বুঝলাম একটু বিকারের মতো অবস্থা হয়ে আসছে। বললাম—এইমাত্র। তুই কেমন আছিস? বলল—এই একরকম, কেটে যাচ্ছে। আমি ঠিক ওখানে আর বসে থাকতে চাইছিলাম না। তুমি তো জানো অষুধ-টসুধের গন্ধে আমার কী রকম গা গুলোয়! তাই এক সময়ে ওর কাছে নিচু হয়ে বললাম—তোর টাকাটা দিতে এসেছি। ও খুব অবাক হয়ে বলল—কত টাকা! বললাম—পঞ্চাশ। ও ঠোঁট ওল্টাল—দূর, ওতে আমার কী হবে! ওর জন্য কষ্ট করে এলি কেন? আমি কি মাত্র পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিলাম তোর কাছে? আমি তো তার অনেক বেশি চেয়েছিলাম! আমি খুব অবাক হয়ে বললাম—তুই তো আমার কাছে চাসনি! আমি নিজে থেকেই এনেছি, অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলাম—তোর মনে নেই? ও বেশ চমকে উঠে বলল—না, ধারের কথা নয়। কিন্তু তোর কাছে আমি কী একটা চেয়েছিলাম না? সে তো পঞ্চাশ টাকার অনেক বেশি। জিজ্ঞেস করলাম—কী চেয়েছিলি? ও খানিকক্ষণ সাদা ছাদের দিকে চেয়ে কী ভাবল, বলল—কী যেন—ঠিক মনে পড়ছে না—ওই যে—সব মানুষই যা চায়—আহা, কী যেন ব্যাপারটা। আচ্ছা দাঁড়া বাথরুম থেকে ঘুরে আসি, মনে পড়বে। বলে ও ওঠার চেষ্টা করল। সেই বিধবাদের একজন এসে পেচ্ছাপ করার পাত্রটা ওর গায়ের চাদর নীচে ঢুকিয়ে ঠিক করে দিল। কিছুক্ষণ—পেচ্ছাপ করার সময়টায়, ও বিকৃত মুখে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ভোগ করল শুয়ে শুয়ে। তারপর আবার আস্তে আস্তে একটু গা ছাড়া হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল—তোর কাছেই চেয়েছিলাম না কি—কার কাছে যে—মনেই পড়ছে না। কিন্তু চেয়েছিলাম—বুঝলি—কোনও ভুল নেই। খুব আবদার করে গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে চেয়েছিলাম, আবার ভিখিরির মতো হাত বাড়িয়ে ল্যাং ল্যাং করেও চেয়েছিলাম, আবার চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়েও চেয়েছিলাম—কিন্তু শালা মাইরি দিল না...। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী চেয়েছিলি! ও সঙ্গে সঙ্গে খোলা চোখ ছাদের দিকে ফিরিয়ে বলল—ওই যে—কী ব্যাপারটা যেন—নীরাকে জিজ্ঞেস কর তো, ওর মনে থাকতে পারে—আচ্ছা দাঁড়া—একশো থেকে উলটোবাগে গুনে

Shahnaz

দেখি, তাতে হয়তো মনে পড়বে। বলে ও খানিকক্ষণ গুনে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল—না, সময় নষ্ট। মনে পড়ছে না। আমি তখন আস্তে আস্তে বললাম—তুই তো সবই—পেয়েছিস! ও অবাক হয়ে বলল—কী পেয়েছি—অ্যাঁ—কী? আমি মৃদু গলায় বললাম—তোর তো সবই আছে। বাড়ি, গাড়ি, ভাল চাকরি, নীরার মতো ভাল বৌ, অমন সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা দার্জিলিঙে কনভেন্টে পড়ছে। ব্যাঙ্কে টাকা, ইন্সিওরেন্স—তোর আবার কী চাই? ও অবশ্য ঠোঁটে একটু হাসল, হলুদ ময়লা দাঁতগুলো একটুও চিকমিক করল না, ও বলল—এ সব তো আমি পেয়েইছি। কিন্তু এর বেশি আর একটা কী যেন—বুঝলি—কিন্তু সেটার তেমন কোনও অর্থ হয় না। যেমন আমার প্রায়ই ইচ্ছে করে একটা গাছের ছায়ায় বসে দেখি সারাদিন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। অথচ ওই চাওয়াটার কোনও মাথামুণ্ডু হয় না। ঠিক সেইরকম—কী যেন একটা—আমি ভেবেছিলাম তুই সেটাই সঙ্গে করে এনেছিস! কিন্তু না তো, তুই তো মাত্র পঞ্চাশটা টাকা—তাও মাত্র যেটুকু ধার করেছিল—কিন্তু কী ব্যাপারটা বলতো, আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না—! অথচ খুব সোজা, জানা জিনিস সবাই চায়!

আমার স্বামীকে অন্ধকারে খুব আবছা দেখাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভাবসাব লক্ষ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। উনি একটু বিমনা গলায় বললেন—অনু, সত্যচরণের ওখান থেকে বেরিয়ে সেই রাত্রে প্রথম বর্ষার জলে আমি ভিজেছিলাম—তুমি খুব বকেছিলে—আর পরদিন সকাল থেকেই আমার জ্বর—মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

—সত্যচরণ তার তিনদিন পর মারা গেছে। সেই কথাটা শেষ পর্যন্ত বোধহয় তার মনে পড়েনি। কিন্তু আমি যতদিন জ্বরে পড়েছিলাম ততদিন, তারপর জ্বর থেকে উঠে এ পর্যন্ত কেবলই ভাবছি কী সেটা যা সত্যচরণ চেয়েছিল! সবাই চায়, অথচ তবু তার মনে পড়ল না কেন?

বলতে বলতে আমার স্বামী দুহাতে আমার মুখ তুলে নিয়ে গভীরভাবে আমাকে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—তবু সত্যচরণ যখন চেয়েছিল তখন আমার ইচ্ছে করছিল সত্যচরণ যা চাইছে সেটা ওকে দিই। যেমন করে হোক সেটা এনে দিই ওকে। কিন্তু তখন তো বুঝবার উপায় ছিল না ও কী চাইছে। কিন্তু এখন এতদিনে মনে হচ্ছে সেটা আমি জানি—

আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী গো সেটা?

আমার স্বামী শ্বাস পেলে বললেন—মানুষের মধ্যে সব সময়েই একটা ইচ্ছে বরাবর চাপা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। কোথাও কেউ একজন বসে আছেন প্রসন্ন হাসিমুখে, তিনি আমার কিছুই চান না, তবু তাঁকে আমার সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার কথা। টাকা-পয়সা নয়, আমার বোধ বুদ্ধি লজ্জা অপমান জীবন মৃত্যু—সব কিছু। বদলে তিনি কিছুই দেবেন না, কিন্তু দিয়ে আমি তৃপ্তি পাব। রোজগার করতে করতে, সংসার করতে করতে মানুষ সেই দেওয়ার কথাটা ভুলে যায়। কিন্তু কখনও কখনও সত্যচরণের মতো মরবার সময়ে মানুষ দেখে সে দিতে চায়নি, কিন্তু নিয়তি কেড়ে নিচ্ছে, তখন তার মনে পড়ে—এর চেয়ে স্বেচ্ছায় দেওয়া ভাল ছিল।

Shahnaz

আমাকে দেখুন

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। এই যে আমি এখানে। একটু আগে আমি বাসের পা-দানিতে ঠেলে-ঠুলে উঠলাম, তারপর নীরেট জমাট ভিড়ের ভিতরে আমি এ-বগল সে-বগলের তলা দিয়ে, এর ওর পায়ের ফোঁকর দিয়ে ঠিক ইঁদুরের মতো একটা গর্ত কেটে কেটে এতদূর চলে এসেছি। বাসের রডগুলো বড় উঁচুতে—আমি বেঁটে মানুষ—অতদূর নাগাল পাই না। আমি সিটের পিছন দিক ধরে দাঁড়াই, তারপর গা ছেড়ে দিই! বাসের ঝাঁকুনিতে যখন আমি দোল খাই আশেপাশের মানুষের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাই, তখন আমার আশেপাশের লোক কেউ খুব একটা রাগ করে না। কারণ আমার ওজন এত কম যে, কারও গায়ে ঢলে পড়লেও সে আমার ভার বা ধাক্কা টেরই পায় না। হ্যাঁ, এখন আমি বাসের পিছন দিকটায় একটা সিট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দুধারে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু সব মানুষ। তারা আমাকে এত ঢেকে আছে যে, বোধহয় আমাকে দেখাই যাচ্ছে না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছে না কেউ। ওইটাই মুশকিল। আমাকে অনেকেই দেখে, কিন্তু লক্ষ করে না। এখন আমি যার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা যার মুখোমুখি, তারা আমাকে হয়তো দেখছে, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে। যেন আমি না থাকলেও কোনও ক্ষতি বা লাভ ছিল না। তার কারণ বোধহয় এই যে, আমার চেহারায় এমন কিছু নেই, যাতে আমাকে আলাদা করে চেনা যায়। হ্যাঁ মশাই আমি মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, রোগাই, তবে খুব রোগা নয় যেটা চোখে লাগে, কালোই তবে খুব কালো নয় যে, আর একবার তাকিয়ে দেখবে কেউ। চল্লিশ বছরের পর আমার মাথা ক্রমে ফাঁকা হয়ে চুল পাতলা হয়ে এসেছে অথচ টাকও পড়েনি—টেকোমানুষকেও কেউ কেউ দেখে। তার ওপর আমার মুখখানা—সেটা না খুব কুচ্ছিত না সুন্দর—আমার নাক থ্যাবড়া নয় চোখাও নয়, চোখ বড়ও নয় আবার কুতকুতেও নয়। কাজেই এই যে এখন ভিড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি—দু'ধারে উঁচু উঁচু মানুষ—এই ভিড়ের মধ্যে কেউ কি আমাকে দেখছেন? দেখছেন না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছেন না—আমি জানি।

আমার বিয়ের পর একটা খুব মর্মান্তিক মজার ঘটনা ঘটেছিল। বউভাতের দুই একদিন পর

Shahnaz

আমি আমার বউকে নিয়ে একটু বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। আর কয়েকদিন পরই দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি যাব, সেই কারণেই কিছু নমস্কারী কাপড়-চোপড় কেনা দরকার ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে আমি আমার বউকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিউ মার্কেটে যাবে?' আমার যা অবস্থা তাতে নিউ মার্কেটে বাজার করার কোনও অর্থ হয় না, বরাবর আমার বাসার কাছে কাটরায় সস্তায় কাপড়-চোপড় কিনি। তবু যে আমি এই কথা বলেছিলাম, তার এক নম্বর কারণ ছিল যে, আমার বউটি ছিল মফস্বলের মেয়ে, নিউ মার্কেট দেখেনি, আর দুই নম্বর কারণ হল আমার শ্বশুরবাড়ির দিকটা আমাদের তুলনায় বেশ একটু পয়সাওয়ালা। আমি নিউ মার্কেটের কথা বললাম যাতে আমার নতুন বউটি খুশি হবে, আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন শুনবে, কাপড়-চোপড় নিউ মার্কেট থেকে কেনা, তখন তাদের ভ্রূ একটু উর্ধ্বগামী হবে। কিন্তু ওই নিউ মার্কেটের প্রস্তাবটাই একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। কারণ ওখানে না গেলে ঘটনাটা বোধহয় ঘটতই না। ব্যাপারটা হয়েছিল কি নিউ মার্কেটে ঢোকার পর ঝলমলে দোকান-পশার দেখে আমার বউ মুগ্ধ হয়ে গেল। যে কোনও দোকানের সামনেই দাঁড়ায়, তারপর শো-কেসে রেখে এক-পা এক-পা করে হাঁটে! আমার দিকে তাকাতেও ভুলে গেল। তখন আমার নতুন বউ, কাজেই আমার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। আমি তাকে এটা ওটা দেখিয়ে একটু মাতব্বরীর চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কোনও জিনিসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সব কিছুই দেখতে লাগল। অভিমানটা একটু প্রবল হতেই এক সময়ে আমি ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি খুব কমিয়ে দিলাম, কিন্তু বউ সেটা লক্ষ না করে নিজের মনে হেঁটে যেতে লাগল। তাই দেখে এক সময়ে আমি একদম থেমে গেলাম। কিন্তু বউ হাঁটতে লাগল। দোকান-পসারের দিকে তার বিহ্বল চোখ, আর গার্ড অফ অনার দেয়ার সময়ে সোলজাররা যেমন হাঁটে তেমনি তার হাঁটার ভঙ্গি। আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম আমার বউ সেই ঝলমলে আলোর মধ্যে লোকজনের ভিড় ঠেলে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে কথাও বলেছিল বটে, আমি তার সঙ্গেই আছি ভেবে, কিন্তু সত্যিই আছি কিনা তা সে লক্ষ করল না। এইভাবে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সে কী একটা জিনিস দেখে খুব উত্তেজিতভাবে আমাকে দেখানোর জন্য মুখ ফিরিয়ে আমাকে খুঁজতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে চেয়ে আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল আমাকে। তখনই মজা করার একটা লোভ আমি আর সামলাতে পারলাম না। নিউ মার্কেটে যে গোলোকধাঁধার মতো গলিগুলো আছে তার মধ্যে যেটা আমার সামনে ছিল আমি তার মধ্যে ঢুকে গেলাম। এবার মফস্বলের মেয়েটা খুঁজুক আমাকে। যেমন সে আমাকে লক্ষ করছিল না, তেমন বুঝুক মজা। আমি আপনমনে হাসলাম, আমি উঁকি মেরে দেখলাম আমার বউটা কান্নামুখে চারিদিকে চাইতে চাইতে ফিরে আসছে দ্রুত পায়ে। আমার কষ্ট একটু হল ওর মুখ দেখে, তবু আর একটু খেলিয়ে ধরা দেব বলে আমি গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম। আর ও দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক অনেকবার হাঁটল, এ গলি সে গলিতে খুঁজতে লাগল আমাকে। আমি ওকে চোখে-চোখেই রাখছিলাম। এক সময়ে বুঝতে পারলাম যে, এবার আমাকে না ফেলে ও কেঁদেই ফেলবে—এমন করুণ হয়ে গেছে ওর মুখশ্রী! চোখ দুটোও ছলছলে আর লাল হয়ে গিয়েছিল। তাই একসময় ও যে গলিটাতে হেঁটে যাচ্ছিল, আমি পা চালিয়ে অন্য পথে গিয়ে সে গলিটার উলটোদিক দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম! বিপরীত দিকে থেকে ও হেঁটে এল, ঠিক মুখোমুখি দেখা হল আমাদের, এমন কি ও আমার এক ফুট দূরত্বের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল তবু আমাকে চিনতে পারল না। খুব অবাক হলাম আমি—ও কি আমাকে দেখেনি। আবার আমি অন্যপথে তাড়াতাড়ি গিয়ে অন্য এক গলিতে একটা কাচের বাসনের দোকানের সামনে কড়া আলোয় দাঁড়ালাম। ঠিক তেমনি ও উলটোদিক থেকে হেঁটে এল, চারদিকের লোকজনকে লক্ষ করল, আমার চোখে ওর চোখ পড়ল, কিন্তু আবার আমাকে পেরিয়ে গেল ও, এমনকি পেরিয়ে গিয়ে একবার পিছু ফিরেও দেখল না। এরকম কয়েকবার আমাদের দেখা হল—কখনও বইয়ের দোকানের সামনে কখনও ফলের দোকান কিংবা পুতুলের দোকানের সারিতে। কিন্তু ও আমাকে কোনও বারই চিনতে পারল না। উদভ্রান্তভাবে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমাকেই পেরিয়ে গেল। তখন আমি ভাবলাম মফস্বলের এই মেয়েটা খুব ঘড়েল, আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে ছিলাম বুঝতে পেরে এখন ইচ্ছে করেই চিনতে চাইছে না। কিন্তু ওর মুখের করুণ এবং ক্রমে করুণতর অবস্থা দেখে সে কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছিল না। তবু আমি অবশেষে একটা ঘড়ির দোকানের সামনে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম—এই যে। ও ভীষণ চমকে গিয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখল। বেশ কিছুক্ষণ দেখে-টেখে তারপর ভীষণ জোরে শ্বাস পেলে কেঁপে কেঁপে এসে বলল—তুমি! তুমি! কোথায় ছিলে তুমি! আমি কতক্ষণ তোমাকে খুঁজছি! আশ্চর্য এই যে, তখন আমার মনে হল ও সত্যি কথাই বলছে। বাসায় ফেরার সময় ওকে আমি বললাম যে, ওর সঙ্গে ওই লুকোচুরি খেলার সময়ে আমি বার বার ওকে ধরার সুযোগ দিয়েছি, ওর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ও প্রথমটায় বিশ্বাস করল না, কিন্তু আমি বার বার বলাতে ও খুব অবাক হয়ে বলল—সত্যি! তাহলে তুমি আর কখনও লুকিয়ো না। এরকম কথাটা বিপজ্জনক।

বেঁধে ভাই কন্ডাক্টর, এইখানেই আমি নেবে যাব—দেখি দাদা...দেখবেন ভাই আমার চশমাটা সামলে...ওই দেখুন, কেউ আমার কথা শুনল না। আমি নামার আগেই কন্ডাক্টর বাস ছাড়ার ঘন্টি দিয়ে দিল, গেট আটকে ধুমসো মতো লোকটা অনড় হয়েই রইল আর হাওয়াই শার্ট পরা ছোকরাটা কনুইয়ের গুঁতোয় চশমাটা দিলে বেঁকিয়ে। তাই বলছিলাম যে, কেউই আমাকে লক্ষ করে না, বাসে-ট্রামে না, রাস্তায় ঘাটে না।

আজকের দিনটা বেশ ভালই। ফুরফুরে হাওয়া আর রোদ দিয়ে মাখামাখি একটা আদুরে আদুরে গা-ঘেঁষা দিন। শরৎকাল বলে গরমটা খুবই নিস্তেজ। এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে আমার বেশ ভালই লাগছে। ওই তো একটু দূরেই একটা ক্রসিং আর তার পরেই আমার অফিস। এই দেখো আমি ক্রসিংটার কাছে এসে রাস্তা পেরোবার জন্য পা বাড়াতেই ট্রাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে নিল, আমার পার হওয়ার রাস্তাটা আটকে এখন চলন্ত গাড়ি আর গাড়ি। কেন ভাই ট্রাফিক পুলিশ, আমি যে রাস্তা পেরোচ্ছি তা কি দেখতে পাওনি? আর একটু হাতখানা তুলে রাখলে কি হাতখানা ভেরে যেত?

যে লিফটে দাঁড়িয়ে আমি দোতলায় উঠছি এই লিফটটা বোধহয় একশো বছরের পুরনো। এর চারদিকে কালো লোহার গ্রিল—ঠিক একখানা খোলামেলা খাঁচার মতো, মাঝে মাঝে একটু কাঁপে, আর খুব ধীরে ধীরে ওঠে। গত তেরো বছর ধরে আমি এই লিফট বয়ে উঠছি, এই তেরো বছর ধরে আমাকে সপ্তাহে ছ'দিন লিফটম্যান রামস্বরূপ আভোগী ওপরে তুলছে। কী বলো ভাই রামস্বরূপ, তুমি তো আমাকে বেশ ছোটটিই দেখেছিলে—যখন আমার বয়স চব্বিশ কি সাতাশ, যখন আমার ভাল করে বুড়োটে ছাপ পড়েনি মুখে। এখন বলো তো আমার নামটা কী! যদি আবার জিজ্ঞেস করি তাহলে এক্ষুনি রামস্বরূপ হাঁ হাঁ করে হেসে উঠে বলবে—আরে জরুর, আপনি তো অরবিন্দবাবু। কিন্তু মোটেই তা নয়। কোনওকালেই আমি অরবিন্দ ছিলাম না। আমি চিরকাল—সেই ছেলেবেলা থেকেই অরিন্দম বসু।

Shahnaz

খোসাটা আমার হাতেই ধরা। আমার চারপাশেই নিরুত্তেজভাবে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। খুবই নির্বিকার তাদের মুখচোখ। এরা কখনও যুদ্ধবিগ্রহ করেনি, দেশ বা জাতির জন্য প্রাণ দিতে হয়নি এদের, এমনকি খুব কঠিন কোনও কাজও এরা সমাধা করেনি সবাই মিলে। জাতটা মরে আসছে আস্তে আস্তে, অন্তর্ভাবনায় মগ্ন হয়ে হাঁটছে, চলছে—একে অন্যের সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে। এদের সময়ের জ্ঞান নেই—উনিশশো উনসত্তর বলতে এরা একটা সংখ্যা মাত্র বোঝে, দু'হাজার বছরের ইতিহাস বোঝে না। এদের কাছে 'টেলিপ্যাথি' কিংবা 'ক্রিক রো' যেমন শব্দ, 'ভারতবর্ষ'ও ঠিক তেমনি একটা শব্দ।

দয়া করে, আমাকে দেখুন; এই যে আমি—অরিন্দম বসু—অরিন্দম বসু—এই যে না-লম্বা, না-রোগা, না-ফর্সা একজন লোক। আমি টেলিপ্যাথি নই, ক্রিক রো নই, ভারতবর্ষও নই—ওই শব্দগুলোর সঙ্গে অরিন্দম বসু—এই শব্দটার একটু তফাত আছে, কিন্তু তা কি আপনি কখনও ধরতে পারবেন?

যাক্ গে সে সব কথা। মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হয়—আমি কি সত্যিই আছি? না কি, নেই? ব্যাঙ্কের ওই ঘুলঘুলি দিয়ে লোকে হাত এগিয়ে টাকা গুনে নেয়, কেউ কেউ মৃদু হেসে ধন্যবাদ দিয়ে যায়। কিন্তু লোক বদল হলেও তারা অবিকল ওইভাবে হাত বাড়িয়ে টাকা গুনে নেবে আর কেউ কেউ ধন্যবাদ দিয়ে যাবে, খেয়ালই করবে না ঘুলঘুলির ওপাশে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই নিউ মার্কেটের ঘটনাটার কথাই ধরুন না—আমার বউ হেঁটে হেঁটে আমাকে খুঁজছে—আমাকে সামনে দেখে, চোখে চোখ রেখেও পেরিয়ে যাচ্ছে আমাকে, ভাবছে—কী আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়!

খুব যত্নের সঙ্গে কলার খোসাটা আমি ফুটপাথের মাঝখানে রেখে দিলাম। উদাসীন মশাইরা, যদি এর ওপর কেউ পা দেন তাহলে পিছলে পড়ে যেতে যেতে আপনি হঠাৎ চমকে উঠে আপনার সংবিৎ ফিরে পাবেন। যদি খুব বেশি চোট না পান আপনি, যদি পড়ো-পড়ো হয়েও সামলে যান, তাহলে দেখবেন আপনার মস্ত লাভ হবে। আপনি চারপাশে চেয়ে দেখবেন। কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন তা মনে পড়ে যাবে। দুর্ঘটনা গুরুতর হলে আপনার হাত-পা কিংবা মাথা ভাঙতে পারত ভেবে আপনি খুব সতর্ক হয়ে যাবেন আপনার বিপজ্জনক চারপাশটার সম্বন্ধে। হয়তো আপনার ভিতরকার ঘুমন্ত আমিটা জেগে উঠে ভাববে 'বেঁচে থাকা কত ভাল'। তখন হয়তো মানুষের সম্বন্ধে আপনি আর একটু সচেতন হয়ে উঠবেন এবং বলা যায় না আপনার হয়তো এ কথাও মনে পড়ে যেতে পারে যে, আজ হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর সালের ষোলোই জুলাই—আপনার বিয়ের তারিখ, যেটা আপনি একদম ভুলে দিয়েছিলেন এবং এই সালে আপনার বয়স চল্লিশ পার হল। তখন মশাই ভেবে দেখবেন এই যুদ্ধ এবং বিপ্লবহীন ভারতবর্ষে একটি নিস্তেজ দুপুরে রাস্তায় কলার খোলা ফেলে রেখে আমি আপনার খুব অপকার করিনি।

আপনি কি এখন চাঁদের কথা ভাবছেন! আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা! ভাববেন না মশাই, ওসব ভাববেন না। কী কাজ আমাদের ওসব ভেবে। খামোকা মানুষ ওতে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর তারপর ভীষণ অবসাদ আসে এক সময়ে। ওদের খুব ভাল যন্ত্র আছে, ওরা ঠিক চাঁদে নেমে যাবে, তারপর আবার ঠিকঠাক ফিরেও আসবে। কিন্তু সেটা ভেবে আপনি অযথা উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক হবেন না। রাস্তা দেখে চলুন। রাজভবনের সামনে বাঁকটা ঘুরতেই দেখুন কী সুন্দর খোলা প্রকাণ্ড ময়দান, উদোম আকাশ। কাছাকাছি যে সব মানুষগুলো

হাঁটছে তাদের দেখে নিন, চিনে রাখুন যত দূর সম্ভব অন্যের মুখ—যেন যে কোনও জায়গায় দেখা হলে আবার চিনতে পারেন। এই সুন্দর বিকেলে ময়দানের কাছাকাছি আমি আপনার পাশেই হাঁটছি—আমাকে দেখুন। এই তো আমি আমার অফিস থেকে বেরিয়েছি। একটু আগেই বেরিয়েছি আজ, খেলা দেখতে যাব বলে। মনে হচ্ছে আপনিও ওইদিকে—না?

দেখুন কী আহাম্মক ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে সুন্দর চান্সটা নষ্ট করে দিল। আর মাত্র দশ মিনিট আছে, এখনও গোল হয়নি। আর ওই ছেলেটা—হায় ঈশ্বর, কে ওকে ওই লাল সোনালি জার্সি পরিয়েছে! ওকে বের করে দিক মাঠ থেকে। দিনতো মশাই আপনারা চোস্ত গালাগালিতে ওর ভূত ভাগিয়ে। আমার জিভে আবার খারাপ কথাগুলো আসে না। কিন্তু দেখুন, রাগে আমারও হাত-পা কাঁপছে! আজ সকাল থেকেই চাঁদ আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা ভেবে ভেবে আমার নার্ভগুলো অসাড় হয়ে আছে! তার ওপর দেখুন এই ফালতু টিমটা আমার দলের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে এক পয়েন্ট। একটা পয়েন্ট—কী সাংঘাতিক! ওদিকে আর আট কি ন' মিনিট সময় আছে মাত্র। কী বলেন দাদা, গোল হবে? কী করে হবে! ক্ষুদে টিমটার সব খেলোয়াড় পিছিয়ে এসে দেয়াল তৈরি করছে গোলের সামনে। আর এরা খেলছে দেখুন, কে বলবে যে গোল দেওয়ার ইচ্ছে আছে? ওই যে ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে দিনের সবচেয়ে সহজ চান্সটাকে মাটি করে দিল—আমার ইচ্ছে করছে ওর সামনে গিয়ে বলি—এই আমাকে দেখো, আমি অরিন্দম বসু, এই টিমটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে সাপোর্ট করে আসছি। জিতলে আনন্দকে ভোগ দিয়েছি, হারলে সুইসাইডের কথা ভেবেছি। তা বাপু, তুমি কি বোঝো সে সব? তুমি তো জানই না যে, আমি—এই ভিড়ের মধ্যে বিশেষ একজন—কী রকম দুঃখ নিয়ে ছলছলে চোখে ঘড়ি দেখছি। অবশ্য তাতে কার কী যায় আসে। আমি কাঁদি কিংবা হাসি—কিংবা যাই করি—কেউ তো আর আমাকে দেখছে না।

না মশাই গোল হল না। রেফারি ওই লম্বা টানা বাঁশি বাজিয়ে দিল। খেলা শেষ। এখন দয়া করে আমাকে একবার দেখুন কী রকম অবসাদগ্রস্ত আমি, কাঁধ ভেঙে আসছে। দেখুন আমার টিমটাকে আমি কত ভালবাসি, কিন্তু তাতে টিমের কিছু যায় আসে না। ওরা চেনেই না আমাকে। অথচ আমি প্রতিটি হারজিতের পর কত হেসেছি-লাফিয়েছি-কেঁদেছি-চাপড়ে দিয়েছি অচেনা লোকের পিঠ। খামোকা। তাতে কারও কিছু এসে যায় না। এই যে আমি সকাল থেকে চাঁদ আর তিনজন মানুষের কথা ভেবে চিন্তান্বিত—ভাল করে ভাত খেতে পারিনি উত্তেজনায়—এতেই বা কার কী এসে যায়।

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। না, আমি জানি, আপনি লিগ টেবিলে আপনার টিমের অবস্থা ভেবে বিব্রত। তার ওপর চাঁদ আর সেই তিনজন মানুষের কথাও ভাবতে হচ্ছে আপনাকে। কত কিছু ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে। সাড়ে উনত্রিশ ফুট লং জাম্প দিচ্ছে মানুষ, গুলিতে মারা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভোটে হেরে যাচ্ছে আপনার দল, বিপ্লব আসতে বড় দেরি করছে। তাই, আমি—অরবিন্দ বসু, ব্যাঙ্কের ক্যাশ ক্লার্ক—আপনার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

ওই যে দোতলার বারান্দায় রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে আমার চার বছর বয়সের ছোট ছেলেটা—হাপু। বড় দুরন্ত ছেলে। সকাল থেকে বায়না ধরেছে—রথের মেলায় যাব বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো। ওই যে এখন দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য। ঝাঁকড়া চুলের নীচে জ্বলজ্বল করছে দুখানা চোখ, আমি এত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি।

Shahnaz

আমি সিঁড়িতে পা দিয়েছি মাত্র, ও ওপর থেকে দুড়দাড় করে নেমে এল—ওর মা ওপর থেকে চেঁচাচ্ছে—হাপু-উ কোথায় গেলি, ও হাপু—উ—উ। এক গাল হেসে হাপু ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়—কত দেরি করলে বাবা, যাবে না? হ্যাঁ মশাই, বাইরে থেকে ফিরে এলে—এই আপনজনদের মধ্যে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কচি ছেলেটাকে আমি কোলে তুলে নিলাম। ওর গায়ে মিষ্টি একটা ঘামের গন্ধ, শীতের রোদের মতো কবোষ্ণ ওর নরম গা। মুখ ডুবিয়ে দিলে মনে হয় একটা অদৃশ্য স্নান করে নিচ্ছি যেন! বললাম—যাব বাবা, বড় খিদে পেয়েছে, একটু বিশ্রাম করে খেয়ে নিই।

যতক্ষণ আমি বিশ্রাম করলাম ততক্ষণ হাপু আমার গায়ের সঙ্গে লেগে রইল, উত্তেজনায় বলল—শীগগির করো। ওর মা ধমক দিতেই বড় মায়ায় বললাম—আহা, বোকো না, ছেলেমানুষ! আসলে ওর ওই নেই-আঁকড়ে ভাবটুকু বড় ভাল লাগে আমার।

বড় দুরন্ত ছেলে। মেলায় পা দিয়েই হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায়। বললাম—ওরকম করে না। হাপু, হাত ধরে থাকো, আমার হাত ধরেই তুমি ঠিকমত মেলা দেখতে পাবে। ও কেবল এদিক-ওদিক তাকায় তারপর ভীষণ জোরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে—ওটা কী বাবা! আর ওটা! আর ওইখানে! আমি ওকে দেখিয়ে দিই—ওটা নাগরদোলা। ওইটা সার্কাসের তাঁবু। আর ওটা মৃত্যুকূপ।

আস্ত একটা পাঁপর ভাজা হাতে নাগরদোলায় উঠে গেল হাপু। ওই যে দেখা যাচ্ছে তাকে—আকাশের কাছাকাছি উঠে হি হি করে হেসে হাত নাড়ছে—সাঁই করে নেমে আসছে আবার—আবার উঠে যাচ্ছে—সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে হাসছে হাপু। দেখে মন ভরে যায়।

মৃত্যুকূপের উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওকে দেখালাম দেয়াল বেয়ে ভীষণ শব্দে ঘুরে ঘুরে উঠে নেমে যাচ্ছে তীব্রবেগে মোটর সাইকেল। ও আমাকে আঁকড়ে ধরে থেকে দেখল।

তারপর আধঘণ্টার সার্কাস দেখলাম দু'জন। দুই মাথাওলা মানুষ সিংগিং ডল, আট ফুট লম্বা লোক। হাপুর কথাবার্তা থেমে গেল। ঝলমল করতে লাগল চোখ।

বাইরে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। আমার পাশে পাশে ও হাঁটতে লাগল। ওর হাতে ধরা হাতটা থেমে গিয়েছিল বলে আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম।

ওই তো ও এগিয়ে যাচ্ছে আমার হাত ছেড়ে! দোকানে সাজানো একগাদা হুইশ্‌ল দেখছে ঝুঁকে, আবার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় আর একটা দোকানে, যেখানে এরোপ্লেনের দৌড় হচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ও, এয়ার গান আর রঙচঙে বল দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে পা ফেলছে...ক্রমে ভিড়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে হাপু...আমি তখন আমার টিমটার কথা ভাবছিলাম—খামোকা একটা পয়েন্ট নষ্ট হয়ে গেল আজ। চাঁদের দিকে চলেছে তিনজন মানুষ—ওরা কি পৌঁছুতে পারবে?

হঠাৎ খেয়াল হল, হাপুকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভিড়ের মধ্যে এক সেকেন্ড আগেও ওর নীল রঙের শার্টটা আমি দেখেছি। তক্ষুনি সেটা টুপ করে আড়াল হয়ে গেল। হাপু-উ বলে ডাক দিয়ে আমি ছুটে গেলাম...

হ্যাঁ মশাই, আপনারা কেউ দেখেছেন নীল জামা পরা চার বছর বয়সের একটা ছেলেকে? তার নাম হাপু, বড় দুরন্ত ছেলে! দেখেননি? ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল জ্বলজ্বলে দুটো দুষ্টু চোখ...না, না, ওই পুতুলের দোকানের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে নয়—যদিও অনেকটা একইরকম

দেখতে। না, তার চেহারার কোনও বিশেষ কিছু চিহ্ন আমার মনে পড়ছে না—খুবই সাধারণ চেহারা, অনেকটা আমার মতোই। কেবল বলতে পারি যে, তার বয়স চার বছর। আর গায়ে নীল জামা। তা নীল জামা পরা অনেক ছেলে এখানে রয়েছে, চার বছর বয়সেরও অনেক। না মশাই, আমার পক্ষে ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয় এত—এই হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে ঠিক কোন জন—ঠিক কোন জন আমার হাপু—আর বোধহয় হাপুর পক্ষেও বলা সম্ভব নয় এত জনের মধ্যে কোন জন—ঠিক কোন জন—বুঝলেন না, ওর মাও একবার ঠিক করতে পারেনি—। যদি হাপুকে দেখতে পান তবে ওকে একবার দয়া করে বলে দেবেন যে, এই যে আমি—এই আমিই ওর বাবা—। এই আমাকে একটু দেখে রাখুন দয়া করে—কাইন্ডলি, ভুলে যাবেন না—

Shahnaz

আরোগ্য

আরোগ্য!

একেই কি আরোগ্য বলে? কে জানে! নার্সিংহোমের বিশাল জানালার পর্দাটা আজ সরানো। ভোরের আলোয় ভরে আছে ঘরখানা। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে একগোছা পাঁচমিশেলি ফুল। এ ঘরে কোনও গন্ধ নেই। কিংবা থাকলেও তা নাকে সয়ে গেছে বলে শান্তশীল সাধারণত কোনও গন্ধ পায় না। আজ এয়ারকন্ডিশনিং বন্ধ এবং জানালার কাচের শার্সি খোলা বলে সাত তলার এই ঘরে বঙ্গোপসাগর থেকে নোনা বাতাস এসে ঢুকে পড়েছে বুঝি।

শান্তশীল খুব গভীর শ্বাস নিল।

মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়স তার। দুরন্ত স্বাস্থ্য ছিল এককালে। তবু যে কেন হৃদযন্ত্র এমন গণ্ডগোল পাকিয়ে বসল কে জানে! মনে হচ্ছে, আজ তার আরোগ্যের দিন।

কয়েকবার শ্বাস নিল শান্তশীল। তার ওঠাও বারণ, হাঁটা বারণ। ডাক্তার অনুমতি না দিলে উঠে বসা অবধি বারণ। নিষেধের বেড়াজাল তাকে ঘিরে ছিল কাল অবধি। আজ কি সে মুক্তি পাবে?

ধীরে খুব ধীরে শান্তশীল পাশ ফিরল। জানালার দিকে। কলকাতার আকাশরেখা কী মনোরম! ভোরের আলোয় কী পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে সাততলা থেকে কলকাতা! এ পাড়াটায় কোথাও নোংরা নেই, ভাঙা বাড়ি নেই, কুশ্রীতা নেই।

শরৎকাল। শান্তশীলের বড় প্রিয় ঋতু। শরতে শিউলি আর কাশফুল ফোটে, শরতে ঘাসের ওপর ঝরে পড়ে শিশিরের মুক্তো, শরতে ঢাকের বাদ্যি আর আগমনী গান।

শান্তশীল কি উঠবে একটু? বসবে? দু'এক পা হাঁটবে? বড্ড ভয় করে। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সে। ডাক্তার গুহ বলেছেন, যদি পৃথিবীতে আরও কিছুদিন বাঁচতে চান তাহলে ক'টা দিন নড়াচড়া অবধি বন্ধ রাখুন।

ডাক্তার গুহ রুগীদের একটু ভয় দেখাতে ভালবাসেন। তাঁর অভিমত হল, হার্টের রুগীদের

একটু ভয় খাওয়ানো ভাল, তাতে দুষ্টুমিটা কমবে।

শান্তশীলের বাঁ দিকে পাশ ফিরে শোয়া অবধি বারণ। ভাগ্য ভাল জানালাটা তার ডান দিকে।

নিজের হৃদযন্ত্রকে ভারী ভয় পায় আজকাল শান্তশীল। নিজের শরীরকেই ভয় পায়। এই রহস্যময় দেহযন্ত্রকে সে এতকাল টেরই পেত না।

বিশাল এ-দেয়াল ও-দেয়াল জোড়া জানালা দিয়ে প্যানোরামিক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আজ যেন বাইরেটা হু-হু করে ঢুকে আসছে ঘরে। রোদ, বাতাস, দৃশ্য। কতকাল সে শুয়ে আছে বিছানায়! কতকাল বাইরে যায়নি। এমনকি কাল অবধি তার কেটেছে আধা ঘোরের মধ্যে। যন্ত্রণায় ডুবে থেকে কতগুলো দিন বেঘোরে কেটে গেল!

বুকে একটু ভার এখনও বোধ করে শান্তশীল। দিনে কত যে ট্যাবলেট খেতে হয় তার কোনও হিসেব নেই। জিব বড় বিস্বাদ। সারাক্ষণ এক ক্লান্তিকর পুকুরে ডুবে থাকা।

কফির গন্ধে মুখখানা আস্তে ফেরাল শান্তশীল।

গুড মর্নিং স্যার।

শান্তশীল তার নার্সের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। মধ্যবয়স্কা, কালো, দেখতে সুন্দর নয়। তবু এই সকালের আলোয় মহিলার চেহারায় বেশ নতুন মাত্রা যোগ হল আজ।

হাসিমুখে সে বলল, ফাইন মর্নিং। আমি কি আজ কফি খাব?

মেয়েটি ভাঙা বাংলায় বলল, আজ কয়েকটা সিপ ড্রিংক করবেন। ব্ল্যাক কিন্তু। নো সুগার।

অনেকদিন বাদে আজ কফি খাবে বলে শান্তশীল উঠতে যাচ্ছিল।

মেয়েটি বলে উঠল, উঁহু ডোন্ট একজার্ট। আমি বসিয়ে দিচ্ছি।

হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে খাটের আধখানা ধীরে ধীরে ওপরে তুলে দিল মেয়েটি।

অবসাদ। বড় অবসাদ। শান্তশীল কফির জন্য হাতখানা পর্যন্ত নাড়াল না কিছুক্ষণ।

মহিলাটি তার বুক থেকে পেট অবধি ন্যাপকিনে ঢেকে দিলেন যত্ন করে। তারপর ফিডার কাপটি হাতে নিয়ে বললেন, জাস্ট এ ফিউ সিপ্‌স।

শান্তশীল পাতলা হালকা কফির লিকারে প্রথম চুমুক দিয়েই টের পেল, যতটা ভাল লাগবে বলে ভেবেছিল ততটা লাগছে না। তবু খেল।

মুখটা সযত্নে মুছিয়ে দিলেন মহিলা। খাটটা নামাতে যাচ্ছিলেন, শান্তশীল হাত তুলে বলল, থাক, একটু বসে থাকি।

বেশিক্ষণ নয় কিন্তু। ডাক্তার অ্যাডভাইস করেছেন, শুয়ে থাকতে হবে।

শান্তশীল কলকাতা শহরের বিশাল পটভূমির ওপর ভোরের আলোর নরম আভা দেখতে লাগল। সে যেন বড় ভাগ্যবান। সাত তলা থেকে কলকাতার এই শোভা যে সে আজ দেখতে পাচ্ছে তা তার নিজের কৃতিত্ব নয়। সে দরিদ্র ঘরের মেধাবী ছেলে। একটা সময়ে জীবনে সে বেশ কষ্ট পেয়েছে অভাবে। মেধাবী বলেই চটপট পাশটাশ করে ইনজিনিয়ার হয়ে ভাল চাকরি পেয়েছে। তার কোম্পানি তাকে ফ্ল্যাট দিয়েছে, গাড়ি দিয়েছে। এই চিকিৎসার বিপুল খরচও বহন করবে কোম্পানি। তার কোনও মাথাব্যথা নেই। গরিবের ছেলে হয়ে যেদিন সে টাকার মুখ দেখতে লাগল, সেদিন থেকে স্ট্যাটাস এবং এটিকেট নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল, সেদিন থেকেই কিন্তু বদ অভ্যাসও ধরে ফেলল তাকে। সাধারণত সুরা-মদির ঘুম তার এত ভোরে ভাঙে না, যদি বা ভাঙে শরীরে থাকে রাজ্যের জড়তা, হ্যাং ওভার। আজ সেসব নেই। আজ ভারী ভাল

Shahnaz

লাগছে তার।

সিস্টার, ডাক্তার কখন আসবেন?

সিস্টার ঘড়ি দেখে বললেন, ন'টা হয়ে যাবে।

আমি একটু হাঁটতে চাই।

সিস্টার মাথা নাড়লেন, ইমপসিবল। ইউ আর নট আউট অব ডেনজার।

শান্তশীল সেটা জানে। তাকে টানা সাতদিন ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছিল। যমে মানুষে টানাটানি গেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে তাকে আনা হয়েছে কেবিনে।

অবসন্ন শান্তশীল ক্লান্ত গলায় বলে, কতকাল খবরের কাগজ পড়ি না, টেলিফোন করি না, গাড়ি চালাই না।

সব হবে। হ্যাভ পেশেন্স। কথা বেশি না বলাই ভাল। টেক রেস্ট।

রেস্ট! বলে শান্তশীল ভ্রূ কোঁচকাল। বিশ্রাম অনেক হয়েছে। তবু এত অবসাদ যে কেন!

ঘড়ি দেখে সিস্টার চলে গেলেন। ব্রেকফাস্টের সময় হল। বিস্বাদ, অদ্ভুত সব খাবার দেয় এরা। ক্যালোরিহীন, ফ্যাটহীন, চিনিহীন, লবণহীন।

শান্তশীলের শরীর সায় দিচ্ছে না, তবু ইচ্ছে করছে জানালার কাছে গিয়ে একটু বসতে। কী সুন্দর বাতাস বইছে। একটা পাখি এসে জানালার কানায় বসল। চড়াই। চুরুক করে ডেকে ফের উড়ে গেল। রাস্তায় গাড়ির শব্দ হচ্ছে, ঝাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কেবিন থেকে। জানালা দরজা বন্ধ থাকলে কোনও শব্দই পাওয়া যায় না।

দুটি চড়াই এসে ঘরে ঢুকল। চক্কর মারল কয়েকটা। তাদের দ্রুত সঞ্চালিত পাখার শব্দ একটা ভাইব্রেশনে ভরে দিল ঘরটা। শব্দটা কি মৃদু ধাক্কা দিচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডে? বুকের মধ্যে একটা ডুগডুগি বাজছে।

চোখ বন্ধ করে গভীর শ্বাস নিতে লাগল সে। রক্তচাপ তার বড্ড বেশি ছিল। কান ঝাঁ ঝাঁ করত, ঘাড়ে ব্যথা হত। এখনও যেন সেই অস্পষ্ট লক্ষণগুলি রয়ে গেছে।

আরোগ্য? না, সে এখনও বোধহয় আরোগ্যের চৌকাঠ ডিঙোয়নি।

ব্রেকফাস্ট এসে গেল। আবার ন্যাপকিনে বুক পেট ঢাকা পড়ল। তারপর শিশুর মতো হাঁ করে নার্সের হাত থেকে চামচে চামচে বিস্বাদ খাবার খাওয়া। তারপর ওষুধ।

মুখ মুছিয়ে খাটটা নামিয়ে দিল নার্স।

কত ঘুম ঘুমোবে শান্তশীল। এত বকেয়া ঘুম জমে ছিল তার শরীরে? নাকি এরা বারবার ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে? কে জানে কী, তবে শান্তশীল ঘুমোলো।

যখন জাগল তখন ঘরের জানালা বন্ধ। এয়ারকন্ডিশনিং চালু হয়েছে। ঘর নিস্তব্ধ। ছুঁচ পড়লে শোনা যায়।

ডাক্তার এলেন। মুখে পেশাদার অভয় হাসি। দাড়ি নিখুঁত কামানো। চোখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। অমায়িকতায় মাখামাখি মুখশ্রী।

কেমন দেখছেন ডক্টর গুহ?

চমৎকার। গুড প্রগ্রেস।

আমার একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছে।

হাঁটবেন। তবে আজ নয়। উইকনেস এখনও আছে। হাঁটতে গেলে মাথা রিল করতে পারে।

পোর্টেবল যন্ত্রে ডাক্তার ইসিজি রিডিং নিলেন। শান্তশীল চোখ বুজে রইল। তার শৈশবে অসুখ হলে একজন সস্তার এলএমএফ ডাক্তার ছিল বাঁধা। ছিল মার্কামারা ওষুধ। মার্কামারা পথ্য। মিকশ্চার, বড়ি, বার্লি, দুধ সাগু, শান্তশীলের সতেরো বছর বয়সে তার স্কুল শিক্ষক বাবা মারা গেলেন। সাত ভাইবোন আর মা নিয়ে বিরাট সংসার। তখন অসুখ হলে ডাক্তারও আসত না। শান্তশীলের এক দাদা ছিল জড়বুদ্ধি। সে মারা যায় মেনিনজাইটিসে, চিকিৎসাই হল না। শুধু ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে ডাক্তার এসেছিলেন। চার টাকা ভিজিটও নিয়েছিলেন।

সেই চারটে টাকার কথা আজ খুব মনে পড়ল। চারটে টাকার জন্য তখন হাহাকার ছিল।

বাঃ, অলমোস্ট নরমাল। আর কয়েকটা দিন রেস্ট নিন। সব ঠিক হয়ে যাবে!

শান্তশীলের চোখের কোণে কি একটু জল? অবসন্ন হাত তুলে সে চোখ মুছে নিল।

নার্সের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বললেন ডাক্তার। তারপর চলে গেলেন।

আজ সে একশো দেড়শো টাকা পেগের মদ খায়, মহার্ঘ হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসে ডিনার।

অথচ, শৈশবে, বেড়ে ওঠার সময়ে এক কাপ করে দুধও কখনও জোটেনি। সাত ভাইবোনের সেই ছিল সবচেয়ে মেধাবী। তাই তার ওপরে ছিল সকলের আশা আর নজর। একটা পরিবারের সে-ই হয়ে উঠেছিল নিউক্লিয়াস।

কী করেছে শান্তশীল তার পরিবারের প্রতি?

হিসেব করে দেখলে সে তার এক ভাইয়ের চাকরি করে দিতে পেরেছে। দুই বোনের বিয়েতে মোটামুটি সাহায্য করেছে। চাকরি জীবনের প্রথমে সে মাইনে বেশি পেত না।

ধার-কর্জ করতে হয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই ঋণ শোধ হয়েছে।

শান্তশীলের বুকটা ভার লাগছে। ব্যথা নেই, কিন্তু ভার। আর ক্লান্তি।

আমি কি বই পড়তে পারি সিস্টার?

বই! নার্স একটা যেন চিন্তা করে মাথা নেড়ে বলে, না।

অন্তত নিউজ পেপার?

ওঃ, ইউ আর ন্যাগিং। আচ্ছা দেখছি দাঁড়ান।

নার্স চলে গেল। একটু বাদে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ এনে দিয়ে বলল, ফর টেন মিনিটস। নো মোর। পড়লে কিন্তু স্ট্রেন হয়।

শান্তশীল কাগজটায় চোখ বোলাল। পৃথিবীর খবর সম্পর্কে তার খিদে ছিল। এখন খিদেটা কেন যেন নেই। কাগজটা বালিশের পাশে ভাঁজ করে রেখে দিল সে। পরে পড়বে। দরজায় টোকা পড়ল।

শান্তশীল কোনও কৌতূহল বোধ করল না। জানালা দিয়ে বাইরে রোদ আর হাওয়ার খেলা দেখতে লাগল।

একটা ছায়া পড়ল চোখে।

শান্তশীল তার অনাগ্রহী চোখ তুলে যুবতীটিকে দেখল। যেন অচেনা বা আধোচেনা কেউ। বিয়ের বারো তেরো বছর পরও শান্তশীল স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি যে, সে তার স্ত্রী মধুশ্রীকে প্রকৃতই ভালবাসে কিনা। আর এখন অসুখের পর, পৃথিবীর সঙ্গে তার এই এক ব্যবধান রচিত হয়েছে যে, এই মহিলাকে কাছের লোক বলেও মনে হচ্ছে না।

মধুশ্রীর শরীর থেকে ইন্টিমেট পারফিউমের তীব্র গন্ধ আসছে। গন্ধটা ভাল লাগছে না

Shahnaz

শান্তশীলের। গন্ধটা তার বুকে ধাক্কা দিচ্ছে, শ্বাসবায়ুকে মন্থন করে গাঢ় করে তুলছে। একটু নিচু হয়ে তার কপালে আলতো হাত রাখে মধুশ্রী।

শান্তশীলের দুটি মেয়ে আছে। এ সময়ে তাদের স্কুল। রোজ নয়, তবে মাঝে মাঝে তারা দুটি করুণ উদ্বিগ্ন মুখ নিয়ে বাবাকে দেখতে আসে। মধুশ্রী আসে রোজ। আসে নিজস্ব গাড়িতে। ফেরার পথে মার্কেটিং করে যায়।

শান্তশীল খুব স্থির অপলক চোখে মধুশ্রীর দিকে চেয়ে রইল। এইভাবে সে তার স্ত্রী সঙ্গে সম্পর্কটাকে খুঁজে দেখছিল। কিরকম সম্পর্ক, কোন সম্পর্ক, কোথায় তাদের যোগসূত্র? এ একটি নারী, সে একজন পুরুষ সেটাও একটা সম্পর্ক বটে, কিন্তু বড্ড পলকা। আরও গভীর কিছু নেই? আরও অবিনশ্বর কিছু?

তুমি তো ভালই আছ এখন। ডাক্তার গুহ বলছিলেন—আর এক সপ্তাহ পরে ছেড়ে দেবেন।

এক সপ্তাহ! এক সপ্তাহে ক'টা দিন? কত ঘণ্টা? কত মিনিট? কত সেকেন্ড? মধুশ্রী কি জানে নার্সিংহোমের এই ঘরে এক-একটা সেকেন্ড কত লম্বা হয়?

শান্তশীল নির্বিকার মুখে বলল, ওঃ।

একটা সপ্তাহ দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

যেদিন তার হার্ট অ্যাটাক হয় সেদিন সকালে মধুশ্রীর সঙ্গে তার বিশ্রী একটা শো-ডাউন হয়েছিল। ঝগড়া তাদের মধ্যে কমই হয়। আসলে সেল্‌স ইনজিনিয়ার শান্তশীলকে কলকাতার বাইরে যেতে হয় খুব বেশি, অফিসের কাজ তার সময়টুকু রাক্ষসের খাবার কেড়ে খেয়ে নেয়। দুটি ফুটফুটে মেয়ে আর অভিমানী বউয়ের সঙ্গে কাটানোর মতো সময় আর তার হাতে বিশেষ থাকে না। কিন্তু সেদিন হয়েছিল। সাংঘাতিক শো-ডাউন। বুকের ব্যথার শুরু সেই থেকে। দুপুরে অফিসে ব্যথা বাড়ল। সন্ধেবেলা আরও। রীতিমত তীব্র ব্যথা। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল। একটা ক্লাব-ডিনার ছিল বিকেলে। শান্তশীল মদ দিয়ে ব্যথাটাকে ধুয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। সিগারেট খেয়েছিল পর পর। ব্যথা উঠতে লাগল মাথায়। বিপদ বুঝে সে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল পার্টি থেকে। গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই যথেষ্ট।

পারেনি। তবে গাড়ি পার্ক করার চত্বর অবধি চলে গিয়েছিল সে। তারপর বুক চেপে ধরে বসে পড়ল মাটিতে। ড্রাইভার নঈম তাকে দেখতে পেয়েছিল আরও কিছু পরে। লোক জড়ো করে শান্তশীলকে সে ধরাধরি করে গাড়িতে তোলে এবং বুদ্ধিমানের মতো সোজা নিয়ে আসে নার্সিংহোমে। তারপর বাড়িতে খবর দেয়।

মেয়েরা দাম্পত্য কলহের কথা সহজে ভোলে, ছেলেরা ভোলে না, শান্তশীলের জিভে যে বিস্বাদ এখনও লেগে আছে, তা ওই দিনের ঝগড়ার স্মৃতি জড়িয়েও।

মধুশ্রী এমনিতে দেখতে খারাপ নয়। রাস্তায় ঘাটে পুরুষরা দু'একবার ফিরে তাকাতে পারে। পঁয়ত্রিশ কিন্তু পঁয়ত্রিশ, বলে মনেও হবে না। তা এই মধুশ্রীকে দেখে শান্তশীলের কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। লক্ষণটা কি খারাপ?

তুমি নিজে কেমন ফিল করছ?

ভাল।

চোখের কোণে জল কেন বলো তো! কেঁদেছ নাকি?

না। ও এমনিই। চোখ জ্বালা করেছিল।

তোয়ালে দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল মধুশ্রী। তারপর বলল, এরা এত করছে তোমার জন্য যে, আমার আর কিছু করার থাকছে না। আমি দেখি, চলে যাই, কোনও মানে হয়?

কেন, সেবা করতে চাও?

কিছু করতে পারলে ভাল লাগত।

এই তো ভাল।

জানি। দে আর প্রফেশন্যাল পিপল। আমরা তো এদের মতো পারব না। তবু মনে হয়, আপনজনের অসুখ করলে কিছু করতে পারলে ভাল হয়।

শান্তশীল চোখ বুজে বলল, ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল।

আমাদের সময়ও কাটছে না। ক'দিন যা টেনশন গেল। কাল রাতে একটু ঘুমোতে পেরেছি।

এতদিন ঘুমোওনি?

হয় নাকি? যা টেনশন।

শান্তশীল জানালায় চড়াই দেখতে পাচ্ছিল। এখন শার্সি বন্ধ। কিন্তু শার্সির বাইরে দুটো চড়াই বরাবর চক্কর খাচ্ছে। হয়ত একটা মেয়ে চড়াই, অন্যটা পুরুষ।

শান্তশীল কোনও দিনই আবেগপ্রবণ নয়। আর পৃথিবীর কোনও মানুষের প্রতিই তার কোনও নাড়ীছেঁড়া টান নেই। তার মা থাকে শান্তশীলের ছোট ভাইয়ের কাছে। জব্বলপুর। এত শক্ততর অসুখের পরও মা'কে দেখতে ইচ্ছে করেনি তার। তার দুটি ফুটফুটে মেয়েকে সে ভালবাসে বটে, কিন্তু সেরকম বাড়াবাড়ি কখনও করে না। তবে আবেগহীনতা তাকে মাঝে মাঝে বিপদে ফেলে দেয়। বাবা মারা যাওয়ার পর কাঁদা দূরের কথা, সে এত স্বাভাবিক আচরণ করেছিল যে মা পর্যন্ত ওই শোকের সময়েও তার ওপর রেগে উঠেছিল।

অবসন্ন শান্তশীল চোখ বুজে ভেবেছিল, সে কি একটু নিষ্ঠুর? হৃদয়হীন?

যখন চোখ মেলল শান্তশীল তখন মধুশ্রী চলে গেছে। শুধু দম বন্ধ করা গন্ধটা রেখে গেছে শরীরের বাতাসে।

নার্স ঘরে নেই। সব সময়ে থাকে না। সে ঘুমোচ্ছে দেখে হয়তো করিডোরে বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা মারছে। অসুবিধে নেই, হাতের কাছেই কলিং বেল আছে। বোতাম টিপলেই দৌড়ে আসবে। কিন্তু তাকে ডাকবার কোনও প্রয়োজন আপাতত নেই। একটু জলতেষ্টা পেয়েছে। তেমন কিছু নয়, একটু পরে জল খেলেও চলবে। শান্তশীল জানালার দিকে চেয়ে হতাশ হল। রোদ্দুর আসছে বলেই বোধ হয় পুরু পর্দায় গোটা জানালাটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের মতো এই ঘরে আর কতদিন তাকে শরীরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে?

শান্তশীল বুকের ভারটা টের পাচ্ছে এখনও। শরীরের অবসাদও। খুব ধীরে সে কনুইয়ের ওপর ভর রেখে উঠ বসবার চেষ্টা করল। মাথার মধ্যে কেমন একটা পাক মেরে চোখ অন্ধকার দেখল কিছুক্ষণ। তারপর সে ভাবটা কেটে গেল। খুব ধীরে শরীরে যতদূর সম্ভব কম চাপ দিয়ে সে উঠে বসল। এই সামান্য পরিশ্রমেই কি হাঁফ ধরল তার? বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগল সে।

এইবার? শান্তশীল দেখল তার স্টিলের বেডটা বেশ উঁচু। সে কি নামবে? পারবে নামতে? পড়ে যাবে না তো? উচিত হবে কি নামাটা?

আরও সাত দিন এই অবরোধে কাটানোটা অর্থহীন। তার বাবা মারা গিয়েছিল অনেক অনাদরে, প্রায় বিনা চিকিৎসায়, তার পরিবারের ডাক্তার ডাকার বা ওষুধ খাওয়ার রেওয়াজই ছিল না একটা সময়ে। তার দাদার করুণ মৃত্যুর কথা এখনও এত স্পষ্ট মনে পড়ে। কী হবে তার?

Shahnaz

মৃত্যুর বেশি আর কী হতে পারে?

শান্তশীল তার পায়জামা পরা পা-দুটো ঝুলিয়ে দিল নীচে। তারপর সামান্য দ্বিধাজড়িত কয়েকটা সেকেন্ড।

শান্তশীল মেঝের ওপর দাঁড়াল। হাঁটু ভেঙে পড়তে চাইছে। শরীরে একটা অদ্ভুত থরথরানি। বিছানায় ভর রেখেই সে এই দুর্বলতা সামাল দিল। হাঁটবার জন্য এখন তাই দুর্জয় সাহস। বুকের থরথরানি, শরীরের অভ্যন্তরে ঝিঁঝির ডাক, মাথার চক্কর এসব নিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করাটাও যে বিপজ্জনক তা শান্তশীল জানে।

এক পা এক পা করে সে কয়েক পা এগিয়ে গেল। শরীরে তেমন ভারসাম্য থাকছে না। সে টলছে। সোজা যেতে গিয়ে বেঁকে যাচ্ছে। জানালার কাছ বরাবর এসে পর্দাটা সরিয়ে বাইরে তাকাল। বেলা দশটার কাছাকাছি কি এখন? বা আর একটু বেশি? এ ঘরে একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। কিন্তু সেদিকে তাকাল না সে। ক'টা বাজে জেনে তার লাভ কী? তার জানালার নীচেই একটা পার্ক, পার্কে জলাশয়। নিবিড় গাছপালা আছে চারদিকে।

শান্তশীল খানিকক্ষণ তৃষিতের মতো চেয়ে রইল সেই দিকে। একটা রাধাচূড়া গাছের তলায় বেঞ্চে ময়লা জামাকাপড় পরা একজন বুড়ো মানুষকে দেখতে পাচ্ছিল সে। বসে ঝিমোচ্ছে।

শান্তশীল ধীর পদক্ষেপে হেঁটে দরজার কাছে এল। সাবধানে দরজাটা খুলে দেখল করিডোর ফাঁকা। বাইরে বেরিয়ে এল শান্তশীল। দরজাটা সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে থাকল নীচে। লিফট নিল না। দরকার কী?

সাত বা আট তলা থেকে নামারও কিছু পরিশ্রম আছে। শান্তশীল রেলিং-এ হাত রেখে নামতে লাগল। নামতেই লাগল। একটার পর একটা ধাপ। অশেষ। অনেক উর্দিপরা লোক তাকে দেখল। কয়েকজন নার্সও। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। কারও তেমন সময় নেই।

খালি পায়ে নীচে নেমে এল শান্তশীল। বুক ভার, শরীরে অবসাদ, তবু তেমন কিছু ঘটল না তার শরীরে। কোনও বিস্ফোরণ নয়, কোনও যবনিকা নয়।

সামনে চমৎকার কংক্রিটের ড্রাইভওয়ে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে রাস্তায়। শান্তশীল ধীর এবং দৃঢ় পদক্ষেপে পথটুকু পেরিয়ে রাস্তায় নামল।

চারদিকে জমজম করছে কলকাতা। অবারিত পৃথিবী। শান্তশীলের মাথার মধ্যে একটা পংক্তি আপনা থেকেই চলে এল, বন্ধন হোক ক্ষয়। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কতবার গানটা শুনেছে। কিন্তু মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল ওই একটি লাইন, বন্ধন হোক ক্ষয়...

শান্তশীল এত মুক্ত কোনওদিন বোধ করেনি। তার পকেটে একটি পয়সাও নেই, পায়ে জুতো নেই, পরনে শুধু পায়জামা আর বুশ শার্ট গোছের। কয়েকদিন দাড়ি কামানো হয়নি। তাকে কেমন দেখাচ্ছে কে জানে?

শান্তশীল যথেষ্ট সাহস বোধ করছে, আত্মবিশ্বাসও। শরীরের জড়তা কেটেছে, বুকের ভার ততটা অনুভব করছে না। সে পায়ে পায়ে পার্কটায় চলে এল। ফটক ঠেলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

একজন দারোয়ান গোছর লোক গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে বলল, ইঁহা ঘুসনা মানা হ্যায় জি।

শান্তশীল তর্ক করল না। বিনয়ের সঙ্গে বেরিয়ে এল। পার্কটাতেই যে তাকে ঢুকতে হবে এমন কোনও কথা নেই। সে তো এখন সব দিকেই যেতে পারে। যেখানে খুশি। সুতরাং সে কিছু চিন্তা না করেই হাঁটতে লাগল।

একটু বাদেই সে যখন বুঝতে পারল যে বাড়ির দিকেই হাঁটছে তখন ইচ্ছে হল পথ পাল্টাতে।

পথ পাল্টাল শান্তশীল। কিন্তু কোন দিকে যাবে তা স্থির করতে মন চাইল না। উদাসভাবে হাঁটতে লাগল শুধু। দেখল, কোনও লাভ হচ্ছে না। তার অভ্যস্ত সংস্কার, তার জৈব চেতনা তাকে ঠিক নিয়ে যাচ্ছে একটা চেনা পথের দিকেই। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

বাড়ির দারোয়ান তাড়াতাড়ি উঠে একটা অভিবাদন জানাল।

সাব, তবিয়ৎ ঠিক তো হ্যায়?

হাঁ।

সিঁড়ি ভেঙে ওঠা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে কি? তার অ্যাপার্টমেন্ট পাঁচতলায়। অনেকটা পথ হেঁটেছে শান্তশীল। অন্তত মাইল তিনেক। সে ঘামছে। একটু হাঁফ ধরেছে তার।

একটু ভেবে লিফটে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল শান্তশীল। তারপর চোখ বুজে দম নিল শ্রান্তভাবে।

কলিং বেল একবার মাত্র বাজাল সে। কেউ দরজা খুলল না। তাহলে কি মধুশ্রী এখনও ফেরেনি। কাজের মেয়েটা অবশ্য নেই, দেশে গেছে শুনেছে সে। তাহলে কি ফিরে যাবে শান্তশীল?

দরজাটা হঠাৎ সামান্য একটু ফাঁক হল। খুব সামান্য। একটা চোখ সেই ফাঁক দিয়ে তাকে বিদ্ধ করল।

তারপরই একটা ক্ষীণ ভয়ার্ত গলায় আর্তনাদ, কে?

শান্তশীল বুদ্ধের মতো শান্তভাবে চোখটার দিকে ঘুরে তাকাল। কিছু বলল না। চোখটা মধুশ্রীর। তাকে চিনতেও পারছে। তবু দরজাটা হাট করে খুলল না তো!

খুব ধীরে ধীরে দরজাটা খুলল মধুশ্রী। তার চোখে অপার বিস্ময়।

তুমি! তুমি কী করে এলে?

শান্তশীল দেখল, মধুশ্রীর চুল এলোমেলো, পরনে তাড়াহুড়োয় চাপানো হাউসকোট, যার বোতামের সঙ্গে বোতামের ঘর ঠিকঠাক মেলেনি। বাঁ গালে টাটকা একটা কামড়ের দাগ।

শান্তশীল ভদ্রভাবে চোখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আমার আসবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কেন যে চলে আসতে হল। এর কোনও মানে হয় না।

দ্বিধাগ্রস্ত মধুশ্রী দরজা মেলে ধরে বলল, এসো।

শান্তশীল ঘরে ঢুকল। মস্ত বড় বসবার আর খাওয়ার ঘর। ইন্টিরিয়র ডেকরেটর দিয়ে সাজানো হয়েছিল। অবিশ্বাস্য রকমের চকচকে। এত সাজানো যে, এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে তেমন স্বস্তি হয় না।

শান্তশীল ঘরে ঢুকে বুঝল, মধুশ্রী ভীষণ রকমের নার্ভাস। মুখ বিবর্ণ।

শান্তশীল খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলল, আমি একটু বাথরুমে যাব।

ওঃ, আচ্ছা।

শোওয়ার ঘরের দরজাটা আপনা থেকেই কি বন্ধ হয়ে গেল? নিঃশব্দে? শান্তশীল একটু থামল। মধুশ্রীর দিকে চেয়ে বলল, দশ মিনিটের জন্য।

অ্যাঁ?

দশ মিনিটের জন্য বাথরুমে গেলে তোমার হবে তো?

Shahnaz

মধুশ্রী অবোধ জন্তুর মতো চেয়ে রইল। বোবা।

দশ মিনিটের বেশিই সময় নিল শান্তশীল। বুকটায় আবার ভার। একটা ঘুনঘুনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে বুকে। বেসিনে উপুড় হয়ে শান্তশীল মুখেচোখে জলের ঝাপটা দিল অনেকক্ষণ। তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছবার সময় টের পেল, শরীর ভেঙে আসছে ক্লান্তিতে, অবসাদে। কিন্তু ঈর্ষা নেই, ক্রোধ নেই, অপমান নেই।

যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল শান্তশীল তখন মধুশ্রীর মুখ বিবর্ণ, চোখে ভয় তবে সামলে নিয়েছে অনেকটা। হাউসকোটের বোতাম ঠিকঠাক লাগানো, চুল এলোখোঁপায় বাঁধা, শুধু বাঁ গালে একটা দাঁতের দাগ জ্বলজ্বল করছে। সামান্য পাউডারের প্রলেপ সেটা ঢাকতে পারেনি।

শান্তশীল এই শরীরে কী করে নার্সিংহোম থেকে চলে এল, কেন এল এইসব জরুরি প্রশ্ন মধুশ্রী করল না। সে শান্তশীলের দিকে তাকাতেই পারছে না।

শান্তশীল বাইরের ঘরেই সোফায় বসল। বুকে ঘনিয়ে উঠছে ব্যথা। ঘাম হচ্ছে। ঘাড়ে দপদপ করছে একটা রগ। মাথার মধ্যে চক্কর। তবু শক্ত গলায় বলল, বিছানার চাদরটা পাল্টে দাও। যাও।

মধুশ্রী ছুট পায়ে চলে গেল।

শান্তশীল বুকে হাত রাখল। দুষ্ট হৃদযন্ত্র এখনও রক্ত পাম্প করে যাচ্ছে। কিন্তু বড্ড দ্রুত। বড্ড বেশি দ্রুত। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। সে কি মরে যাচ্ছে?

মাথাটা একবার ঝাঁকাল শান্তশীল। একবার ককিয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ টের পেল, তার ভারী ঈর্ষা হচ্ছে। ভীষণ। তার রাগ হচ্ছে। তার খুন করতে ইচ্ছে করছে—

মধুশ্রী যখন তাকে নিতে এল ঘরে তখন এলিয়ে পড়ে আছে শান্তশীল। চোখ বোজা। ঘামে ভিজে যাচ্ছে গা।

মধুশ্রী কোলের কাছে ছুটে গেল।

শান্তশীল তার যন্ত্রণার মধ্যেও বুদ্ধের মতো শান্ত গলায় বলল, আমি ভাল আছি। ফোন কোরো না। বরং—কিছু খেতে দাও।

খুব ধীরে ধীরে ফোনটা নামিয়ে রাখল মধুশ্রী। তারপর স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল।

শান্তশীল মৃদুস্বরে বলল, আরোগ্য।

কিছুই বুঝল না মধুশ্রী। শুধু মনে হল, তার পাথরের মতো প্রতিক্রিয়াহীন স্বামী বোধ হয় আসলে রক্তমাংসেরই মানুষ।

Shahnaz

উকিলের চিঠি

ও মিছরি, তোর নামে একটা উকিলের চিঠি এসেছে দেখগে যা। এই বলে মিছরির দাদা ঋতীশ টিয়ার ঝাঁক তাড়াতে ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেল।

গোসাবা থেকে দুই নৌকো বোঝাই লোক এসেছে অসময়ে। লাট এলাকার ভিতর বাগে কোনও বিষয়কর্মে যাবে সব। এই অবেলায় তাদের জন্য খিচুড়ি চাপাতে বড় কাঠের উনুনটা ধরাতে বসেছিল মিছরি। কেঁপে উঠল। তার ভরন্ত যৌবনবয়স। মনটা সব সময়ে অন্য ধারে থাকে, শরীরটা এই এখানে। আজকাল শরীরটা ভার লাগে তার। মনে হয়, ডানা নেই মানুষের।

উকিলের চিঠি শুনে যে উনুন ফেলে দৌড়বে তার জো নেই। বাবা গুলিপাকানো চোখে দেখছে উঠোনের মাঝখানে চাটাইতে বসে। বড় অতিথিপরায়ণ লোক। মানুষজন এলে তার হাঁকডাকের সীমা থাকে না। তাছাড়া দাদু, ঠাকুমা, মা, কাকা-জ্যাঠারা সব রয়েছে চারধারে। তাদের চোখ ভিতর বার সব দেখতে পায়। উটকো লোকেদের মধ্যে কিছু বিপ্রবর্ণের লোক রয়েছে, তারা অন্যদের হাতে খাবে না। সে একটা বাঁচোয়া, রান্নাটা করতে হবে না তাদের। চাল ডাল ওরাই ধুয়ে নিচ্ছে পুকুরে। বাঁকে করে দু বালতি জল নিয়ে গেছে কামলারা। উনুনটা ধাঁধিয়ে উঠতেই মিছরি সরে গিয়ে আমগাছতলায় দাঁড়াল। কালও বড্ড ঝড়জল গেছে। ওই দক্ষিণধার থেকে ফৌজের মতো ঘোড়সওয়ার ঝড় আসে মাঠ কাঁপিয়ে। মেঘ দৌড়োয়, ডিমের মতো বড় বড় ফোঁটা চটাসফটাস ফাটে চারধারে। আজ সকালে দশ ঝুড়ি পাকা জাম, গুটিদশেক কচি তাল কুড়িয়ে আনা হয়েছে ক্ষেত থেকে। ঘরের চালের খড় জায়গায় জায়গায় ওলট-পালট। মাটির দেয়াল জল টেনে ডোস হয়ে আছে, এখন চড়া রোদে শুকোচ্ছে সব। আমতলায় দাঁড়িয়ে মিছরি দেখে, ঋতীশ দাদা টিয়ার ঝাঁক উড়িয়ে দিল। ট্যা ট্যা ডাক ছেড়ে সবুজ পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। মনে হয়, মানুষের ডানা নেই।

যারা এসেছে তারা সব কেমনধারা লোক যেন! রোগা-রোগা ভীতু-ভীতু চেহারা, পেটে সব খোঁদল-খোঁদল উপোসী ভাব। জুল-জুল করে চারধারে চায় আর লজ্জায় আপনা থেকেই চোখ নামিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক এসে উনুনটায় দুটো মোটা কাঠ ঢুকিয়ে দিল,

Shahnaz

ফুলঝুরির মতো ছিটকে পড়ল আগুনের ফুলকি। একটা কাঠ টেনে আধপোড়া একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল লোকটা। এই গরমেও গায়ের ঘেমো তেলচিটে গেঞ্জিটা খুলছে না, বুকের পাঁজর দেখা যাবে বলে বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে। তাকে দেখে হাসি পেল মিছরির।

সেই লোকটা চারধারে চেয়ে মিছরিকে দেখে কয়েক কদম বোকা পায়ে হেঁটে এসে বলল—আনাজপাতি কিছু পাওয়া যায় না?

ক্ষেত ভর্তি আনাজ। অভাব কিসের? মিছরি বলল—এক্ষুনি এসে পড়বে। ক্ষেতে লোক নেমে গেছে আনাজ আনতে।

—একটু হলুদ লাগবে আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা। যদি হয় তো ফোড়নের জন্য একটু জিরে আর মেথি।

যদি হয়! যদি আবার হবে কি! খিচুড়ি রাঁধতে এসব তো লাগেই সে কি আর গেরস্তরা জানে না! মা সব কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে।

লোকটার দিকে চেয়ে মিছরি বলল—সব দেওয়া হচ্ছে। ডাল চালটা ধুয়ে আসুক।

লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকাল। খুব সংকোচের গলায় বলল—বেলা হয়েছে।

সে কথার মধ্যে একটা খিদের গন্ধ লুকিয়ে আছে। শত চেষ্টা করেও লোকটা খিদের ভাবটা লুকোতে পারছে না। গেঞ্জিতে ঢাকা হলেও ওর পাঁজরা দেখা যায়। কারা এরা? কোত্থেকে এল, কোথাই বা যাচ্ছে? ছোট বোন চিনি যদিও মিছরির পিঠোপিঠি নয় তবু বোনে বোনে ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্ক। ফ্রকপরা চিনি তিনটে ব্যাঙ লাফ দিয়ে মসলার বারকোশ নিয়ে এসে ঠক করে উনুনের সামনে রেখ ঝুপসি চুল কপাল থেকে সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এই যে মসলা দিয়ে গেলাম কিন্তু। দেখো সব, নইলে চড়াই খেয়ে যাবে।

রোগা লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বারকোশটা নিচু হয়ে দেখল।

বলল—উরে ব্বাস, গরমমসলা ইস্তক। বাঃ, বাঃ, এ নাহলে গেরস্ত!

চিনি দুটো নাচুনী পাক খেয়ে মিছরির ধারে এসে জিভ ভ্যাঙাল, বলল—যা দিদি, তোর নামে উকিলের চিঠি এসেছে। বড্ড মোকদ্দমায় পড়ে গেছিস ভাই। চিঠিটা ভিজিয়ে একটু জল খাস শোওয়ার সময়, মিষ্টি লাগবে।

বলে নিচু ডালের একটা পাকা আম দুবার লাফ দিয়ে পেড়ে ফেলল চিনি। শিঙে দিয়ে চুষতে চুষতে যেদিকে মন চায় চলে গেল।

উকিলের চিঠি বলে সবাই খ্যাপায়। আর মোকদ্দমাও বটে। এমন মোকদ্দমায় কেউ কখনও পড়েনি বুঝি।

ধীর পায়ে লাজুক মুখে মিছরি ঘরে আসে। এমনিতে কোনও লাজলজ্জার বালাই নেই। বাপের বাড়িতে হেসে খেলে সময় যায়। কিন্তু ওই চিঠি যেদিন আসে সেদিন যত লজ্জা। বরের চিঠিই যেন বর হয়ে আসে।

মিছরির বর উকিল।

ছোট কাকা প্রায় সমানবয়সী। দাদা ঋতীশের চেয়েও ছ'মাসের ছোট। আগে তাকে নাম ধরেই 'শ্যামা' বলে ডাকত মিছরি, নিজের বিয়ের সময় থেকে 'ছোট কাকা' বলে ডাকে।

ছোট কাকা মিছরির নাকের ডগায় দুবার নীলচে খামখানা নাচিয়ে ফের সরিয়ে নিয়ে বলল—রোজ যে আমার কাপড় কাচতে খিটখিট করিস, আর করবি?

অন্য সময় হলে মিছরি বলত—করব, যাও যা খুশি করোগে।

এখন তা বলল না। একটু হেসে বলল—কাপড় কাচতে খিটখিট করব কেন, তোমার নস্যির রুমাল বাবু ও কাচতে বড় ঘেন্না হয়।

—ইঃ ঘেন্না! যা তাহলে, চিঠি খুলে পড়ে সবাইকে শোনাব।

—আচ্ছা, আচ্ছা, কাচব।

—আর কী কী করবি সব বল এই বেলা। বৌদি রান্না করে মরে, তুই একেবারে এগোস না, পাড়া বেড়াস। আর হবে সেরকম?

—না।

—দুপুরে আমার নাক ডাকলে আর চিমটি কাটবি?

—মাইরি না।

—মনে থাকে যেন! বলে ছোট কাকা চিঠিটা শুঁকে বলল—এঃ, আবার সুগন্ধী মাখিয়েছে!

বলে কাকা চিঠিটা ফেলে দিল সামনে। পাখির মতো উড়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে মিছরি এক দৌড়ে বাগানে।

কত কষ্ট করে এতদূর মানুষ আসে, চিঠি আসে। রেলগাড়িতে ক্যানিং, তারপর লঞ্চে গোসাবা, তারপর নৌকোয় বিজয়নগরের ঘাট, তারপর হাঁটাপথ। কত দূর যে! কত যে ভীষণ দূর!

খামের ওপর একধারে বেগনে কালিতে রবার স্ট্যাম্প মারা। কালি জেবড়ে গেছে, তবু পড়া যায়—ফ্রম বসন্ত মিদ্দার, বি. এ. এল. এল-বি, অ্যাডভোকেট। আর বাংলায় মিছরির নাম ঠিকানা লেখা অন্য ধারে। রবার স্ট্যাম্পের জায়গায় বুঝি এক ফোঁটা গোলাপগন্ধী আতর ফেলেছিল, সুবাস বুক ভরে নিয়ে বড় যত্নে, যেন ব্যথা না লাগে এমনভাবে খামের মুখ ছিঁড়ল মিছরি। এ সময়টায় তাড়াতাড়ি করতে নেই। অনেক সময় নিয়ে, নরম হাতে, নরম চোখে সব করতে হয়। মা ডাকছে—ও মিছরি, আনাজ তুলতে বেলা গেল। লোকগুলোকে তাড়া দে, বিপিনটা কি আবার গ্যাঁজা টানতে বসে নাকি দ্যাখ।

বড় বিরক্তি। লোকগুলোর সত্যি খিদে পেয়েছে। আকাশমুখো চেয়ে উঠোনে হাভাতের মতো বসে আছে সব। তাদের মধ্যে যারা একটু মাতব্বর তারা বাবুর সঙ্গে এক চাটাইতে বসে কথাবার্তা বলছে। রান্নার লোকটা বিশাল কড়া চাপিয়ে আধ সেরটাক তেল ঢেলে দিল।

মিছরি ক্ষেতে নেমে গিয়ে কুহুস্বরে ডাক দিল—বিপিনদা, তোমার হল? রান্না যে চেপে গেছে। অড়হর গাছের একটা সারির ওপাশ থেকে বিপিন বলে—বিশটা মদ্দ খাবে, কম তো লাগবে না। ছট বলতে হয়ে যায় নাকি! যাচ্ছি, বলো গে হয়ে এল।

মিছরি চিঠিটা খোলে। নীল, রুলটানা প্যাডের কাগজ। কাগজের ওপরে আবার বসন্ত মিদ্দার এবং তার ওকালতির কথা ছাপানো আছে। নিজের নাম ছাপা দেখতে লোকটা বড় ভালবাসে।

ছট করে চিঠি পড়তে নেই। একটু থামো, চারদিক দেখো, খানিক অন্যমনে ভাবো, তারপর একটু একটু করে পড়ো, গেঁয়ো মানুষ যেমন করে বিস্কুট খায়, যত্নে ছোট্ট ছোট্ট কামড়ে।

চিঠি হাতে তাই মিছরি একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের মাঠে একটা ছোট্ট ডোবায় এক একজন কাদামাখা পা ধুতে নেমেছিল। জলে নাড়া পড়তেই কিলবিলিয়ে একশো জোঁক বেরিয়ে আসে। মিছরি দেখতে পায়, লোকটা মাঠে বসে পায়ের ঝোঁক ছাড়াচ্ছে। ক্ষেতের উঁচু মাটির দেওয়ালের ওপর কোনও কায়দায় একটা গরু উঠে পড়েছে কে জানে। এইবার বাগানের মধ্যে

Shahnaz

হড়াস করে নেমে আসবে।

নামুকগে। কত খাবে। বাগান ভর্তি সবজি আর সবজি। অঢেল, অফুরন্ত। বিশ বিঘের ক্ষেত। খাক।

উকিল লিখেছে—হৃদয়াভ্যন্তরস্থিতেষু প্রাণপ্রতিমা আমার...। মাইরি, পারেও লোকটা শক্ত কথা লিখতে। লিখবে না! কত লেখাপড়া করেছে।

হু হু করে বুক চুপসে একটা শ্বাস বেরিয়ে যায় মিছরির। লোকটা কত লেখাপড়া করেছে তবু রোজগার নেই কপালে! এ কেমন লক্ষ্মীছাড়া কপাল তাদের!

উকিল লিখেছে—ঘুমিয়া জাগিয়া কত যে তোমাকে খুঁজি! একটু থমকে যায় মিছরি। কথাটা কি ঘুমিয়া? ঘুমিয়া মানে তো কিছু হয় না। বোধ হয় তাড়া-হুড়োয় ঘুমাইয়া লিখতে গিয়ে অমনটা হয়েছে। হোকগে, ওসব তো কত হয় ভুল মানুষের। ধরতে আছে?

ছ্যাঁক করে ফোড়ন পড়ল তেলে। হিং ভাজার গন্ধ। রান্নার লোকটা বুঝি কাকে বলল—এর মধ্যে একটু ঘি হলে আর কথা ছিল না।

জ্যাঠা বোধ হয় সান্ত্বনা দিয়ে বলল—হবে হবে। তা মিছরি, পাথরবাটিতে একটু ঘি দিয়ে যা দিকিনি.

মিছরি আর মিছরি! ও ছাড়া বুঝি কারও মুখে কথা নেই! মিছরি নড়ল না! চিঠি থেকে চোখ তুলে উদাসভাবে আকাশ দেখল। আবার একটা টিয়ার ঝাঁক আসছে গাঙ পেরিয়ে। আসুক।

ছোট কাকার এক বন্ধু ছিল, ত্র্যম্বক। মিছরির বিয়ের আগে খুব আসত এ বাড়িতে। বিয়ের পর আর আসে না। কেন বলো তো! মিছরি উদাস চেয়ে থাকে। কোনওদিন মনের কথা কিছু বলেনি তাকে ত্র্যম্বক। কিন্তু খুব ঘন ঘন তার নাম ধরে ডাকত। সিগারেট ধরাতে দশবার আগুন চাইত।

কেন যে মনে পড়ল!

উকিল লিখেছে—ত্রিশ টাকার মধ্যে কলিকাতায় ঘর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজিয়াছি। মাঝে মাঝে ভাবি, বনগাঁ চলিয়া যাইব। সেখানে প্র্যাকটিসের সুবিধা হইতে পারে। বাসাও সস্তা।

তাই যদি যেতে হয় তো যাও। আমি আর পারি না। বিয়ের পর এক বছর চার মাস হল ঠিক ঠিক। আর কি পারা যায়, বলো উকিলবাবু। তোমার পাষাণ হৃদয়, তার ওপর পুরুষমানুষ, লাফঝাঁপ করে তোমাদের সময় কেটে যায়। আর আমি মেয়েমানুষ, লঙ্কাগাছে জল ঢেলে কি বেলা কাটে আমার, বলো? চোখের নোনা জলে নোনাগাঙে জোয়ার ফেলে দিই রোজ। উকিলবাবু, পায়ে পড়ি...

খিচুড়িতে আলু, কুমড়ো, ট্যাঁড়স, ঝিঙে, পটল সব ঢেলে দিয়ে রোগা বামুনটা আম গাছের তলায় জিরেন নিচ্ছে। গলায় ময়লা মোটা পৈতেটা বেরিয়ে গেঞ্জির ওপর ঝুলে আছে। বড্ড রোগা, ঘামে ভিজে গেছে তবু গেঞ্জি খোলেনি পাঁজর দেখা যাওয়ার লজ্জায়। বিড়ি ধরিয়ে ছোট কাকাকে বলল—বউ আর ছেলেপিলেদের সোনারপুর ইস্টিশানে বসিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তারা সব কদিন ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাবে। ঠিক করেছি বাজার যেখানে পাব জমি দখল করে ঘর তুলে ফেলব আর চাষ ফেলে দেব। মশাই, কোনওখানে একটু ঠাঁই পেলাম না আমরা। বাঁচতে তো হবে নাকি!

ছোটকাকা বলে, কতদূর যাবেন? ওদিকে তো সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্ট আর নোনা জমি। বাঘেরও ভয় খুব। লোকটা বিড়ি টেনে হতাশ গলায় বলে, আসতে আসতে এতদূর এসে

পড়েছি আর একটু যেতেই হবে। বাঘেরও খিদে, আমাদেরও খিদে, দুজনাকেই বেঁচে থাকতে হবে তো!

উকিলবাবু আর কী লেখে? লেখে—সোনামণি, আমার তিনকুলে কেহ নাই, নইলে তোমাকে বাপের বাড়ি পড়িয়া থাকিতে হইত না। যাহা হউক, লিখি যে আর কয়দিন ধৈর্য ধরো। কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু হইবেই। ওকালতীতে পসার জমিতে সময় লাগে।

বুঝি তো উকিলবাবু, বুঝি। তোমার যেদিন পসার হবে ততদিন আমি থাকব তো বেঁচে! যদি মরে যাই, তবে তোমার লক্ষ্মীমন্ত ঘরে আর কোনও না কোনও পেত্নী এসে আমার জায়গায় ভেঁড়েমুশে সংসার করবে। বালা বাজিয়ে হাওয়া খাবে, মাছের মুড়ো চিবোবে, গাল ভরতি পান খেয়ে রুপোর বাটায় পিক ফেলবে। ততদিন কি বাঁচব উকিলবাবু?

বিপিন কলাপাতা কেটে উঠোনে ফেলছে। ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে দলটার মধ্যে। ঝপাঝপ পাতা টেনে বসে পড়ল সব। বাঁ হাতে সকলের পাঁচ ছটা কাঁচালঙ্কা, পাতে একথাবা নুন। খিচুড়ি এখনও নামেনি। সবাই কাঁচা লঙ্কা কামড়াচ্ছে নুন মেখে। ঝালে শিস দিচ্ছে।

উকিলবাবু কী লেখে আর? লেখে—বন্ধুর বাসায় আর কতদিন থাকা যায়? ভাল দেখায় না। ধারও অনেক হইয়া গেল। লজ্জার মাথা খাইয়া লিখি, কিছু টাকা যদি পারো...

গরম খিচুড়ি মুখে দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে জিভের যন্ত্রণায়। একজন বুড়ো বলে—আস্তে খা। ফুঁইয়ে ফুঁইয়ে ঠাণ্ডা করে নে।

—উঃ, যা রেঁধেছ না হরিচরণ, লাট বাড়ির বাস ছেড়েছে।

মিছরি আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা হেলে গেছে। গাছতলায় আর ছায়া নেই। রোদের বড় তেজ।

দলের মাতব্বর জিজ্ঞেস করে মিছরির বাবাকে—ওদিকে কি কোনও আশা নেই মশাই? অ্যাঁ! এত কষ্ট করে এতদূর এলাম।

মিছরি ঘরে চলে আসে। চোখ জ্বালা করছে। বুকটায় বড় কষ্ট।

পড়ন্ত বেলায় মিছরি তার উকিলকে চিঠি লিখতে বসে—আশা হারাইও না। পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে...।

Shahnaz

ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুল গাছের নিবিড় ছায়া থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না। কী করে। তবু অভ্যাস পাঁচ বছর ধরে পাগলটা বসে আছে ওই বকুলগাছের তলায়। পাঁচ বছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ্য করছে ও। ভয় করলে কি চলে।

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিং থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে নেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধ মুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে নীল মাছি।

ওই ঠোঁট জোড়া ছ'সাত বছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার। একবার মাত্র। জীবনে ওই একবার। তাও জোর করে। এখন ওই নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড় ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাতঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্নাঘরের এঁটোকাটা মুক্ত করতে থাকে তখন কল্যাণী রোজকার মতোই ঘুম গলায় বলে—ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ওই গাছতলায় এল তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চিৎকার করত, আকাশ বাতাসকে গাল দিত। চিৎকার করে হাত তুলে বলত টেলিগ্রাম...টেলিগ্রাম...! তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে। যদি আক্রমণ করে। তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড় অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনও ভালবাসেনি কল্যাণী, সে ভালবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারেনি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল, তুষার কল্যাণীর সংসারের দোরগড়ায়। চৌকি দিতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা জানালা খুলত না।

—চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? ঠিক সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার-কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায় বসে রইল। কিন্তু তার বেশি এগোল না। চিৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই কেন থানা

গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল—ওকে কিছু খেতে দিয়ো। সারাদিন বসে থাকে।

—কেন?

—দিয়ো। ও তো কোনও ক্ষতি করত না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন!

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দুবেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গোগ্রাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে উড়ে নামে, চেঁচায়, নীল মাছির ভিড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয়! না, ঠিক ঘুম নয়। এক ধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত কুল কুল করে তার মাথার ভিতর বয়ে যায়। চোখ বুজে সে সেই আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত—আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারব না, মা।

মাইনের ওপর তাকে তাই উপরি তিনটে টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত নিয়ে গিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে—হাভাতে, পাগল, রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা! কপালও বটে তোর, এমন বাসার সামনে আস্তানা গাড়লি যে তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।

ভাতঘুমে রোজ কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়।

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেইসব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে দেওয়া মাছের টুকরা, নিজের ভুক্তাবশেষ সবই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গত বছর একটা প্রমোশন হয়েছে তুষারের জুনিয়ার থেকে। এখন সে সিনিয়র একজিকিউটিভ। নিজের কোম্পানির দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানালার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ারকন্ডিশন করা ঘরখানায় সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুয়াশার মতো আবছা দেখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকটিক করে নড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিব। চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময় প্রায়ই টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকায়দায় আটকে থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির গোছা হাতে দারোয়ান এঘর-ওঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ফুসফুস ভরে বাতাস টানে সে!

Shahnaz

কোনও কোনও দিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোনও কোনও দিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে! দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইঁট কাঠ বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রিট মিক্সার, ক্রেন হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চা ছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বিমের গায়ে টং টং করে ছুড়ে মারছে! ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ওই তুচ্ছ শব্দটি—ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর সেই কাঠামোর ভিতরে ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারিদিক আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইঁট কাঠ পাথরের স্তূপ! ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ওই শব্দ যেন কখনও শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে—ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কিসের ছুটি! কেন অবসর! সে পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—এ তার ভালই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দেয়—কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্যে এখনও পাথর ছুড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে।

চৌরঙ্গির ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে—সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছে করে না। বাড়ি ফেরা—সেই এক-ঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে—সামনের বাঁদিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাব। কোথায়। তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে মোড়ে এসে যায়। এবার? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনও কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো—লোহার বিমে নুড়ি ছুড়ে মারার শব্দ—তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয়—কেবলই মনে হয়—কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি বিনা বৃথা চলে গেল জীবনে।

সে আবার বলে—বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরনো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার সেই বাড়িটাকে দেখল। কী একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ-সাত বছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরনো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্য কেনা এক প্যাকেট দামি সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরনো বাড়ির তিন তলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তুষার ভাবে—এখনও নিনি আছে কি এখানে? আছে তো!

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ-সাত বছর আগেকার সেই নিনি এখনও আছে কিনা সন্দেহ। যদি না থেকে থাকে তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার?

একটু দাঁড়িয়ে ভেবে, একটু ঘুরে-ফিরে দেখে তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে।

চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরিজিতে বলল—কাকে চাই?

তুষার হাসল—চিনতে পারছ না?

নিনি ওপরের দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডান দিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রঙ মেলেনি। পাঁচ বছরে অন্তত এইটুকু পাল্টেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়—আঃ, তুমি কি সেইরকম দুষ্টু আছ। বুড়ো হওনি?

—আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছ কিনা! তোমার স্বামী পুত্র হয়নি তো! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উল্টে বলল—আমার ওসব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন কাগজে ছাওয়া দেওয়াল, ভাড়া করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলি আসবাবপত্র। এখনও সেন্ট-পাউডার ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিও আর গিটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল—তুমি একটুও বদলাওনি।

—তুমিও।

কিন্তু তুষারের তীব্র ইচ্ছাটা এখনও অস্থির অন্ধের মতো বেরোবার পথ খুঁজছে! সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামি মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে—এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

Shahnaz

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ওই যে গোপনতার ভান করে দামি বোতল বের করা ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে নিনি বারবার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত—মনে রেখো এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হয়ো না, ছল্লোড় কোরো না।

তুষার হাসল। সে বারবার নিনির কাছে মাতাল হয়ে ছল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকতায় একটা গৎ গিটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওত পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরে তীব্র ইচ্ছেটা গিটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বিমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ ইচ্ছা আনন্দময় আবরণ উন্মোচন, তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে নিনি—থামো, থামো, আমার বড় ব্যথা—

তুষার থামে—কী বলছ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে ব্যথায় নীল মুখ তুলে বলে—এইখানে বড় ব্যথা—

পেটের ডান ধার দেখিয়ে বলে—গত বছর আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। অ্যাপেন্ডিসাইটিস—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সব কিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল, তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটে ফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনোন নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরের ব্যালকনি, উলটোদিকে ফুটপাথে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো-মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাববার কিছু নেই। এখন এক রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বকুল ঝরে পড়ে। অবিকল পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। রাত বাড়ছে। তার খিদে পাচ্ছে।

পুরনো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার। কখনও নির্জন শেক্সপিয়ার সরণি, কখনও চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গি রোড ধরে বহুক্ষণ হাঁটল সে। এখনও মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে। তার মন বলছে, এখানে নয় এখানে নয়। চলো সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে। ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভূতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা? সে কি চাকরি করতে করতে ক্লান্ত? সে কি সংসারের একঘেয়েমী আর পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারী বিরক্ত হয় তুষার—কাঁদছ কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না? আমাদের যা ট্রেইন হয় তাতে না খেলে চলে না—

কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী—শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছ যাওনি? তোমার ঠোঁটে গালে শার্টে লিপস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ—যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেক রাত হল আরও। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুল গাছের তলায় তখন পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকার ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার! কেই হ্যায়।

সে ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেব। রোজ মঙ্গলা রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসতে। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয় বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে?

তুষার হাসল—তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে ওর জন্য আমরা কিছু দিই—

থালার নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুল গাছটার তলায় গেল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটুদূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না অরুণ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

Shahnaz

—ওইখানে, ওই ব্যালকনিতে মাঝে মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখ না? তার বাঁ গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনও মাছির মতো বসে থাকে—দেখ না? এখনও আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনও তেমনি উজ্জ্বল রঙ। চেয়ে দেখ না অরুণ?

পাগল গ্রাহ্য করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল! পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়তো কোনও গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে করবে প্রত্যক্ষ।

—তোমার কোনও নিয়ম না মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছ অরুণ। তোমার মুক্তি নেই?

ডাল তরকারিতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাথের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভিতরকার ঝুঝুকো আঁধার আর একবার দেখা গেল। লোহার বিমের গায়ে নুড়ি পাথরের টুং টুং শব্দ। অবিরল অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কিসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে! কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—কী হল?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—এসো তো, এসো তো কল্যাণী।

চারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দেখে তুষার, চুমু খায়, তীব্র আগ্রহে, রিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড়বিড় করে বলে—কেন তোমার জন্যে ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান। আমাকে দিতে পারো তা?

বৃথা। সব শেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু। আর কিছু নয়!

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়! প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মতো উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন হ্যামারটা ধম্ করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করতে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দুহাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কিসের শব্দ ওটা? অন্ধকারে উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা একা উন্মাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুমভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো। বুক কাঁপে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো, তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু

ক্রেন হ্যামার! অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে—চলো সমুদ্রে। চলো পাহাড়ে! চলো ছড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে আস্তে হাঁপায়।

বাইরে খর বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে। বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে তাকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দেখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে সে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখনার মতো অন্ধকার ক্লান্তি নামে চার ধারে। অনেক দূর হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনওদিন ওঠে না। হেঁটে হেঁটে চলে যায় বহু দূর। কী একটা কাজ বাকি রয়ে গেল জীবনে! করা হল না! এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে। সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনও বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নীচে বকুলগাছ। তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেট-এর মশারির ভিতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাতে খোঁপাসুদ্ধু একটা মেয়ের মুখ, নীচে লেখা সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিন্ত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে আস্তে বলে—কী করে ঘুমোও?

—চলো, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি। এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্রতো দেখেছি। দার্জিলিং শিলং-ও দেখা।

—অন্য কোথাও। অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার। কিন্তু সে জানে মনে মনে, ঠিক জানে—যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছাপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। এক মাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

Shahnaz

মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে—না নাঃ। বলেই চমকায়। কীসের না? কেন না?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরি ডিকটেশন দিতে দিতে বলে ওঠে—না নাঃ। স্টেনোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারিদিকে চায়। অদৃশ্য মশারির মতো কী একটা ঘিরে আছে চারদিকে। ওটা কী! ওটা কেন! কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপিয়ার সরণি ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে—জোর চালাও ভাই। আরও জোরে—আরও জোরে...

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মতো একটা ক্রেন হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লাহার বিমে নুড়ি ছুড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে আমার ঘরে যেতে?

পাগল খায়। উত্তর দেয় না।

—ইচ্ছে করে না কল্যাণীকে একবার কাছ থেকে দেখতে?

পাগল খায়। কথা বলে না।

—জানতে চাও না সে কেমন আছে?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের ঘরে! যাবে অরুণ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে—আপনার বড় দয়া। রোজ দেখি দু'বেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দেন। আজকাল কেউ এতটা করে না কারও জন্য! আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার—কী বলেন?

—বলি, ওই রকম মহাপ্রাণ হয়ে ওঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন—এটাই আমাদের বড় লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার! দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি!

কিন্তু ভাবে তুষার! ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে—না নাঃ। চমকায়! জালবদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে এখনও মাঝে মাঝে ক্রেন হ্যামারটা ধম্ করে নেমে আসে! জেগে উঠে যন্ত্রণায় বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।

এত রাতে সত্যিই তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুল গাছটার তলায়।

—চলো অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনওদিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।

কে জানে কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল।

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দেখ কাকে এনেছি।

কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল একটা চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিন্‌ঠিন্ শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

—মা গো! চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল। তুষারের হাতে-ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এত কাছ থেকে অরুণকে অনেকদিন দেখেনি কল্যাণী। কি বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা। খালাসীদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা। খাকি প্যান্টের রং পালটে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ঙ্কর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে কেবল তখনও অকৃপণ, সুন্দর, সুগন্ধ বকুল ফুলে ছেয়ে আছে ওর মাথায় জটায় ঘাড়ে।

কাঁপা হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তারদিকে তাকালই না। চোখ নিচু রেখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে তুষার বলছিল—খাও অরুণ, খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার। নিয়ে এল ঘরে।

—এই দেখ আমার ঘরদোর। ওই যে মশারির নীচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দেখ, ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দেখ ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ওই ড্রেসিং টেবিল। এই দেখ, আরও কত কী—

ঘুরে ঘুরে অরুণকে সব দেখায় তুষার।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—এখানে এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না অরুণ? ইচ্ছে করে না এই সব জিনিসপত্রের মালিক হতে? তুমি আর চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বউ? সোমার মতো মেয়ে।

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—বলো অরুণ, ইচ্ছে করে না!

—অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার! পাগল বলে।

—কোথায়—কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে।

বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না অরুণ। থাকো থাকো। থেকে দেখ।

পাগল কিছু বলে না।

Shahnaz

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার!

পাগলটা আস্তে আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুল গাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুলকুল করে বয়ে চলে তার অন্যলগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে।

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল তুষার। চেয়ে দেখে নিশ্চিন্তে বকুল গাছের ছায়ায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দেখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না অরুণ? বকুল গাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে! হায় পাগল, ভালবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনও সন্দেহ নেই। সে কাছ থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থরথর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড় শীত পড়েছে এবার। বকুল গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে? ছোঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তরের হাওয়া লাগছে শরীরে। বড় দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরনো কম্বল পাঠিয়ে দেয় কল্যাণী! পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালবাসে এখনও! কে জানে? মাঝে মাঝে উগ্র হিংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনও দিনের পরদিন থাকে নিঃস্পৃহ। আর ওই যে ভালবাসার জন্য পাগল অরুণ—ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী। বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার, বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সব সময়ে উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি। কখন যে ধম্ করে নেমে আসে! অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে উঠে তুষার।

ঠিক সকাল নটায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুল গাছটার গোড়ায় পাগলকে দেখে। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানি এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে! ক্লান্তি বাড়ে। দিন শেষে তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দেয় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দেয়, নাড়া দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোকা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে।

তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারদিকে আধো আলো আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি বিস্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনও ফুল, বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।

পাগল বসে থাকে।

Shahnaz

এক দুই

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ভগবান আসলে দু'জন আছেন?

কেন বলুন তো!

আমার ইদানীং কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে ভগবান আসলে দু'জন আছেন। একজন বড়লোকের ভগবান, আর একজন গরিবের ভগবান। আরও কি মনে হয় জানেন, গরিবের ভগবানও বেশ গরিব।

এরকম মনে হওয়ার তো একটা কারণ থাকবে, না কি?

না, সে রকম লজিকাল কারণ কিছু নেই। মনে হল, তাই বললাম। এই গতকালকের কথাই ধরুন। মাসের শেষ বলে পুঁইচচ্চড়ি আর ডাল হয়েছে। তা খেতে বসে মনে হল, একটু লেবু আর লঙ্কা হলে বেশ হত। তাই ভগবানকে খুব কষে ডাকতে লাগলাম। কারণ, ঘরে লেবু বা লঙ্কা কোনওটাই ছিল না। তা ডাকতে ডাকতে যখন আর্ধেক ভাত সাবাড় করে ফেলেছি ঠিক সেইসময়ে আমাদের পাশের ঘোষবাড়ির বউটি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা এনে বলল, তাদের গাছে সূর্যমুখী লঙ্কা হয়েছে, তার শাওড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। ওই লঙ্কার জোরে বাকি ভাতটা খেয়ে উঠলাম। লক্ষ করবেন ভগবান অর্ধেকটা দিলেন, কিন্তু বাকি অর্ধেক দিলেন না।

আপনার কি ধারণা বড়লোকের ভগবান বেশি সার্ভিস দেন?

সেরকমই মনে হয়। নব চাটুজ্জের কথাই ধরুন না। বিশাল কারবার। নিউ আলিপুরে প্যালেসের মতো বাড়ি, গ্যারেজে খানচারেক গাড়ি। টাকায় লুটোপুটি খাচ্ছেন। তা এই তো সেদিন কোন কনজিউমার প্রোডাক্টের স্লোগান প্রতিযোগিতায় হেলাফেলায় একটা স্লোগান লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাস দেড়েক বাদে সেই কোম্পানির লোক একখানা ঝকঝকে মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। উনি স্লোগান কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়ে প্রাইজ পেয়েছেন। শুনলাম সেটার দাম নাকি সতেরো লাখ টাকা। ভগবান যদি একজন হতেন তাহলে এরকমটা হতে পারত কি?

খুবই শক্ত প্রশ্ন। ভগবান সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না।

আরে সে তো আমিও জানি না। আপনার কি ধারণা আমি ভগবান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ?

Shahnaz

শাস্ত্রটাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-উপনিষদ, গীতাটিতা আমি কিচ্ছু পড়িনি। তবে ভগবান মানি খুব।

আপনি দু'জন ভগবানের কথা বললেন। কিন্তু হিন্দুদের তো শুনি তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী।

আহা, ওসব হচ্ছে একজনেরই নানা রকম প্রতীক, বুঝলেন না? কখনও ঘেঁটু, কখনও শীতলা, কখনও শিব, কখনও বিষ্ণু। খুব কমপ্লিকেটেড ব্যাপার। তাই আমি ধর্মের মধ্যে বিশেষ মাথা গলাই না। তবে মন্দিরটন্দির দেখলে একটা নমো ঠুকে যাই।

আপনার আস্তিকতা বেশ সহজ সরল, তাই না?

যা বলেছেন। জটিলতা ব্যাপারটা আমার সহ্য হয় না। আমি শুধু জানি, ওপরে একজন কেউ আছেন। আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়, একজনের জায়গায় দু'জনও হতে পারেন।

ওপর বলতে আপনি ঠিক কোন জায়গাটা মিন করছেন?

কেন, ওপর বলতে ওপরটাই মিন করছি।

যদি আকাশ মিন করে থাকেন তাহলে আপনার জানা উচিত যে আকাশ হল মহাশূন্য। আর মহাশূন্যে ওপর-নীচ, পূর্ব-পশ্চিম কিছু নেই। মহাশূন্য সম্পূর্ণ দিগ্বিদিকশূন্য।

আহা, আবার আপনি জট পাকিয়ে তুললেন। আমি তো অত ভেবেটেবে বলিনি। লোকে যা বলে-তাই বললাম। সামওয়ান ইজ আপ দেয়ার।

তাহলে অবশ্য কথা নেই। বেশি জানতে গেলে অনেক সময়ে বিশ্বাসটাই ভেঙে যায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমাদের মহাশূন্য নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার মশাই, আমরা তো আর মহাশূন্যে মর্নিংওয়াক করতে যাচ্ছি না। আমরা যেমন ওপর আর নীচ দেখছি সেরকমটাই তো ভাল।

যার কাছে যেমন। না জানারও নিশ্চয়ই কিছু উপকারিতা আছে।

ঠিক বলেছেন। বেশি জানতে গেলে নানা রকম ভজঘট্ট বাঁধে। এই ধরুন, বউকে নিয়ে দিব্যি সুখে-দুঃখে সংসার করছেন, হঠাৎ যদি জানতে পারেন, বিয়ের আগে বউয়ের একটা কেলেঙ্কারি বা অ্যাফেয়ার ছিল তাহলে কি সংসারটা তেতো হয়ে যাবে না?

খুবই ঠিক। আপনি কি সংসারী মানুষ?

বিয়ের কথা বলছেন? না ও ব্যাপারটা আর হয়ে উঠল না। তার জন্য দায়ী হল অর্থনৈতিক অবস্থা। আমি একজন ব্যবসায়ীর কর্মচারী। বুঝতেই পারছেন, এসব কোম্পানি কর্মচারিদের কীভাবে ট্রিট করে। উদয়াস্ত খেটে চার হাজার টাকা হাতে পাই। ঘাড়ে বুড়ো বাবা-মা, একটা বোন, পড়ুয়া ভাই। বাড়িওলা জল বন্ধ করে দিয়েছে। গুণ্ডা লাগাবে বলে শাসাচ্ছে। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থায় বত্রিশ বছর বয়সেই যেন বার্ধক্য এসে গেছে। বিয়ের শখও নেই। মেয়েদের দেখলে আজকাল ভারী জড়সড় হয়ে পড়ি, হীনম্মন্যতায় ভুগি।

অর্থনৈতিক অবস্থা কবেই বা ভাল বলুন। দেশজোড়া দারিদ্র্য। তাতেও তো বিয়ে হচ্ছে, সন্তান জন্মাচ্ছে।

ওসব দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। আমি বিয়ে পাগল নই। এই বেশ আছি। দারিদ্র্য থাকলে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শখ-আহ্লাদ বলতে কিছু নেই। ভাতের পাতে একটা দুটো ব্যঞ্জন হলেই হল। মা-বাবা, ভাই-বোনেরা সবাই আমার প্রতি সিমপ্যাথেটিক। কিন্তু বউ এলেই যে আমার নানা অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো দেখতে পাবে এবং আমাকে গঞ্জনা দেবে।

বিয়ের ওসব সাইড এফেক্ট তো আছেই। সে জেনেশুনেই লোকে বিয়ে করছে তো!

যে করছে সে করুক। আমি ওর মধ্যে নেই।

আচ্ছা, এই যে আপনি বললেন, বউ এলে যে আপনার অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো দেখতে পাবে, তার মানে কী? আপনার ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো কি বউ ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না?

পাচ্ছে বইকি, কিন্তু তার জন্য তারা আমার ওপর চড়াও হচ্ছে না, হামলা করছে না। বউ পরের বাড়ির মেয়ে, তার স্বার্থ আমার ওপর নির্ভরশীল, সে ছাড়বে কেন? আমার এক বন্ধু তো বউয়ের গঞ্জনা শুনতে শুনতে ভ্যাবলা মতো হয়ে গিয়ে শেষে ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছে রেললাইনে গলা দিয়ে...ওঃ, সে কথা মনে করলেই ভয় হয় মশাই। আমার কি মনে হয় জানেন, দুর্বলচিত্ত মানুষদের বিয়ে না করাই উচিত। শরীরের প্রয়োজনে বরং প্রস কোয়ার্টারে যাক, বিয়ে করার রিস্ক না নেওয়াই ভাল।

দুর্বলচিত্ত মানুষের সংখ্যাই তো বেশি। সারা পৃথিবীর অ্যাসেসমেন্ট করলে দেখবেন, দুনিয়ার নাইনটি পারসেন্ট মানুষ দুর্বলচিত্ত।

তা হতে পারে। অন্যের খবরে আমার দরকার কি বলুন। আমি যে দুর্বলচিত্ত সেটাই আমার কাছে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। ওঃ হ্যাঁ, আপনি তো আবার বেশি জানতে চান না।

দূর মশাই, জেনে হবেটা কী? জানলে যদি জ্বালা বাড়ে তাহলে লাভটা কী? ওই ভয়ে তো আমি খবরের কাগজও পড়ি না। কাগজ রাখার পয়সা নেই বটে, কিন্তু আমাদের ম্যানেজারের টেবিলে খবরের কাগজ থাকে। আমি কখনও তাকাইও না।

তার মানে কি পৃথিবী সম্পর্কে আপনার কোনও আগ্রহই নেই? রাজনীতি, খেলাধুলো, সিনেমা, যুদ্ধবিগ্রহ, আর্ট কালচার?

ছিল, ছিল। বছর দশ পনেরো আগেও ওসবে ইন্টারেস্ট ছিল। তারপর দেখলাম, দুনিয়াটা তার নিজের মতো চলেছে, আমি মাধ্যাকর্ষণের ফলে তার গায়ে ছারপোকার মতো সেঁটে আছি মাত্র। টিকে থাকা ছাড়া আমার কোনও ধর্ম নেই, কর্মও নেই। দুনিয়াকে জানার চেষ্টা করা বৃথা। সায়েন্টিস্টরা চেষ্টা করছে, দার্শনিকরা করছে, জ্ঞানী পণ্ডিতরা করছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে অন্তরস্থ। দুনিয়াকে জানা ও বোঝা অত সহজ নয়। তাই আমি আর ওসব চেষ্টাই করি না। সকাল নটায় বেরোই, হিসেব বুঝিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত দশটা। হপ্তায় এই একদিন ছুটি।

ছুটির দিনে কী করেন?

সকালে বাজার, তারপর জামাকাপড় কাচা, দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলে এই একটা দিন এসে এই পার্কটায় একটু বসে থাকি।

আর কোনও এন্টারটেনমেন্ট নেই আপনার? সিনেমা থিয়েটার?

দূর দূর, ওসব বানানো কৃত্রিম জিনিস দেখে মনকে বিভ্রান্ত করার মানেই হয় না। গত দশ বছর আমি সিনেমা দেখিনি, বিশ্বাস করবেন?

করলাম। তা পার্কে বসে থাকাটাই এন্টারটেনমেন্ট আপনার?

বসে থাকি, আর ভাবি।

কী ভাবেন?

আমার ভাবনার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। ব্রেন পাওয়ার কম তো, তাই চিন্তার জগতে কোনও শৃঙ্খলাও থাকে না। বসে বসে যা মাথায় আসে তাই ভাবি।

কোনও মহিলার কথা?

Shahnaz

ওঃ, আপনি ওই একটা দিকেই আমাকে গোত করতে চান তো? তা মশাই, সত্যি কথা বলতে কি, এক-আধজন মহিলার কথাও যে মনে আসে না তা নয়।

কোনও বিশেষ মহিলার কথা কি?

তাও বলতে পারেন। আমি যতই অপদার্থ হই, আমারও যৌবন ডাকাডাকি করেছে এক সময়ে। তা ওই কাঁচাবয়সে কখনও সখনও এক আধজন মেয়েকে ভারী পছন্দও হয়েছিল।

তাহলে রোমান্স হয়েছিল?

রোমান্স কথাটা ভারী বাবু কথা। অত ভাল ব্যাপার কি আমাদের মতো অপদার্থের কপালে হয়? তখন কসবায় একটা খোলার ঘরে থাকতাম। এ চাকরিটা তখনও পাইনি। বাবা ছিল প্রাইভেট বাসের কন্ডাকটর। অবস্থা অনুমান করে নিন। তা সেই সময়ে আমি কলেজে পড়ি। যাতায়াতের পথে একটা গোলাপি রঙের বাড়ির একতলার জানালায় একটা ফুটফুটে মেয়েকে প্রায়ই দেখতে পেতাম। কোঁকড়া চুল ছিল মাথায়, বেশ ফরসা, মুখখানা যেন নরুণে চেঁছে যত্নে বানানো। মেয়েটা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকত।

তার বয়স কত ছিল?

তেরো চোদ্দো হবে।

তারপর?

যাতায়াতের পথে রোজই চোখে চোখ পড়ত। একটু লাজুক ছিলাম বলে এই একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিতাম। তবে এইভাবে চলল, আর আমার ভিতরে নানা রকম কেমিক্যাল চেঞ্জ ঘটতে লাগল। প্রেমে পড়লে যা হয় আর কি।

আপনি কি বিজ্ঞানের ছাত্র?

কেন বলুন তো! কী করে বুঝলেন?

কেমিক্যাল চেঞ্জের কথা বললেন কি না।

সায়েন্স পড়েছি বটে, কিন্তু তাতে কোনও সম্ভাবনা তৈরি হয়নি আমার জীবনে। পাস কোর্সে বি. এসসি. পাস করেছিলাম। পয়সার অভাবে ফিজিক্সে অনার্স কন্টিনিউ করতে পারিনি।

অনার্স ছিল, তার মানে সম্ভাবনা তো ছিলই!

পয়সার অভাব আমাদের দেশে সব রকম মেধাকেই গলা টিপে মেরে দেয়, বুঝলেন?

হ্যাঁ। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু সেই মেয়েটার কথা শেষ করুন।

শেষ না করলেও হয়। তবে হ্যাঁ, তার প্রতি আমার প্রবল দুর্বলতা জন্ম নিয়েছিল। আর আমার যাওয়া-আসার সময় সর্বদাই সে জানালায় থাকত, এটাও একটা পয়েন্ট, অর্থাৎ তারও আমার প্রতি আগ্রহ ছিল, তাই না?

তাই তো মনে হচ্ছে! পরিচয় হল কী করে?

পরিচয়ে বাধা ছিল। একে আমি লাজুক, গরিবের ছেলে, টিউশানি করে কলেজে পড়ি। আর ওই মেয়েটি বড়লোক না হলেও আমাদের চেয়ে অন্তত তিন চার ধাপ ওপরের সমাজের লোক। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর মতো ব্যাপার। তবে মেয়েটি যে আমার জন্যই অপেক্ষা করত তাতে সন্দেহ ছিল না আমার। বেশ কিছুদিন চোখাচোখি খেলার পর সে আমাকে দেখে একটু হাসতও।

বটে!

হ্যাঁ মশাই। আমিও মনে মনে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। জীবনে ওটাই আমার

প্রথম ও একমাত্র প্রেম কি না।

বুঝেছি। বলুন।

বোধহয় মাস দুয়েক এরকম চলার পর একদিন হঠাৎ দেখলাম, জানালায় মেয়েটির পাশে একজন ফরসা বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। যত দূর মনে হল মেয়েটির মা।

এই রে!

হ্যাঁ, আমিও খুব চমকে গিয়েছিলাম, ভয়ও পেয়েছিলাম। মিতুর মাকে দেখে আমি সেদিন প্রায় ছুটে পালাই।

মেয়েটির নাম বুঝি মিতু?

হ্যাঁ।

তারপর?

দিন দুই বাদে একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় দেখি সেই ভদ্রমহিলা তাঁদের গ্রিলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে ডাকলেন, এই ছেলে, শোনো!

ও বাবা!

হ্যাঁ, আমি তো ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। উনি বললেন, ভয় পেয়ো না, ভিতরে এসো। কথা আছে। আমি ভাবলাম, ভিতরে নিয়ে গিয়ে বোধহয় লোক ডেকে ধোলাই দেবেন। তবু ভদ্রতার খাতিরে না গিয়েও পারলাম না। ভদ্রমহিলা আমাকে যত্ন করে বসালেন, পাখা ছেড়ে দিলেন। তারপর আমার বাড়ির খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

বাঃ, এ তো গ্রিন সিগন্যাল।

হ্যাঁ। গ্রিন সিগন্যালই। আমিও অকপটে তাঁকে সব বলে দিলাম। উনিও দেখলাম, আমাদের সব খবরই রাখেন। বেশ কিছুক্ষণ নানা কথা বলার পর হঠাৎ বলে বসলেন, তুমি কি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? আমি তো প্রস্তাব শুনে হাঁ। কী বলব ভেবেই পাচ্ছিলাম না। বুকের মধ্যে উথালপাথাল। উনি তখন খুব করুণ মুখ করে বললেন, বিয়ে করতে চাইলে আমাদের আপত্তি নেই। তোমার অবস্থা জেনেও বিয়ে দেব। তবে আমার মেয়ে কিন্তু পঙ্গু।

পঙ্গু? এঃ হেঃ, কীরকম পঙ্গু?

কোমরের তলা থেকে পা অবধি সমস্ত নীচের অংশটাই ছিল আনডেভেলপড। হাঁটাচলার ক্ষমতাই ছিল না মেয়েটার। তাই ওকে জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হত। বসে বসে মিতু বাইরের জগৎ দেখত—যে জগতে যাওয়ার ক্ষমতাই ছিল না তার। কিন্তু কোমর থেকে মুখ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—যে কোনও মেয়েকে টেক্কা দেওয়ার মতো।

আপনি কি করলেন? পিছিয়ে গেলেন?

না। সে বয়সটা তো বিবেচনা বা স্থিরবুদ্ধির বয়স নয়। ভাবলাম, পঙ্গু তো কী হয়েছে, ওকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেব। বাড়িতে এসে বললামও সে কথা। মায়ের তো মাথায় হাত। বাবা বাক্যহারা।

আর মিতু? তার মতামত নেননি?

সেখানেই তো গোল বাঁধল।

কিসের গোল?

কথা কইবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম, অমন সুন্দর মেয়েটাকে ভগবান অনেক দিক দিয়ে মেরে রেখেছেন। মিতুর বুদ্ধিটাও তেমন ডেভেলপ করেনি।

Shahnaz

জড়বুদ্ধি নাকি?

অনেকটাই। স্পষ্ট কথা বলতে পারত না। ভ্যাবলা।

তবে তো ব্যাপারটা কেঁচে গেল!

হ্যাঁ। ওই যে আপনাকে দু'স্বর ভগবানের কথা বলছিলাম, কেন বলছিলাম বুঝতে পারছেন তো! গরিবের ভগবান হয় নিজেই গরিব, নইলে হাড়কেপ্পন। লঙ্কা আর লেবু চাইলে লঙ্কাটা হয়তো দেন, লেবুটা টেনে রাখেন।

ভগবানের ওপর যখন আপনার এতই রাগ তখন তাকে ঝেড়ে ফেললেই তো হয়।

ভগবান আমাদের মতো কিছু লোকের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছেন। ঝেড়ে ফেললেই তিনি যাবেন কেন? আচ্ছা, আপনি কি নাস্তিক নাকি?

আস্তিক নাস্তিক কিছুই নই। ও নিয়ে কিছু ভাবিনি কখনও। দরকারও হয়নি।

তার মানে আপনার জীবনটা বেশ স্মুথ। কোনও সমস্যাই নেই। তাই না? হয়তো ভাল চাকরি করেন, মেলা টাকার মালিক, কলকাতায় নিজ বাটি, ঘাড়ে গন্ধমাদন কোনও দায়িত্ব নেই। ঠিক কি না!

তাই যদি হত তাহলে সন্ধেবেলা এসে একা একা এই নেড়া পার্কে বসে থাকতাম নাকি? এটাকে পার্ক বললে কথাটারই অপমান হয়। দেখছেন গোটা মাঠটায় কেমন টাক-পড়া ভাব। গাছপালার নামগন্ধ নেই!

হ্যাঁ, পার্কটার কোনও সৌন্দর্য নেই বটে। তাছাড়া উত্তর দিকের ওই ভ্যাটটা থেকে খুব দুর্গন্ধও আসছে।

গত দশ দিন ময়লা নেয়নি। কালও দেখেছি, মরা বেড়াল পড়ে আছে পাশে। গন্ধ তো হবেই। আর পার্কটার ওই কোণে আজ সকালেই দুটো ডেডবডি পাওয়া গেছে। একটা মেয়ে আর একটা ছেলের। দুজনেরই গলার নালি কাটা।

বলেন কি? কিছু টের পাইনি তো!

এই পার্কটা আজকাল অ্যান্টিসোশ্যালদের আড্ডা, তা জানেন তো! প্রকাশ্যেই মদ, গাঁজা, সেক্স, জুয়া সবই চলে। আজকাল ওদের ভয়ে কোনও ভদ্রলোক আর এ পার্কে আসে না। আজ দেখুন, পার্ক পুরো ফাঁকা। কেন জানেন? ডেডবডি পাওয়ার পর পুলিশ অ্যাকশন হয়েছে সারাদিন। এখনও পেট্রল চলছে। বদমাশরা ভেগেছে বলেই পার্কটা এত ফাঁকা।

তা বটে, পার্কে তো আসি সপ্তাহে একদিন। দেখি, কিছু ছেলে-ছোকরা অন্ধকারে কেমন সন্দেহজনক আচরণ করছে। তবে তাতে আমার আর কী বলুন। আমি একটু কোণার দিক বেছে নিয়ে ঘাসে বসে থাকি চুপ করে। আমাকে কেউ গ্রাহ্য করে না। যারা খুন হল তারা কারা বলুন তো?

কে জানে! ড্রাগ পেডলার হতে পারে। চোরা চালানদার হলেই বা কি। মোট কথা, খুব ক্লিন লোক নয়। কম হলেও আপনার তবু একটা চার হাজার টাকা বেতনের চাকরি আছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় আপনার পজিসন কিন্তু বেশ ভাল। এই যারা খারাপ কাজটাজ করে বেড়ায় তাদের চার হাজার টাকার চাকরি জুটলে অনেকেই হয়তো খারাপ কাজ করত না। কী বলেন?

কে জানে মশাই, দেশ, সমাজ, বেকার সমস্যা এসব নিয়ে আমি মাথাই ঘামাই না। ঘামিয়ে কিছু হয়ও না। আমি শুধু একবগ্গা আমার আয় আর ব্যয়ের ব্যাপারটা প্রাণপণে মেলানোর চেষ্টা করি। আমাদের আয়ের সঙ্গে আমাদের ব্যয়ের কোনওদিন বন্ধুত্ব হয় না, জানেন? সবসময়ে ওই

ব্যয় ব্যাটা এগিয়ে থাকে। দুটোয় কোনওদিন বনিবনা হল না।

আচ্ছা, সেটা তো দেশের লাখো লোকের সমস্যা। কিন্তু অবস্থাটা পালটে দিতে ইচ্ছে হয় না?

পালটে দেব? আমার কোন দায় বলুন তো! দেশে কোটি কোটি লোক থাকতে আমারই বা হঠাৎ দেশের অবস্থা পালটানোর ইচ্ছে হবে কেন? আপনার হয় নাকি?

হয়। খুব হয়। তবে পন্থাটা ভেবে পাই না।

ঝুটমুট ভেবে শরীরপাত করার দরকারটা কি? ওসব আমার আপনার কম্মো নয়। আমি তো ধরেই নিয়েছি যা করার ভগবানই করবেন।

আপনি কিন্তু হতাশাবাদী।

না মশাই, না। হতাশাবাদী হল আশাটাশা ছেড়ে দিয়েছে যে, আমারতো ওসব আশাটাশা ছিল না কিছু, আমি তো আপনাকে বলেইছি, আমি হলাম বাস কন্ডাক্টরের ছেলে। বাপ খেয়ে না খেয়ে ছেলেকে মানুষ করার জন্য বি. এসসি. অবধি পড়িয়েছিল। মানুষ হওয়া অবশ্য হয়নি। কিন্তু তার জন্য আমার কোনও হা-হুতাশও নেই। যা আছি, যেটুকু পাচ্ছি তাই নিয়েই আমাকে থাকতে হবে। বিপ্লবটিপ্লব করার কথা কখনও ভাবিনি। আর বিপ্লবও তো আর এক রকমের নয়। নানা পার্টি নানা বিপ্লবের কথা বলে। তাতেই বুঝে গেছি, কারও এখনও মনস্থির হয়নি।

হাল ছেড়ে দিচ্ছেন?

সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও নিজেকে আমি মোটেই বুদ্ধিমান ভাবি না।

আপনার গল্পটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

কোন গল্পটা?

ওই যে মিতুর সঙ্গে আপনার প্রেমের গল্প।

প্রেমের গল্পের দু'রকম পরিণতি থাকে। হয় মিলনাত্মক, নয় বিয়োগান্তক, তাই না?

হ্যাঁ, আপনারটা কীভাবে শেষ হল?

আমারটা ঠিক মিলন বা বিয়োগ কোনওটাই হল না। কেমন যেন নষ্ট দুধের মতো কেটে গেল, আমি নিজেকে তখন প্রশ্ন করেছিলাম, বাপু, প্রেমেই যদি পড়ে থাকো, তাহলে সেই প্রেমের এমন জোর নেই যে মেয়েটার শরীর আর মনের খামতিগুলো উপেক্ষা করতে পার? এ আবার কেমন প্রেম? কিন্তু কি জানেন, ভিতর থেকে কোনও সাড়াই এল না। আর সেই যে প্রেম কেঁচে গেল আর কখনও পেকে উঠল না।

মিতুর কোনও খবর রাখেন না?

না, খবর রেখে হবেটাই বা কি বলুন। ও পাড়া ছেড়ে চলে আসার পর আর সম্পর্কও নেই। তবে মাঝে মাঝে একটু-আধটু মনে পড়ে আর কি। আচ্ছা আপনি কি এ পাড়ার বাসিন্দা?

তা বলতে পারেন। কাছেপিঠেই আমার আস্তানা।

এই পার্কে প্রায়ই আসেন বুঝি?

না, তবে যাতায়াতের পথে পার্কটা নজরে পড়ে। আজ পার্কটা ফাঁকা দেখে একটু বসবার লোভ হল।

বেশ করেছেন। আপনার সঙ্গে বেশ আলাপও হয়ে গেল আমার। আজকাল কারও সঙ্গেই যেচে আলাপটালাপ করা হয় না। মনে হয় চেনা-জানা বাড়িয়ে হবেটা কী?

মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকাটা কি ভাল নয়?

Shahnaz

আমার কি মনে হয় জানেন? মানুষ জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই কাটিয়ে দেয় নানা রকম অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন কাজে। তার মধ্যে একটা হল এই লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় দেখা হলে দেঁতো হাসি হেসে কুশল প্রশ্ন বা খেজুর করা, ওতে কি লাভ বলুন, কিছুটা সময় ফালতু কাটানো ছাড়া আর কী?

আপনি বুঝি কম কথার মানুষ?

তা নয়। কেউ কথাটথা কইলে আমার বরং বেশ অহংকার হয়। ভাবি, লোকটা পাত্তা দিচ্ছে। আমিও তাকে খুশি করারই চেষ্টা করে থাকি। এসব আমি করি বটে, কিন্তু কাজটা যে অর্থহীন সেটাও ভুলতে পারি না।

চেনাজানা থাকলে দায়ে দফায় মানুষের সাহায্যও তো পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, সেরকম কিছু হয় বটে। কিন্তু চেনাজানাদের কাছ থেকে আমরা কখনও তেমন কোনও উপকার পাইনি। অবশ্য উলটোটাও সত্যি। আমরাও কারও তেমন কোনও উপকার করিনি। মানুষের উপকার করার জন্যও কিছু যোগ্যতার দরকার হয়। আমার সে যোগ্যতা নেই।

আপনি আপনার বাইরের জগৎটাকে নিয়ে ভাবেন না তো!

না। ওই যে বললাম, ভেবে সময় নষ্ট।

বই পড়েন?

পাগল। ওসব বাতিক আমার নেই।

চাকরিটা আপনার কেমন লাগে?

খারাপ কি? মালিকের বিল্ডিং মেটেরিয়ালের বিরাট ব্যবসা। সিমেন্ট, বালি, স্টোন চিপ্‌স, রড, চুন, ইট, সুরকি নিয়ে এলাহি ব্যাপার। রোজ পঞ্চাশ ষাট লরি বোঝাই হয়ে সাপ্লাই যাচ্ছে চারদিকে। যাকে বলে কর্মযজ্ঞ।

আপনার কাজটা কী?

সব কিছু নলেজে রাখা।

শুধু নলেজে রাখা? আর কিছু নয়?

ওটাই তো হাড়ভাঙা খাটুনি। সারাদিন গোটা পাঁচেক গোডাউনে চক্কর মেরে বেড়াতে হয়। কোন অর্ডারে কত মাল যাচ্ছে তার হিসেব রাখতে হয়। একশোটা কৈফিয়ত দিতে হয়।

আপনি কি ম্যানেজার?

অনেকটা সেরকমই শোনায় বটে। ম্যানেজারের ইজ্জত অবশ্য নেই, তবে খাটনি আর ঝুঁকিটা আছে।

মালিকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তাহলে ভালই?

না, ভাল বললে ভুল হবে। তবে হুকুম তামিল করি বলে মালিকরা আমাকে নিয়ে ঝামেলা পোয়ায় না। আর তাই, আমাকে তারা লক্ষও করে না।

তাদের নজরে পড়ার জন্য চেষ্টা করেন না?

মানুষের ওপর নজর দেওয়ার ফুরসত তাদের কই? তাদের নজরতো আগম নির্গমের ওপর। কত মাল বেরোচ্ছে, কত টাকা ঢুকছে।

এতে আপনার বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয় না?

বিদ্রোহ কীসের? মাসের শেষে যে চার হাজার টাকা দিচ্ছে! ওটাই তো জোঁকের মুখে নুন।

আচ্ছা, আপনি কি পলিটিকস করেন?

না তো!

তবে কি ইউনিয়ন-টিউনিয়ন?

না না, ওসব নয়। আমাদের কারবারে অবশ্য ইউনিয়ন নেই। কারও চাকরিই পাকা নয়; ইউনিয়ন করবে কোন সাহসে বলুন!

আপনার কি মনে হয় না একটা ইউনিয়ন থাকলে ভাল হত?

না, হয় না। ইউনিয়ন যেখানে আছে সেখানেই বা ভালটা কী হচ্ছে বলুন। ইউনিয়ন বেশি পেশি প্রদর্শন করলে মালিক লক আউট করে দিচ্ছে, না হয় তো কারখানা বা ব্যবসা তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

তাহলে কি আপনি আত্মবিক্রয় করে দিয়ে বসে আছেন?

যথার্থ বলেছেন। আমরা কে না আত্মবিক্রয় করতে বসে আছি বলুন। মানুষতো নিজেকে সবসময় আরও বেশি সেলেবল কমোডিটি করে তোলার জন্যই নানা ভাবে নিজেকে ঘষামাজা করছে। তাই নয় কি?

অনেকটা তাই বটে।

সবটাই তাই। আমরা কে কত টাকার কাছে বিক্রয়যোগ্য বা ক্রয়যোগ্য সেটাই আসল কথা। দুঃখের বিষয় হল শাহরুখ খান চারকোটিতে বিকোয়, আমি চার হাজারে।

সেই দুঃখেই কি মাঝে মাঝে আপনার ভিতর থেকে একজন ঘাতক বেরিয়ে আসতে চায়?

না মশাই, না। ঘাতকটাতক আমার মধ্যে নেই। আমার মতো লোকেরা বড় জোর নিজেকে মারতে পারে। আত্মঘাতী একটা প্রবণতা আমার মধ্যে এক সময়ে ছিল। কিন্তু সেটাও আজকাল ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, আপনি তো আমার নামটাও জিজ্ঞেস করেননি। অবশ্য নাম জেনে হবেটাই বা কী। রাম বা হরি, রমেশ বা যতীন যা হোক একটা হলেই হল। আমাদের তো আর নামের মহিমা নেই, কী বলেন?

আপনার নামটা আমি জানি।

বলেন কি মশাই? নাম জানেন! কী করে জানলেন?

পুলিশের রেকর্ডে আপনার নাম আছে।

হাঃ হাঃ কী যে বলেন মশাই! পুলিশের রেকর্ডে আমার নাম! আমি কী জাতে উঠে গেলাম নাকি? হাঃ হাঃ! না মশাই, আপনি একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছেন। অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন আমায়।

সেটাও সম্ভব।

আজ্ঞে সেটাই ঘটনা। কিন্তু পুলিশের রেকর্ডের কথা আপনি জানলেন কী করে? আপনি কি পুলিশের লোক?

পেট চালানোর জন্য কিছু তো করেই হবে। পুলিশের চাকরিটাই জুটেছিল কপালে।

ও বাবা, আমি তা হলে এতক্ষণ একজন জবরদস্ত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বসে খেজুর করে যাচ্ছিলাম! কী সৌভাগ্য! বলতে কি আপনিই আমার জীবনে প্রথম পুলিশ-বন্ধু। অবশ্য বন্ধু বললে যদি আপনি অপমান বোধ না করেন।

না, অপমান বোধ করব কেন?

আচ্ছা, পুলিশের রেকর্ডে আমার কী নাম আছে তা বলবেন?

মনোরঞ্জন রায়। সঞ্জীব সরকারওয়াল—অর্থাৎ আপনার এমপ্লয়ার আপনাকে মনো বলে ডাকে।

Shahnaz

ও বাবা! আপনি সবরওয়ালের নামও জানেন দেখছি! কী আশ্চর্য! আপনার ইনফর্মেশন তো একেবারে ঠিক! আমার নাম মনোরঞ্জন রায়, আমার মালিক সঞ্জীব সবরওয়াল আমাকে মনো বলে ডাকে। সবই তো মিলে যাচ্ছে! কিন্তু পুলিশের রেকর্ডে আমার নাম উঠল কেন বলুন তো! ক্রিমিন্যাল হিসেবে নাকি?

না। তবে একজন অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং রহস্যময় মানুষ হিসেবে।

মশাই, আপনি আমার মাথা ফের গুলিয়ে দিলেন। আমার মতো একজন ডিসকোয়ালিফায়েড লোকের জীবনে সন্দেহজনক বা রহস্যময় কী থাকতে পারে বলুন তো!

সেটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন।

লাখ টাকার প্রশ্ন! কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। আমি নিজের সম্পর্কে আপনাকে যা বলেছি তা কি সবই মিথ্যে? আষাঢ়ে গল্প?

না। বরং আপনি নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত সত্যি কথাই বলেছেন। আপনি নিজেকে যেমন বর্ণনা করেছেন আপনি ঠিক সেরকমই।

তবে?

আপনি একজন টোটালি ফ্রাস্ট্রেটেড, হতাশাবাদী, উচ্চাশাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ। দুর্বলচিত্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, ভীতু সবই ঠিক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওরকমই তো!

অন্তত এক বছর আগে অবধি আপনি ওরকমই ছিলেন। আপনার একটা গুণ আছে। আপনি খুব প্রভুভক্ত মানুষ। সবরওয়াল আপনার কাছে ঈশ্বরতুল্য। এটা অন্যদের চোখে গুণ না হয়ে দোষ বলেও গণ্য হতে পারে। কিন্তু আপনার স্থির বিশ্বাস, সবরওয়ালের ওপরেই আপনার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আপনার আরও বিশ্বাস যে, পৃথিবীর একমাত্র সবরওয়াল ছাড়া আর কেউ আপনাকে চাকরি দেবে না। আর তার ফলে প্রভুভক্ত হয়ে ওঠাটা আপনার অবশ্যম্ভাবীই ছিল।

হ্যাঁ, কথাটা খুব ভুল নয়। সবরওয়াল আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আর সেই জন্যই সবরওয়ালকে বাঁচিয়ে রাখাটাও আপনার প্রয়োজন। তাই না?

সে তো ঠিকই।

যিশু দাস নামে কাউকে আপনার মনে পড়ে কি?

যিশু দাস! ও বাবা, সে তো বিরাট গুণ্ডা ছিল!

হ্যাঁ, তোলাবাজ মস্তান। এলাকার টেরর। সবরওয়াল তাকে নিয়মিত তোলাও দিত। ব্যবসায়ীদের ওসব হিসেবের মধ্যেই ধরা থাকে। কাজেই কোনও গোলমাল ছিল না। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল যিশু দাসের হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল বম্বের একজন বিশেষ নায়িকাকে নিয়ে একটা হিন্দি ফিল্ম প্রোডিউস করবে। ওটাই নাকি ছিল তার জীবনের স্বপ্ন। সেই জন্য তার প্রচুর টাকার দরকার হয়ে পড়ে। আর সেজন্যই সে সবরওয়ালের কাছে পঞ্চাশ লাখ টাকা দাবি করে বসে। না হলে খুনের হুমকি দিতে থাকে। তার ফলে সবরওয়াল ভয় খেয়ে কারবার গুটিয়ে ফেলার কথা ভাবতে শুরু করে। ঝানু ব্যবসায়ীরা জানে টাকাটা দিলে এরপর দাবি আরও বাড়তে থাকবে। ঘটনাটা আপনার মনে আছে কি?

খুব আছে মশাই, খুব আছে। আমরা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, সবরওয়ালের বিপদ ঘটলে আপনারও অস্তিত্বের সংকট। তবে যাই হোক, একদিন যিশু দাস হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়। তার পরিবার এবং গাং তন্নতন্ন করে তাকে খুঁজেছে,

হিল্লিদিল্লিতেও খোঁজ করা হয়েছে, কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। খুন হয়ে থাকলে লাশটা তো পাওয়া যাবে। তাও পাওয়া যায়নি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই জানি। অনেকে বলে যিশুর হঠাৎ মতির পরিবর্তন হয় এবং সে সাধু হয়ে কোথাও চলে গেছে।

আমাদের ধারণা আর একটু প্র্যাকটিক্যাল। তদন্তে জানা যায় যিশু দাসকে শেষবার দেখা গেছে সবরওয়ালের গোডাউনের কম্পাউন্ডে ঢুকতে। তারপর থেকে সে বেপাত্তা। সন্ধের পর সে সবরওয়ালের গোডাউনে যায়। তারপর থেকেই তাকে আর দেখা যায়নি। তখন গোডাউনে প্রায় কোনও কর্মচারীই ছিল না। শুধু সবরওয়াল আর আপনি। গেটে অবশ্য দুজন দারোয়ান ছিল।

তা হবে হয়তো! আপনি কি বিশেষ কিছু ইঙ্গিত করছেন?

হ্যাঁ। আমার নিজস্ব ধারণা, যিশু দাস সবরওয়ালের গোডাউনেই খুন হয়ে যায়। সবরওয়াল কোনও ভাড়াটে গুণ্ডা আনায়নি বা তার কাছে কোনও অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। সবরওয়ালের কাছ থেকে যিশু বিদায় নেয় রাত আটটার কিছু পরে। যিশু সেদিন আলটিমেটাম দেওয়ায় সবরওয়াল খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে পুলিশকেও ফোন করেছিল তার প্রোটেকশনের জন্য। সে নিজের অফিসঘরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে এক নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাটা আমার খুব মনে আছে। ওঃ কী টেনশনই গেছে। কিন্তু খুনের কথা কী যেন বলছিলেন?

বলছিলাম, আমার নিজস্ব রিকনস্ট্রাকশন অফ ইভেন্ট অনুযায়ী, যিশু দাস খুন হয় এবং তা হয় সবরওয়ালের গোডাউনের বিশাল চত্বরেরই কোথাও।

বলেন কী! এ তো সাঙ্ঘাতিক কথা!

না, খুব সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। একজন টোটালি ফ্রাস্ট্রেটেড লোক যখন নিজের অস্তিত্বের সমূহ সংকট দেখতে পায় তখন তার ভিতরে ঘুমন্ত ঘাতক জেগে উঠতেই পারে।

কী যে বলেন স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটা লোককে মেরে ফেলা খুব কঠিন কাজ নয়, যদি হাতে কোনও মারাত্মক অস্ত্র থাকে, যদি ভিকটিম অপ্রস্তুত থাকে এবং যদি খুব স্ট্রং মোটিভেশন থাকে, ঠিক কি না মনোবাবু?

আজ্ঞে, খুবই ঠিক স্যার। আপনি পুলিশ অফিসার, কত জানেন।

তদন্তকারী পুলিশেরা কিন্তু কোনও সূত্রই পায়নি। এমনকী এটা মার্ডার কেস না অ্যাবডাকশন না নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তারা আজও জানে না। কেসটার চার্জে আমি ছিলাম না। তবে শুনেছি যিশু যেসব ঠেক থেকে তোলা আদায় করত তার সব কটা আমি একে একে গিয়ে দেখেছি। সবচেয়ে লাইকলি স্পট বলে আমার মনে হয়েছে সবরওয়ালের গোডাউনের বিরাট চত্বর। আমি কখনও আপনাকে জেরা করিনি বা মুখোমুখিও হইনি। শুধু আড়াল থেকে দুদিন আপনাকে একটু ওয়াচ করেছি। আপনাকে সবসময়ে শশব্যস্ত, টেনশনে ভোগা নিরীহ লোক বলেই আমার মনে হয়েছে।

হ্যাঁ স্যার, আমিও তো তাই বলতে চাইছি।

কিন্তু আপনার চোখে সেই গ্লিন্টটা আছে।

সেটা কী জিনিস স্যার!

গ্লিন্টকে বাংলায় ঠিক কী বলে তা জানি না। একটা ঝলকানির মতো। একটা ঝিলিক। ঠিক

Shahnaz

বোঝানো যাবে না। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ দ্যাট প্লিন্ট ইন ইওর আইজ। খুনি চিনতে আমার ভুল হয় না। মনোবাবু।

হাসব না কাঁদব তা বুঝতে পারছি না স্যার।

প্রবলেম হল যিশুর ডেডবডিটা নিয়ে। খুন হয়ে থাকলে তার লাশ যাবে কোথায়। আমি একদিন সকালে, যখন কেউ কাজে আসেনি, জায়গাটা তন্ন তন্ন করে দেখি। উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ন্যাচারাল ডিচ আছে। পাঁচ ছ'ফুট ডায়মিটারের একটা ডিচ। চারদিকে প্রচুর আগাছা থাকায় গর্তটা চোখেই পড়ে না। টর্চ ফেলে দেখি, বেশ গভীর। অন্তত আট দশ ফুট নীচে ডিচের তলায় কয়েকটা সিমেন্টের চাঙড়। জলে ভিজলে সিমেন্ট জমে যায়, আর সময়টা ছিল বর্ষাকাল। আমার অনুমান ডিচের মধ্যে একটা ডেডবডি ফেলে ওপরে কয়েক বস্তা সিমেন্ট ঢেলে দিলে কাজটা এগিয়ে থাকে। সিমেন্টের ওপর অবশ্য যথেষ্ট রাবিশও ফেলা হয়েছে।

হ্যাঁ স্যার, গোডাউনে মাঝে মাঝে এক-আধটা সিমেন্টের বস্তা জমে যায়। সেগুলো ডিচের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।

হ্যাঁ, তা আমি জানি। ওই চাঙরগুলোর মধ্যে যদি যিশুর খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলা পাওয়া যায় তাহলে আমি অবাক হব না। তবে আমি চাঙড়গুলো ভেঙে দেখিনি। সবই আমার অনুমান।

স্যার, কেন যে ওসব ভয়ঙ্কর অনুমান করছেন কে জানে। যিশু মস্ত গুণ্ডা, সে যদি খুন হয়েও থাকে তবে সেটা তার সমকক্ষ লোকই করেছে।

আপনি যিশুর সমকক্ষ নন?

পাগল! কী যে বলেন স্যার!

নরম্যালি, যিশু যদি বাঘ তো আপনি ইঁদুর। কিন্তু যখন অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। প্রভুভক্ত যখন প্রভুর বিপদের গন্ধ পায় তখন বিশেষ সিচুয়েশনে অর্ডার অফ পারসোনালিটিজ উলটে যেতে পারে। তখন বাঘ হয়ে যায় ইঁদুর, ইঁদুর বাঘের জায়গা নেয়।

স্যার, আপনার কথা শুনে বড্ড ভয় পাচ্ছি।

কেন, ভয়টা কীসের?

আপনি যা সব বললেন সেগুলা কি ভয়ের কথা নয়? একটা নেংটি ইঁদুর হঠাৎ হালুম-বাঘা হয়ে উঠলে সে নিজেই যে ভয় খেয়ে যাবে। না মশাই, না, আপনি আমার ভিতরে ভুল জিনিস দেখেছেন। আমি ওরকম নই।

সেটা আমিও জানি। আপনি ওরকম নন।

আজ সকালেই তো বাজারে পাতিলেবু কিনতে গিয়ে একটু দরাদরি করছিলাম, লেবুওয়ালা এমন রক্ত-জল-করা চোখে চাইল যে আমি পালানোর পথ পাই না।

হ্যাঁ, আপনি ওরকমও বটে। খুব ভীতু, ঝঞ্ঝাটবিরোধী, এসকেপিস্ট।

তাহলেই বুঝুন, আপনি আমাকে ভুল অ্যাসেস করছেন কি না।

না, তাও করছি না। খুনের কিনারা করার দায়িত্ব আমাকে কেউ দেয়নি। যিশু দাস মোট বাইশটা খুন করেছে বলে পুলিশের হিসেব আছে। বেঁচে থাকলে সে হয়তো আরও বাইশটা খুন করত। সুতরাং তার লোপাট হওয়া নিয়ে পুলিশের তেমন মাথাব্যথাও নেই। তবে হাঁ, সে বেঁচে থাকলে পুলিশ তার কাছ থেকে কমিশন পেত। সেইটেই যা লস। কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট অন্য জায়গায়। সেটা আপনি।

কী যে বলেন স্যার, এ যে অবিশ্বাস্য! তবে বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। জীবনে

আমাকে কেউ এত ইম্পর্ট্যান্স দেয়নি।

তারা ভুল করেছে। আপনার ইম্পর্ট্যান্স এতটাই বেশি যে, আমি অনেক খোঁজখবর নিয়ে, আপনার ডেলি রুটিন চেক করে তবে এই পার্কে ঠিক আপনার পাশে এসে বসে আছি।

আমার ভারী গুমোর হচ্ছে স্যার, বুকটা ফুলে উঠছে অহংকারে।

আপনি যিশুকে মারার জন্য কি লোহার রড ব্যবহার করেছিলেন মনোবাবু?

আপনি যে কেন আমাকে বারবার ঠেলে খুনখারাপির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। তবে আমি স্বীকার করি লোহার রড একটি মারাত্মক জিনিস।

স্বীকার করেন?

হ্যাঁ, আমাদের কারখানায় একজন লেবারের বাঁ চোখের ভিতর দিয়ে একবার একটা রড ঢুকে গিয়েছিল তার মাথার মধ্যে, তক্ষুনি মারা যায়। ঘটনাটা ভাবলে এখনও শিউরে উঠি।

যিশুকে কি ওভাবেই মারা হয়েছিল মনোরঞ্জনবাবু? চোখের ভিতরে রড ঢুকিয়ে?

কী করে জানব স্যার? ওসব যে বীভৎস ব্যাপার।

আর তার ডেডবডিটা? সিমেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে, জল ছিটিয়ে হুইলব্যারোতে নিয়ে গিয়ে ডিচের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন?

মা গো! আপনি যে কীরকম সব ভয়ঙ্কর কথা বলেন! আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

বাঁচার জন্য মানুষ তো সব কিছু করতে পারে। তাই না?

তা অস্বীকার করছি না স্যার। তবে আমি বলতে চাই, আপনি ভুল লোককে সন্দেহ করছেন। আমি সে নই।

আমি তা স্বীকার করি। এই যে মনোরঞ্জন আমার পাশে এখন বসে আছে সে খুনি নয়, মারকুট্টা নয়, ভয়ংকর নয়। কিন্তু এই মনোরঞ্জনের মধ্যে আরও একজন মনোরঞ্জন সেই দিন জেগে উঠেছিল, তাকে আমিও চিনি না, আপনিও চেনেন না।

তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই স্যার।

জানি। কিন্তু সে যখন একবার জেগেছে তখন প্রয়োজন দেখা দিলেই সে কিন্তু আবার জাগবে।

সেটা তো ভয়ের ব্যাপার স্যার।

হ্যাঁ, আপনাকে সেই মনোরঞ্জন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতেই আমার আসা। পুলিশ আপনাকে ধরতে পারবে না, আপনার ফাঁসি বা জেলও হবে না, কিন্তু আমি তবু বলছি, আপনি বিপন্ন। ওই ভয়ঙ্কর মনোরঞ্জন কিন্তু আপনাকে সহজে রেহাই দেবে না।

চলে যাচ্ছেন স্যার?

হ্যাঁ।

যাবেন না স্যার, আর একটু বসুন।

কেন?

একা থাকতে থাকতে আমার বড় ভয় করছে স্যার। দয়া করে অন্তত আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যান।

কাকে ভয় পাচ্ছেন মনোরঞ্জনবাবু?

আজ্ঞে, মনোরঞ্জনকে।

দেশ, ২০০৩

Shahnaz

ওষুধ

উকিলবাবু এখনও আসেননি। মক্কেলরা বসে বসে মশা মারছে।

দুর্গাপদ খুবই ধৈর্যশীল লোক। সে জানে, বড় অফিসার, বড় ডাক্তার, বড় উকিল ধরলে ধৈর্য রাখতে হয়। যে যত বড় সে তত ঘোরাবে!

দুর্গাপদ রাস্তা পেরিয়ে উলটোদিকের পানের দোকানে গিয়ে লেমনেড চাইল। তেষ্টা পেয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ। উকিলবাবুর বাড়ির চাকরের কাছে জল চাইলে দিত নিশ্চয়ই, কিন্তু চাইতে কেমন ভয়-ভয় আর লজ্জা-লজ্জা করছিল তার।

দোকানদার বুড়ো মানুষ। তার দোকানটাও তেমনি কিছু বড় দোকান নয়। ছোট মোটো, গরিবগুর্বোর দোকান। বিড়ি চাও আছে, পিলা পাতি কালা পাতি চমন বাহার মোহিনী জর্দা দেওয়া পান পাবে, ক্যাপস্টান গোল্ড ফ্লেক চাও তাও মজুদ, কম দামি কোল্ড ড্রিংকস রাখতে হয় বলে তাও রাখা, কিন্তু বেশি বায়নাক্কা হলে অন্য দোকান দেখতে হবে।

বুড়ো তার লাল বাক্স খুলে বরফে রাখা বোতল অনেক বেছে বুছে একটা বের করে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—এরকম ঠাণ্ডা হলে চলবে?

অন্যমনস্ক দুর্গাপদ বলে—হুঁ।

লজেনচুসের গন্ধওলা ঠাণ্ডা, মিষ্টি ঝাঁঝালো জলটা খেতে গিয়ে বুকের জামা ভিজে গেল দুর্গাপদর। কাগজের নল দিয়ে টেনে সে এসব খেতে পারে না। চুরুক চুরুক খাওয়া তার পছন্দ নয়। ঘঁৎঘঁৎ করে না গিললে তৃপ্তিটা পায় না।

জলটা খেতে খেতে চেয়ে আছে উলটো দিকের বাড়িটার দিকে। না উকিলবাবু এখনও আসেননি।

কতকগুলো ব্যাপার আছে যা কেবল এই উকিল, ডাক্তার বা অফিসাররাই জানে, আর কেউ জানে না। মুশকিলটা সেখানেই। তার ওপর দুর্গাপদ কস্মিনকালে মামলা মোকদ্দমা বা কোর্টকাছারি করেনি। উকিলবাবু আগের দিনই সাফ বলে দিয়েছে—কেউ বিয়ে ভাঙতে চাইলে আটকানো কি যায়? কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখতে পারি বড় জোর। আর চাও তো, ভাল মাসোহারার

ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। সে এমন ব্যবস্থা যাতে বাছাধনকে দ্বিতীয় বার বিয়েয় বসতে খুব ভেবে-চিন্তে বসতে হবে।

কিন্তু দুর্গাপদ তার জামাইকে খুব একটা অপছন্দ করে না। লোকটা নরম সরম, ভদ্র, বিনয়ী, খরচে ধরনের। বরং তার মেয়ে লক্ষ্মীই ট্যাটন। বিয়ের আগে পাড়া জ্বালিয়েছে। বিয়ের পর বছর দুই যেতে না যেতে বাপের বাড়িতে এসে খাদিমা হয়ে বসেছে। জামাই নিতে আসেনি। জামাইয়ের বদলে দিন কুড়ি আগে জামাইয়ের পক্ষের এক উকিলের চিঠি এসেছে। জামাই ডিভোর্সের মামলা আনছে।

তার মেয়ে লক্ষ্মীর তাতে কোনও ভাব বৈলক্ষণ নেই। রেজিস্ট্রি করা খামটা খুলে চিঠিটা তেরছা নজরে পড়ে বারান্দায় ফেলে রেখে পা ছড়িয়ে উকুন বাছতে বসল সরু চিরুনি দিয়ে। বাতাসে উড়ে উড়ে ঘুড়ির মতো লাটি খেয়ে খেয়ে চিঠিটা করুণ মুখে এসে উঠোনে দুর্গাপদর পায়ের পাতায় লেগে রইল। দুর্গাপদ উঠোনে বসে একটা ভাঙা মিটসেফের ডালায় কব্জা লাগাচ্ছিল। ইংরেজিতে লেখা চিঠিটা বুঝতে একটু দেরি হল বটে, কিন্তু অবশেষে বুঝল এবং মাথাটা তখনই একটা পাক মারল জোর।

জামাইবাবাজি যে লোক খুব খারাপ নয় তা জানে বলেই দুর্গাপদ কটমট করে তাকাল মেয়ের দিকে। কিন্তু এসব তাকানো-টাকানোয় ইদানীং আর কাজ হয় না। কোনওদিন হতও না।

—বলি ব্যাপারটা কি শুনছিস? হুংকার দিল দুর্গাপদ।

সূক্ষ্ম চিরুনিতে উঠে আসা চুলের গোছা আলোয় তুলে উকুন খুঁজতে খুঁজতে নির্বিকার গলায় বলে—দেখলে তো, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?

দুর্গাপদ বুঝল পুরুষকারে কাজ হবে না। গলা নরম করে বলল—স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হয় সে তো দিন রাত্তিরের মতো সত্য। তা বলে উকিলের চিঠি কেন? তেমন কী হল তোদের?

লক্ষ্মীর মা ঘরেই ছিল। বরাবরের কুঁদুলী মেয়েছেলে। সেখান থেকেই গলা তুলে জিজ্ঞেস করল—কে উকিলের চিঠি দিল আবার?

—নবীন। হাল ছেড়ে দুর্গাপদ বলে।

—জামাই?

—তবে আর কে নবীন আছে?

লক্ষ্মীর মা কিছু মোটাসোটা। ফর্সা গোলগাল প্রতিমার মতো চেহারা। বড় বড় চোখে রক্ত হিম-করা দৃষ্টিতে চাইতে পারে। দুর্গাপদর প্রাণ এই চোখের সামনে ভারী ধড়ফড় করে ওঠে।

ইংরিজি জানে না, তবু উঠোনে নেমে এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর দুর্গাপদকে জিজ্ঞেস করল, ডিভোর্স করবে নাকি?

—তাই তো লিখেছে।

—করলেই হল? আইন নেই?

—ডিভোর্সের কথা তো আইনেই আছে।

—তোমার মাথা। ডিভোর্স হল বে-আইনি ব্যাপার। কেউ ডিভোর্স করেছে জানতে পারলে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। জেল হয়।

লক্ষ্মীর মা তার বাপের বাড়ি থেকে যা যা শিখে এসেছে তার ওপরে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু শেখাতে পারেনি। অনেক ঠেকে দুর্গাপদ আর সে চেষ্টা করে না। তবু বলল—জেল গাওগে না। কে আটকাচ্ছে পুলিশে যেতে।

Shahnaz

লক্ষ্মীর মা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল—আমি যাব পুলিশের কাছে? তবে তুমি পুরুষমানুষ আছ কী করতে?

এ নিয়ে যখন লক্ষ্মীর মার সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলছিল তখন লক্ষ্মী ম্যাটিনি শোয়ে যাবে বলে রান্নাঘরে গিয়ে পান্তা খেতে বসল।

লক্ষ্মীর মায়ের বাঁজা নাম ঘুচিয়ে ওই লক্ষ্মীই জন্মেছিল, আর ছেলেপুলে হয়নি। একমাত্র সন্তান বলে আশকারা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে দুর্গাপদর কাছে যতটা তার চেয়ে ঢের বেশি তার মায়ের কাছ থেকে। সারাদিন মায়ে মেয়ের গলাগলি ভাব, গুজগুজ ফুসফুস। দুটো মেয়েছেলে একজোট, অন্যধারে দুর্গাপদ একা পুরুষ। কীই বা করবে? চোখের সামনেই মেয়েটা বখে গেল।

লক্ষ্মী সিনেমায় বেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্মীর মা দুর্গাপদকে বলে—জামাই খারাপ নয়, কিন্তু ওর বাড়ির লোকেরা হাড়জ্বালানী। সব কটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে সদরে চালান দিয়ে আসবে। যাও। এ কী কথা! দেশে আইন নেই। কোর্ট কাছারি নেই? পুলিশ জেলখানা নেই? ডিভোর্স করলেই হল?

এসব ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে গিয়ে লাভ নেই তা দুর্গাপদ জানে। কিন্তু কোথায় যেতে হয় তা তারও মাথায় আসে না। সে তেমন লেখাপড়া জানে না, খুব ভদ্রসমাজের লোকও সে নয়। তবে ইলেকট্রিক মিস্তিরি হিসেবে গয়েশপুর থেকে কাঁচরাপাড়া অবধি তার ফলাও প্র্যাকটিস। বলতে কি উকিল, ডাক্তার, অফিসারদের মতোই তার গাহককেও ঘুরে ঘুরে আসতে হয়। বলতে নেই তার টাকা অঢেল। সে সাইকেলখানা নিয়ে ভরদুপুরে বেরিয়ে পড়ল।

বুদ্ধি দেওয়ার লোকের অভাব দুনয়ায় নেই। একজন দুঁদে উকিলের ঠিকানা মায় একটা হাতচিঠিও দিয়ে দিল। তাতে লাভ হল কিনা দুর্গাপদ জানে না। প্রথমদিন জামাইয়ের উকিলের দেওয়া চিঠিটা পড়ে দুঁদে উকিল মোট মিনিট দশেক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পঁচিশটা টাকা নিল। কিন্তু তবু কোনও ভরসা দিতে পারল না।

দুর্গাপদ আজও এসেছে। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ ঢিব ঢিব, মুখ শুকনো, গলা জুড়ে অষ্টপ্রহর এক তেষ্টা। মেয়েটা ঘাড়ে এসে পড়লে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। আর হারামজাদী শুধু যে ঘাড়ে এসে পড়বে তা তো নয়, ঘাড়ে বসে চুল ওপড়াবে। পাড়ায় ঢি ঢি ফেলে দেবে দু দিনেই। স্বভাব জানে তো দুর্গাপদ। গতকাল সে লক্ষ্মীকে খুব সোহাগ দেখিয়ে বলেছিল—মা গো, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বনিবনা করে থাকো গে যাও। আমি সঙ্গে যাব, বুঝিয়ে সুজিয়ে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে আসব। থাকতে যদি পারো তো মাসে তিন শো টাকা করে হাত-খরচ পাঠাব তোমায়।

শুনে লক্ষ্মীর কী হাসি! পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, এলো চুলে বসে ছিল। হাসির চোটে সেই চুলে মুখ বুক ঢাকা পড়ল। বলল—মাসোহারার লোভ দেখাচ্ছ? তুমি মরলে সর্বস্ব তো এমনিতেই আমি পাব।

মূর্তি দেখে দুর্গাপদ ভারী মুষড়ে পড়েছিল। লক্ষ্মীর মা বলল—পুরুষমানুষ বোকা হয় সে তো জানা কথা। কিন্তু তোমার মতো এমন হাঁদারাম আর মেনিমুখো তো জন্মেও দেখিনি। লক্ষ্মী শ্বশুরবাড়ি যাবে কেন, ওর সম্মান নেই? জামাইদের দেমাকের দিন শেষ হয়ে গেছে। তারা পায়ে ধরে নিতে এলেও যাবে না। এ বাড়িতে বাকি জীবন বসে বসে খাবে। মেয়ে কি ফ্যালনা?

উকিলবাবুর গাড়ি এসে থামল। তাড়াহুড়োয় দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিতে ভুলে গিয়ে রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল। পিছন থেকে "ও দাদা দাম দিয়ে গেলেন না" শুনে লজ্জা পেয়ে ফিরে

এসে দাম মেটাতে গেলে বুড়ো দোকানদার মোলায়েম গলায় বলল—উকিলবাবুর এখন দেরি হবে। হাত পা ধোবেন, জল-টল খাবেন, পাক্কা এক ঘণ্টা, রোজ দেখছি। আপনার নাম লেখানো আছে তো?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে বলল—জনা আষ্টেকের পর।

—তাহলে আরও দেড় ঘণ্টা ধরে নিন।

—বড় উকিল ধরে বড্ড মুশকিল হল দেখছি।

—আসানও হবে। উনি হারা মামলায় জিতিয়ে দেন। কত খুনিকে খালাস করেছেন।

দুর্গাপদ বলল—কিন্তু আমারটা কিছু হল না।

—আপনার মুশকিলটা কী?

—সে আছে অনেক ঝামেলার ব্যাপার। জামাই ডিভোর্স চাইছে।

—অ। বলে বুড়ো মুখে কুলুপ আঁটল।

দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে উকিলবাবুর বাইরের ঘরে আরও জনা ত্রিশেক লোকের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে থাকে। আড়াই ঘণ্টা বসতে হবে। ঘরটা বিড়ি আর সিগারেটে ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কা। শোনা গেল উকিলবাবু এখনও চেম্বারে আসেননি। জল খাচ্ছেন বোধহয়। গুটি গুটি আরও মক্কেল আসছে।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা। হাঁটু ব্যথা হল, মাথা ধরে গেল, হাই উঠতে লাগল ঘন ঘন। তারপর ডাক এল। ব্যস্ত বড় উকিলবাবু মক্কেলদের এক দুইবার দেখে মনে রাখতে পারেন না, তাই ফের পুরনো পরিচয় এবং বখেরার কথা বুঝিয়ে বলতে হল। সব বুঝে উকিলবাবু হাসি হাসি মুখ করে বললেন—ভাঙন রুখতে চাইছেন তো? কিন্তু কী দিয়ে রুখবেন? আজ হোক কাল হোক এ ভাঙবেই। আমরা ভাবের কথা বুঝি না, কেবল আইন বুঝি। কে কাকে ভালবাসে বা বাসে না, কার বিয়ে ভাঙা ভাল নয় বা কার ভাল এসব হল নীতির কথা, ভাবের কথা। আইন তার তোয়াক্কা করে না। বলেন তো লড়তে পারি। কিন্তু খামোকা।

ফের পঁচিশটা টাকা গুনে দিয়ে দুর্গাপদ উঠে পড়ল।

২

খেয়ে উঠে নবীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটির জলে আঁচাচ্ছিল। এমন সময় দেখল, উঠোনে জ্যোৎস্না পড়েছে। এই হেমন্তকালের জ্যোৎস্নার রকম সকমই আলাদা। একটু দুধের সরের মতো কুয়াশায় মাখামাখি চাঁদখানা ভারী আহ্লাদী চেহারা নিয়ে হাসছে। বাতাসে চোরা শীত। উঠোনে বসে থাকা ঘেয়ো কুকুরটা এঁটো খেতে খেতে ভ্যাক ভ্যাক করে ডেকে উঠল।

নবীন কাঁধের গামছায় মুখ মুছতে মুছতে শুনল মা তাকে ডেকে বলছে—ও নবীন, গায়ে একটা গেঞ্জি দে। এ সময়কার ঠাণ্ডা ভাল না।

আঁচাতে গিয়ে চারদিককার দৃশ্য দেখে জগৎ সংসার বেবাক ভুলে চেয়ে রইল নবীনচন্দ্র। ঘটিতে আঙুলের টোকা মেরে মৃদুস্বরে একটু গানও গেয়ে ফেলল সে—না মারো না মারো পিচকারি...

ঘেরা উঠোনের যে ধারটায় দেওয়ালের গায়ে দরজাটা রয়েছে তার পাশেই মায়ের আদরের দু দুটো মানকচুর ঝোপ আশকারা পেয়ে মানুষপ্রমাণ প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। এক একখানা পাতা জবল সাইজের কুলোকেও হার মানায়। কুকুরটা ভ্যাক ভ্যাক করে সেদিকেই বারবার ছুটে গিয়ে

Shahnaz

ফের লেজ নামিয়ে চলে আসছে। নবীনের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বোঝাবারও চেষ্টা করল ভ্যাক ভ্যাক করে।

নবীন গান থামিয়ে বলে—কে?

কচুপাতার আড়ালে কপাটের গায়ে লেগে থাকা ছায়ামূর্তি বলে উঠল—আমি হে নবীন। কথা ছিল। আঁচাচ্ছিলে বলে ডাকিনি, বিষম খেতে পারো তো।

অক্ষয় উকিলের হয়ে এসেছে। আজকাল বড় আলতুফালতু কথা বলে, মানে হয় না।

নবীন উঠোন পেরিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বাতি জ্বেলে বলে—আসুন।

বিবর্ণ একটা শাল জড়ানো বুড়োটে লোকটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ারে বসে ঠ্যাঙ তুলে ফেলল। বলল—ডিভোর্সের মামলা বড় সোজা নয় হে!

নবীন ভ্রূ কুঁচকে বলল—ও পক্ষ কোনও জবাব দিয়েছে?

—জবাব এত টপ করে দেবে? এত সোজা নাকি? যা সব আর্গুমেন্ট দিয়েছি তার জবাব ভেবে বের করে মুসাবিদা করতে দুঁদে উকিলের কাল ঘাম ছুটে যাবে। তবে এও ঠিক কথা ডিভোর্স জিনিসটা অত সহজ নয়।

নবীন গম্ভীর মুখে বলে—শক্তটাই বা কি? রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি ডিভোর্স হচ্ছে দেখছি।

—আরে না। সরকার ডিভোর্স জিনিসটা পছন্দ করে না। আইনের অনেক ফ্যাঁকড়া আছে। যা হোক সে নিয়ে আমি ভাবব, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। খরচাপাতি কিছু দেবে না কি আজ?

—খরচা আবার কি? নবীন অবাক হয়ে বলে—এখনও মোকদ্দমা শুরুই হয়নি।

—আছে, আছে। মোকদ্দমা শুরু হয়নি বলে কি আর উকিলের বসে থাকলে চলে? আইনের পাহাড় প্রমাণ বই ঘাঁটতে হচ্ছে না? এই যে মাঝে মাঝে এসে খবর দিচ্ছি এর জন্যও তো কিছু পাওনা হয় বাপু। মহেশ উকিলের সঙ্গে বাজার দর নিয়ে কথা বলতে গেলে পর্যন্ত ফিজ চায়।

নবীন বেজার হল। তবে বলল—ঠিক আছে, কাল সকালে কারখানায় যাওয়ার সময় দুটো টাকা দিয়ে আসবখন। মোকদ্দমাটা বুঝছেন কেমন?

অক্ষয় শালটা খুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলে, সোজা নয়। তোমার বউ বাগড়া দিতে পারে। তারও অনেক পয়েন্ট আছে। সবচেয়ে মুশকিল হল মাসোহারা নিয়ে।

নবীন খেঁকিয়ে উঠে বলে—মাসোহারাই যদি দেব তবে আর উকিলকে খাওয়াচ্ছি কেন?

সান্ত্বনা দিয়ে উকিল বলে—সেই নিয়েই তো ভাবছি। ওরা কী কী পয়েন্ট দেবে, আর আমাদেরই বা কী কী পয়েন্ট সে সব গুছিয়ে ভাবতে হচ্ছে। তোমার বউ যদি বলে যে শ্বশুরবাড়িতে তার ওপর খুব অত্যাচার হত?

অত্যাচার আবার কি? মা খুড়ি একটু ফিচফিচ করত, তা অমন সব মা খুড়িই করে। ভারী বেয়াড়া মেয়েছেলে, কাউকে গ্রাহ্য করত না। উলটে মুখ করত, বিনা পারমিশনে সিনেমায় যেত, যে সব বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঝগড়া সেই সব বাড়িতে গিয়ে আমাদের নিন্দে করে আসত।

—মারধর করা হয়নি তো?

—কস্মিনকালেও না। বরং ও-ই উলটে আমার হাত খিমচে দিয়েছিল। একবার কামড়েও দেয়। আমি দু একটা চটকান মেরেছি হয়তো। তাকে মারধর বলে না।

—চরিত্রদোষ ছিল কি? থাকলে একটু সুবিধে হয়। ডিভোর্সের বদলে অ্যানালমেন্ট পেয়ে যাবে, মাসোহারা দিতে হবে না।

—ছিল কি আর না? তবে সে সব খোঁজখবর আর কে নিয়েছে!

অক্ষয় উকিল উঠতে উঠতে বলে—কোন পয়েন্ট টিকবে কোনটা টিকবে না বলা শক্ত। ভাবতে হবে। তুমি বরং কাল চারটে টাকাই দিয়ে যেয়ো।

জ্বলন্ত চোখে নবীন চেয়েছিল। অক্ষয় উকিলের আসল রোজগার হল জামিন দেওয়া। সস্তা হয় বলে নবীন ধরেছে, কিন্তু এখন ভারী সন্দেহ হচ্ছে তার যে লোকটা এজলাসে দাঁড়িয়ে সব গুলিয়ে না ফেলে।

জ্যোৎস্নাটা আর তেমন ভাল বলে মনে হল না নবীনের। গলায় গানও এল না। নিজের বিবাহিত জীবনের ভুল-ভ্রান্তিগুলো মনে হয়ে খুব আফশোস হচ্ছে। ঢ্যামনা মেয়েছেলেটাকে সে চিরকালটা প্রশ্রয় দিয়েছে। উচিত ছিল ধরে আগাপাশতলা ধোলাই দেওয়া। তাহলে হাতের সুখের একটা স্মৃতি থাকত। এখন দাঁত কিড়মিড় করে মরা ছাড়া গতি নেই। আদালত তো বড় জোর বিয়ে ভেঙে দেবে, তার বেশি কিছু করবে না। আইনে মারধরের নিয়ম নেই, কিন্তু থাকা উচিত ছিল।

কাউকে কিছু না বলে লক্ষ্মী সটকে পড়েছিল। প্রথমে সবাই ধরে নিয়েছিল, অন্য কারও সঙ্গে ভেগেছে। পরে খবর এল, তা নয়। বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। তাতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করেছিল নবীন। মুখটা বাঁচল। কিন্তু সেই থেকে তার লোহা-পেটানো হাত পা নিশপিশ করে।

সকালে কারখানা যাওয়ার পথে অক্ষয় উকিলের চেম্বারে উঁকি দেয় নবীন। চেম্বারের অবস্থা শোচনীয়! ওপরে টিনের চালওলা পাকা ঘরের চুন বালি গত বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ঝুরঝুর করে সব ঝরে পড়ে যাচ্ছে। উকিলের নিজস্ব চেয়ারের গদি ফেড়ে গিয়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। তিন আলমারি বইতে উই লেগেছে, আলমারির গায়ে উইপোকার আঁকাবাঁকা মেটে সুড়ঙ্গ। বই অবশ্য নকল, মক্কেলদের শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য সাজিয়ে রাখা বেশির ভাগ বই-ই ভামি। ওপরে মলাট, ভিতরটা ফোঁপরা। মক্কেলহীন ঘরে বসে অক্ষয় উকিল গত কালের শালটা গায়ে দিয়ে নাতিকে অঙ্ক কষাচ্ছে। চারটে টাকা পেয়ে গম্ভীর মুখে বলল—এ মামলা তুমি জিতেই গেছ ধরে নাও।

নবীন নিশ্চিন্ত হল না।

৩

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে আসে। ওভারটাইম খেটে বেরোতে বেরোতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

কারখানা ছাড়িয়ে বাজারের পথে পা দিতেই মোড়ের মাথায় শুকনো মুখে তার শ্বশুর দুর্গাপদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু থমকাল নবীন। কথা বলা উচিত কিনা ভাবছে। লোকটা তেমন খারাপ নয়।

নবীনকে বলতে হল না, দুর্গাপদই শুকনো মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে এগিয়ে এল—সব ভাল তো?

নবীন বে-খেয়ালে প্রণাম করে ফেলে। বলে—মন্দ কী?

দুর্গাপদ শুকনো ঠোঁট জিভে চেটে বলে—এদিকে একটু বিষয় কাজে এসেছিলাম; ভাবলাম দেখা করে যাই।

Shahnaz

নবীন ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করে—ওদিকে সব ভাল?

দুর্গাপদ হতাশ মুখে বলে—ভাল আর কই? তুমি উকিলের চিঠি দিয়েছ। আমি অতশত ইংরিজি বুঝি না, তবে পড়ে মনে হল, ডিভোর্স-টিভোর্স কিছু একটা কথা আছে।

নবীন বিনীতভাবেই বলল—তাই লেখার কথা। ঠিকমত লিখেছে কি না কে জানে? আইনের ইংরিজির অনেক ঘোরপ্যাঁচ।

দুর্গাপদ বলে—শুধু ইংরিজি কি, উকিলের মুখের কথাও ভাল বোঝা যায় না। দু বারে কড়কড়ে পঞ্চাশটা টাকা দিলাম দুটো মুখের কথা শোনার জন্য। ডিভোর্স ঠেকানোর নাকি উপায় নেই, বলছে উকিল। আমরা তবু ঠেকাতেই চাই।

নবীন গম্ভীর হয়ে বলে—আমার উকিল বলছে ডিভোর্স পাওয়া নাকি খুব শক্ত। সরকার নাকি ডিভোর্স পছন্দ করে না।

—কারও কথাই বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে লক্ষ্মীর মা বলছে, ডিভোর্স নাকি বে-আইনি। পুলিশ খবর পেলে জেলে দেবে।

নবীন হাসল।

দুর্গাপদ করুণ নয়নে চেয়ে বলল—হাসছ বাবা? লক্ষ্মীর মা যে কী ভাবে আমার জীবনটা ঝাঁঝরা-করে দিল তা যদি জানতে।

লোহা-পেটানো শরীরটা গরম হয়ে গেল নবীনের মেনিমুখো শ্বশুরের কথা শুনে। ঝাঁকি দিয়ে বলল—স্ট্রং হতে পারেন না? মেয়েছেলেকে দরকার হলে চুলের মুঠি ধরে কিলোতে হয়।

এ কথায় দুর্গাপদও গরম হয়ে বলল—বেশি বলো না বাবাজীবন! তুমি নিজে পেরেছ? পারলে উকিলের শামলার তলায় গিয়ে ঢুকতে না!

এ কথায় নবীন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

৪

সিনেমা থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মীর খুব উদাস লাগছিল। দুনিয়ায় সে কাউকে গ্রাহ্য করে না, শুধু এই উদাস ভাবটাকে করে। এই যে কিছু ভাল লাগে না উদাস লাগে, এই যে দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে ভারী আলাদা মনে হয়, এই যে সিনেমা দেখেও মন ভাল হতে চায় না—এই তার রোগ। ভিতরে নাড়াচাড়া নেই, নিথর, ভ্যাতভ্যাতে পান্তার মতো জল-ঢ্যাপসা একটা মন নেতিয়ে পড়ে আছে।

সিনেমা-হলের বাইরে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে চেয়ে থাকে লক্ষ্মী। কোথায় যাবে তা যেন মনে পড়তে চায় না।

লক্ষ্মী একটা রিকশা নিল। স্টেশনে এসে উদাসভাবেই নৈহাটির ট্রেনে উঠে বসল। নিজের কোনও কাজের জন্য কখনও কাউকে সে কৈফিয়ত দেয় না।

উঠোনে ঢুকতেই নেড়ি কুকুরটা ভ্যাক ভ্যাক করে তেড়ে এসে লেজ নেড়ে কুঁইকুঁই করে গা শোঁকে। কচুপাতা একটু গলা বাড়িয়ে গায়ে একটা ঝাপটা দেয়।

প্রথমটা কেউ টের পায়নি। কয়েক মুহূর্ত পরেই সারা বাড়িতে একটা চাপা শোরগোল পড়ে গেল।

লক্ষই করল না লক্ষ্মী। উদাস পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে উঠল। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রাস্তার ধকলটা সামলাতে বড় বড় শ্বাস টানতে লাগল।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে! লক্ষ্মীর হয়তো একটু ঘুমই পেয়ে থাকবে। হঠাৎ ঘরে একটা

বোমা ফাটল দড়াম করে। কানের কাছে একটা বিকট গলা বলে উঠল—উকিলের শামলার তলায় ঢুকেছি? কেন আমার হাত নেই?

বলতে না-বলতেই চুলের গোছায় ভীষণ এক হাঁচকা টানে লক্ষ্মী খাড়া হয়ে স্তম্ভিত শরীরে দাঁড়িয়ে রইল। গালে ঠাস করে একটা চড় পড়ল দু-নম্বর বোমার মতো। মেঝেয় পড়তে না-পড়তেই নড়া ধরে কে যেন ফের দাঁড় করায়।

বিকট গলাটা বলে ওঠে—কার পরোয়া করি? কোন উকিলের ইয়েতে তেল মাখাতে যাবে এই শর্মা? এই তো আইন আমার হাতে? বলি, পেরেছে দুর্গাপদ দাস?

বলতে না-বলতেই আর একটা তত জোরে নয় থাপ্পড় পড়ল গালে!

লক্ষ্মীর গালে হাত। ছেলেবেলা থেকে এত বড়টি হল কেউ মারেনি তাকে। এই প্রথম, কিন্তু কী আশ্চর্য দেখ! মনের ম্যাদামারা ভাবটা কেমন কেটে যাচ্ছে। টগবগ করছে রক্ত। আর তো মনে হচ্ছে না পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নেই মানে? ভীষণভাবে সম্পর্ক আছে। ভয়ঙ্কর নিবিড় সম্পর্ক যে।

মেঝেয় বসে লক্ষ্মী কাঁদতে লাগল হাঁটুতে মুখ গুঁজে। কিন্তু সে কাঁদতে হয় বলে কাঁদা। মনে মনে কী যে আনন্দে ভেসে যাচ্ছে সে!

দরজার একটু তফাত থেকে উঁকি মেরে দৃশ্যটা দেখে দুর্গাপদ হাঁ। বজ্জাত মেয়ে বটে! এত নাকাল করিয়ে নিজে এসেছে।

একমাত্র সন্তান মার খাচ্ছে বলে একটু কষ্টও হল দুর্গাপদর। কিন্তু লোভীর মতো জুলজুলে চোখে সে দেখলও দৃশ্যটা। ঠিক এরকমই দরকার ছিল লক্ষ্মীর মায়ের। দুর্গাপদ পেরে ওঠেনি। কিন্তু বহুদিনকার সেই পাকা ফোড়ার যন্ত্রণার মতো ব্যথাটা আজ যেন ফেটে গিয়ে টনটনানি কমে গেল অনেক।

পরিশ্রান্ত নবীন ঘরে শিকল তুলে বেরিয়ে এলে পর দুর্গাপদ গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে হাসি হাসি মুখে বলল—এই না হলে পুরুষ।

রাত্রিবেলা লক্ষ্মী নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল বাপকে। মার খেয়ে মুখ-চোখ কিছু ফুলেছে। কিন্তু সেটা নয়, দুর্গাপদ লক্ষ করল লক্ষ্মীর চোখ দুখানায় আর সেই পাগুলে চাউনি নেই। বেশ জমজম করছে মুখ-চোখ।

লক্ষ্মী বলল—বাবা, রাতটা থেকে যাও না কেন?

নবীন সায় দিল—রাত হয়েছে, যাওয়ার দরকারটা কি?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে ম্লান মুখে বলে—ও বাবা, তোর মা কুরুক্ষেত্র করবে তা হলে। চিনিস তো!

দুর্গাপদ জানে সকলের দ্বারা সব হয় না। নিয়তি কেন বাধ্যতে।

Shahnaz

কৈখালির হাটে

নামখানা জম্পেশ। বজ্রবাহু মণ্ডল। এই নাম শুনে প্রাইমারির মাস্টারমশাই হরিপদ গড়াই বলেছিল, তোর নামখানাই তো ভূমিকম্প রে! কিন্তু নাম ধুয়ে তো জল খাবি না বাবা, একটু লেখাপড়ায় মন দে।

তা দিয়েছিল বেজা। বজ্রবাহু বলে আর কে ডাকছে তাকে। বেজা নামই সকলের মুখে। তা বেজা লেখাপড়ায় তেমন বোবাকালাও ছিল না। প্রাইমারি ডিঙিয়ে হাই, তারপর হাইও ডিঙিয়ে গিয়েছিল। সেকেন্ড ডিভিশন। তা তা-ই বা কম কী? কিন্তু এইখানে তার লেখাপড়ার গাড়ি সেই যে থেমে গেল, আর নড়ল না। বাপ অজাগর মণ্ডল সাপকাটিতে মারা যাওয়ার পর বজ্রবাহুর মাথায় বজ্রাঘাত। সংসারের হাল না ধরলে শুকিয়ে মরতে হবে। বিধবা মা, আরও তিনটে ভাইবোন, বাপের ধারদেনা—সব মিলিয়ে বিশ বছরের বেজা হিমসিম। অজা মণ্ডলের তিন বিঘে জমি ছিল পার্টির দয়ায়। তার পাট্টা ছিল না বটে। অজা মণ্ডল মরার পর জমি নিয়ে বখেরা লেগে গেল। জয়েশ ততুণ্ড লিডার মানুষ। সে বলল, ও জমি তো আমার, অজা ভাগে চাষ করত। জয়েশের ওপর কথা কইবে কে? সুতরাং জমি একরকম ভোগে চলে গেল।

বেজার যখন পাগল হওয়ার জোগাড় সেই সময়ে স্বর্গ থেকে দেবদূতের মতো নেমে এল নব হালদার। সেও লিডার মানুষ। জমিজমা, গরুবাছুর, পাকা বাড়ি নিয়ে ফলাও অবস্থা। তাকে ডেকে বলল, শোনো বাপু, তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে, বুদ্ধি-বিবেচনাও আছে মনে হয়। যদি আমার প্রস্তাব মেনে নাও তাহলে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বেজা তখন সবাইকেই খুশি করতে মুখিয়ে রয়েছে, এতগুলো উপোসী মানুষকে রক্ষা না করলেই হয়। বলল, যে আজ্ঞে।

আমার মেয়ে মালতীকে তো দেখেছ বাপু। তাকে যদি বিয়ে করো তাহলে তোমার পাশে আমি আছি।

বেজা পক করে খানিক হাওয়া গিলে ফেলল। হাওয়ার ডেলাটা পেটে নামল না, গলাতেই বেলুনের মতো আটকে রইল। যাকে ঘাঁটাপড়া মেয়েছেলে বলে মালতী হল তাই। বয়সে না হোক

বেজার চেয়ে তিন চার বছরের বড়। একবার বিয়েও হয়েছিল বিষ্টুপুরের নগেনের সঙ্গে। বছর না ঘুরতেই ফেরত এসেছে। তারপর থেকে মালতী আর বিয়েতে বসেনি বটে, কিন্তু পুরুষ-সঙ্গে তার খামতি নেই। সারা গাঁয়ে তাকে নিয়ে ঢি ঢি। নব হালদার মেয়েকে সামাল দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে না। মালতী তার বাপকে কুকুর বেড়াল বলে মনে করে।

সেই মালতী হালদারকে বেজা বিয়ে করবে কি? সে গলায় বাতাসের বেলুনটা গিলে ফেলার চেষ্টা করল অনেকবার। হল না।

নব হালদার বলল, জমি ফেরত পাবে। তিন বিঘের জায়গায় পাঁচ বিঘে। আর একখানা তিন চাকার ম্যাটাডোরও দেব। ভাল করে দেবে দেখ।

পেটের দায় বড় দায়। তবু রাজি হতে সময় নিচ্ছিল বেজা। কারণ ইদানীং শোনা যাচ্ছে মালতী নরেশ লস্করের সঙ্গে নটখট করে বেড়াচ্ছে। আর নরেশ হল হলদিঘাটের খুনে গুণ্ডা। ডাকাতির মামলাতেও তার নাম আছে!

নব হালদারের মুখের দিকে চেয়ে বেজার মনে হল, লোকটা বড় নাচার। মালতীকে কারও ঘাড়ে না গছালে তার চলছে না।

বেজা বলল, যে আজ্ঞে।

নব একটু হাসল। বলল, তবে বাপু, বুঝতেই পারছ, মালতী আদরে মানুষ, তোমাদের ওই ভাঙা ঘরে তো আর থাকতে পারবে না। তুমিই দিব্যি এসে থাকবে আমার বাড়িতে। আলাদা ঘরটর আছে। খরচাপাতিও ধরো আমারই।

বেজা মাথা নিচু করে রইল। ঘর-জামাই হতে তার আর আপত্তি কীসের?

এই ঘটনার দু'দিন বাদে কৈখালির হাটে যাচ্ছিল বেজা। কুমোরপাড়ার মোড়ে মালতীর মুখোমুখি পড়ে গেল।

খুব রসের হাসি হেসে মালতী বিষবিছুটি মাখা গলায় বলল, এই যে নাগর, শুনলুম নাকি আমার সঙ্গে মালাবদল করার জন্য হাঁ করে আছ!

বেজা তটস্থ হয়ে বলল, ইয়ে-মানে আপনার আপত্তি থাকলে—

আহা, আমার আবার আপত্তি কী গো! আমি তো বরণডালা সাজিয়ে বসেই আছি। বলি ভালমানুষের পো, মধু আর হুল দুটোই সইবে তো!

তারপর সে কী গা-জ্বালানো হাসি!

ভাবী বউয়ের রকমসকম দেখে বড্ড দমে গিয়েছিল বজ্রবাহু। তার নামটাই যা শক্তসমর্থ, সে অতি দুর্বল মানুষ।

তা মালতী যে চোখেই দেখুক তাকে, বিয়েটা কিন্তু হয়ে গেল। ঘটা পটা তেমন কিছু নয়, তবে হ্যাজাক জ্বেলে, মন্ত্রপাঠ করে, দু-পাঁচ জনকে ভোজ খাইয়ে একরকম হল ব্যাপারটা। কিন্তু যখন একা ঘরে মালতীর মুখোমুখি হতে হল তাকে তখন যে বুকের ধুকপুকুনিটা শুরু হল তার সেটা অদ্যাবধি থামেনি।

বিয়ের রাতে মালাটালা পরে ঘরে ঢুকতেই প্রেতিনীর মতো সে কী খলখল করে হাসি মালতীর! যেন সং দেখাচ্ছে। বলল, বাঃ, বর তো দিব্যি সেজেছে দেখছি! তা এবার কী হবে গো! রসের খেলা নাকি? এস এস নাগর, দেখি তুমি কেমন পুরুষ!

নিজেকে এমন নপুংসক কখনও মনে হয়নি বেজার। তখন তার ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। মালতী সম্বন্ধে শোনা ছিল তার। লোকে তাকে খারাপই বলে। কিন্তু বিয়ের রাতে যে

Shahnaz

অবস্থা করে তাকে ছাড়ল মালতী তাতে বেজার চোখ ভরে জল এসেছিল। মালতী শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না। আর শরীর দিয়ে তাকে খুশি করার মতো মনের অবস্থাও ছিল না তার সেদিন। অপমানে, লজ্জায়, নিজেকে হীন ভেবে ভেবে ছোট হয়ে গিয়ে সেদিন সে একটা জরদগব। মালতী শেষমেষ একখানা লাথিও মেরেছিল তাকে। সঙ্গে অশ্রাব্য গালাগাল।

সেই রাতে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়েছিল তার।

কেন যে তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল নব হালদার তা সে খুব ভেবে দেখেছে। বেশি ভাবতে হয়নি অবশ্য। পরদিনই মালতীর বউদি মঙ্গলা তাকে আড়ালে ডেকে বলেছে, মেয়ের বদনাম ঘোচাতে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে আমার শ্বশুর। তুমি হলে শিখণ্ডী। সেইরকমই থাক। নইলে কপালে কষ্ট আছে।

মালতীর সঙ্গে এক ঘরে ওই একটা রাতই কেটেছে বজ্রবাহুর। পরদিন থেকেই সে পাশের খুপরিতে চালান হয়ে গেল।

বিয়ে যা-ই হোক, নব হালদার তাকে কথামত জমি আর তিন চাকার ম্যাটাডোরখানা দিয়েছিল বটে।

সেই ম্যাটাডোরখানা চালিয়েই আজ কৈখালির হাটে এসেছে বেজা। গঙ্গারামের মাল বয়ে এসেছে গঞ্জ থেকে। হাট ভাঙলে ফের ফেরত নিয়ে যাবে। এই করে তার রোজগার কিছু কম হয় না। ছোট ভাই বিশালবাহু চাষবাস দেখে। পরিবারটা বেঁচে গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় মালতী এখনও তার বউ। ঠিক বটে মালতীর সঙ্গে আজকাল তার একরকম দেখাই হয় না। তবু বিয়েটা টিকে আছে। মালতী বিয়ের দু-বছর বাদে এখন নতুন পুরুষ ধরেছে। খয়রাপোতার মহাজন বীরেশ মহান্তকে। বীরেশ ফূর্তিবাজ লোক, টাকা ওড়াতে ভালবাসে। মালতীকে তার পছন্দও খুব। বেজা এসব দেখেও দেখে না। পাশের ঘরে যা হওয়ায় হয়। বেজা তার খুপরিতে শুয়ে ঘুমোয়।

বেজা জানে, তাকে আজকাল কেউ মানুষ বলে মনে করে না। পুরুষ হয়েও বউকে সামলাতে পারেনি বলে তার বিস্তর বদনাম। কিন্তু বেজা ভাবে, লোকে যাই বলুক তার কর্তব্য সে করেছে। পরিবারটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কৈখালির হাট মানে এক বিচিত্র জায়গা। দোকান-পসার, বিকি কিনির এমন রমরমা হাট এ তল্লাটে নেই। অন্তত দশ-বারো খানা গাঁয়ের লোক এসে হাটে ভিড় করে।

বজ্রবাহু ম্যাটাডোর এক চেনা দোকানির হেফাজতে রেখে হাট দেখতে বেরল। কেনাকাটাও কিছু আছে। ছোট বোন সিতির জন্য একটা হাত-আয়না, মায়ের জন্য মালিশের ওষুধ, একখানা ভাল কাটারি এইসব টুকিটাকি।

২

জিপগাড়িটা থামিয়ে পেচ্ছাব করতে নেমেছিল বীরেশ মহান্ত। বাঁশবনের ধারে নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক কর্মটা সারতে সারতে তার মনে হচ্ছিল, পেচ্ছাবের সেই তেজটা যেন আর নেই। আগে যেমন মাটি খুঁড়ে ফেলত, সেরকমটা আর হয় না আজকাল। শরীরের সেই তেজবীর্য ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে হয়তো। কমারই কথা।

প্যান্টের জিপারটা টেনে জিপগাড়ির দিকে ফিরে আসছিল সে। জিপে মালতী বসা। ছেনাল মেয়েছেলেটা এই দুপুরে কেমন সেজেছে দেখ। জরির কাজ করা ঝলমলে লাল টকটকে শাড়ি,

হাতায় কাজ করা ব্লাউজ, মুখে গুচ্ছের স্নো-পাউডার, কপালে মস্ত টিপ, ঠোঁটে রাঙা লিপস্টিক। একেবারে সং। তার ওপর মুখে একখানা ন্যাকা ন্যাকা খুকি-খুকি ভাব। আজকাল আর কেন যেন মেয়েছেলেটাকে পছন্দ হচ্ছে না তার।

জিপ গাড়িটার দিকে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়ায় বীরেশ, পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়, একটু ভাবে।

কী গো! তোমার হল?

বীরেশ জবাব দিল না।

দেরি হচ্ছে কেন? হাটে যেতে সন্ধে হয়ে যাবে যে!

বীরেশ সিগারেট খেতে খেতে ধীরে ধীরে একটা সিদ্ধান্তে আসতে লাগল। নাঃ, এবার এই মেয়েছেলেটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। অনেক হয়েছে, আর নয়। এর একটা নামকোবাস্তে স্বামী আছে। মেনিমুখোটা পাশের ঘরে শুয়ে ঘুমোয়। মেনিমুখো হলেও লোকটাকে কখনও খারাপ লাগেনি বীরেশের। সরল, সোজা ছেলে। নাটকে একটা পার্ট করতে হবে বলে করে যাচ্ছে। পেটের দায় বলেও তো কথা আছে।

কই গো! জবাব দিচ্ছ না কেন?

মালতী জিপগাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল।

বীরেশ হাসল, বলল আসছি।

দেরি করছ কেন বল তো!

এই একটু হাত পায়ের আড় ভাঙছি।

একা সিগারেট খাচ্ছ? আমাকেও একটা দাও। বড্ড ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে বীরেশ ওকে সিগারেট দিল। মেয়েছেলের সিগারেট খাওয়া কেন যেন পছন্দ হয় না বীরেশের।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল বীরেশ।

তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো! কেমন যেন আলগা আলগা ভাব! কী হয়েছে বলবে তো!

কিছু নয়, রোজ কি আর একরকম থাকা যায়?

বলি, আমি পুরনো হয়ে যাইনি তো!

তা একা তুমি কেন? আমিও তো পুরনো হচ্ছি।

জিপের পিছনে কয়েক পেটি মাল আছে। বীরেশের দিশি মদের ব্যবসা। কৈখালির হাটে মদের ব্যাপারীরা তার্থের কাকের মতো চেয়ে বসে আছে। গিয়ে পড়লে পেটি নামাতেও হবে না, লহমায় বিক্রি হয়ে যাবে জিপগাড়ি থেকেই।

বীরেশ গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক কষল।

মালতী বলল, কী হল থামলে কেন?

মদের গন্ধ পাচ্ছি যেন! বোতল ভাঙল নাকি?

মালতী হাসল, না গো, তোমার ফ্লাস্ক থেকে আমি একটু হুইস্কি ঢেলে খেয়েছি।

কখন?

যখন তুমি নেমে গিয়েছিলে তখন।

কেমন যেন এ ব্যাপারটাও পছন্দ হল না বীরেশের, যখন মানুষটার প্রতি অপছন্দের ভাব

Shahnaz

হয় তখন সেটা ধীরে ধীরে বাড়ে। তখন তার সব কিছুই অপছন্দ হতে থাকে। বীরেশের সিটের ধারের খাঁজে বেটে মোটা বড়সড় স্টিলের ফ্লাস্কটা রাখা। তাতে বরফ মেশানো দামি হুইস্কি। বীরেশ দিনের বেলা খায় না সূর্য ডুবলে তবে ওইসব।

গম্ভীর হয়ে আছ কেন বলো তো!

না, গম্ভীর হব কেন? ঠিকই আছি।

না, তুমি ঠিক নেই। বলো না গো কী হয়েছে।

এই শুরু হল ন্যাকামি। এটাই সবচেয়ে অসহ্য।

হঠাৎ বীরেশ বলল, আচ্ছা, গায়ে অমন বিটকেল গন্ধ মাখো কেন বলো তো! মাথা ধরে যায়।

ও মাগো, বিটকেল গন্ধ কী? এই সেন্ট যে নিউ মার্কেট থেকে কিনে এনেছিলে তুমি।

আমি?

ও মা, মনে নেই?

তা হবে। গন্ধটা ভাল লাগছে না তো!

ঠিক আছে এটা না হয় মাখব না।

কৈখালির রাস্তা জঘন্য। মাঝে মাঝেই রাস্তার ছাল চামড়া উঠে গিয়ে কোপানো ক্ষেতের মতো অবস্থা, বড় বড় গর্ত, তার ওপর ধুলো তো আছেই। ঝপাং ঝপাং করে জিপ লাফাচ্ছে। তিন চারখানা গো-গাড়ি সামনে রাস্তা আটকে চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। জিপ এগোতে পারছে না। ভারী বিরক্তিকর অবস্থা। ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে বটে, কিন্তু সরু রাস্তায় গো-গাড়িই বা সাইড দেবে কী করে?

দুটো হাঁচি দিল মালতী। তারপর রুমালে নাক মুখ চাপা দিয়ে বলল, এই রে! আমার আবার নাকে ধুলো গেলেই সর্দি হয়।

বীরেশ গো-গাড়িগুলোকে পাশ কাটানোর ফিকির খুঁজছে, সুবিধেমত জায়গা পেলে রাস্তা থেকে ওভারটেক করে ফের রাস্তায় উঠবে। কিন্তু সেরকম সুবিধে পাচ্ছে না। ডানধারে ঝোপঝাড়, বাঁশ বন, গভীর নাবাল কিংবা পুকুর বা ক্ষেত।

ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে বীরেশ।

ওঃ, অত হর্ন দিয়ো না তো! মাথা ধরে গেল।

হর্ন না দিলে হবে কেন? দেখছ না সাইড দিচ্ছে না।

তবু হর্ন বন্ধ করো।

বীরেশ অবশ্য কথাটাকে পাত্তা দিল না। হর্ন বাজাতে লাগল।

মালতী ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে বলল, একটু খাচ্ছি।

বীরেশ বিরক্ত হল, কিছু বলল না।

মালতী ফ্লাস্কের ঢাকনায় হুইস্কি ঢেলে খেতে লাগল।

জিপটার বাঁহাতি স্টিয়ারিং বলে রাস্তাটা ভাল দেখতে পাচ্ছে না বীরেশ। সামনে একটা তুমুল ধুলোর পাহাড় উঠছে দেখে বুঝে নিল, উলটোদিক থেকে গাড়ি আসছে। গো-গাড়িগুলো জড়োসড়ো হয়ে থেমে পড়েছে। সুতরাং তাকেও থামতে হল।

নেচে নেচে, কেতরে, বহু কসরত করে খানিক রাস্তায় চাকা নামিয়ে একটা ট্রেকার উলটোদিক থেকে এসে পার হয়ে গেল তাদের। ঝাণ্ডা লাগানো পার্টির গাড়ি।

ওই তো, ওরা তো সাইড পেয়ে গেল।

উলটো দিকের গাড়ি যে সুবিধেটা পায় সেটা যে সে পাবে না তা আর মালতীকে বোঝাবার চেষ্টা করল না বীরেশ। তবে সে একটা হিসেবনিকেষ করে নিয়ে জিপটা ছাড়ল। ডানদিকে চাকারাস্তার বাইরে খানিকটা নামানো যাবে। ছোট ছোট ঝোপ আছে বটে, তাতে আটকাবে না।

অ্যাকসেলেটর চেপে হর্ন দিতে দিতে জিপটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং শক্ত হাতেই ধরে ডান বাঁয়ে মোচড় দিচ্ছিল বীরেশ।

কিন্তু কপাল খারাপ। বাঁয়ের সামনের চাকাটা বোধহয় একটা পাথরে লেগে গাড়িটা টাল খেয়ে ডান ধারে একটা লাফ মেরে উঠে ডান কাতে পড়ে গেল।

প্রথম ধাক্কাতেই গাড়ি থেকে ছটকে গিয়েছিল বীরেশ। পড়ে চোখে অন্ধকার দেখল। আর কিছু মনে নেই।

গো-গাড়ির গাড়োয়ানরাই নেমে এসে ধরে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল তাকে। বাকিরা গিয়ে জিপের তলায় চাপা পড়া মালতীকে যখন বের করে আনল তখন তার শরীর নিথর হয়ে গেছে। হয়তো বেঁচেও যেত মালতী, যদি না মদের বোতলের ভারী পেটিগুলো তার বুক আর মুখের ওপর আছড়ে পড়ত।

৩

রাহুটা যে বড্ড প্রবল হে তোমার মেয়ের!

তাতে কী হয়!

ওঃ সে অনেক ফেরে পড়তে হয়।

বেঁচেবর্তে থাকবে তো!

তা থাকবে, শনিটাও যেন কামড়ে আছে।

তাতেই বা কী হয়! ভেঙে বলবে তো!

দাঁড়াও, ভাল করে দেখি। এ মেয়ে তো ভাল করে দেখতেই দিচ্ছে না হাত, বারবার টেনে নিচ্ছে।

শক্তিপদ একটা ধমক দিল মেয়েকে, অমন করছিস কেন?

বকুল খিলখিল করে হেসে বলে, সুড়সুড়ি লাগছে যে!

শক্তিপদ বিরক্ত হয়ে বলে, এ মেয়েকে নিয়েই হয়েছে আমার মুশকিল, বড্ড অশৈরণ। ক্ষণে ক্ষণে হাসি পায়। ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা লাগে, সুড়সুড়ি লাগে, ভয় লাগে।

জ্যোতিষী হরুঠাকুর গম্ভীরভাবে শক্তিপদর দিকে চেয়ে বলে, একটাই নাকি?

মেয়ে এই একটাই। ছেলে আছে তিনটে, তা তাদের নিয়ে ভাবি না। এইটে হয়ে অবধি আমিও যেন বাঁধা পড়ে গেছি। মেয়ের বড্ড মায়া তো।

বয়স কত হল মেয়ের?

এই তো ষোলো পোরে আর কি। বিয়ের যোগটা একটু দেখ তো হরুঠাকুর।

দেখছি বাপু, দেখছি। দেখি মা হাতটা বেশ চ্যাটালো করে মেলে ধরো তো।

বকুল হেসেই অস্থির।

তা লেগে যাবে খন বিয়ে।

কবে লাগবে?

Shahnaz

শিগগিরই।

তোমাদের জ্যোতিষীদের মুশকিল কি জানো? সব আন্দাজে ঢিল। লেগে যাবে সে তো আমিও জানি। কিন্তু কবে লাগবে, পাত্তর কেমন হবে, সুখে ঘর-সংসার করবে কিনা সব বিস্তারিত না বললে হয়?

কেতুটা একটু ভেতরে যাচ্ছে বটে, তবে—

বকুল হাতটা এবার সুট করে টেনে নিয়ে বলে, ও বাবা, আমার হাত ব্যথা করে না বুঝি!

শক্তিপদ গলে গেল। মেয়ে হল তার প্রাণ। পাঁচ সিকে পয়সা ফেলে বলল, ওতেই হবে। কপালে যা আছে খণ্ডাবে কে?

হরু ঠাকুর বলে, আরে বাপু, গ্রহবৈগুণ্য যাই থাক মা মঙ্গলচণ্ডীর কবচটা নিয়ে গিয়ে ধারণ করাও। দামও বেশি নয়। কাজ হয়ে যাবে।

আচ্ছা, সে হবে খন। মেয়ে এখন নেপাল ঘোষের চপ খাওয়ার জন্য অস্থির। আসি হে ঠাকুর।

কৈখালির হাটে এসে যে নেপাল ঘোষের চপ না খেয়েছে সে আহাম্মক। তিন রকমের চপ করে নেপাল। আলুর চপ, মোচার চপ, আর ভেজিটেবল চপ। তিনটেই ঝুড়ি ঝুড়ি উড়ে যায়। দোকানের সামনে লম্বা লাইন।

জ্যোতিষীর কাছ থেকে উঠে এসে বকুল বলল, উঃ হাতটা একেবারে ব্যথা হয়ে গেছে। তুমি যেন কী বাবা!

শক্তিপদ কাচুমাচু হয়ে বলে, তোর নাকি শনির দৃষ্টি আছে। সেই জন্যই আসা। তবে হরু ঠাকুর শনির কথাটা কিছু বলল না তো!

আমি তো ভালই আছি। তুমি অত ভাবো কেন?

মেয়ের বড় মায়া। শক্তিপদ ঘরবাঁধা লোক ছিল না তেমন। কাজ কারবার নিয়ে ব্যস্ত মানুষ। চৌপর দিন তার মাথায় নানা বিকিকিনির চিন্তা। তিনটে ছেলে হয়েও তার স্বভাব ঘরমুখো হয়নি কখনও। কিন্তু তিন ছেলের পর মেয়েটা হতেই সে কাত। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তার বুকখানা যেন জলে ভরে উঠল। মা লক্ষ্মীরই কেউ হবে। মেয়ে হয়ে ইস্তক তার কাজ কারবারও ফেঁপে ফুলে উঠল। তিনটের জায়গায় সাতখানা ট্রাক হল, দু'খানা বাস, তিনটে ট্রেকার, টাকায় টাকায় ভাসাভাসি কাণ্ড।

চুড়ি কিনি বাবা? ওই তো পিন্টুর দোকান।

এক গাল হেসে শক্তিপদ বলে, কিনবি? তা কেন।

কাচের চুড়ি কস্মের জিনিস নয়। কয়েকদিন বেশ ঝলমল করে তারপর পট পট করে ভাঙলে। আগে কাচের চুড়ি দু চোখ দেখতে পারত না শক্তিপদ। কিন্তু মেয়ে চাইলে ব্রহ্মাণ্ড দিতেও রাজি।

দু'হাত ভরে চুড়ি পরে বাপকে দেখায় বকুল, কেমন দেখাচ্ছে বাপ?

খুব ভাল মা। তবে তুই তো দস্যি মেয়ে, চুড়ি ভেঙে যেন হাত রক্তারক্তি করিস না।

পাঁচটা টাকা পিন্টুর কোলে ফেলে মেয়ে আগলে এগোয় শক্তিপদ। তা এগোয় সাধ্যি কি। দু'পা এগিয়েই মেয়ের বায়না, পুঁতির মালাগুলো কী সুন্দর না বাবা?

হ্যাঁ, তা ভালই।

না তেমন দামি জিনিসটিনিস নয়, এইসব ছোটখাটো জিনিসেরই বায়না বটে মেয়ের।

ও বাবা, ওই দেখ নেপালের দোকানে লাইন।

লাইন দেখে শক্তিপদর চোখ কপালে।

ও বাবা, এ যে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে।

আমার যে খিদে পেয়েছে বাবা!

তাহলে চল বিশ্বনাথের দোকানে একটু মিষ্টি খেয়ে নে।

এ বাবা, মিষ্টি আমি খাই নাকি? চপই খাব।

দাঁড়া দেখি, লাইনে চেনা মানুষ পাই কিনা।

কৈখালির হাটে চেনা মানুষের অভাব নেই তার। সে তালেবর লোক। সবাই চেনে।

লাইনের পাশ দিয়ে এগোতেই একেবারে সামনের দিকে বজ্রবাহুর সঙ্গে দেখা।

বেজা নাকি রে?

শক্তিদা যে! কী খবর?

তা চপ নিচ্ছিস বুঝি?

হ্যাঁ।

আমার জন্যও নিস তো কয়েকখানা। তিন রকমেরই নিবি, এই পয়সা।

দুর। পয়সা রাখো। ক পয়সাই বা দাম!

বাঁচালি বাপ। মেয়েটা তখন থেকে খিদেয় কাতর।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেজা গরম গরম চপ নিয়ে এলা শালপাতার ঠোঙায়। এনেছেও মেলা।

মেয়েটা হাঁ করে তাকিয়ে বজ্রবাহুকে দেখছিল।

এই তোমার মেয়ে বুঝি?

হ্যাঁ।

তোমার তো মেয়ে অন্ত প্রাণ!

শক্তিপদ একটু লজ্জার হাসি হাসল। সবাই তাই বলে বটে। মেয়ে নাকি শক্তিপদকে একেবারে বশ করে রেখেছে। তাতে একটু অহংকারই হয় তার। মেয়ে তো নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

ঘাসের ওপর তিনজন বসেছে ত্রিভুজ হয়ে। চপ খেতে খেতে শক্তিপদ বলে, তা সেই ডাইনির খপ্পরেই এখনও পড়ে আছিস!

সবই কপাল শক্তি দাদা। পেটের দায়ে মেনে নিতে হয়েছে।

সবই জানি। তোর জন্য দুঃখও হয়। গেছো মেয়েছেলেটার তো গুণের শেষ নেই। তা এখন তোর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে?

মাথা নেড়ে বেজা বলে, না দাদা, সম্পর্ক নেই। আমি হলুম গিয়ে শিখণ্ডী। নব হালদারের প্রেস্টিজ রাখতে আমাকে দরকার ছিল।

মেয়েটা চপ তেমন খাচ্ছে না। খুব হাঁ করে তাকে দেখছে। বজ্রবাহুর চেহারাটা খারাপ নয়। বহু মেয়েই তাকায়। কিন্তু সে নিজে আর মনের দুঃখে মেয়েদের দিকে তাকায় না। তার জীবনটাই অন্ধকার হয়ে গেছে।

তুমি তো খাচ্ছ না খুকি!

মেয়েটা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়। ভারী লক্ষ্মীশ্রী আছে মুখখানায়।

বজ্রবাহু বলল, চপে বড্ড ঝাল দেয় নেপাল। তুমি বোধ হয় ঝাল খেতে পারছ না! জিলিপি খাবে? শ্রীঘরের জিলিপি ভারী ভাল। সাড়ে আট প্যাঁচের জিলিপি। খাবে?

Shahnaz

মেয়েটা চুপ করে আছে। মাথা নিচু। হাসছে।

দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

বজ্রবাহু গিয়ে গরম জিলিপি নিয়ে এল। মেয়েটা লজ্জায় হাত বাড়িয়ে নিল ঠোঙাটা। বাপকে দিল, বজ্রবাহুকে দিল। নিজে একখানা একটু একটু কামড়ে খেতে লাগল। কিন্তু যেন খাওয়ায় মন নেই।

শক্তিপদ জিজ্ঞেস করে, তা হ্যাঁ রে বেজা, তোর ভ্যান চলছে কেমন?

ভালই। নব হালদার ও ব্যাপারে ঠকায়নি।

কেমন হচ্ছে টচ্ছে?

খারাপ নয় দাদা। একখানা ছোট ট্রাক বায়না করেছি। সামনের মাসেই পাব। তখন আমি চালাব। ছোট ভাইটাকে এটা দেব।

ভাল খুব ভাল। ধীরে ধীরে রয়ে সয়ে হোক। আমারও তো ওই রকম ভাবেই হয়েছে কিনা।

জানি। তুমি একটা দৃষ্টান্তই তো চোখের সামনে।

শক্তিপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর মতো একটা ছেলে যদি পেতাম—

কথাটা শেষ করল না শক্তিপদ। শেষ করার দরকারও ছিল না। সবাই বোঝে।

আমার কথা ভেবো না দাদা। খারাপ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলাম। এভাবেই জীবন যাবে।

৪

শেফালীর চোখ টকটকে লাল। বিস্তর কেঁদেছে। দিদি মরায় তুমি তো খুশিই হয়েছ জামাইদা, তাই না?

মাথা নেড়ে বেজা বলে, না শেফালী, খুশি হব কেন? মালতী যেমনই হোক, একটা মানুষ তো। একজন মানুষ মরলে কি খুশি হওয়ার কথা!

আমরা জানি, দিদি কী রকম ছিল। তোমার ওপর অনেক অন্যায় অত্যাচারও হল। তুমি ভাল লোক। এ বাড়ির সবাই কিন্তু তোমার সুখ্যাতি করে।

উদাস মুখে বেজা বলে, তা হবে হয়তো।

তোমাকে আমার একটা কথা বলার ছিল।

কী কথা শেফালী?

সে তোমাকে বাবা বলবে। যা বলবে ভেবে দেখো। দিদি খারাপ ছিল বলে ভেবো না যে আমরা সবাই খারাপ।

তা ভাবব কেন?

মালতী মারা গেছে এই দিন সাতেক হল। বীরেশ মহান্ত বেঁচে গেছে। ঘটনাটা নিয়ে সারা গাঁয়ে ফিসফাস গুজগুজ চলছে তো চলছেই।

বজ্রবাহু একটা মুক্তির স্বাদ টের পায় বটে, কিন্তু তার আনন্দ হয় না। বরং একটু দুঃখই হয় মালতীর জন্য। জীবনটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মিসমার করে দিয়ে গেল। নিজে মরল, খানিক মেরে রেখেছিল বজ্রবাহুকেও। মেয়েমানুষকে আজকাল একটু একটু ভয় পায় বজ্রবাহু।

নব হালদার সকালে তাকে ডেকে বলল, সব তো শেষ হয়ে গেল, দেখলে তো! মেয়েটাকে নিয়ে আমার শান্তি ছিল না। এখন ভাবি, তোমাকেও কষ্টের মধ্যে ফেলেছিলাম হে।

না না, কষ্ট কিসের?

কষ্ট নয়? খুব কষ্ট। সবই টের পেতাম। কিন্তু একটা কথা বলি।

কী কথা?

সম্পর্কটা ছাড়ান কাটান হোক আমি তা চাই না।

বজ্রবাহু চুপ করে থাকে।

তোমার দিকটা আমি যেমন দেখছিলাম তেমনই দেখব।

বজ্রবাহু চুপ।

একটা প্রাশ্চিত্তিরও হবে। বলছিলাম যদি শেফালীকে বিয়ে করো তবে সব দিক বজায় থাকে। সে ভারী ভাল মেয়ে। মালতীর একটা রক্তের দোষ ছিল হয়তো। কিন্তু শেফালী তেমন নয়।

শেফালী ভাল মেয়ে, আমি জানি। কিন্তু প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে হবে।

শোকাতাপা নব হালদার দুর্বল গলায় বলে, তুমি ঠকবে না বাবা, কথা দিচ্ছি।

বজ্রবাহু বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলেছিল। শাশুড়ি আর শেফালী আড় হয়ে পড়েছিল।

শাশুড়ি বলেছিল, যাবে কেন বাবা? আমরা কি পর?

শেফালীর মালতীর মতো চটক নেই। কিন্তু সে ভাল মেয়ে, এটা বুঝতে পারা শক্ত নয়। কিন্তু ভাল মেয়ে বলেই যে ঘাড় পাততে হবে এমন কোনও কথা নেই। চার বছর বাদে একটা সম্পর্কের গারদ থেকে মুক্তি পেয়েছে বজ্রবাহু। ফের আবার একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে তার মন চায় না। তাছাড়া এই বাড়ির অনুষঙ্গও তো আছে। শেফালীকে বিয়ে করলে এখানেই বাস করতে হবে। সেটা কি পারবে সে?

তবে নব হালদারকে চটাতেও চাইছে না বেজা, সবে তার ব্যবসা জমে উঠছে। নব চটলে কোন কলকাঠি নেড়ে তাকে পথে বসায় কে জানে। নবর পিছনে পার্টিও আছে।

সুধাপুর থেকে নবগঞ্জ পর্যন্ত টানা একটা ট্রিপ মারল বেজা, নবগঞ্জেই রাতের ঠেক। চেনা জায়গা। হরিরামের দোকানে মাল খালাস করে সে পয়সা বুঝে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জোর শীত পড়েছে এবার। সুফল মিত্রের পাইস হোটেল খেয়ে সে তার ম্যাটাডোরে রাত কাটাবে বলে ফিরছিল। দূর থেকে দেখতে পেল, অন্ধকারে কে একজন তার ম্যাটাডোরের পাশে দাঁড়িয়ে।

বেজা নাকি রে?

শক্তিদা যে! এখানে?

একটা ট্রাক ফেঁসেছে। তাই আসা। কে যেন বলল, তুইও এখানে। তাই ভাবলুম দেখাটা হয়ে যাক।

ভাল করেছ।

আজ ফিরবি না?

খামোখা তেল পুড়িয়ে লাভ কি? রাত কাটালে সকালে হয়তো একটা ট্রিপ হয়ে যাবে। মুকুন্দ হালদারের মাল যাবে বলে মনে হচ্ছে।

তা হাঁ রে বলছিলাম কি, খুব বরাতজোর তোর!

মালতীর কথা বলছ তো!

খুব বেঁচে গেলি।

বাঁচলুম তো, কিন্তু মনটা ভাল নেই।

Shahnaz

কেন বল তো!

নব হালদার ফের বেঁধে ফেলতে চাইছে।

সে কী?

তার ছোট মেয়ে শেফালীকে বিয়ে করার জন্য ধরে পড়েছে খুব। চটাতে ভরসা হয় না। ম্যাটাডোরখানাই তো ভরসা, যদি কেড়ে কুড়ে নেয়। তার লোকবলও তো আছে।

একটু চেয়ে থেকে শক্তিপদ একটু হাসল, তা বটে, তবে অত ভয় খাস না। শক্তিপদ এখনও মরে যায়নি।

তুমি আর কী করবে দাদা। সবই আমার কপাল।

শোন রে বাপু, অত কপালের ওপর বরাত দিয়ে বসে থাকিসনি। এবার একটু পুরুষ হ।' লেখাপড়া জানিস, বুদ্ধি আছে, শুধু সাহসটারই যা অভাব।

ঠিকই বলেছ। সাহসেরই অভাব। নইলে কি আর—যাকগে।

কথা দিয়ে ফেলিসনি তো?

না। সময় নিয়েছি।

ভাল করেছিস। কাল ফিরে একবার আমার বাড়ি যাস। কথা আছে।

ঠিক আছে দাদা। ব্যাপারটা কী!

বড় অশান্তি যাচ্ছে আমার। চিকিচ্ছের দরকার।

কার চিকিচ্ছে?

বলব 'খন।

৫

শক্তিপদর বউ পদ্ম রাগে ঝনঝন করছিল, আসকারা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে মাথায় তুলেছে, এখন যা মনে চায় তাই করে। তিন দিন মেয়ে কুটোটি দাঁতে কাটছে না। বলি এরকম কতদিন চলবে রে হতভাগী?

বিছানায় দক্ষিণের জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে বকুল। মুখখানা শুকনো।

বলি রাগটা কার ওপর? কী চাস কী তুই?

বকুল কিছু বলছে না।

পদ্ম বলল, এরপর কি আমি গলায় দড়ি দেব? তাই চাস?

বকুল চুপ করে চেয়ে আছে। জানালার বাইরে আতাগাছের ডালে ফিঙে পাখি নেচে বেড়াচ্ছে। দুটো প্রজাপতি ঢুকল ঘরে। ফের বেরিয়ে গেল।

মা!

পদ্ম ফিরে চাইল, কী?

আমার শীত করছে। লেপটা টেনে দাও তো গায়ে।

লেপ টেনে পদ্ম তার কপালে হাত রাখল। গলা নেমে এল খাদে, না জ্বর তো নেই। এক গেলাস গরম দুধ দিই মা, খা।

তুমি কেন বললে আমি তিন দিন খাইনি! আমি তো রোজ খাই।

সে তো এতটুকু করে। মুখরক্ষা করার জন্য। ও কি খাওয়া? বলি, উপোস, দিচ্ছিস কেন রে মুখপুড়ি?

মনটা ভাল নেই মা।

কেন সেটা বলবি তো।

পরে বলব। সময় হয়নি। বাবা কোথায় বলো তো!

তার কি আর সময় অসময় আছে! এ সময়ে লোকজন আসে, ব্যবসাপত্তরের কথাই হচ্ছে হয়তো। ঘরসংসারে কি তার মন আছে। ওই তো আসছে বুঝি! খুব হন্তদন্ত দেখছি যেন।

শক্তিপদই। ঘরে ঢুকেই বলল, ওগো, মেয়ের চিকিচ্ছের ব্যবস্থা হয়েছে।

চিকিচ্ছে। কিসের চিকিচ্ছে?

সে আছে, তুমি বুঝবে না। তবে বজ্রবাহু এক কথাতেই রাজি।

কিসের রাজি গো! এ তো বড় সাঁটের কথা কইছ দেখি।

তা সাঁটই ধরে নাও। মেয়ে পেটে ধরেছ, এখনও ওর মনের কথা বুঝতে পার না, কেমন মা তুমি? আমি চলি, মেলা লোক বসে আছে।

শশব্যস্তে চলে গেল শক্তিপদ।

ওমা! তুই মুখচাপা দিয়ে হাসছিল যে বড়। কী হল বল তো! এসব কী আমি যে বুঝতেই পারলুম না।

দুধ দেবে বলেছিলে যে!

সে তো বলেছিলুম।

শিগগির নিয়ে এসো। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

শারদীয় দেশ, ১৪০৭

Shahnaz

ক্রীড়াভূমি

নিজের ভিতরই আছে এক অলৌকিক। কখনও কখনও তাকে টের পাওয়া যায়। স্পষ্ট নয়—কেননা একমাত্র ধর্মের পথেই সেই অলৌকিক স্পষ্ট ও ঈশ্বরের সমতুল হয়। তুমি স্বধর্মে কখনও স্থির থাকো না—সুতরাং তুমি কখনও কখনও একপলকের জন্য মাত্র সেই অলৌকিককে প্রত্যক্ষ করে বিপদগ্রস্ত হও।

তাই তুমি একবার স্বপ্নে এক জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে এক নীল অতি সুন্দর বর্ণের উড়ন্ত সিংহকে তোমার নিকটবর্তী হতে দেখে ভয় পেয়েছিলে। অথচ ভয়ের কারণ ছিল না, কেননা সেই সিংহের নীল কেশর, নীল চোখ ও নীল নখ সবকিছুই হিংস্রতাশূন্য ছিল; এবং সেই নীলবর্ণ সিংহের বাসস্থান ছিল না বলে সে অতি নম্রভাবে তোমার সম্মুখের ভূমি স্পর্শ করে তোমার কাছে একটি বাসস্থানের সন্ধান জানতে চায়, কেননা তুমি এই পৃথিবীর আইনসম্মত বসবাসকারী। তুমি নিজেও জান না কেন তুমি তাকে উত্তরদিকে ভুল পথে উড়ে যেতে সংকেত করেছিলে, এবং সেই সুন্দর সিংহটি অতি ধীর ও সাবলীল গতিতে পুনরায় মাধ্যাকর্ষণ ত্যাগ করে চলে যেতে থাকলে পিছন থেকে তুমিই তাকে উপর্যুপরি গুলি করেছিলে; কেন? সেই গুলির শব্দ শুনে এবং আহত ও ক্রুদ্ধ সেই সিংহ তার ক্ষতস্থান কামড়ে ধরে তোমার দিকেই ফিরে তাকালে তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু ঘুম থেকে জাগরণের ভিতরে চলে আসবার সময় যখন তুমি এক অতি সূক্ষ্ম বাধাকে অতিক্রম করছিলে তখন তোমার এক অংশ জাগ্রত ছিল, অন্য অংশ ছিল তখনও স্বপ্নাবিষ্ট, এবং তোমার জাগ্রত অংশ তোমার দেহবিচ্ছিন্ন স্বপ্নাবিষ্ট অন্য অংশকে ভয়ে আর্তনাদ করতে শুনেছিল। স্বকণ্ঠের সেই অলৌকিক স্বপ্নাবিষ্ট আর্তনাদ এখনও তোমার পাপবোধকে তাড়িত করে—তুমি গুলি করেছিলে কেন? যদি স্বপ্নে আবার দেখা হয়, যদি কয়েকটি চিহ্নের দ্বারা সেই সিংহ তোমাকে আবার শনাক্ত করে? কিংবা যেন আর একবারও ভিন্ন এক স্বপ্নে তুমি তোমার বন্ধু অতীশকে খুন করেছিলে বলে জাগ্রতাবস্থায়ও বহুদিন তুমি বিমর্ষ ছিলে কেন? তোমার প্রশ্ন এই যে, স্বপ্নেও কেন তুমি হত্যাকারী?

কিংবা কয়েক বছর আগে এক শীতকালে টেরিটিবাজারের কাছে তুমি যে মোটর দুর্ঘটনায়

পড়েছিলে তার কথা ধরা যাক। সেদিন বিকেলের পার্টিতে তুমি সামান্য হুইস্কি খেয়েছিলে, কিন্তু মাতাল হওনি; সেদিনকার পার্টিতে তুমি অনেকক্ষণ বিদেশি নাচ নেচেছিলে, কিন্তু তুমি ক্লান্ত ছিলে না। এমন কি নাচের সময় যে মহিলা সারাক্ষণ তোমার বক্ষলগ্ন ছিল তার মুখও তোমার ঠিক মনে পড়েনি। ঠিক কী হয়েছিল তা আজও তোমার জানা নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, তখন অনেক রাত, ফেরার পথে টেরিটিবাজারের কাছে রাস্তা ফাঁকা ছিল, গাড়িতেও তুমি ছিলে একা। তুমি জোরে চালিয়ে দিলে তোমার গাড়ি। তোমার পুরনো আমলের পৈতৃক মোটর গাড়িতে ভয়ঙ্কর লজঝড় শব্দ হচ্ছিল বলে তুমি মাঝে মাঝে গালাগাল দিচ্ছিলে, মাঝে মাঝে তুমি তোমার প্রিয় ফরাসি গান 'ও-লা-লা ও-লা-লা' গাইছিলে, অথচ গিয়ার স্টিয়ারিং ক্লাচ ও অ্যাক্সিলেটারের ওপর তোমার হাত পাগুলি নির্ভুল কাজ করে যাচ্ছিল। বিপদের কোনও সম্ভাবনা ছিল না—কেননা তোমার গাড়িটির গান নেই, অন্যমনস্কতা নেই। তার ধর্ম এই যে, সে শুধু তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়, তোমার ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার স্বধর্মে তোমাকে টেনে নিয়ে যায়। তোমার গাড়িটির আত্মা নেই, পাপ-পুণ্য নেই, তবু তুমি এই মোটর গাড়িটিকে ভালবাস, যেমন, মানুষ তার গৃহপালিতগুলিকে ভালবাসে, অথচ তোমার গাড়িটি কি প্রতিদানশীল? কী হয়, যদি তুমি গাড়ির যন্ত্র-সংলগ্ন তোমার হাত-পা তুলে নাও, চোখ বন্ধ কর? এই অলৌকিক চিন্তা হঠাৎ মনে এলে তুমি আপন মনে হেসেছিলে। তারপর গাড়ি চালাতে চালাতে তুমি খানিকক্ষণ খেলাচ্ছলে চোখ বন্ধ করে রাখবার চেষ্টা করে দেখেছিলে চোখ আপনিই খুলে যায়। তুমি গাড়ির যন্ত্র-সংলগ্ন তোমার হাত-পা কিছুক্ষণের জন্য তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে দেখলে ধর্মান্ধ এই মোটরগাড়ি তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অধিকার করে আছে, তার কাছে তুমি তুচ্ছ ও অন্তঃসারশূন্য। কিংবা হয়তো তুমি স্বভাবত আত্মরক্ষাকারী, সেই জন্য মোটরগাড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক অমোঘ। হতাশ হয়ে তুমি আবার কিছুক্ষণ তোমার ফরাসি গান গেয়েছিলে এবং পরমুহূর্তেই এক অন্যমনস্কতা তোমাকে পেয়ে বসেছিল। অকারণে তোমার মনোরম, ছেলেবেলায় দেখা তোমার প্রিয় কিশোরীদের মুখগুলি তোমার মনে পড়েছিল। সেই মুখগুলি তোমার আজও প্রিয়, কেননা ফের দেখা হয়নি। তোমার ছেলেবেলায় কবে যেন তোমার একটা মার্বেল হারিয়েছিল, আজও সেই মার্বেলটার কথা মনে রয়ে গেছে, কেননা এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্নে সেই মার্বেলটা তুমি হঠাৎ কুড়িয়ে পাও। সেই মার্বেল তোমার মাথার ভিতরে শব্দহীন গড়িয়ে গেল। তুমি হঠাৎ লক্ষ করেছিলে কবেকার স্বপ্নে দেখা এক নীল সিংহ তোমার মাথার ভিতরে আজও বাসা বেঁধে আছে। অন্যমনস্কভাবে তোমার খেয়াল হয়েছিল যে, তুমি যে, 'ও-লা-লা—ও-লা-লা' গানটি গাইছিলে, তোমার সেই প্রিয় ফরাসি গানটির সুর ছিল সেইসব গ্রামীণ মানুষগুলির সুরের মতো, যারা গো-চারণক্ষেত্রে ও বীজক্ষেত্রে ও নৌবাহনের সময় এরকম গান গায় এবং আত্মপ্রকাশহীন নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে। এইখানে তুমি কিছুক্ষণের জন্য মোটরগাড়ির সঙ্গে, তোমার বিপজ্জনক খেলা ভুলে গিয়েছিলে। তারপর তোমার চলন্ত গাড়িতে বসে এইসব দ্রুত স্মৃতি ও তোমার গানের বিষণ্ণ গ্রামীণ সুরে আবিষ্ট থেকে যখন এক গভীর নিরাসক্তি তোমাকে পেয়ে বসেছিল তখন— ঠিক কী হয়েছিল তোমার মনে নেই। তুমি তোমার জাগ্রত অংশকে ফাঁকি দিয়ে স্বপ্নে পতনশীল মানুষের মতো হঠাৎ যন্ত্র-সংলগ্ন তোমার হাত-পা টেনে নিয়েছিলে। তোমার মোটরগাড়ি টাল খেয়ে গেল; পলকের মধ্যেই বিপদ বুঝতে পেরে তুমি সোজা হয়ে বসে গিয়ার স্টিয়ারিং ক্লাচ ও অ্যাক্সিলেটার চেপে ধরতে গিয়ে দেখলে ভয়ঙ্কর স্মৃতিভ্রংশ ঘটে গেছে, তুমি কোনওটারই ব্যবহার জান না। ইতিমধ্যে চোরাগলি,

Shahnaz

অন্ধকার, তীব্র বাঁক দেয়ালের খাড়াই তোমার দিকেই ধাবমান দেখে তুমি চিৎকার করে উঠেছিলে। আবার ঠিক সময়ে ব্রেক চেপে ধরেছিলে তুমিই। তোমার মোটরগাড়ি ভীষণ লাফিয়ে উঠে থামল। কিন্তু স্টিয়ারিঙের সঙ্গে দারুণ সংঘর্ষে তোমার পাঁজরার একটা হাড় মট করে ভেঙে গেলে তুমি তীব্র যন্ত্রণায় ঢলে পড়ে অস্ফুট গাল দিলে 'ইডিয়ট'।

কিংবা আর একদিন, যেদিন তোমার ছিমছাম শূন্য বাড়িতে অনেকদিন পর মনোরমা এসেছিল। সন্ধে হয়ে গেলে তুমি আলো জ্বালনি, আধো অন্ধকারেই সুবিধে ছিল তোমার। মনোরমা অনেকক্ষণ গ্রামোফোন বাজাল তারপর 'ধ্যুৎ, ভাল লাগছে না' বলে উঠে গিয়ে পিয়ানোর কাছে বসল জানালার দিকে পিঠ রেখে। যদিও সে পিয়ানো বাজাতে জানত না, তবু ওই জায়গাটা ছিল তার প্রিয়, কেননা ওখান থেকে পুরো ঘরটার দিকে না তাকিয়েও তোমাকে দেখা যায়। তুমি তোমার হেলানো চেয়ারে পড়েছিলে মনোরমার মুখোমুখি। মনোরমা সারাক্ষণ দেখছিল তোমাকে—চোখ না খুলেও তুমি টের পাচ্ছিলে। তুমি কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছ তা জানবার কৌতূহল থাকলেও সে কোনও প্রশ্ন না করেই তা জানতে চাইছিল। তুমি কী করে তোমার সেদিনকার হৃদয়হীন কথাবার্তা শুরু করবে তা ভেবে পাচ্ছিলে না। কেননা কথাগুলো বলা হয়ে গেলে মনোরমা চলে যাবে—এই যাওয়াটা তার পক্ষে কত অপমানকর তা ভেবে মনে মনে বড় কষ্ট পাচ্ছিলে তুমি। তুমি একপলক চোখ খুলে দেখলে সে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে আলমারিতে সাজানো খেলাধুলোয় পাওয়া তোমার ট্রফিগুলো দেখছে। পরমুহূর্তেই উঠে গেল সে, ছায়ার মতো তাকে বইয়ের র‍্যাকের কাছে, টেলিফোনের কাছে, ড্রেসিং টেবিলের কাছে পর পর দেখা গেল, আবছা গলা শোনা গেল তার 'তুমি কি ভীষণ চরিত্রহীন সুমন!' তুমি ভেবে পেলে না—ও কি করছে! কিন্তু সুযোগ বুঝে তুমি বলতে শুরু করেছিলে 'শোনো মনোরমা—।' মনোরমার ছায়াকে আবার পিয়ানোর কাছে দেখা গেল, তুমি আবার বললে 'শোনো মনোরমা।' পরমুহূর্তে মাথা নিচু করল মনোরমা, তার ডানহাত কোলের ওপর থেকে শাড়ির আঁচল তুলে নিলে তুমি অতর্কিতে বুঝতে পেরেছিলে মনোরমা কাঁদছে। তুমি তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিলে, তুমি কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তার আগেই কান্নার ঝোঁকে ভর রাখতে গিয়ে মনোরমা বাঁ হাত বাড়িয়ে পিয়ানোর এলোমেলো রিডগুলো ছুঁয়ে গেলে তুমি তড়িদাহতের মতো স্থির হয়ে গেলে। ধীর গম্ভীর স্বরে সেই পিয়ানো তোমাকে চুপ করতে বলল। তুমি আর একবার উঠবার চেষ্টা করলে। পিয়ানো গর্জন করে উঠল। যেন মনোরমার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলে ডালা-খোলা প্রকাণ্ড সেই অন্ধকার পিয়ানো তোমার ওপর লাফিয়ে পড়বে। তুমি আবার মনোরমার স্বর শুনতে পেলে 'সুমন, তুমি চরিত্রহীন—।' স্খলিতকণ্ঠে তুমি আবার মনোরমার নাম ধরে ডাকলে, ঠিক সেই সময়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মনোরমা ভারসাম্য রক্ষার জন্য আবার পিয়ানোর রিডে হাত রেখেছিল, তার অশিক্ষিত অপটু হাতে পিয়ানো তীব্রভাবে বেজে উঠলে ঘরের সবকিছু প্রাণ পেয়ে গেল। অর্থহীন শ্বেতপাথরের টেবিল, টেলিফোন, বইয়ের র‍্যাক, ওয়ার্ডরোব—এ সব কিছুই তোমার ওপর লাফিয়ে পড়বে—এরকম মনে হল। তীব্র ও অলৌকিক ভয় থেকে তুমি দেখলে—এ ঘরের সবকিছুই মনোরমার; তোমার ট্রফিগুলি, হেলানো চেয়ার, গ্রামোফোন, চেস্ট অফ ড্রয়ার্স-এ সবকিছুই মনোরমার, তুমি আগন্তুক মাত্র। মুহূর্তেই হাঁটু গেড়ে এই কথা বলবার অলৌকিক ইচ্ছে হয়েছিল তোমার যে 'ক্ষমা করো!' তুমি নড়তে পারলে না। মনোরমা তড়িৎগতিতে তার ব্যাগ কুড়িয়ে নিল, তুমি তার আধভাঙা কথা শুনতে পেলে 'আমি সব জানি, কিন্তু তুমি কখনও বলো না সুমন, বলো না—' পরমুহূর্তেই দরজার কাছে তার দ্রুত

অপসৃয়মাণ অবয়ব একপলকের জন্য দেখা গেল, কি গেল না। ইচ্ছে হয়েছিল সিঁড়ি পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরো, কিন্তু তখনও ধর্মরক্ষাকারী সেই পিয়ানোর স্বর বাঘের মতো মনোরমাকে পাহারা দিচ্ছিল, ঘরের সবকিছুই ছিল—তখনও মনোরমার, তখনও সজীব ছিল তোমার ট্রফিগুলি, টেলিফোন, বইয়ের র‍্যাক ও হেলানো চেয়ার। কিছুক্ষণ ঠিক কী হয়ে গেল তুমি তা বুঝলে না। এরপর তুমি অনেকদিন পিয়ানোর কাছ বসেছ, কখনও ধীরে কখনও দ্রুতবেগে তোমার শিক্ষিত সুপটু আঙুলে রিড চেপে দেখেছ—পিয়ানোর ভিতরে অলৌকিক কিছু নেই। কিন্তু কোথাও ছিল সেই ঘরে, অন্ধকারে, তোমার স্পর্শকাতরতার ভিতরে পিয়ানোর সেই অচেনা 'নোট'—মনোরমা না জেনে কয়েক মুহূর্তের জন্য সেইখানে তার হাত রেখেছিল।

ছেলেবেলায় তুমি যে সব খেলা খেলেছিলে তার মধ্যে একটা খেলা ছিল তোমার মায়ের সঙ্গে। অথচ নিতান্ত বালক বয়সেই তুমি তোমার মাকে শেষবার দেখেছিলে। খুব দীর্ঘ চুল ছিল তাঁর—এটুকু ছাড়া আর কিছুই তোমার মনে নেই। তোমার মাকে যারা দেখেছিল তারা বলত তুমি মাতৃমুখী ছেলে—ভাগ্যবান। যে দু-একটি ছবি ছিল তোমার মায়ের তা থেকে চেহারা ভাল বোঝা যায় না, শুধু বোঝা যায়—তোমার মতোই তীব্র চিবুক ছিল, একটু চাপা গাল আর একটু উঁচু কিন্তু খুব সুন্দর নাক ছিল তাঁর। কিশোর বয়সের সমস্ত লক্ষণ শরীরে ফুটে উঠলে একদিন কৌতূহলবশত তুমি শাড়ি পরেছিলে, তোমার মায়ের কিশোরী বয়সের ছবিতে যেমন ছিল তেমনি দু চোখে কাজল এবং কপালের ভ্রূ-সঙ্গমে কাজলের টিপ পরেছিলে তুমি, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি তোমার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে চোরাহাসি হেসে আপন মনে প্রশ্ন করেছিলে, 'এ রকম ছিল আমার মা?' আয়নায় অচেনা এক কিশোরীর মুখ তোমার দিকে চেয়ে গোপন ও রহস্যময় কোনও কারণে হেসে উঠেছিল! বড় তির্যক ও বিচিত্র ছিল তার দুই চোখ। এ তো তুমি নও! তুমি ভয় পেয়েছিল। 'আমি কি সুমন?' তুমি এই প্রশ্ন করেছিলে, কেননা সেই কিশোরী প্রতিবিম্বের তীব্র ও রহস্যময় টান গোপন স্রোতের মতো তোমাকে সম্ভবত বীজরূপে আর একবার তার গর্ভস্থ অন্ধকারের দিকে আকর্ষণ করেছিল। মনে পড়ে তুমি একবার দুহাত বাড়িয়ে আয়নার ফ্রেমটা ধরবার চেষ্টা করেছিলে, পরমুহূর্তেই তুমি আর ছিলে না। ঠিক কী হয়েছিল তোমার তা জানা নেই, শুধু সন্দেহ হয় কিছুক্ষণের জন্য সেই ঘরে একা এক কিশোরীই ছিল তার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে, তুমি তার কোথাও ছিলে না। অনেকক্ষণ পর যখন তুমি সচেতন হয়েছিলে তখনও তোমার মনে 'আমি কি সুমন?' এই প্রশ্ন আবছাভাবে খেলা করে গিয়েছিল। মনে পড়ে ক্রমে ভয় ভেঙে গিয়েছিল এবং তুমি তোমার কিশোর বয়সে তোমার কিশোরী মায়ের সঙ্গে আরও কয়েকবার এই খেলা খেলেছিলে। কথার মাঝখানে, খেলার মাঝখানে, ঘুমের মাঝখানে অতর্কিতে সচেতন হয়ে তুমি মাঝে মাঝে নিজের ভিতরে এক রহস্যময় নারীত্বকে লক্ষ করে 'আমি কি সুমন?' এই প্রশ্ন করে মনে মনে চমকে উঠেছ। কালক্রমে যদিও তোমার শরীর মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো পরুষ ও সুগঠিত হয়েছে তবু তোমার মুখে কোথাও এখনও সেই এক কিশোরীসুলভ রহস্যময় নম্রতা রয়ে গেছে, একপলক আয়নায় তাকালেই তুমি তা ধরতে পারো। এখনও যখন তুমি নানা কাজে থাকো, যখন সিঁড়ি ভেঙে ওঠো, কিংবা সিঁড়ি ভেঙে নামো, যখন দরজা খুলতে হাত বাড়াও, কিংবা কেউ 'সুমন' বলে ডাকলে পিছন ফিরে সাড়া দাও, বিদেশি নাচের আসরে যখন অচেনা মহিলাকে হালকা আলিঙ্গনে বদ্ধ কর তখন মাঝে মাঝে কাকে মুহূর্তের গভীর অন্যমনস্কতা থেকে নিজের ভিতরে হঠাৎ এক অলৌকিক 'আমি কি সুমন?' এই প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়েছ।

Shahnaz

তোমাদের পরিবারে ছিল চোখের অসুখ। তোমার বাবার একটু বয়স হয়ে গেলে তাঁরও দৃষ্টিশক্তি খুব কমে এসেছিল। খুব ভারী ঘোলাটে কাচের চশমা ছিল তাঁর, তবু ঘড়ি দেখবার জন্য, চিঠি পড়বার জন্য সবসময় তাঁকে একটা আতসকাচ ব্যবহার করতে হত। যখন চোখ দিয়ে দেখবার ক্ষমতা আরও ক্ষীণ হয়ে আসছিল তখন সবকিছু দেখবার আগ্রহ ক্রমশ বেড়েছিল তাঁর। তুমি তাঁকে কখনও দেখেছ সিঁড়ির ফাটলের কাছে বসে আতসকাচ দিয়ে পিঁপড়েদের চলাফেরা লক্ষ করছেন, কখনও আতসকাচের ভিতর দিয়ে পিয়ানোর ওপর জমে ওঠা ধুলোর আস্তরণের দিকে অকারণে চেয়ে আছেন। কতদিন তুমি দেখেছ তোমার বাবা বাড়ির দক্ষিণ কোণে ভিতের কাছে তাঁর আতসকাচটি নিয়ে বসে আছেন, তাঁর ধারণা ছিল দক্ষিণ কোণ থেকেই বাড়িটা ভাঙতে শুরু করবে, কেননা ওই কোণ থেকেই বাড়িটার ভিত গাঁথা শুরু হয়েছিল। তোমাকে কাছে ডেকে কখনও কখনও তিনি বলেছেন, 'তুমি কি খুব বেশি আয়ু চাও? খুব বেশি দৃষ্টিশক্তি চাও? সুমন, তুমি কখনও খুব বেশি চেয়ো না।' মাঝে মাঝে তিনি তোমাকে ঠাকুরমার গল্প বলেছেন। বাড়িতে কারও দৃষ্টিশক্তি ভাল ছিল না, দাদু অন্ধ, জ্যাঠামশাই অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন, তখন সকলের চোখের দেখা তোমার ঠাকুমা একলা দেখতেন। এত বেশি প্রখর হয়েছিল তাঁর চোখ যে তোমাদের মস্ত বাগান থেকে একটি ফুল কেউ তুলে নিলে তিনি টের পেতেন, তোমার প্রায় অন্ধ পিসিমার খেলনার বাক্স থেকে পুঁতির মালা চুরি গেলে তিনি ধরে ফেলতেন। এইভাবে সবকিছুর ওপর তাঁর ভয়ঙ্কর মায়ার সৃষ্টি হয়েছিল বলে মরবার সময় তাঁর প্রাণ বেরোতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল, আর শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পরও দেখা গিয়েছিল তাঁর চোখ খোলা রয়েছে। এইভাবে তোমার বাবা তোমাকে প্রায়ই কাছে ডাকতেন, তোমার গলার শব্দ শুনতে চাইতেন। তুমি তোমার বাবার ভিতরে খুব আনন্দ কিংবা খুব বিষাদ কখনও দেখনি। খুব কাছের কিংবা খুব দূরের বলেও তাঁকে তোমার কখনও বোধ হয়নি। শুধু তাঁর রহস্যহীন পরিষ্কার মুখ চোখ দেখে তোমার প্রায়ই তাঁকে বড় দূর ভ্রমণকারী বলে মনে হত। তখন তোমার যৌবন আরম্ভের সময়ে তুমি একদিন তোমার প্রথম নীতিবিগর্হিত যৌন স্বপ্নটি দেখেছিলে, আর একদিন তুমি অলি নামে মেয়েটিকে প্রথম চুম্বন করেছিলে। সেই সময় তুমি প্রায়ই বড় অন্যমনস্ক ও অস্থির ছিলে। এমনই একদিন যখন তুমি তোমার বাবার ঘরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলে তখন তিনি চোখ কুঁচকে তোমাকে দেখবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সুমন?' তুমি সাড়া দিলে তিনি বললেন, 'একবার আমার কাছে এসো।' তুমি কাছে গেলে বললেন, 'হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বোসো।' তুমি তোমার বাবার হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসলে, তিনি তাঁর আতসকাচটি তুলি নিয়ে 'দেখি সুমন, তোমার মুখখানি' এই বলে তোমার মুখের ওপর আতসকাচটি ধরলে, তুমি কাচের ভিতরে তাঁর মস্ত বড় গভীর চোখগুলি দেখেছিলে। তোমার মনে হয়েছিল, বহু দূর বিস্তৃত রয়েছে সেই চোখ, এবং তোমার এই বোধ এসেছিল যে সেই চোখের ভিতরে ধূসর মাঠ, পর্বতশৃঙ্গ, সমুদ্র ও আকাশ রয়েছে—একটু ম্লান—কিন্তু এই চোখ তাঁর যিনি কাছের ও দূরের সব কিছু দেখতে পান, যিনি আলো ও অন্ধকারে সমভাবে দেখেন, যিনি ঈশ্বর, এবং তোমার স্রষ্টা। তাঁর ডান হাতখানা তোমার মাথার ওপর স্থির হয়ে ছিল। খানিকক্ষণ তোমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, কেননা তোমার বোধ হয়েছিল তিনি তোমার ধর্মহীন ক্রিয়াকাণ্ডগুলি, তোমার সামঞ্জস্য শূন্য বোধ ও প্রবৃত্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি একবার বিড় বিড় করে বললেন, 'চোখ বড় মায়ার সৃষ্টি করে।' তারপর তিনি তাঁর হাত ও আতসকাচ সরিয়ে নিলেন। সেই দিনই দুপুরবেলা তোমার বাবা তাঁর আতসকাচটি নিয়ে নিঃশব্দে ছাদে উঠে গিয়েছিলেন এবং শেষবারের মতো আতসকাচ দিয়ে

সূর্যকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দুটো চোখই পুড়ে গিয়েছিল। তাই তারপর থেকে তুমি সবচেয়ে বেশি লক্ষ করেছ মানুষের চোখ। প্রথমে তুমি নিজের চোখ দিয়ে শুরু করেছিলে। জল খেতে গিয়ে তুমি কতদিন গ্লাসের জলে নিজের চোখের ছায়া দেখে চোখ ফেরাতে পারনি। কতদিন তুমি ইচ্ছে করে চোখ বুজে রাস্তা দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত হেঁটে গেছ। বড় রোমাঞ্চকর ও অস্বাভাবিক ছিল তোমার তোমাকে নিয়ে সেই খেলা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তুমি অন্ধের মতো হাঁটতে শিখেছিলে, তুমি চোখ বুজে দিকনির্ণয় করবার কৌশল আয়ত্ত করেছিলে, এবং অন্ধের যেমন হয় তেমনই তোমার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি প্রখর ও স্বর্শকাতর হয়ে উঠেছিল। এই ভাবে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে তুমি ভেবেছিলে এখন তুমি তোমার অন্ধকার দিনগুলির জন্য প্রস্তুত।

তুমি অনেকদিন তোমার বন্ধুদের চোখ বুজে হেঁটে যাওয়া ও দিকনির্ণয় করার কৌশল দেখিয়ে বিস্মিত করেছ। যারা তোমার এই কৌশল দেখেছিল তাদের মধ্যে একমাত্র অতীশ তোমাকে মাঝে মাঝে বলেছিল যে এই খেলা ভাল নয়। কারণ জিজ্ঞেস করলে সে সঠিক উত্তর দিতে পারত না, শুধু বলত 'দেখো তুমি—এ ভাল নয়।' অতীশ ছিল শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির এবং প্রথম চেনা হওয়ার পর থেকেই তুমি মাঝে মাঝে লক্ষ করেছিলে যে তার মুদ্রাদোষের মতো একটি স্বভাব রয়েছে। কম কথা বলত অতীশ এবং কখনও কখনও কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেত সে। যেন কথা ভুলে গিয়ে 'কী বলছিলাম বলো ত? কেন বলছিলাম?' এই প্রশ্ন করে বোকার মতো চেয়ে থাকত। তুমি অনেকদিন কথার খেই ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছ কিন্তু অতীশের ধাঁধা কাটত না, সে প্রশ্ন করতে থাকত 'কেন বলছিলাম? কেন বলছিলাম? কেন?' তারপর আর সে প্রশ্নও তার থাকত না এবং সে কিছুক্ষণ প্রাণপণে কোনও কথা বলবার চেষ্টা করত, পারত না। অবশেষে সে তার স্বাভাবিকতা ফিরে পেলে বহুদিন লজ্জাবশত উঠে চলে গেছে। অথচ তুমি ক্রমশ বুঝতে পেরেছিলে তোমাদের কুড়ি-একুশ বছর বয়সের সব বন্ধুদের মধ্যে অতীশ ছিল সবচেয়ে জ্ঞানী ও অনুভূতিপ্রবণ। মাঝে মাঝে তুমি তার এই স্বভাবটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ, সে সঠিক উত্তর না দিয়ে হেসে বলত 'ওটা আমার মনের তোতলামি।' কিন্তু কতদিন তোমার মনে হয়েছে—বহুজনের মধ্যেও অতীশ তোমাকে লক্ষ করছে অতি নিবিষ্টভাবে, যেন গোপনে সে তোমাকে কোনও কথা বলতে চায়। খেলাধুলো করত না অতীশ, কিন্তু তুমি যখন খেলতে নেমে ফুটবলের পিছনে ছুটছ তখনও টের পেয়েছ মাঠের সীমানায় বাইরে ভিড় থেকে অতীশ তোমাকে লক্ষ করছে। যখন তুমি চোখ বুজে পিয়ানোর সঙ্গে গান গাইছ, তখনও টের পেয়েছ অতীশ আর সকলের মতো গান না শুনে তোমাকে লক্ষ করেছ। কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করলে হেসে এড়িয়ে যেত, বলত 'তুমি বড্ড বেশি স্পোর্টসম্যান সুমন। বোধহয় তুমি সব কিছু নিয়ে খেলতে পারো।' তুমি উঁচু গলায় হেসে উঠে বলেছ 'ইয়াঃ!' খেলা শেষ হয়ে গেলে তুমি আর অতীশ ফাঁকা খেলার মাঠে পাশাপাশি শুয়ে ছিলে, অতীশ বলছিল খেলা শেষ হয়ে গেলে খেলার মাঠ আমার ভাল লাগে।' তুমি চোখ বুজে ছিলে, উত্তর দিলে না। অতীশ আচমকা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বলল 'সুমন, আমার একটা খেলার কথা তোমায় বলতে পারি, কারণ তোমার একটা খেলার সঙ্গে আমার খেলাটার বোধহয় মিল আছে।' তুমি চোখ বুঝে সর্তক গলায় প্রশ্ন করলে 'কী সেটা?' অতীশ হাসল 'বলছি। আগে বলো তো কত ছেলেবেলার কথা তোমার মনে আছে!' তুমি হালকা গলায় বললে 'এই ধরো চার-পাঁচ বছর বয়সের কথা কিছু কিছু মনে আছে।' অস্থির গলা শোনা গেল অতীশের 'না, অত নয়। ও তো অনেকেরই মনে থাকে, আরও ছেলেবেলার কথা মনে নেই?' উৎসুক হয়ে তুমি একটু ভেবে দেখলে 'খুব মনে নেই,

Shahnaz

তবে আমার একটা নীল রঙের টি-পটের কথা মনে পড়ে, মার হাতে দেখেছিলাম—যখন আমার তিন সাড়ে তিন বছর বয়স।' অতীশের ব্যগ্র গলা শোনা গেল 'আর কিছু, আরও ছেলেবেলার?' তুমি অবাক হয়ে আধ-বসার মতো উঠে অতীশের আবছা মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, তোমার মনে হয়েছিল অতীশ এতকাল যা বলতে চেয়েছিল আজ তা বলতে চায়। তোমার ভয় হচ্ছিল অতীশ তার পুরনো অভ্যাসবশে চুপ করে না যায়। তুমি শান্ত গলায় বললে 'বোধহয় একবার জ্বরের ঘোরে আমি একটা থার্মোমিটার ভেঙে ফেলেছিলাম, তখন আমার বয়স বোধহয় আড়াই কি তিন, আবছা মনে পড়ে, আমি থার্মোমিটারটা ছুড়ে ফেলছি, কিন্তু এটা আমার কল্পনাও হতে পারে।' 'হতে পারে'। অতীশ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল 'কিন্তু এরকম মনে করবার চেষ্টা করে দেখো আরও ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে কি না।' তুমি অনেকক্ষণ ভেবেছিলে, তুমি কিছুটা অস্বস্তিবোধ করে বলেছিলে 'না। কিন্তু আর কী মনে পড়বে! দু একটা ঘটনার কথা পুরনো ছবির মতো মনে থেকে যায়। ব্যস।' অতীশ অস্পষ্ট গলায় বলল 'দু একটা ঘটনার কথা নয়, সবকিছু একের পর এক স্পষ্ট মনে করার কথা বলছি যা তুমি আর কারও কাছ থেকে শোনোনি, যা কল্পনারও নয়।' তুমি হেসে উঠেছিলে 'পাগল! তুমি কি পারো আরও ছেলেবেলার কথা মনে করতে?' অতীশ হাসল না, ধীর স্বাভাবিক গলায় বলল 'পারি।' তুমি দ্রুত চিন্তা করে বললে 'কতদূর পারো?' অতীশ তেমনই স্বাভাবিক গলায় বলল 'অনেক, যতদূর যাওয়া যায়।' তুমি হাসছিলে 'তার মানে এক দেড় বছর, ছ' মাস না জন্মমুহূর্ত পর্যন্ত?' অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে উঠল অতীশের চোখ 'ঠিক জন্মমুহূর্তটিও মনে পড়তে পারে।' বলেই সম্ভবত লজ্জায় সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে বলে উঠল 'সুমন, ওই দেখ ওরিয়ন।' সে কথা ঘোরাচ্ছে বুঝতে পেরে সেদিকে তুমি কান দিলে না।' ঠিক আছে' তুমি বলেছিলে 'কীরকম ছিল তোমার জন্মমুহূর্ত?' অতীশ মুখ লুকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল 'অন্যরকম, আমাদের রোজকার জীবনের মতো নয়।' তুমি নিজেও জান না কেন অতীশের স্বর শুনে তোমার রোমকূপে কাঁটা দিয়েছিল। অতীশ হাসল 'মনে করতে করতে ফিরে যাওয়া যায়। তুমিও চেষ্টা করে দেখতে পারো।' তুমি বিশ্বাস করোনি, বলেছিলে, 'কী করে সম্ভব?' অতীশ হাসছিল 'ঠিক জানি না, আগে আমি এটা খেলতাম কিন্তু এখন আর আমি ইচ্ছে করে খেলি না, খেলাটাই পেয়ে বসে আমাকে। কথা বলতে বলতে, কিংবা পথ চলতে আমার ভিতরে খেলাটা শুরু হয়ে যায়। তখনই চেনা-পরিচয় মুছে যায়, কথা ভুল হয়ে যায়, আমি ফিরে যেতে থাকি।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তুমি হঠাৎ উঁচু গলায় হেসে উঠলে অতীশ বড় লজ্জা পেয়েছিল। তুমি বিশ্বাস করোনি, কিন্তু তারপর গোপনে তুমি মাঝে মাঝে অতীশের খেলাটা খেলতে চেষ্টা করেছিলে—কিছুই তোমার মনে পড়েনি। ঠিক স্মৃতিচারণের খেলা নয়। একটু ভিন্ন ও রহস্যময়—ঠিক অতীশের মতো করে সেই খেলা তুমি খেলতে পারোনি। তুমি একা একা আপন মনে 'ইয়াঃ' বলে হেসে উঠেছ। কিন্তু একদিন রোজকার মতোই তুমি খুব ভোরে উঠে খেলার মাঠে গিয়েছিলে। একা একা আবছা অন্ধকারে তুমি আস্তে গড়িয়ে দিলে তোমার ফুটবল তারপর ছুটতে শুরু করলে। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর তোমার গতি বাড়ছিল। মাঠের সীমানা ধরে তুমি তোমার বলটির পিছনে ছুটছিলে মাঠকে সবসময় বাঁ দিকে রেখে চক্রাকারে। সাধারণত তুমি চারবার মাঠটিকে ঘুরে এলে ভোর হয়ে যায়। তুমি তিনবার ঘুরে এসে চারের পাক শুরু করেছিলে, তোমার মাংসপেশিগুলি সতেজ ও রক্তস্রোত দ্রুত হয়ে উঠছিল, ভোরের দম নিয়ে তোমার ফুসফুস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল—এইভাবে চারের পাক শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ভোর হল না। তোমার খেয়াল ছিল

না—বলটা তোমার পায়ের টোকা খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল—তুমি অভ্যাসমত ছুটছিলে। কিন্তু একসময়ে তুমি বুঝতে পেরেছিলে তোমার পায়ে বলটা আর নেই—কোথায় গড়িয়ে গেছে। থেমে তোমার খেয়াল হল তুমি অন্তত সাতবার মাঠটাকে ঘুরে এসেছ অথচ ভোর হয়নি। তুমি বলটা খুঁজবার জন্যে মাঠের দিকে তাকালে, সেখানে গাঢ় অন্ধকার জমে আছে, তুমি আকাশের দিকে তাকালে—সেখানে গাঢ় অন্ধকার জমে আছে। মাঠ না, আকাশ না, সূর্য ও নক্ষত্র কিছুই তুমি দেখতে পেলে না। তুমি পা বাড়িয়ে দেখলে, তুমি হাত চোখের সামনে এনে দেখলে—কিছুই দেখা যায় না। তোমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তুমি যত্নে শেখা তোমার ইন্দ্রিয়গুলির স্পর্শকাতরতার কথা ভুলে গিয়েছিলে, চোখ বুজে দিকনির্ণয় করবার কৌশলের কথাও তোমার মনে এল না। মনে আছে তুমি আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসেছিলে, তোমার দুটি হাত কোলের ওপর জড়ো করা, গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। নিতান্ত তুচ্ছ কারণেই তুমি কাঁদছিলে—কখনও অলি নামে যে মেয়েটিকে তুমি প্রথম চুমু খেয়েছিলে তার জন্য, কখনও বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথটির জন্য, মাঠ সূর্য ও নক্ষত্রগুলির জন্য। তুমি চোখ চেয়ে দেখেছ অনেক, তুমি চোখ বুজেও দেখেছ অনেক, আর একধরনের দেখা তোমাকে খেলাচ্ছলে শিখিয়েছিল অতীশ—তুমি অনুভব করলে সেই খেলা তোমার ভিতরেই গোপনে ছিল এতদিন। তোমার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সেই খেলায় অতি দ্রুত পশ্চাৎগামী রেলগাড়ির মতো তুমি ফিরে যাচ্ছিলে। ক্রমশ আলো ও অন্ধকার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল—ক্রমে চেষ্টারহিত তুমি বুঝেছিলে চোখের মতোই তোমার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি একে একে নিভে গেল। তুমি আর কিছুই স্পর্শ কর না, কিছুই প্রত্যক্ষ কর না, কিছুই শ্রবণ কর না, তুমি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কর না, তোমার আনন্দ ও বিষাদ কিছুই নেই—সেইখানে খুব ভোর আকাশের নীচে তোমার প্রিয় মাঠের ওপর তোমার বীজটি পড়ে আছে যার সঙ্গে 'আমি' এই বোধটুকু মাত্র ধর্মের মতো সংলগ্ন আছে, আর কিছুই নেই। 'আমি' এই বোধটুকু মায়ার মতো তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে সৃষ্টি করেছিল—অলৌকিক এই শিল্প-নির্মাণ। এ তোমারই। তুমি প্রাণপণে সেই বোধ ভেদ করতে চাইছিলে, চিৎকার করে উঠতে চাইছিলে, দৌড়াতে চাইছিলে—পারলে না। কয়েকটি অলীক মুহূর্তের পর কে যেন আবার খেলাচ্ছলে তোমার কোলের কাছে বলটি ঠেলে দিলে তুমি দুহাতে তুলে নিলে তোমার বল, বুকের মধ্যে চেপে ধরে তাকিয়ে দেখলে—সবুজ বিস্তৃত মাঠ, সূর্য উঠছে। তুমি নড়লে না, তুমি তেমনই বসে রইলে—এতদিন তোমার যা দেখা হয়নি সব কিছুর জন্য অবিরল চোখের জলে তোমার বুক ভেসে যাচ্ছিল। তুমি চোখ মেলে সেই অন্ধকার আর কখনও দেখনি।

এরপর দীর্ঘকাল কেটে গেলে একবার বিদেশে থাকতে তুমি জেনেছিলে অতীশ সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে গেছে, এই কারণে যে, সে বিয়ে করবার পর নিতান্ত সন্দেহবশত তার বউ মল্লিকার কৌমার্য হরণ করতে পারেনি বলে মল্লিকা তাকে ত্যাগ করে গিয়েছিল। তারপর অতীশের কথা তোমার আর মনে ছিল না। কিন্তু যখন তুমি বিদেশে প্রবাসে অচেনা রাস্তায় ও মাঠে হেঁটেছ, যখন কোনও নদীর ধারে দাঁড়িয়ে নিসর্গ প্রত্যক্ষ করেছ, যখন সমুদ্র পাড়ি দিয়েছ তখন শৈশব বাল্য ও কৈশোরের কোনও কোনও ছবি মনে ভেসে উঠলে তোমার অতীশের সেই খেলাটার কথা মনে পড়েছে। তুমি একা একা আপন মনে 'ইয়াঃ' বলে হেসে উঠেছ। এইভাবে তুমি তোমার উনত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে গেলে একদিন এক পার্টিতে তোমার পরিচিতদের মধ্যে একজন তোমার হাতটা চেপে ধরেই ছেড়ে দিয়ে বলেছিল 'সুমন, তোমার গায়ের জোর কমে যাচ্ছে।' তুমি চমকে উঠেছিলে, কেননা তুমি বাস্তবিক অনুভব করেছিলে তোমার জোর

Shahnaz

অনেক কমে এসেছে। তুমি আগেকার মতো আর ফুটবল নিয়ে দৌড়োও না। খেলাধুলো তুমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছ। সেই স্পর্শকাতরতাও তোমার আর নেই। তুমি অনুভব কর তুমি কখনও বিধর্মী, কখনও তুমি ধর্মদ্রোহী—তাই তোমার মধ্যস্থ অলৌকিক এখন তোমার ভিতরে মাঝে মাঝে ত্রাসের সঞ্চার করে। আর তোমার যা আছে তোমার ধর্মহীন ক্রিয়াকাণ্ড, বোধ ও প্রবৃত্তি—এ সবই তোমার কাছে তুচ্ছ। আপাদমস্তক তুমি তোমার কাছেই গুরুত্বহীন ও সামঞ্জস্যশূন্য। সুতরাং বিপদে কে তোমাকে রক্ষা করে, একাকিত্বে কে তোমাকে সঙ্গ দেয়? আবার তোমার বিশ্বাস এই যে তুমি স্পষ্টতই এক ধারাবাহিকতার সূত্রে গ্রথিত আছ—তুমি প্রাকৃত। তুমি অনেকের দ্বারা রক্ষিত, তুমিই আবার অনেকের রক্ষাকারী। প্রয়োজনশূন্য তুমি নও—তুমি সম্পর্কযুক্ত মানুষ—ধারাবাহিক—তুমিও দূরবর্তী ক্রীড়াভূমির দিকে একজন মশালবাহী—তোমার এ বিশ্বাস গথিক গম্বুজের মতো দৃঢ়মূল। সুতরাং অলৌকিক তোমার কাছে নীতিবিগর্হিত অনুপ্রবেশকারী, যেহেতু তুমি আয়নায় প্রায়ই নিজের মুখ প্রতিবিম্বিত দেখেছ, তুমি দোকানে দোকানে ক্রয়কারী যুবতীদের দেখেছ, তুমি গাছে গাছে বয়সের ফসল প্রত্যক্ষ করেছ, তুমি ফসলের ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন জলসেচন ও পক্ব শস্যকে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করেছ। তোমার ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও কর্মক্ষম, তুমি বাহ্যকাম ও ব্যবহারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারো, তুমি স্বভাবে আছ, তবে কেন এই অলৌকিক?

দেশ, ১৩৭২

Shahnaz

খগেনবাবু

নলতাপুরের বাসে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সামনের দিকে খগেনবাবুকে দেখতে পেল দিগম্বর। অন্তরাত্মা পর্যন্ত চমকে উঠল। নলতাপুরের বাসে খগেনবাবু কেন? ইদিকে তো ওনার আসার কথাই নয়। তবে কি এত বছর বাদে খবর হয়েছে।

মেয়েদের সিটে এঁটে বসে আছে জুঁইফুল। সংক্ষেপে জুঁই। জায়গা নিয়ে একটু আগে ক্যাটর ক্যাটর করে ঝগড়া করেছে অন্য সব মেয়েমানুষদের সঙ্গে। তারা বলছে, জায়গা নেই। জুঁই বলছে, ঢের জায়গা, চেপে বসলেই হয়। সেই কাজিয়ায় দিগম্বর নাক গলায়নি। জুঁইয়ের গলার জোরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পারেও বটে মেয়েটা। সিটে গায়ে গায়ে মেয়েমানুষ বসা, সর্ষে ছড়ালেও পড়বে না এমন অবস্থা। তার মধ্যেই ঠিক ঠেলে গুঁতিয়ে জায়গা করে বসেছে। খুব আরামে না হলেও বসেছে তো। এখন দিব্যি ঘাড় ঘুরিয়ে চলন্ত বাস থেকে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

জুঁইয়ের মুখোমুখিই প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল দিগম্বর। প্রাইভেট বাস, কন্ডাকটর ঠেলে লোক তোলে, যতক্ষণ না বাসের পেট ফাটো-ফাটো হয়। ফলে লোকের চাপে ঠেলা খেতে খেতে অনেকটা সরে এসেছে সে। আরও সরত, সামনে এক বস্তা গাঁটি কচু থাকায় ঠেকে গেছে। এখান থেকে জুঁই মাত্র হাত তিনেক তফাতে। কিন্তু মাঝখানে বিস্তর কনুই, হাত, মাজা আর মাথার জঙ্গল থাকায় তিন হাতই এখন তিনশো হাত। আর বাসের মধ্যে চতুর্দিকে এমন গণ্ডগোল হচ্ছে যে, খুব চেঁচিয়ে না ডাকলে জুঁই শুনবেও না।

কিন্তু জানান দেওয়াটা একান্ত দরকার। একেবারে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা দাঁড়াল কিনা ব্যাপারটা। আর কেউ নয়, স্বয়ং খগেনবাবুই বাসে সামনের দিকে।

একটু আগে জুঁই যখন চেঁচিয়ে ঝগড়া করছিল তখন তার গলা খগেনবাবুর কানে যায়নি তো! এতদিনে অবশ্য জুঁইয়ের গলার স্বর খগেনবাবুর ভুলে যাওয়ারই কথা। আর বাসের কে না চেঁচাচ্ছিল তখন? অত
চেঁচামেচিতে কে কার গলা চিনবে!

সুবিধে এই যে, বাসে একেবারে গন্ধমাদন ভিড়। একটু আগেও দিগম্বর ভিড়ের জন্য

Shahnaz

কন্ডাকটরকে দু কথা শুনিয়েছে, পয়সাটাই চিনলে, মানুষের সুখ দুঃখ বুঝলে না। আমাদের কি গরু ছাগল পেয়েছ, নাকি তামাকের বস্তা? এখন অবশ্য দিগম্বর মনে মনে বলছে, ভিড় হোক, বাবা, বাসে আরও ভিড় হোক। গাড়ির পেট একেবারে দশমেসে হয়ে যাক।

খগেনবাবুকে দেখেই ঘাড়টা নামিয়ে ফেলেছে দিগম্বর। এখনও সেটা নোয়ানো অবস্থাতেই আছে। সুযোগ বুঝে পিছন থেকে কে যেন হাত ভেরে যাওয়ায় নিজের হাতব্যাগটা আলতো করে তার কাঁধে রেখেছে। অন্য সময় হলে খেঁকিয়ে উঠত, এখন কিছু বলল না। বরং ব্যাগটার আড়াল থাকায় একরকম স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তিটা বড় ঠুনকো। সানকিডাঙায় বেশ কিছু লোক নেমে যাবে, হত্তুকিগঞ্জে আজ হাটবার—সেখানে তো বাস একেবারে সুনসান হয়ে যাওয়ার কথা। তবে উঠবেও কিছু সেখান থেকে। কিন্তু তা ওঠানামার ফাঁকেই খগেনবাবু যে পিছনে তাকাবেন না এমন কথা হলফ করে কি বলা যায়। জুঁইকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। এদিকে তাকাচ্ছে না। নতুন-নতুন কারণে অকারণে তাকিয়ে থাকত। পুরনো হওয়ায় এখন আর চোখেই পড়ে না।

ভেবে একটু অভিমান হচ্ছিল দিগম্বরের। এই যে সে ভালমানুষদের চাপে অষ্টাবক্র হয়ে গাঁটি কচুর বস্তায় ঠেক খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যে 'আহা, উহঁ' করার আছে কে এই দুনিয়ায়?

কিন্তু অভিমানের সময় নেই। জানান দেওয়াটাই একটা ভীষণ দরকার! গলা তুলে ডাকতে পারছিল না দিগম্বর। খগেনবাবু শুনে ফেলবে। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জুঁইয়ের প্লাসটিকের চটি পরা একটা পা একটু এগিয়ে আছে। চেষ্টা করলে পা বাড়িয়ে জুঁইয়ের পা-টা হয়তো ছোঁয়া যায়।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে যেই পা তুলেছে অমনি হড়াস করে কচুর বস্তায় বসা লোকটার কোলসই হয়ে গেল দিগম্বর। লোকটা খুন হওয়ায় আগে যেমন মানুষে চেঁচায় তেমনি চেঁচাতে তাকে, ওরে বাবারে! গেলাম! গেলাম!

দিগম্বর বুঝল, হয়ে গেছে। এই গোলমালে খগেনবাবু নিশ্চয়ই তাকাবে। সে মুখ তুলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ! চুপ।

লোকটা কোঁকাতে কোঁকাতেও তেজের সঙ্গে বলে, কেন চুপ করব? চুরি করেছি নাকি? কোথাকার ঢ্যামনা হে তুমি? ওপরের শিক ভাল করে ধরতে পারো না? ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

কাঁকালে লেগেছিল দিগম্বরের। গাঁটি কচু যে বাসের ছাদেই ওঠানো উচিত, বাসের ভিতরে নয়, সে কথাটা তুলতে পারত। কিন্তু খগেনবাবুর ভয়ে বলল না কিছু।

ভেবেছিল চেঁচামেচি শুনে সবাই তাকাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে বুঝল, চারদিকে হাটুরে গণ্ডগোলে ব্যাপারটা লোকে গ্রাহ্যই করেনি। জুঁইও আচ্ছা লোক বটে। সামনেই এতবড় কাণ্ড ঘটে গেল, একবার তাকাবে তো! তা নয়, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঠঘাট দেখছে।

বাস থামে। চলে। আবার থামে। দিগম্বরের দু জোড়া চোখ থাকলে ভাল হত। তবু সাধ্যমত সে খগেনবাবু আর জুঁইয়ের দিকে নজর রাখে। খগেনবাবুর কপালের বড় আঁচিলটা এখনও দিব্যি আছে। মাথার চুলে বাঁকা টেরি। গায়ে সেই একপেশে বোতামঘরওলা পাঞ্জাবি। ভুঁই কালো রঙের মধ্যেই আরও ঢলঢলে হয়েছে। চোখ দুখানা আগের মতো চঞ্চল নয়। ধীরস্থির।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দিগম্বর। পাপ কাজ করলে ধরা পড়ার ভয়ও থাকে বটে। কিন্তু এই হাওড়া জেলার নলতাপুরের বাসে খগেনবাবুর দেখা পাওয়ার কথাই নয়। পেট থেকে একটা ভয়ের ভুড়ভুড়ি গলায় উঠে আসায় দিগম্বর একটা ঢেঁকুর তুলল।

জুঁইয়ের মাথার উপর দিয়ে এক একজন জানালায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে! তার বগলটা জুঁইয়ের নাকের ডগায়। জুঁই দুর্গন্ধ পাওয়ার মতো নাক কুঁচকে মুখ তুলে বগলবাজকে কী যেন বলল। জয় মা। যদি এবার তাকায়!

তা তাকালও, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিঁড়ে চ্যাপটা দিগম্বরকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বগলবাজ ধমক খেয়ে তার বগল গুটিয়ে নিয়েছে। যত সব মেনিমুখো পুরুষ! বগলটা আর একটু রাখলে আবার তাকাত জুঁই।

সানকিডাঙা! সানকিডাঙা! দিগম্বরের পিলে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কন্ডাকটর।

বাস থেমেছে। হুড় হুড় করে লোক নামছে। দিগম্বর পাটাতনে উবু হয়ে বসে চোখ বুজে আছে। সর্বনাশ! বাস খালি হয়ে যাবে নাকি! নেমেই যাচ্ছে যে!

উবু হওয়ায় জুঁইয়ের চটির ডগাটা হাতের কাছ পেয়ে গেল সে। ভিড়ও অনেক কমেছে। হাত বাড়িয়ে একবার নাড়ল। কচুওয়ালা বড় বড় চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। কিছু বলতে মুখটা ফাঁকও করেছিল বোধহয়। কিন্তু তা দেখার অত সময় নেই দিগম্বরের।

জুঁই পা-টা পট করে টেনে নিয়েই সোজা তাকাল তার দিকে। বলল, ও কি গো?

এমন সুযোগ আর আসবে না। দিগম্বর একটু হামা টেনে মুখটা কাছে নিয়ে বলল, বাসের সুমুখ দিকে খগেনবাবু। তাকিয়ো না বোকার মতো। ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বোসো।

শুনে কেমনধারা ফ্যাকাশে মেরে গেল জুঁই। দুবার বলতে হল না। ফট করে ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে ফেলল।

সানকিডাঙায় নামল যত, উঠলও তত। আবার ঠাসা-চাপা গন্ধমাদন ভিড়। তবে দিগম্বর বসে ছিল, বসেই রইল। দু একজন হাঁটুর গুঁতো দিয়ে অবশ্য দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। বলল, দাঁড়াও! দাঁড়াও! বসলে জায়গা আটকে থাকে। দিগম্বর কাতর মুখ করে বলল, শরীর খারাপ। বড় বমি আসছে। শুনে লোকজন আর কিছু বলল না, বরং একটু যেন তফাতে চেপে থাকারই চেষ্টা করতে লাগল। কচুওয়ালা মহা ত্যাঁদড়! কিছু আঁচ করে মাঝে মাঝে শেয়ালের মতো চাইছে। দিগম্বর তার দিকে চেয়ে দেঁতো হাসি হেসে বলল, হত্তুকিগঞ্জের হাটে যাচ্ছ নাকি? কচুওয়ালা দিগম্বরকে পাত্তা না দিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছোটলোক আর বলে কাকে।

বসে থেকে চারদিকে বাঁশবনের মতো লোকের পা দেখে দিগম্বর। পা দেখে কে কেমন লোক তা বোঝা যায় না। মুখ দেখে যায়। বেশির ভাগ পা-ই প্যান্ট ধুতি পায়জামা আর লুঙ্গিতে ঢাকা। এর ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে অবশ্য জুঁইকে দেখতে পাচ্ছে দিগম্বর। কাণ্ড দেখ! জুঁই গলা টানা দিয়ে ঘোমটা ফাঁক করে সামনের দিকে চাইছে মাঝে মাঝে। মেয়েমানুষ কোনওকালে কথা শুনবে না। হাঁ-হাঁ করে ওঠে দিগম্বর, কিন্তু তার কথা জুঁইয়ের কানে যায় না।

বসে আরও কষ্ট। হাঁটু ঝিনঝিন করে এত টাইম মেরে বসে থাকায়। চারদিকে পা, তার ঠেলাও কম নয়। কচুর গাঁটটায় এক হাতে ভর দিতে গিয়েছিল, কচুওয়ালা তেরিয়া হয়ে বলল, ভর দেবে না। কচু থেঁতলে যাবে। দিগম্বর ফোঁস করে ওঠে, আর তুমি যে বসেছ কচুর ওপর! কচুওয়ালা তার জবাব দিল, আমার কচু। আমি বসব তোমার তাতে কী যায় আসে?

বিপদে পড়লে সবাই মাথায় চড়ে। দিগম্বর আর কথা বাড়ায় না।

কখন যেন একটা মেয়েছেলে নেমে যাওয়ায় জুঁই একটু এগিয়ে এসে বসতে পেরেছে! এখন প্রায় দিগম্বরের মুখোমুখি। হঠাৎ ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা নামিয়ে এনে বলল, কোথায় দেখলে? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো।

Shahnaz

দিগম্বর দাঁত কিড়মিড় করে। আহা, দেখার জন্যে একেবারে আঁকুপাঁকু যে। দু দুটো বউ পেরিয়েও মেয়েছেলেদের ব্যাপারটা আজও ধাঁধা লাগে দিগম্বরের। কী যে চায় ত ওরাই জানে।

সে চাপা ধমক দিয়ে বলল, আছে আছে। ঘোমটা টেনে চুপ মেরে বসে থাকো। খবরদার তাকাবে না!

কচুওয়ালা সব শুনছে। ভারী লজ্জা লাগে দিগম্বরের।

ভুল দেখনি তো! জুঁই বলে।

জলজ্যান্ত খগেনবাবু। ভিড় টপকে দেখবে কী করে? দাঁড়ালে দেখা যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে দেখব?

আ মোলো! একজন বসা মেয়েমানুষের হাঁটুতে কপালটা ঠুকে গেল দিগম্বরের। বলল, পাগল হলে নাকি?

আহা আমার তো ঘোমটা আছে। দেখব?

মরবে বলছি, মরবে!

জুঁই আবার সোজা হয়ে বসে। দেখার চেষ্টা করে না ঠিকই। তবে বে-খেয়ালে ঘোমটা অনেক সরে গেছে।

হত্তুকির হাট! হত্তুকির হাট! কন্ডাক্টর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

খগেনবাবু কোথায় নামবে তা জানা নেই। কাঁটা হয়ে থাকে দিগম্বর। চারদিকে পায়ের যে ঘন বাঁশবন ছিল তা এক লহমায় ফাঁকা ফাঁকা হয়ে এল। হত্তুকির হাট জায়গাটা বড় ভয়ের। এখানেই সবচেয়ে বেশি লোক নামে। এমন কি কচুওয়ালা পর্যন্ত তার গাঁট কাঁধে তুলছে। সামনে একটা আড়াল ছিল। তাও গেল। গাঁট তুলতে তুলতে কচুওয়ালা কটমট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। কিছু লোক আছে কিছুতেই অন্য মানুষকে ভাল চোখে দেখে না।

দিগম্বর চোখ বুজে ভগবানকে বলছিল, খগেনবাবুর যেন এখানেই কাজ থাকে।

বেহায়া মেয়েছেলেটাকে দেখ। ঘোমটা প্রায় খসে পড়েছে। মুখখানা উদোম খোলা। গলা টানা দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে ড্যাবা ড্যাবা চোখে। লজ্জার মাথা খেয়ে দিগম্বর জুঁইয়ের কাপড় ধরে টান দিল। চাপা গলায় বলল, বসে পড়ো। বসে পড়ো।

জুঁইয়ের জ্ঞান ফেরে। ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দেয়। তারপর কুঁজো হয়ে দিগম্বরকে বলে, দেখেছি।

দিগম্বর কটমট করে তাকায়। বলে, উদ্ধার করেছ। তোমাকে দেখেছে?

না। এদিকে তাকাচ্ছে না। সঙ্গে কারা আছে মনে হল। তারা বসে আছে বলে দেখা গেল না। আবছা যেন মনে হয়, বউ মতো কেউ। তার সঙ্গে কথা বলছে আর সিগারেট খাচ্ছে। বলেই জুঁই আবার সোজা হয় এবং ফের অবাধ্য হয়ে সামনের দিকে টালুকটলুক চেয়ে থাকে।

বাসের মাথায় ধমাধম মাল চাপানোর শব্দ হচ্ছে। বিস্তর চেঁচামেচি। কাতারে লোক উঠছে ভিতরে। অনেক ধমক চমক অপমান সয়েও দিগম্বর বসেই থাকে। সামনে বাঁশগেড়ের খাল। পুরনো পোল দু বছর আগের বানে ভেসে গেছে। নতুন পোল তৈরি হচ্ছে সবে। ফলে বাস ওপারে যায় না। যাত্রীরা একটা বাঁশের সাঁকো পায়ে হেঁটে পেরিয়ে ওপাশে বাস ধরে। বাঁশগেড়েতে বাস থেকে নামলে কী হবে তাই ভাবে দিগম্বর, আর বিরক্ত চোখে জুঁইয়ের কাণ্ড দেখে। নতুন নতুন যেমন তাকে অপলক চোখে দেখত, এখন ঠিক সেই চোখে সামনের দিকে চেয়ে খগেনবাবুকে দেখছে! মেয়েছেলেদের কি ভয়ভীতি নেই?

ভিড়টা আবার চেপে আসার পর বুকে আটকানো দম ছাড়ে দিগম্বর। জুঁই এখনও দেখছে। বিরক্তি কেটে এবারে একটু মায়া হল দিগম্বরের। জুঁইকে দোষ দেওয়া যায় না। একসময়ে তো খগেনবাবুরই বিয়ে করা বউ ছিল জুঁই। চার পাঁচ বছর সুখে দুঃখে টানা ঘরও করেছে। তারপর না হয় পালিয়ে এসেছে দিগম্বরের সঙ্গে। তা বলে তো আর সব কিছুই ভুলে যাওয়া যায় না। দিগম্বরের সঙ্গে আছে মাত্র চার বছর, ভুলে যাওয়ার পক্ষে সময়টাও বেশি যায়নি। বাচ্চা কাচ্চা হয়েছিল না ভাগ্যিস! হলে এতক্ষণে বোধহয় গিয়ে হামলে পড়ত।

জুঁই হঠাৎ আবার নিচু হল। বলল, সঙ্গের জন মেয়েছেলেই বটে, বুঝলে।

হোক না। দিগম্বর তেতো মুখে বলে।

মুখটা দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য। নীল রঙের শাড়ি, জরির পাড়।

তোমাকে দেখেনি তো!

না। দুজনে খুব কথা হচ্ছে।

হোক। তুমি মুখ ঘুরিয়ে থাকো!

পান খেল এইমাত্র। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলতে দেখলাম। মেয়েছেলেটাই পান দিল।

দিকগে। অত দেখো না, ধরা পড়ে যাবে।

জুঁই ভ্রূ কুঁচকে বলে, মেয়েছেলেটা কে বলো তো। বউ নাকি?

কে বলবে! তুমিও যা জানো, আমিও তাই।

খুব বলত, আমি মরে গেলে নাকি আর বিয়ে করবে না।

আহা, তুমি তো আর মরে যাওনি!

মরার চেয়ে কম কি? মেয়েমানুষের কতরকম মরণ আছে, জানো?

জুঁই আবার সোজা হয়।

বাঁশগেড়ে এসে গেল বলে। বসে থেকেও বঝতে পারে দিগম্বর। এইবার নামতে হবে। ভাবতে শরীর হিম হয়ে আসে। মাঝখানে শুধু পাথরগড়ে একটুখানি থামবে। তা সে পাথরগড়েই থামল বোধহয়। কারা যেন নামল সামনের দরজায়। এখানে বেশি লোক নামেও না, ওঠেও না। তাই নামবার তেমন হইচই নেই। তবু বোঝা গেল কারা যেন নামছে। খগেনবাবুই কি?

জুঁইয়ের শাড়ি ধরে আবার একটু টান মারে দিগম্বর। জুঁই নিচু হয়।

কী বলছ?

কারা নামল?

কী করে জানব? কত লোক নামছে উঠছে! কেন?

ওরা কিনা?

জুঁই ফিক করে এই বিপদের সময়ে একটু হাসেও। বলে, না। কর্তা বসার জায়গা পেয়েছেন। এদিকে পিছন ফেরানো। ভয় নেই। মেয়েমানুষটাকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না।

দেখতে চাইছ কেন?

দেখি না কীরকম।

ভালই হবে। খগেনবাবুর মেলা পয়সা। ভাল মেয়েছেলেই পাবে। তুমিও তো খারাপ ছিলে না।

আমি তো কালো।

Shahnaz

রংটাই কি সব?

জুঁই মুখ গোমড়া করে বলে, কর্তা অবশ্য কোনওদিন কালো বলেনি। বরং বলত, মাজা রংই আমার পছন্দ।

এদিকে কোথায় যাচ্ছে বলো তো দিগম্বর জিজ্ঞেস করে।

কী জানি।

আত্মীয় স্বজন কেউ নেই তো।

না। তবে শ্বশুরবাড়ি হতে পারে।

দূর। এদিকে বিয়ে হলে সে খবর আমি ঠিক পেতাম।

জুঁইয়ের কথা বলায় মন নেই। আবার সোজা হয়ে বসে দেখছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে প্রায়।

এই করতে করতে বাসটা থেমে এল। কন্ডাক্টর ছোকরা তেজি গলায় চেঁচাল বাঁশগেড়ে, বাঁশগেড়ে। বাস আর যাবে না।

ঘচাং করে বাসটা থামতেই হুড়ুম দুড়ুম লোক নামতে থাকে। জুঁই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দিগম্বর হাত ধরে টেনে বলল, দেখেশুনে! দেখেশুনে!

জুঁই হাঁ করে চাইল দিগম্বরের দিকে, যেন চিনতেই পারছে না। চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ যেন চেতন হয়ে বলে উঠল, ফর্সা। খুব ফর্সা। বুঝলে!

কে?

বউটা।

হোক না। তাতে তোমার কি?

জুঁই মাথা নেড়ে বলে, কিছু না। বললাম আর কি!

সাবধানে মাথা তোলে দিগম্বর। ভিড়ের প্রথম চোটটা নেমে গেছে। ধীরে সুস্থে খগেনবাবু উঠল। ফর্সা মেয়েছেলেটাও। খগেনবাবু মেয়েছেলেটার কোল থেকে একটা বছর খানেকের খোকাকে নিজের কোলে নিলে। বলল, সাবধানে নেমো।

জুঁই প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, খোকাটা দেখেছ! কী সুন্দর নাদুস-নুদুস।

আর একটু হলেই খগেনবাবু ফিরে তাকাত। ধুতির খুঁটটা সিটের কোণে আটকে যাওয়ায় সেটা ছাড়াচ্ছিল বলে তাকিয়েও তাকাল না। সেই ফাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে জুঁইয়ের হাত ধরে টেনে নেমে পড়ে দিগম্বর। বাসের পিছনে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, তোমার মতলবখানা কী বলো তো! বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেল নাকি?

জুঁই হাঁ করে দিগম্বরের দিকে তাকায়। মেঘলা আকাশের ফ্যাকাশে আলোয় ওর মুখখানা দেখায় যেন ঘোরের মধ্যে আছে। চিনতে পারছে না দিগম্বরকে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চিনতে পারল যেন। বলল, বিয়েই করেছে তাহলে।

করবে না কেন? দুনিয়ায় কে কার জন্য বসে থাকে?

জুঁই মাথা নেড়ে ভাল মানুষের মতো বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।

দিগম্বর উঁকি দিয়ে দেখল বহু মানুষ বাঁশের সাঁকো পেরোতে লাইন দিয়েছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। তার মধ্যে খগেনবাবু বা সেই ফর্সা মেয়েছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে ধীরে ধীরে দিগম্বর আর জুঁই এগোয়। দেরি হয়ে গেছে। ওপারের বাসে আর বসার জায়গা পাবে না তারা। কিন্তু সে কথা কেউ ভাবছে না।

সাঁকোটা নড়বড় করে দোলে। মেলা লোকের পায়ের চাপে মড়মড় শব্দ উঠছে। কখন ভাঙে তার ঠিক নেই। খুব সাবধানে জুঁই আগে আগে, দিগম্বর তার পিছু পিছু সাঁকোতে ওঠে। নীচে ভরা বর্ষার খাল গোঁ-গোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টানে সাঁকো থরথর করে কাঁপে। সবটাই ভালয় ভালয় পেরিয়ে একেবারে জমিতে পা দেওয়ার মুখে জুঁইয়ের পা ফসকাল।

উরে বাবাঃ। বলে টাল্লা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে, কিন্তু গায়ে গায়ে মেলাই লোক, পড়বে কোথায়। তাই পড়ল না জুঁই। একজনে পিঠে ধাক্কা খেয়ে সেই পিঠেই হাতের ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠল।

একটা খোকা কেঁদে উঠল, হঠাৎ। লোকটা মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, দেখেশুনে চলবে তো মেয়ে! আর একটু হলেই ছেলেটা ছিটকে পড়ত।

জুঁই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিগম্বরের বুক হিম হয়ে যায়। লোকটা খগেনবাবু। কোত্থেকে যে উদয় হল হঠাৎ।

দুজনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে তার সাধ্য কি? সাঁকোর সরু মুখে ঠেলাঠেলি দৌড়াদৌড়ি। কে আগে যাবে। তাই দুজনকেই এগোতে হল।

সামনেই খগেনবাবু যাচ্ছে। কোলের খোকাটা চুপ করে চেয়ে দেখছে পিছন বাগে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দিগম্বরের। চাপা স্বরে বলে, চিনতে পারেনি।

জুঁই ফিরে চায়। তেমনি ভ্যাবলা আনমনা মুখ। চোখের দৃষ্টিতে যেন সর পড়েছে। কিছু দেখছে না যেন।

কিছু বলছ?

বললাম, কপালটা ভাল। আমাদের চিনতে পারেনি।

বউটাকে দেখলে ভাল করে?

ও আর দেখব কি? রংটাই যা ফর্সা।

জুঁই মাথা নাড়ে, না মুখটাও সুন্দর।

থ্যাবড়া মুখ। তোমার মতো বড় বড় চোখ নয়।

তুমি তো ভয়ে চামচিকে হয়ে আছ, দেখলে কখন?

দেখেছি।

ছাই দেখেছ। বউটা সুন্দরীই।

আমার চোখে লাগল না।

জুঁই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা। দেখ ওরা মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে।

দুজনেই দাঁড়িয়ে যায়। কাঁচা সরু রাস্তায় লোকের ঠেলাঠেলি। বাসটা সামনেই দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে। তার গায়ে লোকে গিয়ে পিঁপড়ের মতো জমাট বাঁধছে।

পথ ছেড়ে দুজনে ঘাস জমিতে সরে দাঁড়ায়। দেখে খগেনবাবু কোলে বাচ্চা আর পিছনে বউ নিয়ে মাঠের পথ ধরে পুবমুখো যাচ্ছে।

দিগম্বর বলল, এ জায়গা হল দীঘরে। পুবে গামছাডোবা। গামছাডোবাতেই যাচ্ছে তাহলে।

জুঁই তেমনি আচ্ছন্ন ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলল, বেশ দেখাচ্ছে না?

বউ বাচ্চা নিয়ে খগেনবাবু মেঘলা আকাশের নীচে মাঠ পেরিয়ে গামছাডোবায় যাচ্ছে তাতে সুন্দর দেখানোর কী আছে বোঝে না দিগম্বর।

Shahnaz

দেরি করলে চলবে না। বাস ছাড়বে এখুনি। নলতাপুরে জুঁইয়ের দেড় বছরের মেয়েটা বড় বউয়ের জিম্বায় আছে। বড় বউ আবার বেশিক্ষণ জুঁইয়ের বাচ্চা রাখতে হলে চেঁচামেচি করে। তার নিজেরই তিনটে।

দিগম্বর তাড়া দেয়, চলো চলো। দেরি হচ্ছে।

আঃ, দাঁড়াও না।

দাঁড়াব! বলো কি? এরপর সেই সাড়ে সাতটায় লাস্ট বাস।

হোকগে।

তার মানে?

জুঁই কথাটা শুনতে পায় না। সামনে আদিগন্ত খোলা হা-হা করা মাঠে মেঘলা আলোর মধ্যে খগেনবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছে। সাবধানে আল পেরোচ্ছে। বউয়ের হাতে একটা চামড়ার ছোট সুটকেস।

কন্ডাক্টর হাঁকাহাঁকি করছে জোর গলায়, নলতাপুর...নলতাপুর...চরণগঙ্গা।

দিগম্বর চেয়ে দেখে, বাসের বাইরে আর লোক পড়ে নেই। যে যেখানে পেরেছে উঠে পড়েছে। ছাদে পর্যন্ত।

জুঁইফুল! কী হচ্ছে শুনি। দিগম্বর একটু আদর মিশিয়ে ডাকে।

জুঁই জবাব দেয় না। তবে বড় বড় চোখে তাকায়। এরকম তাকানো কোনও কালে দেখেনি দিগম্বর। আজই কেমনধারা একটু অন্যরকম দেখছে। ভূতে পেলে বোধহয় এমন হয়।

কিছু বলছ? আবার জিজ্ঞেস করে জুঁই। কিন্তু জবাব শোনার আগেই আবার মাঠের দিকে চেয়ে দেখে। ফিসফিস করে বলে, সত্যি বলছ চিনতে পারেনি?

বরাতজোর আর কাকে বলে! চিনলে রক্ষে ছিল না। একসময়ে তো খগেনবাবুর চামচাগিরি করতাম।

কিন্তু চিনল না কেন বলো তো।

ভুলে গেছে। মুখটা ভুলে গেছে।

তা কি হয়! আমি তো ভুলিনি। তবে কর্তা ভোলে কী করে?

দেখেনি ভাল করে।

ধমকাল কিন্তু। মেয়ে বলে ডাকল।

শুনেছি তো।

এত কাছে থেকে দেখেও না চেনার কথা তো নয়।

তুমিই বা বেছে বেছে ওর ঘাড়ে পড়তে গেলে কেন?

সে কি ইচ্ছে করে? পড়লাম, উঠে বুঝলাম একেবারে কর্তার পিঠের ওপর...ও, গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখ! কতকাল পর...

কী কতকাল পর?

সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি তোমায় মেয়েমানুষটা যত ফর্সাই হোক, কর্তার চোখে ও রং ধরবে না।

তাই বা বলছ কী করে?

বলছি, জানি বলেই। কর্তার পছন্দ মাজা রং।

বিরক্ত হয়ে দিগম্বর বলে, না হয় তাই হল। এবার চলো তো। বাস ভেঁপু দিচ্ছে। কন্ডাক্টর

ওই হাতছানি দিয়ে ডাকতে লেগেছে, দেখ চেয়ে।

দাঁড়াও না। এ বাসটা ছেড়ে দাও। পরের বাসে যাব।

উরে বাস! বলো কি। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত থাকব কোথায়? জল এলে দীঘরেতে মাথা বাঁচানোর জায়গা নেই!

আমি এখন যাব না। দেখব।

কী দেখবে?

ওরা কতদূর যায়। একদম মিলিয়ে গেলে তবে যাব।

কিন্তু বাস যে—

তাহলে তুমি একা যাও। আমি একটু দেখি।

বাস তাদের আশা ছেড়ে দিয়ে অবশেষে ছাড়ে। দিগম্বর অবশ্য যায় না। একটা হাই তুলে গাছতলায় গিয়ে বসে বিড়ি ধরায়।

জুঁই মেঘলা আলোয় মাঠের দিকে তেমনি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

Shahnaz

খেলা

খুব ভোরে ইনডোর সুইমিং পুলের ধারে তিনি এসে দাঁড়ালেন, মুখে হাসি নেই, গাম্ভীর্যও নয়, একটু চিন্তিত বোধ হয়, প্যান্টের দু পকেটে হাত, কাঁধটা একটু উঁচুতে তোলা, দু পা পরস্পরের সঙ্গে কাটাকুটি করা, গায়ে সাদাকালো একটা ব্যানলনের গেঞ্জি। নিথর জলে তাঁর ছায়া পড়েছে। একটু ঝুঁকলেই নিজের ছায়া তিনি দেখতে পারেন। কিন্তু গত বিশ বাইশ বছর ধরে তিনি পৃথিবীর হাজারও পত্রপত্রিকায়, পোস্টারে, চলচ্চিত্রে বা টেলিভিশনে নিজের এত ছবি দেখছেন যে নিজের ছায়া বা প্রতিবিম্ব দেখতে তাঁর আর কোনও ইচ্ছেই হয় না। সারাটা জীবন তাঁকে তাড়া করছে হাজারও ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট, হাজারও সাক্ষাৎকার, লক্ষ লক্ষ লোকের জয়ধ্বনি, স্তুতি ও ভালবাসা।

এই হোটেলটা কতদূর ভাল তা তিনি বলতে পারেন না। এই শহরটাই বা কীরকম তাও তাঁর জানা নেই। গতকাল গভীর রাতে তিনি এই শহরে নেমেছেন বিমান থেকে। বিমানবন্দরে অত রাতেও অগুন্তি লোক অপেক্ষা করছিল। গভীর জয়ধ্বনি সমুদ্র গর্জনের মতো রোল তুলল তিনি বিমান থেকে বেরোতে না বেরোতেই। তিনি মানুষ দেখে দেখে ক্লান্ত—একথা বলা যায় না। তবে মানুষ কি তাঁকে দেখে দেখে ক্লান্ত হয় না কখনও? জয়ধ্বনি তাঁর আজকাল একই রকম লাগে, যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় তাঁকে স্বাগত জানায়। তবু ধ্বনি কিন্তু প্রায় এক।

শহরটা তিনি দেখতে পেলেন না। দেখার ইচ্ছেও ছিল না। লাক্সারি বাসে তাঁর টিমসহ যখন তাঁকে তোলা হয় তখনও সাংবাদিকরা কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেছে। তাঁর দেহরক্ষী কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেয়নি বটে, তবু ওর মধ্যেই এক আধজন যেন কী কৌশলে ঢুকে পড়েছিল। তাদেরই একজন পাশ থেকে ভয়ে ভয়ে চুরি করে তাঁকে দুটো চারটে কথা বলতে অনুরোধ করে। তাঁর বড় মুশকিল, তিনি কাউকেই প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। দেহরক্ষী তেড়ে এসেছিল, তিনি করতলের মুদ্রায় তাকে নিরস্ত করে ছদ্মবেশী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে আর কী জানার থাকতে পারে লোকের? এই ভেবে তিনি আজকাল অবাক

হন। তাঁর নিজের আত্মজীবনী ছাড়াও কয়েক ডজন বই লেখা হয়েছে তাঁর ওপর। প্রতিটি বই পৃথিবীর সব প্রধান ভাষায় লাখ লাখ বিকিয়েছে। তাঁর সব ক্রীড়াকৌশল দেখানো হয়েছে বারংবার সিনেমায়, টিভিতে, স্থিরচিত্রে। তবে মানুষ আর কী জানতে চায়। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়েসের এ জীবনে তাঁর আর কোন গুপ্ত সংবাদ থাকবে যা লোকে জানে না? তিনি যখন যা বলেন তা তৎক্ষণাৎ টেপ করা হয়, নয়তো তুলে নেওয়া হয় শর্টহ্যান্ডে, তিনি যখন যা বলেন তাই প্রচারিত হয়ে যায় সাধারণ্যে।

আজ এই খুব ভোরে তিনি কিছু অনিশ্চয় একা। একা হওয়ার অভ্যাস তাঁর নেই-ই প্রায়। অবশ্য একা বলতে ঠিক যা বোঝায় তা তিনি কখনওই হতে পারেন না। তাঁর দেহরক্ষী ছায়ার মতো পিছু নেয়। তাঁর দু পকেটে দুটো রিভলবার, মজবুত ও সতর্ক ওই প্রহরীটি তার কর্তব্য পালন করার জন্য কারও অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। তাঁরও নয়। কারণ এই রক্ষীকে নিয়োগ করেছে একটি বিমা কোম্পানি—যে কোম্পানিতে তিনি কয়েক মিলিয়ন ডলারে বিমাবদ্ধ রয়েছেন।

কোনওদিনই ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে নিজেকে তিনি কখনও মুক্ত মানুষ বলে অনুভব করতে পারেন না। তিনি যা বলেন, যা করেন তা সব সময়েই গোচরে বা অগোচরে মানুষ লক্ষ করে। তাই যতক্ষণ জেগে থাকেন তিনি, ততক্ষণ তাঁকে সচেতন থাকতে হয়। নিজের মতো থাকা তাঁর আর হয়ে ওঠে না।

আজ এই ভোরে ইনডোর সুইমিং পুলের ধারে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর জীবনের নানা বেড়াজালের কথা ভাবছিলেন। কিংবা তাও নয়। তাঁর হয়তো ইচ্ছে করছিল, একা একটু রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে। একা ঘুরে ঘুরে এ শহরটা একটু দেখে আসতে। কিন্তু তা হওয়ার নয়। কাল রাত থেকে হোটেলের বাইরে হাজার হাজার মানুষ চাপ বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই। ওরা একবার তাঁকে দেখতে চায়। বেরোলেই ওই অতি উৎসাহীরা ঘিরে ধরবে, ছোঁবে, ছাপবে, তারপর আদরের উন্মাদনায় শ্বাসরোধ করে ফেলবে তাঁর।

তিনি জানেন, তাঁর কোনও শত্রু নেই। কিন্তু জনপ্রিয়তাই যে কতবড় শত্রু তা তিনি আজ বুঝে গেছেন।

কাল রাতে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। ঘুমহীনতায় কোনও রোগ নেই, উদ্বেগ নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। তবু তাঁর ঘুম সহজে আসে না।

নিঃশব্দে স্ত্রীর ঘুম না ভাঙিয়ে তিনি উঠেছেন, কফি খেয়েছেন একা, বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। তিনি যেদিকে আছেন হোটেলের সেদিকটা সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কোনও অনভিপ্রেত লোকজন আসতে পারে না এদিকে। নিরাপত্তা প্রায় নিশ্চিন্ত।

তত ভোরে সুইমিং পুলের ধারে কেউই নেই। কিন্তু কে জানে, কোনও গুপ্ত জানালা থেকে, কোনও ফাঁক ফোঁকর দিয়ে, কোনও দূর অলিন্দ বা কক্ষ থেকে এই বিশাল হোটেলের কেউ না কেউ তাঁকে দূরবীন দিয়ে দেখছে না, বা টেলি লেন্সে ফটো তুলছে না? আসলে ওই সন্দেহটাই নিশ্চিত সত্য। কেউ না কেউ সব সময়েই তাঁকে দেখছে। এ পৃথিবীর কোটি কোটি লোক তাঁর অচেনা, কিন্তু তাঁকে চেনে পৃথিবীর প্রায় সবাই। এইটেই সবচেয়ে জটিল ঘটনা।

সুইমিং পুলটা দুবার প্রদক্ষিণ করলেন তিনি। তারপর ভোরের প্রথম জাগ্রত মানুষটির দেখা মিলল।

লোকটা লম্বাটে, এশীয়, ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থায় একটা পাইপ কামড়ে পকেটে দেশলাই

Shahnaz

বা লাইটার খুঁজতে খুঁজতে খুবই উদভ্রান্ত অন্যমনস্কতায় চত্বরে বোধহয় এসেছিল। তাঁর দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করেই অবহেলা ভরে চোখ সরিয়ে নিল। লাইটার বের করে পাইপ ধরিয়ে আবার একবার চাইল। তারপরই কেমন হতভম্ব আর ফ্রিজ হয়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

ধূমপান তিনি পছন্দ করেন না। নাকটা একটু কুঁচকে নিলেন। আর লোকটার ওই হতভম্ব ভাবটা তিনি একটুও উপভোগ করলেন না। বরং ভারী সঙ্কোচ হল তাঁর। অপ্রত্যাশিত তাঁর দেখা পেলে লোকে কেন ভূত দেখে?

যে সৌভাগ্য লোকটা সারাজীবনও কল্পনা করতে পারেনি তিনি আজ ভোরে লোকটার জীবনে সেই সৌভাগ্যের কারণ ঘটলেন। একটু হেসে তিনি বললেন—গুড মর্নিং।

লোকটা তোতলাতে লাগল। সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্তের মতো বলতে লাগল—মাই গড! ...ইউ...ইউ আর...ওঃ, গুড মর্নিং...গুড মর্নিং! গুড মর্নিং...!

তিনি স্মিত হাস্যে লোকটাকে আনন্দের ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকেন।

লোকটা জানে যে তিনি ধূমপান পছন্দ করেন না। পৃথিবীর সব মানুষই তাঁর পছন্দ অপছন্দের কথা জেনে গেছে। পাইপ নিভিয়ে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে বলল—আপনার সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছিল একথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না! আপনি কি দয়া করে আমাকে একটু স্মারক দেবেন না? ছোট স্বাক্ষর একটি?

তিনি মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাস্যে বললেন—এই সাক্ষাৎকার কি আপনার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ?

—বোধহয় আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা।

—কেন?

—আমি এক সম্রাটের সাক্ষাৎ পেয়েছি যিনি ক্রীড়াজগতে গত বিশ বছর তাঁর অপ্রাকৃত জাদুবিদ্যা দেখিয়েছেন, যাঁর মতো কেউ কখনও জন্মায় নি, আগামী একশো বছরে কেউ জন্মাবেও না।

তিনি বললেন—মানুষের সাধ্য যা নয় আমি তা কী করে করতে পারি? আমি যা করেছি তা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নিশ্চয়ই। আর জাদুবিদ্যা আমি কিছুই জানি না, সারাজীবন আমাকে কঠোর অনুশীলন করতে হয়েছে।

—এ সবই আমরা জানি। কিন্তু তবু আপনি অলীকতার সীমারেখা ছুঁয়েছেন। বিশ্বকাপের এক ফাইন্যালে দেখেছি আপনার ভৌতিক ড্রিবলিং। সে যে না দেখেছে...

খুবই ক্লান্ত লাগে তাঁর। হয়তো এরা ঠিকই বলে! তাঁর মধ্যে কিছু একটা আছে। ধাঁধার মতো, রহস্যের মতো, অলৌকিকত্বের মতো। তিনি নিজে কোনওদিনই তা টের পাননি। কিন্তু অন্যেরা বলে যেসব কৌশলে আর পাঁচজন বড় খেলোয়াড় খেলে তাঁর নিজের কৌশল তার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হয়তো তিনি বেশি ত্রুটিহীন। আর সেটাই হাজারও লোক মিরাকল বলে মনে করে। তিনি বললেন—আমি যা করি তা সবই চেষ্টার দ্বারা।

বলতে বলতে তিনি চোখের কোণ দিয়ে লক্ষও করলেন, তাঁর দেহরক্ষী অধৈর্য হয়ে পড়ছে, এগিয়ে আসতে চাইছে। উটকো এই লোকটা যদি কোনও বেতাল নড়াচড়া করে তবে তাঁর দেহরক্ষী ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তিনি তাই তাড়াতাড়ি বললেন—আপনি অটোগ্রাফ চাইছিলেন না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বলে লোকটা একটা দশ টাকার নোট বের করে পকেট থেকে। একটা ডটপেনও।

তিনি দশ টাকার নোটটা নিয়ে পকেটে ভরে নিশ্চিন্তে হাঁটতে লাগলেন। এ রকম মজা তিনি প্রায়ই করেন। লোকটা চোরের মতো পিছু পিছু আসছে আর মাঝে মাঝে হেঁ হেঁ শব্দ করছে।

তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—টাকাটার জন্য ধন্যবাদ। এটা দিয়ে আমার বাল বাচ্চার জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাব।

লোকটা হাত কচলে বলে—সম্রাট, আপনাকে আমার কিছুই দেওয়ার থাকতে পারে না। আমি কী দেব আপনাকে? দয়া করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

তিনি হাসলেন। তোলা হাঁটুতে নোটটা রেখে ডটপেন দিয়ে বারো অক্ষরের নাম সই করে দিলেন অভ্যস্ত দ্রুত বেগে।

তারপর সামান্য ক্লান্তি ও গরম বোধ করে ফিরে এলেন ঘরে। স্ত্রী এমন চমৎকার ভাবে সেজেছেন। অপেক্ষা করছেন প্রাতঃরাশের জন্য। তিনি স্ত্রীকে একটি চুমু খেলেন। স্ত্রী উজ্জ্বল মুখ করে তাকালেন তাঁর দিকে। সেই চোখের দৃষ্টিতে সুগভীর তৃপ্তি ও অহংকার তাঁর স্বামীকে নিয়ে।

স্ত্রী বললেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এত খেলার ধকল এবার সত্যিই শেষ হচ্ছে।

তিনি বিছানায় শুয়ে থেকে বললেন—হ্যাঁ। আজ আমার শেষ খেলার আগের খেলাটি।

—তুমি কি নামবে মাঠে?

—নিশ্চয়ই!

—খুব সাবধান। এদের মাঠ ভাল নয় শুনেছি।

তিনি হাসলেন। বললেন—আমিও শুনেছি। তুমি কিন্তু অকারণে দুশ্চিন্তা কোরো না। এটা আর একটা খেলা মাত্র। খেলাই, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। যুদ্ধে সৈন্যরা এর চেয়ে অনেক শক্ত কাজ করে।

প্রাতঃরাশের পর তিনি ঘুমোলেন।

বেশিক্ষণ নয়। একটু বাদেই দরজায় টোকার শব্দ। বিশিষ্ট লোকরা আসছেন। ফোনে খবর নিচ্ছেন। অন্য সব খেলোয়াড়রা দেখা করতে চাইছে। আসছে সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার, টি ভি বা রেডিওর লোক, আসছে ম্যাসাজ করতে মেসেউয়ার।

তাঁর স্ত্রী বহুক্ষণ এই ভিড় ঠেকিয়ে রাখলেন, আর ভিড় ঠেকাল তাঁর মজবুত দেহরক্ষী। তবু এক সময়ে তাঁকে উঠতে হয়। হাসতে হয়। কথা বলতে হয়।

দুপুর গড়াতে না গড়াতে খেলা-পাগল এক শহর ভেঙে পড়ে স্টেডিয়ামে। কী গভীর আনন্দের চিৎকারে ভরে ওঠে পরিমণ্ডল।

তিনি মাঠে নামেন এগারো জনের সঙ্গে। সবই অভ্যস্ত তাঁর। সেই জয়ধ্বনি, ক্যামেরা, ভিড়।

তারপর সব সরে যায়। হঠাৎ দেখেন, তিনি স্বক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন। দাবার ঘুঁটির মতো সাজানো বাইশজন খেলোয়াড় দুদিকে। মাঝখানে সেই ফুটবল। পৃথিবীর মতো গোল। এই বল তাঁকে সব দিয়েছে যা হয়তো সবটাই পাওনা ছিল না।

শরীরে এতটুকু ক্লান্তি বা অসুস্থতা ছিল না। মাঠ যথেষ্ট ভাল না হলেও কিছুটা খেলা যায়। চারদিকের আকুল চোখগুলি তাঁর দিকেই চেয়ে আছে তিনি জানেন। সমস্ত ক্যামেরার লেন্স তাঁরই দিকে নিবদ্ধ তিনি জানেন। সমস্ত ভাষ্যকার কণ্ঠ বারংবার তাঁরই নাম উচ্চারণ করছে—তিনি

Shahnaz

জানেন। তাঁর সমস্ত চলাফেরা, ছোটা, বল ধরা বা মরা এ সবগুলিই বারংবার দেখানো হবে, বর্ণিত হবে, ব্যাখ্যা করা হবে। মাঠের বাইশজনের মধ্যে বাদ বাকি একুশজনের কোনও গুরুত্বই নেই এই হাজার লক্ষ কোটি মানুষের কাছে।

এত দিয়েছি তোমাদের—তবু কেন চাও? এবার চোখ ফিরিয়ে নাও আমার দিক থেকে। ফিরিয়ে নাও। আমি যে কখনও নিজমনে থাকতে পারি না।—এই কথা তিনি মনে মনে বললেন।

চেষ্টাহীন রইলেন সারাক্ষণ। ছুটলেন না, উদ্যোগ করলেন না, বল কেউ কেড়ে নিতে এলে সহজেই ছেড়ে দিলেন। জানেন, তিনি চেষ্টা করলে কিছুতেই ওরা কেড়ে নিতে পারবে না। জানেন, তিনি যদি বল পায়ে ছোটেন, তবে এরা বৃক্ষরাজির মতো স্থির হয়ে যাবে। তিনি অনায়াসে গোলরক্ষককে ঠকিয়ে বল পাঠাতে পারেন জালে। কিন্তু কেন তা করবেন তিনি? আরও হাজার লক্ষ কোটি চোখকে নিজের উপর টেনে আনতে? আরও অনির্জন, একাকিত্বহীনতাকে বরণ করবেন? ভক্তের মৃগয়া কি এক সময়ে শেষ করা উচিত নয়? ওরা ভাবুক তিনি জাদুকর নন, স্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ মাত্র।

খেলা শেষ হল। ড্র। তিনি বুঝলেন, তাঁর দল ম্লান তার ছায়ায় ফিরে যাচ্ছে ড্রেসিং রুমে। সবাই বলছে—উনি আজ খেলতে পারেননি।

তিনি হাসলেন আপনমনে। আজ একরকম আনন্দ হয় তাঁর। আনন্দটা নিখাদ নয়। একটু বিষাদের বিষ তাতে মিশে থাকে।

পরদিন রাতে সুদূর স্বদেশের দিকে ধাবমান বিমানে বসে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমের মাঝখানে অকারণে জেগে উঠলেন একবার। কেন জাগলেন তা বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু জাগলেন। মনে হল, খুবই ক্ষীণ একটা বাঁশির আওয়াজ যেন ঘুমঘোরে শুনেছেন তিনি। কোনও নিয়ম ভঙ্গের জন্য রেফারি যেমন বাঁশি বাজায়।

তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে চারদিকে চাইলেন। সবাই ঘুমে। বাইরে নীল রাত্রির আকাশ তীর বেগে উঠে যাচ্ছে।

নিয়ম ভঙ্গ ঘটল নাকি কিছু? কখন? কোথায়? তিনি ভাবলেন, খুঁজলেন মনে মনে। তাঁর সারা মুখে, শরীরের অজস্র শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের বন্ধুরতা। ডান গালে একটি প্রিয় ক্ষত চিহ্নে তিনি প্রায়ই আঙুল বুলিয়ে নেন। এখনও নিলেন, কিছু মনে পড়ল না।

আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলেন তিনি। হেলানো সিটে মাথা এলিয়ে চোখ বুজলেন। খুব স্বস্তি পেলেন না। তাঁর ভিতর থেকে কে যেন বলছে—ঠিকই শুনেছিলে। বাঁশি বেজেছিল।

এবার তিনি মৃদু হাসলেন। মাথা নাড়লেন আপন মনে। জানেন, তিনি জানেন। নিয়মভঙ্গের জন্য কোথাও না কোথাও কে যেন বাঁশি বাজিয়েছে। ঠিক কখন নিয়মভঙ্গ ঘটেছে তা তিনি জানেন না। ফাউল? না হ্যান্ড বল? অফসাইড নয় তো?

না এসব নয়। তিনি তা জানেন। খেলার মাঠটা আর ছোট থাকছে না। বড্ড ছড়িয়ে পড়ছে এবার। বিশাল তার পরিধি। সারা পৃথিবীময় আকাশময়, খেলাও এবার কত বিচিত্র! কত নিয়ম, কত অনিয়ম! অলীক রেফারি তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছে, সতর্ক করছে।

প্রসন্ন মনে তিনি মাথা নাড়লেন।

খেলার ছল

মিঠুর গোলগোল মোটামোটা দুটো পায়ের একটা জীবনের বুকের ওপর, আর একটা তার শোয়ানো হাতে। তার বুকের ওপর কাত হয়ে শুয়েছে মিঠু, ঘাড়ের কাছে মাথা আর ল্যাভেন্ডারের গন্ধময় চুল। জীবন কানের ওপর মিঠুর দুরন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস আর কবিতা-আবৃত্তি শুনতে পাচ্ছিল : 'ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা, তাহারি মাঝারে দেখে আপনার সূর্যতারা। তারি একধারে আমার ছায়ারে আনি মাঝে মাঝে দুলায়ো তাহারে, তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো কলধ্বনি...' একটা ছোট নরম হাতে মিঠু তার বাবার গাল ধরে মুখটা ফিরিয়ে রেখেছে তার দিকে। জীবন অন্যমনস্ক ভাব দেখালেই মুখ টেনে নিয়ে বলছে 'শোনো না বাবা!'

মিঠুর ভারী শরীর, নরম তুলতুলে। বুকের ওপর যেখানে মিঠুর পা সে জায়গাটা অল্প ধরে আসছিল জীবনের। পা-টা একবার সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে মিঠু দাপিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই উঠে এল জীবনের বুকের ওপর, দুই কনুইয়ের ভর রেখে জীবনের মুখের দিকে চেয়ে হেসে হঠাৎ অকারণে ডাকল 'বাবা!'

'উঁ'।

'তুমি শুনছ না।'

'শুনছি মা-মণি।' জীবন চোখ খুলে তার ছয় বছরের শ্যামবর্ণ মেয়েটির দিকে তাকালে হঠাৎ তার বুক কানায় কানায় ভরে ওঠে। চুলে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ, চোখে কাজল, মুখে অল্প পাউডারের ছোপ—এত সকালেই মেয়ে সাজিয়েছে অপর্ণা। না সাজালেও মিঠুকে দেখতে খারাপ লাগে না। কী বড় বড় চোখ, আর কী পাতলা ঠোঁট মিঠুর! জীবন মিঠুকে আবার দু হাতে আঁকড়ে ধরে বলে, 'তোমার কবিতাটা আবার বলো।' মিঠু সঙ্গে সঙ্গে দুলে ওঠে, 'ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' শুনতে শুনতে সকালের গড়িমসির ঘুম-ঘুম ভাবটা আবার ধীরে ধীরে জীবনকে পেয়ে বসতে থাকে। বলতে কি সারাদিনের মধ্যে মিঠু আর তার বাবাকে নাগালে পায় না, সকালের এটুকু সময় ছাড়া। তাই এটুকুর মধ্যেই সে পুষিয়ে নেয়। ধামসে, কামড়ে, কবিতা

Shahnaz

বলে, গান গেয়ে বাবার আদর কেড়ে খায়। জীবনের মাঝে মাঝে বিশ্বাস হতে চায় না যে এই সুন্দর, সুগন্ধী মেয়েটা তার!

মাঝখানের ঘর থেকে অপর্ণার গলা পাওয়া যাচ্ছিল। চাপা গলা, কিন্তু রাগের ভাব। মিঠু মাথা উঁচু করে মায়ের গলা শুনবার চেষ্টা করে বাবাকে চোখের ইংগিত করে বলল 'মা!' নিঃশব্দে হাসল 'মা আতরদিকে বকছে। রোজ বকে।' জীবন নিস্পৃহভাবে বলে 'কেন'! মিঠু মাথা নামিয়ে আনল জীবনের গলার ওপর, তার থোকা থোকা চুলে জীবনের মুখ আচ্ছন্ন করে দিয়ে বলল, 'আতরদি রোজ কাপডিশ ভাঙে। সকালে দেরি করে আসে। মা বলে ওকে ছাড়িয়ে দেবে।' বলতে বলতে টপ করে জীবনের বুক থেকে পিছলে নেমে যায় মিঠু, মশারি তুলে মেঝেয় লাফিয়ে পড়ে। জীবন ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে বলে 'কোথায় যাচ্ছ, মা-মণি!' দরজার কাছে এক ছুটে পৌঁছে গিয়ে মিঠু ঘাড় ঘুরিয়ে বলে 'দাঁড়াও, দেখে আসি।'

গোয়েন্দা! এই মেয়েটা তার পুরোপুরি গোয়েন্দা। বাড়ির সমস্ত খবর রাখে, আর সকালে বাবাকে একা পেয়ে সব খবর চুপি চুপি বলে দেয়। বিশেষত অপর্ণার খবর। মিঠু তার সহজ বুদ্ধিতে বুঝে গেছে যে, বাবা মায়ের খবরটাই বেশি মনোযোগ দিয়ে শোনে। গতকাল তাদের মোটরগাড়িটার জ্বর হয়েছিল কিনা, কিংবা তিনশো ছিয়ানব্বই নম্বর বাড়িতে কুকুরটার কটা বাচ্চা হল এসব খবরে বেশি কান দেয় না। মিঠুর উলটো হচ্ছে মধু—জীবনের তিন বছর বয়সের ছোট মেয়ে। সে মায়ের আঁচল ধরা জীবনকে চেনে বটে, কখনও সখনও কোলেও আসে কিন্তু থাকতে চায় না। দুই মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে জীবন উঠে সিগারেট ধরাল। মাথা ধরে আছে—কাল রাতের হুইস্কির গন্ধ এখনও যেন টেকুরের সঙ্গে অল্প পাওয়া যাচ্ছে। কেমন ঘুমে জড়িয়ে আছে চোখের পাতা। কিছুতেই মনে পড়ে না কাল রাতে 'বার' থেকে কী করে সে ঘরের বিছানা পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছিল। কোনওদিনই মনে পড়ে না। কাল বিকেলে কারখানা থেকে তার ড্রাইভার তাকে 'বার' পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছিল। বার-এ দেখা হয়েছিল দুজন চেনা মানুষের সঙ্গে। আচার্য আর মাধবন। তারপর!

মিঠু ছোট পায়ে দৌড়ে এসে মশারি তুলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের কোলে। হাঁফাচ্ছে। এত বড় বড় চোখ গোল করে বলল, 'আমাদের বেড়ালটা না বাবা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে ছিল। মরে কাঠ হয়ে আছে।' একটু অবাক হয়ে জীবন বলল, সে কি!' তার হাত ধরে টানতে টানতে মিঠু বলল, 'চলো দেখবে। নইলে এক্ষুণি আতরদি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবে'। কৌতূহল ছিল না, তবু মিঠুকে এড়াতে পারে না জীবন, তাই হাই তুলে বিছানা ছাড়ল।

ঘরের চারদিকেই লক্ষ্মীর শ্রী। মেঝেতে পাতা চকচকে লিনোলিয়ম। ওপাশে অপর্ণা আর মিঠু মধুর আলাদা বিছানা। নিচু সুন্দর খাটের ওপর শ্যাওলা রঙের সাদা ফুলতোলা চমৎকার বেডকভার টান টান করে পাতা। মশারি খুলে নেওয়া হয়েছে। ডানদিকে প্রকাণ্ড বুককেস যার সামনেটা কাচের, বুককেসের ওপর বড় একটা হাইফাই রেডিও, তার ঢাকনার অর্গান্ডিতে অপর্ণার নিজের হাতের এমব্রয়ডারি, পাশে মানিপ্ল্যান্ট রাখা, লেবু রঙের চিনেমাটির ফুলদানি, সাদা ক্যাবিনেটের ভিতরে রেকর্ডচেঞ্জার মেশিন—কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা নেই। পুবের জানালা খোলা, নীল পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে শরৎকালের হালকা রোদ আর অল্প হিম হাওয়া আসছে। অপর্ণা ঘর বড় ভালবাসে, তা ছাড়া তার রুচি আছে। এর জন্য জীবন কখনও মনে মনে কখনও প্রকাশ্যে অপর্ণাকে বাহবা দেয়। কোন জায়গায় কোন জিনিসটা রাখলে সুন্দর দেখায় জীবন তা ভেবেও পায় না, যদিও এ সবই জীবনের রোজগারে অর্জিত জিনিস, তবু তার মাঝে মাঝে মনে

হয় এই ঘরদোর, এই ফ্ল্যাট বাড়িটার আসল মালিক অপর্ণাই। সারাদিন ঘুরে ঘুরে অপর্ণা বড় ভালবাসায়, যত্নে, বড় মায়ায় এই সবকিছু সাজিয়ে রাখে। জীবনের সন্দেহ হয়, সে যখন থাকে না, তখন—পোষা গৃহপালিতের গায়ে লোকে যেমন হাত রেখে আদর করে তেমনি অপর্ণা রেডিও, বুককেস, সোফায় বা টেবিলে তার স্নেহশীল সর্তক হাত রেখে আদর জানায়। তাই জীবন যখনই ঘরে ঢোকে তখনই মনে হয় এ সব জিনিস অপর্ণারই পোষমানা, এ সব তার নয়। তাই যখন সে ঘরে চলাফেরা করে, বসে, বা শুতে যায়, যখন ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খোলে তখন সে তার নিজের ভিতরে এক ধরনের কুণ্ঠা ও সতর্কতা লক্ষ করে মনে মনে হাসে। বাস্তবিক অপর্ণা হয়তো তার এ স্বভাব লক্ষ করে না, কিন্তু জীবন জানে লোকে যেমন তাদের ঘরে ফিরে সহজ, খোলামেলা, আরামদায়ক অবস্থা ভোগ করে সে ঠিক তেমন করে না।

'শীগগির বাবা' বলতে বলতে মিঠু তাকে টেনে আনল মাঝখানের ঘরে। আসলে ঘর নয়, প্যাসেজ। তিনদিকে তিনটে দরজা—একটা রান্নাঘর, অন্যটা বসবার, তৃতীয়টা তাদের শোওয়ার ঘরের। তিন কোণা প্যাসেজের একধারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো ক্রিম রঙের সুন্দর ফ্রিজটা। রাতে যখন প্রায়ই ভীষণ ঘোর অবস্থায় খানিকটা এলোমেলো পায়ে অন্ধকার প্যাসেজটা পার হয় জীবন তখন সে মাঝে মাঝে ফ্রিজটার কাছে একবার দাঁড়ায়, কোনও দিন ঠাণ্ডা সাদা ফ্রিজটার গায়ে হাত রাখে। মনে হয় ঘুমন্ত সেই ফ্রিজটা তার হাত টের পেয়ে আস্তে জেগে ওঠে, সাড়া দেয়। জীবনের মনে হয় ফ্রিজটা এতক্ষণ যেন এই আদরটুকুর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। এখন দিনের বেলা সব কিছু অন্যরকম। ফ্রিজটার দুটো দরজা দু হাট করে খোলা, সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে গম্ভীর-মুখ অপর্ণা, তার পিঠে ঝুঁকে মধু, আতর নিচু হয়ে তলার থাকে অন্ধকারে কিছু দেখবার চেষ্টা করছে। জীবন লক্ষ করে সে এসে দাঁড়াতেই অপর্ণার শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। জীবন অল্প হেসে জিজ্ঞেস করে 'কী হল!' অপর্ণা ফ্রিজটার দিকে চেয়ে থেকেই জবাব দিল 'দেখো না, বেড়ালটা ভিতরে ঢুকে মরে আছে!' জীবন অপর্ণার মুখের খুব সুন্দর কিন্তু একটু নিষ্ঠুর পাথুরে প্রোফাইলের দিকে চেয়ে সহজ গলায় বলে 'কী করে গেল ভেতরে!' অপর্ণা সামান্য হাসে, 'কি জানি! হয়তো আমিই কখনও যখন ফ্রিজ খুলেছিলুম তখন ঢুকে গেছে। খেয়াল করিনি।' জীবন সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে বলে 'ওরকম ভুল হয়। ওটাকে বের করে ফ্রিজটা ভাল করে ধুয়ে দিয়ো। মরা বেড়াল ভাল নয়।' 'আচ্ছা।' জীবন চলে যাচ্ছিল বাথরুমের দিকে, হঠাৎ মনে-পড়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে 'আর আজ বাজারে যাবে বলেছিলে! ছুটির দিন। যাবে না!' এক ঝলক মুখ ফিরিয়ে জীবনের চোখে চোখ রাখল অপর্ণা, হাসল 'যাব না কেন! একটা বেড়াল মরেছে বলে! তুমি তরি হও না।' কথাটা ঠিক বুঝল না জীবন, শুধু অপর্ণার ওই একঝলক তাকানোর দিকে চেয়ে ওর সুন্দর ছোট কপালে সিঁদুরের টিপের চারপাশে কোঁকড়ানো চুল, ঈষৎ ফুলে থাকা অভিমানী সুন্দর ঠোঁট নিখুঁত আর্চ-এর মতো ভ্রু আর থুঁতনির চিক্কণতা দেখে হঠাৎ নিজেকে তার বড় ভাগ্যবান মনে হল। বড় সুন্দর বউ তার। বড় সুন্দর অপর্ণা। ছেলেবেলা থেকে অনেকে এরকম বউ পাওয়ার আশায় বড় হয়ে ওঠে। ভেবে দেখতে গেলে জীবনের ছেলেবেলা ছিল বড় দুরন্ত, বড় ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির বড় দামাল দিন ছিল তখন। আজ একটা বেড়াল তার ফ্রিজ-এর ভিতর মরে পড়ে আছে, আর তখন সেই ছেলেবেলায় যখন সে ছিল চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, তখন উনুনের পাশে ছোট্ট নোংরা যে চৌখুপী জায়গায় সে চট আর শতরঞ্জির বিছানায় শুত তখন আর-একটা বেড়াল তার মাথার কাছে শুয়ে থাকত সারা রাত। মিনি নামে সেই বেড়াল উনিশ শো পঞ্চাশে চক্রবর্তীদের তিনতলা থেকে দিয়েছিল লাফ। জীবন আজও জানে না বেড়ালটা

Shahnaz

আত্মহত্যা করেছিল কিনা। সেই সব ছেলেবেলার দিনে জীবন কখনও অপর্ণা বা অপর্ণার মতো সুন্দর অভিজাত বউ-এর কথা ভাবেইনি।

বাথরুমের বড় আয়নায় কোমর পর্যন্ত নিজের আকৃতির দিকে চেয়ে মৃদু হাসল জীবন। দুর্ধর্ষ কাঁধের ওপর শক্ত ঘাড়, বুকে দু ধারে চৌকো পেশি, দাঁতে ব্রাশ ঘষতে হাতের শক্ত রগ, শিরা আর মাংসপেশিতে ঢেউ ওঠে। ছোট করে ছাঁটা চুল, টানা, মেয়েলি এবং দুঃখী এক ধরনের অদ্ভুত চোখ তার। তার গায়ের রং শ্যামবর্ণ, যেমনটা মিঠুর। মধু তার মায়ের মতোই ফর্সা। জীবনের নাক চাপা, ঠোঁট একটু পুরু কিন্তু সুন্দর। তার সঙ্গে মিঠুরই মিল বেশি, মধুর সঙ্গে অপর্ণার। জীবনের চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ আছে, বোঝা যায় আলস্য বা আরামে সে খুব অল্প সময়ই ব্যয় করেছে। তৃপ্তিতে আয়নার দিকে চেয়ে হাসে জীবন। বাস্তবিক প্রায় ফুটপাথের, রাস্তার জীবন থেকে এতদূর উঠে আসতে পারার পরিশ্রম ও সার্থকতার কথা ভাবলে তার মাঝে মাঝে নিজেকে বড় ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সে তার বউ মেয়ে এবং পরিবারের জন্য কি সমস্ত কর্তব্যই করেনি! এই ভেবেই সে তৃপ্তি পায় যে এরা কেউ দুঃখে নেই, জীবনের ওপর পরম নির্ভরতায় এরা নিশ্চিন্তে বেঁচে থেকে বেঁচে থাকাকে ভালবাসছে। সে নিজেও কি বেঁচে থাকাকেই ভালবাসেনি বরাবর। যখন সেই অনিশ্চিত ছেলেবেলায় সে কখনও চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, কখনও বা মোটরসারাই কারখানার ছোকরা কারিগর, তখনও সে রাস্তা পার হতে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল দেখে আনন্দে গান গেয়েছে, খাদ্য অনিশ্চিত ছিল তবু প্রতিটি খাদ্যকণার কত স্বাদ ছিল তখন! তখন দেশভাগের পর কলকাতায় এসে রহস্যময় এই শহরকে কত সহজে চিনে নিয়েছিল জীবন! আজ সে যখন তার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে, গাড়ির জানালা থেকে, বা বার-এর দরজার কাচের পাল্লার ভিতর দিয়ে দেখে তখন এখানকার রাস্তাঘাট, ভিড়, আলো কত দূরের বলে মনে হয়! কিংবা রাতে ঘোর মাতাল অবস্থায় ফিরে এসে যখন খাবার ঘরে ঢাকা খাবার খুলে সে সুন্দর সমস্ত খাবারের রঙের দিকে চেয়ে দেখে তখনও তার মনে হয় এ সব খাবারে কি সেই সব স্বাদ আর পাওয়া যাবে!

জীবন ঘরে ঢুকে দেখল ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অপর্ণা মধুকে সাজাচ্ছে। জীবন বলল 'ও যাবে নাকি!'

অপর্ণা মধুর মাথায় রিবন জড়াতে জড়াতে বলল 'যাবে না! থাকবে কার কাছে! যা বায়না মেয়ের।'

জীবন বিরক্ত ভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখল মিঠু মেঝের লিনোলিয়মে খোলা 'হাসিখুশি'-র সামনে বসে হাঁ করে মা আর মধুর দিকে চেয়ে আছে। জীবন বলল 'দোকানে দোকানে ঘুরতে হবে, ওকে নিলে অসুবিধে। কখন জলতেষ্টা পায়, কখন হিসি পায় তার ঠিক কি!'

শুনে মিঠু মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে। অপর্ণা তার ধীর হাতে মধুর মাথার রিবন সরিয়ে নেয়। তেমনই গম্ভীর মুখে একবার মিঠুর দিকে চেয়ে বলে 'ঠিক আছে।'

জীবন সঙ্গে সঙ্গে সহজ হওয়ার ভাব করে বলে 'অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছে হয়—'

'না, থাক। আতর তো রইলই, ও দেখতে পারবে।'

'কাঁদবে বোধ হয়।'

'তা কাঁদবে।'

'কাঁদুক।' জীবন হাসে 'কাঁদা খারাপ নয়। তাতে অভ্যেস ভাল হয়। জেদ-টেদ কমে স্বাভাবিকতা আসে।'

অপর্ণা উত্তর দিল না।

জীবনের খয়েরি রঙের ছোট সুন্দর গাড়িটা দরজার সামনে দাঁড় করানো। ড্রাইভার গাড়ির দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের এক পা পিছনে অপর্ণা—ছাইরঙা সিল্কের শাড়ি, ছাইরঙা ব্লাউজ, হাতে ছাইরঙা বটুয়া, মাথায় এলো খোঁপা, পায়ে শান্তিনিকেতনি চটি—বড় সুন্দর দেখায় অপর্ণাকে। পাশাপাশি যেতে কেমন অস্বস্তি হয় জীবনের। সে নিজে পরেছে সাদা টেরিলিনের শার্ট আর জিন-এর প্যান্ট—নিঃসন্দেহে তাকে দেখাচ্ছে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো, তবু অপর্ণার পাশে কী কারণে যেন কিছুতেই তাকে মানায় না। ড্রাইভারকে ইঙ্গিতে সরে যেতে বলে জীবন একবার পিছু ফিরে চাইল। ব্যালকনিতে আতরের কোলে মধু—সে ভীষণ কাঁদছে, চোখের জলে মুখ ভাসছে তার। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছে মিঠু—বিষণ্ণ মুখ—জীবনের চোখে চোখ পড়তেই হাসল, হাত তুলে বলল 'টা-টা বাবা। দুর্গা দুর্গা বাবা!' অপর্ণা খুব তাড়াতাড়ি ব্যালকনির দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে গাড়িতে ঢুকে গেল। জীবন হাসিমুখে হাত তুলে ব্যালকনিতে মিঠু আর মধুর উদ্দেশ্য বলল 'শীগগিরই আসছি ছোট মা। টা-টা, দুর্গা দুর্গা বড় মা।'

'টা-টা, দুর্গা দুর্গা বাবা। টা-টা দুর্গা দুর্গা।'

'টা-টা। দুর্গা দুর্গা।'

জীবন গাড়ি এনে দাঁড় করাল মোড়ের পেট্রল পাম্পে। অপর্ণা নামল না। জীবন নেমে ধরাল একটা সিগারেট। আকাশে শরৎকালের ছেঁড়া মেঘ, রোদ উড়ছে। পেট্রল পাম্পের একদিকে বিরাট একটা সাইন বোর্ড 'হ্যাপি মোটরিং!' সেই দিকে চেয়ে রইল জীবন, হঠাৎ আলগা একটা খুশিতে তার মন গুন গুন করে উঠল 'হ্যাপি মোটরিং! হ্যাপি হ্যাপি হ্যাপি মোটরিং!' যে বাচ্চা ছেলেটা মোটরে পেট্রল ভরল, হাত বাড়িয়ে তাকে একটা টফি দিল অপর্ণা। খুশি হল জীবন। অপর্ণার মুখ এখন পরিষ্কার ও সহজ। হায়! কতকাল অপর্ণার সঙ্গে জীবনের ঝগড়া বা খুনসুটি হয় না। জীবন যা বলে অপর্ণা একটু গম্ভীর মুখে তাই মেনে নেয়। সত্যিই মেনে নেয় কিনা জীবন তা জানে না। অন্তত বিয়ের আগে অপর্ণা যে বাড়ির মেয়ে ছিল সে বাড়ির লোকেরা সহজে অন্য কারও কথা মনে নিতও না, বশও মানত না। অপর্ণাই মানছে কি! ঠিক জানে না জীবন। আসলে সারাদিনে তাকে অপর্ণার বা অপর্ণাকে তার কতটুকু দরকার পড়ে!

ভাল করে দেখাও হয় না। শুধু রাতে যখন সে ঘোরলাগা অবস্থায় ঘরের দরজায় পৌঁছোয়, আর দরজা খুলে দিয়ে অপর্ণা সরে যায় তখন প্যাসেজের আলো-আঁধারিতে সে একঝলক অপর্ণার সুন্দর কিন্তু নিষ্ঠুর মুখে একটু বিরাগ লক্ষ করে মাত্র। সেটুকুও ভুল হওয়া সম্ভব। তবু অপর্ণাকে ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে ভালবাসার কথা মনেও হয় না জীবনের।

সামনেই ট্র্যাফিকের হলুদ বাতি লাল হয়ে যাচ্ছিল। আগে একটা সাদা বড় প্লিমাউথ শ্লথ হয়ে থেমে যাচ্ছিল, জীবন স্টিয়ারিং ডাইনে ঘুরিয়ে তাকে পাশ কাটাল, গতি কমাল না, জ্বলজ্বলে লাল আলোর নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল তার ছোট গাড়ি, আড়াআড়ি ক্রসিং-এর গাড়িগুলো সবে চলতে শুরু করেছে, জীবন অনায়াসে ধাক্কা বাঁচিয়ে বেরিয়ে গেল। অপর্ণা চমকে উঠে বলল 'এই। কী হচ্ছে!' জীবন বাঁ হাতটা তুলে অপর্ণাকে শান্ত থাকতে ইঙ্গিত করল শুধু। অপর্ণা ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের রাস্তা দেখে নিয়ে বলে 'পুলিশ তোমার নাম্বার কল করছে, হাত তুলে থামতে

Shahnaz

বলছে।' জীবন গম্ভীর মুখে বলল 'যেতে দাও।' অপর্ণা চুপ করে যায়। চওড়া সুন্দর গড়িয়াহাটা রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে পার্ক সার্কাসের দিকে। সকাল। ট্র্যাফিক খুব বেশি নয়। তবু সামনেই বাস স্টপে একটা দশ নম্বর বাস আড় হয়ে থেমেছে, ফলে পাশ কাটানোর রাস্তা প্রায় বন্ধ। জীবন নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটা গালাগাল দেয়, গাড়ির গতি একটুও কমায় না, তার ছোট গাড়ি বাসটাকে প্রায় বুরুশ করে বেরিয়ে গেল। অপর্ণা কিছু বলে না, শুধু তার বড় বড় চোখ কৌতূহলে জীবনের মুখের ওপর বার বার ঘুরে যায়। জীবনের মুখ বড় গম্ভীর, কপালে অল্প ঘাম। যেতে যেতে জীবন ভীষণ বেগে হঠাৎ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার সোজা করে নিল, গাড়ি এত জোরে টাল খেল যে ড্যাশবোর্ডে মাথা ঠুকে গেল অপর্ণার। 'উঃ।' গাড়ির সামনের রাস্তায় চমৎকার সাজগোজ করা একটি যুবতী মেয়ে তিড়িং করে লাফ দিয়ে ট্রামলাইনের দিকে গিয়ে পড়ল। ওই বয়সের মেয়েকে এরকম লাফ দিতে আর দেখেনি জীবন, সে ঘাড় ঘুরিয়ে আর একবার মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করে, অপর্ণা হঠাৎ তীব্র গলায় বলে 'তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো! এটা কি বাহাদুরি নাকি!' জীবন তার গম্ভীর অকপট মুখ ফেরায়, 'অপর্ণা, আমরা একটু মুশকিলে পড়ে গেছি।' অপর্ণা বড় চোখে তাকায় 'মুশকিল!' জীবন রাস্তার দিকে তার পুরো মনোযোগ রেখে বলে 'গাড়ির ব্রেকটা বোধহয় কেটে গেছে। ধরছে না।' অপর্ণা নিঃশব্দে শিউরে ওঠে, চুপ করে জীবনের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে 'স্টার্ট বন্ধ করে দাও।' জীবন একটা টেম্পোকে পাশ কাটিয়ে নিল, অদূরে একটা ক্রসিং, আড়াআড়িভাবে একটা লরি পাশের রাস্তা থেকে প্রকাণ্ড কুমিরের মতো মুখ বার করেছে—এক্ষুণি রাস্তা জুড়ে যাবে। জীবন এই বিপদের মধ্যেও ছোট আয়নার একপলকের জন্য নিজের ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্ন ও রেখাবহুল মুখ দেখতে পেল, অপর্ণা চোখ বুজে হাতে হাত মুঠো করে ধরে আছে। জীবন হাত বার করে লরির ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে নাড়ল, তারপর হাত নাড়তে নাড়তেই এক হাতে স্টিয়ারিং জীবন গাড়িটাকে এক ঝটকায় মোড় পার করে দিল। অল্প ফাঁকায় জীবন। 'স্টার্ট বন্ধ হচ্ছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। একটু আগেও সব ঠিকঠাক ছিল। অথচ...'। অপর্ণা বক্তব্যহীন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকায় 'কী হবে তাহলে!' ড্যাশবোর্ডে ঝুলছে স্টিলের চকচকে চাবির রিং, দোল খাচ্ছে। জীবন আর একবার স্টার্ট বন্ধ করার চেষ্টা করল। অপর্ণা শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলে 'ঠেলা গাড়ি, ওঃ, একটা ঠেলাগাড়ি...' জীবন তার হাতের ওপর অপর্ণার নরম হাত টের পায়, বলে 'ভয় পেয়ো না, চেঁচিয়ো না, মাথা ঠিক রাখো, সামনে যতদূর দেখা যায় দেখে দেখে আমাকে বলো। ফাঁকা রাস্তা পাচ্ছি এখনও। বোধ হয় বেরিয়ে যাব।' অপর্ণা হাতের দলাপাকানো রুমালে চোখ মোছে, 'গাড়ির এত গণ্ডগোল, আগে টের পাওনি কেন?' খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে বাতাস আসছে, তবু জীবনের কপালের ঘাম নেমে আসছে চোখে মুখে, জিভে সে ঘামের নোনতা স্বাদ পায়, বলে 'দিন পনেরো আগেই তো গ্যারাজ থেকে আনলুম, গিয়ারটা একটু...' অপর্ণা হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে 'বাঁ দিকে, বাঁ দিকে মোড় নাও, সামনে জ্যাম!' তিনটে রিকশা একে অন্যকে কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল, পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ির বনেট লাগল একটা রিকশার হাতলে, ছোট্ট একটা ধাক্কায় রিকশাটাকে সরিয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরল জীবন, রিকশাওয়ালা, হাতল শূন্যে তুলে প্রাণপণে রিকশাটাকে দাঁড় করবার চেষ্টা করছে—এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হাজরা রোডে ঢুকে উলটোদিক থেকে আসা একটা ষোলো নম্বর বাস-এর দেখা পায় জীবন। বাসটা একটা ধীরগতি কালো অস্টিন অফ ইংল্যান্ডকে ছাড়িয়ে যাবে বলে রাস্তা জুড়ে আসছে। দাঁতে ঠোঁট চাপে জীবন, টের পায় ঠোঁটের চামড়া কেটে দাঁত বসে যাচ্ছে, ফুটপাথ ঘেঁষে স্টিয়ারিং ঘোরায় সে, তবু বুঝতে পারে অত অল্প

জায়গা দিয়ে গাড়ি যাবে না। চোখ বুজে ফেলার ভয়ঙ্কর একটা ইচ্ছে দমন করে সে দেখে ষোলো নম্বর বাসটা তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, বাস-এর ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে তার কান মলে দিয়ে বলতে পারে 'শিখতে অনেক বাকি হে!' কিন্তু জীবন খুব অবাক হয়ে দেখল তার ছোট গাড়িটা যেন ভয় পেয়ে জড়োসড়ো এবং আরও ছোট হয়ে রাস্তার সেই খুব অল্প ফাঁক দিয়ে ফুরুৎ করে বেরিয়ে গেল। নেশাগ্রস্তের মতো হাতে জীবন, 'অপর্ণা...'। তাকিয়ে দেখে অপর্ণা দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, জীবনের ডাক শুনে শুধু বলল 'আমার মেয়ে দুটো! মেয়ে দুটোর কী হবে!'

মুহূর্তের জন্য স্টিয়ারিঙের ওপর হাত ঢিলে হয়ে যায় জীবনের। গাড়ি টাল খায়। দুর্বল সময়টুকু আবার সামলে নেয় জীবন, বলে 'কেঁদো না, কাঁদলে আমার মাথা ঠিক থাকবে না। একটু ভুল হয়েছে তোমার, এই রাস্তার মোড় নিতে বললে, কিন্তু রাস্তায় বড় ভিড়।' গাড়ি খুব জোরে চলছে না, জীবন চারদিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছিল। অপর্ণা চোখে জল মুছে শক্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে 'যেমন করে হোক বাসার দিকে গাড়ি ঘোরাও।' জীবন স্থির গলায় বলে 'তাতে লাভ কি! বাসার সামনে গেলেই কি গাড়ি থামবে!' অপর্ণা জোরে মাথা নাড়ে, 'না থামুক। মধু আর মিঠু হয়তো এখনও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।' জীবনের ঘাড় টন টন করছিল ব্যথায়, সহজ ভঙ্গিতে না বসে সে অনেকক্ষণ তীব্র উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে আছে। বাঁ দিকে পর পর কয়েকটা সরু নোংরা গলি, মোড় ফেরা গেল না। সামনেই চৌরাস্তা, দূর থেকেই দেখল জীবন ট্র্যাফিক পুলিশ অবহেলার ভঙ্গিতে হাত তুলে তার সোজা রাস্তা আটকে দিল। অপর্ণা হঠাৎ জোরালো গলায় বলল 'ডান দিকে মোড় নাও, ওদিকে ফাঁকা রাস্তা, তারপর রেইনি পার্ক...' কিন্তু জীবন মোড় নিতে পারল না, গাড়িটা অল্পের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল, তারপর সহজ নিশ্চিতভাবে ট্র্যাফিক পুলিশটাকে লক্ষ করেই ছুটছিল। লোহার হাতে স্টিয়ারিং সোজা রাখে জীবন, পুলিশটার হাতের তলা দিয়ে তার গাড়ি ছোটে। বাঁকের মুখে নীল রঙের একটা ফিয়াট তার গাড়ির বাফারের ধাক্কায় নড়ে উঠে থেমে কাঁপতে তাকে। ফিরেও তাকায় না জীবন, দুটো লরি পর পর কাটিয়ে নেয়। পিছনের পুলিশটা চেঁচিয়ে গাল দিচ্ছে। সামনেই হাজরার মোড়, লাল বাতি জ্বলছে, অনেক গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে। কিছুই ভাবতে হয় না জীবনকে, সে থেমে থাকা গাড়িগুলোকে বাঁয়ে রেখে অবহেলায় এগিয়ে যায়, আবার একটা ডবল ডেকার, পিছনে লম্বা ট্রাম আড়াআড়ি রাস্তা জুড়ে যাচ্ছে, জীবন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে 'আজ কেবলই লাল বাতি, রোজ এমন হয় না তো!' অপর্ণা বাঁ হাত বাইরে বের করে মোড় নেবার ইঙ্গিত দেখায়, ডবলডেকারটার মুখ কোনওক্রমে এড়িয়ে জীবন গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল। রাস্তা ফাঁকা নয়, কিন্তু অনেকটা সহজ। বাঁয়ে মনোহরপুকুরের মুখ, একটু দ্বিধাগ্রস্ত হাতে গাড়ি ঘোরাবে কিনা ভাবতে ভাবতে জীবন সোজাই চলতে থাকে। কালীঘাটের স্টপে গোটা চার-পাঁচ স্টেট বাস একসঙ্গে থেমে আছে। দূর থেকেই জীবন দেখে প্রথম বাসটা ধীর স্থির ভাবে স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে, সে পৌঁছুবার আগে আর বাসগুলো যে ছাড়বে না তা নিশ্চিত। ওখানে বাস স্টপের পাশেই একটা পাবলিক ইউরিন্যাল। আগে থেকেই জীবন তাই ট্রামের ট্র্যাকে তুলে দিল তার গাড়ি। অপর্ণা কী বলতে গিয়ে থেমে যায়। কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে, তাদের গাড়িটাকে এবার অনেকের নজরে পড়েছে। জীবন কালীঘাট পেরিয়ে ট্রামের ট্র্যাকে ঘাসমাটির জমির ওপর দিয়েই চলতে থাকে। লোকজন দূর থেকে চেঁচিয়ে কী বলছে। জীবন একটু ঘোলাটে চোখে অপর্ণার দিকে চায়; 'অপর্ণা...' অপর্ণা অর্থহীন চোখে তার মুখের দিকে তাকায়। জীবন বলে 'আমার কেমন ঘুম পাচ্ছে।' অপর্ণা বুঝতে না পেরে বলে 'কী বলছ?' জীবন মাথা নাড়ে,

Shahnaz

'চোখের সামনে আঁশ-আঁশ জড়ানো একটা ভাব। অনেকক্ষণ সিগারেট না খেলে আমার একরকম হয়। আমি অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি।' অপর্ণার চোখে জল টলমল করছে, রুমালের ঘষায় চোখের আশেপাশের জায়গা লাল, বড় সুন্দর দেখায় তাকে। কপালের সিঁদুর অল্প মুছে গেছে। সে তৎপর গলায় বলে 'কোথায় তোমার সিগারেট? জীবন তার দিকে চেয়ে বলে 'পকেটে।' অপর্ণা বলে 'বের করে দাও।' এবার সামনের মোড়ে সবুজ বাতি জ্বলছে, বালিগঞ্জের ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা হয়ে, ট্রাম ট্র্যাকের পাশে পাশে কয়েকটা গাছ, স্টপে লোকের ভিড়। তাদের গাড়িটা কাছে আসতেই লোকে চেঁচাচ্ছে 'এটা কী হচ্ছে...!' জীবন ক্রমান্বয়ে হর্ন দিয়ে ট্রামের ট্র্যাক থেকে রাস্তায় নামে। সামনেই একটা নয় নম্বর। এটা ট্রলি বাস—প্রকাণ্ড বড়, আস্তে আস্তে রাস্তা জুড়ে চলে। জীবন হর্ন দেয়, বাসটাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করা বৃথা—জায়গা নেই। ট্রাম ট্র্যাকের দিকে আবার মুখ ঘোরাতে গিয়ে জীবন দেখে তিন-চারজন লোক রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁয়ে স্টিয়ারিং চেপে ধরে জীবন। কংক্রিটে প্রবল ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা সোজা ফুটপাতে উঠে যায়। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের গাড়িবারান্দার তলা থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কয়েকজন লোক সরে যায় জীবনের গাড়ির মুখ থেকে। জীবন গালাগাল শুনতে পায় 'এই শুয়োরের বাচ্চা, হারামি...' ছোট আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন তার গাড়ির পিছু নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে পিছিয়ে পড়তে থাকে। তারা দূর থেকে হাত নেড়ে শাসায়। মুক্ত-অঙ্গনের সামনে জীবন ফুটপাথ ছেড়ে আবার রাস্তায় নামে। একটা ঢিল এসে পিছনের কাচে চিড় ধরিয়ে দিল। এতক্ষণ উত্তেজনায় অপর্ণাকে দেখেনি জীবন, এখন দেখে অপর্ণা গাড়ির দরজায় ঢলে চোখ বুজে আছে। কপালে একটু জায়গা কাটা, একটা রক্তের ধারা থুঁতনি পর্যন্ত নেমে এসেছে। জীবন চেঁচিয়ে ডাকে 'অপর্ণা।' আস্তে চোখ খোলে অপর্ণা, কেমন বোধ ও যন্ত্রণাহীন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ জীবনের মুখের দিকে তাকায়, হঠাৎ তীব্র আক্রোশে বলে 'তুমি ছোটলোক। তুমি বরাবর ছোটলোক, ভিখিরি ছিলে। তুমি কখনও আমার উপযুক্ত ছিলে না।' ঠিক। সে কথা ঠিক। জীবন জানে। ফাঁকা সুন্দর রাস্তার দিকে চেয়ে সে বলে 'আমার ঘুম পাচ্ছে অপর্ণা। আমি রাস্তা ভাল দেখছি না।' অপর্ণা তেমনই আক্রোশের গলায় বলে 'ভেবো না, 'তুমি মরলেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি দরজা খুলে এক্ষুণি লাফিয়ে পড়ব।' বলতে বলতেই দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দেয় অপর্ণা, আঁধখোলা দরজার দিকে ঝুঁকে পড়ে, দ্রুত হাত বাড়িয়ে অপর্ণার কনুইয়ের ওপর বাহুর নরম অংশ চেপে ধরে তাকে টেনে আনে জীবন। বলে 'কপালটা কী করে কাটল! দরজায় ঠুকে গিয়েছিল, না! রুমালে ওটা মুছে ফেল, বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।' বলতে বলতে লেকের দিকে গাড়ির মুখ ফেরায় জীবন, বলে 'গাড়ির স্পিড পঁচিশের মতো। এখন লাফিয়ে পড়লেও তুমি বাঁচবে না। যা নরম শরীর তোমার! কোনওকালে তো শক্ত কোনও কাজ করোনি! বলতে বলতে হাসে জীবন। অপর্ণা রুমালে মুখ চেপে ফোঁপায়, 'কেমন অসম্ভব...অসম্ভব লাগছে...এমন সুন্দর সকালটা ছিল...মিঠু মধু আর এখন! দুজনেই হয়তো মরে যাব।' জীবন প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে গাড়ির সিট-এর ওপরে রাখে, বলে 'একটা সিগারেট আমার মুখে লাগিয়ে দাও তো। আর ধরিয়ে দাও।' অপর্ণা কাঁপা হাতে জীবনের ঠোঁটে সিগারেট লাগায়। লেকের হাওয়া দিচ্ছে, অপর্ণা অনভ্যাসের হাতে দেশলাই ধরাতে গিয়ে পর পর কাঠি নষ্ট করে। জীবন মাথা নাড়ে 'হবে না, ওভাবে হবে না।' বলতে বলতে ঠোঁটের সিগারেট নিয়ে অপর্ণার দিকে বাড়িয়ে দেয় 'তুমি নিজে ধরিয়ে দাও। গাড়ির মধ্যে নিচু হয়ে বসে ধরাও।' অপর্ণা প্রায় আর্তনাদ করে বলে 'তার মানে? আমাকে মুখে

দিতে হবে?' জীবন একবার তার দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয় 'তাড়াতাড়ি করো। আমার বিশ্রী ঘুম পাচ্ছে।' অপর্ণা একটু দ্বিধা করে, তারপর গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে মুখে লাগিয়ে সিগারেটটা ধরানোর চেষ্টা করে। ধরায়, তারপর সিগারেট জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলে 'ছোটলোক, তুমি ছোটলোক ছিলে। কোনও দিন তুমি সুন্দর কোনও কিছু ভালবাসোনি। ভেবো না আমি টের পাইনি। কাল রাতে যখন তুমি প্যাসেজ দিয়ে আসছিলে তখন আমি ফ্রিজ-এর দরজা খোলার আর বন্ধ করার শব্দ পেয়েছিলুম।' স্টিয়ারিং হুইলের ওপর জীবনের হাতের পেশি ফুলে ওঠে 'তার মানে?' অপর্ণা হিসহিসে গলায় বলে 'ওই বেড়ালটা, ওই সুন্দর কাবলি বেড়ালটা...তুমি কোনওদিন ওটাকে সহ্য করতে পারোনি।' লেক-এর চারধারে ফাঁকা রাস্তায় জীবন গাড়ি ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। হাওয়া দিচ্ছে, প্রবল হাওয়ায় তার কপালের ঘাম শুকিয়ে যেতে থাকে, আর তার আবছা মনে পড়ে...হ্যাঁ মনে পড়ে...সে ফ্রিজ-এর দরজা খুলেছিল কাল রাতে। অপর্ণা ঠিক বলছে। অপর্ণাই ঠিক বলছে। তার গাড়ি টাল খায়, ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে একটা ছেলে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, আকাশের দিকে চোখ। জীবন তার দিকে সোজা এগিয়ে যেতে থাকে, অপর্ণা চিৎকার করে ওঠে এই— এই-ই..' ছেলেটা চমকে উঠে তাকায়, তারপর দৌড়ে রাস্তা পার হয়। ঘুড়ির সুতো গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে লেগে দু'ভাগ হয়ে যায়। ভো-কাট্টা! জীবন হাসে। অপর্ণা হাঁফাতে হাঁপাতে বলে 'আমাদের পিছনে একটা পুলিশের গাড়ি...' জীবন আয়নায় তাকিয়ে একটা কালো গাড়ি দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের প্রথম রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় সে, অল্পক্ষণ পরেই তার গাড়ি লেক পার হয়ে ঢাকুরিয়া ওভারব্রিজ-এর ওপর উঠে আসে। ব্রিজ-এর নীচে একটা পুলিশ দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে তার গাড়িতে থামবার ইঙ্গিত করে। গ্রাহ্য না করে জীবন বেরিয়ে যেতে থাকে। অপর্ণা পিছু ফিরে দেখে বলে 'তোমার নম্বর টুকে নিল।' বলতে বলতেই আবার কেঁদে ফেলে অপর্ণা, 'তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তোমার অনেক বছর জেল হওয়া উচিত।' জীবন কথা বলে না। সামনেই যাদবপুরের ঘিঞ্জি বাস ট্রার্মিনাস, বাজার দোকানপাট। একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে, পিছনের চাকার কাছে একটা লোক বসে ঠিকঠাক করে কী যেন ঠিক করছে, একটা সাইকেল রিকশা মুখ ফেরাল। জীবন সোজা রাখে তার গাড়ি, রিকশার সামনের চাকা আর লরির পিছনের চাকায় সেই লোকটার মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় সে স্পষ্ট টের পায় কিছু একটায় তার গাড়ির ধাক্কা লাগল, একটা চিৎকার শোনা যায়। সে মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দেখো তো লোকটা মরে গেছে কিনা!' কিন্তু অপর্ণা কী বলল শুনতে পেল না জীবন। তার কান মাথা চোখ জুড়ে দপ্ দপ্ করে চমকে উঠল একটা রগ। সে জিজ্ঞেস করল 'কী বলছ?' অপর্ণা অস্ফুট উত্তর দিল। শোনা গেল না। সামনে লোক, অজস্র লোক, সরু রাস্তা, রিকশা লাইন, নিচু দোকান ঘর—এইসব হিজিবিজি ছবির মতো তার চোখে দুলে দুলে উঠছিল।... একটা বেড়াল...কাল রাতে একটা বেড়াল ফ্রিজ-এর মধ্যে সমস্ত রাত...না মনে পড়ে না, মনে পড়ে না...জীবন দেখল ব্যালকনিতে মধু আর মিঠু দাঁড়িয়ে, মিঠু তার বাবার মতো, মধু তার মায়ের মতো—তারা হাত নাড়ছে, টা-টা, দুর্গা দুর্গা বাবা। অপর্ণা কিছু বলছে? 'কী বলছ তুমি?' সে জিজ্ঞেস করে, অপর্ণা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে স্টিয়ারিং সোজা রাখবার চেষ্টা করে। জীবন ঝাঁকুনি খেয়ে আবার ধোঁয়াটে ভাবটুকু কাটিয়ে নেয়। অপর্ণা কাঁদে কী হচ্ছে...এবার তুমি মাথা খারাপ করছ। চারজনকে ধাক্কা দিলে পর পর। ওরা ঢিল ছুড়ছে, গালাগাল দিচ্ছে।' বাস্তবিক ঢিল এসে পড়ছিল, পিছনে লোক দৌড়ে আসছে, সামনের দিকে একটা লোক বাঁশ তুলে চিৎকার করছে 'মাইরা ফালামু...।' জীবন ক্লান্ত

Shahnaz

গলায় বলল 'এত লোক কেন বলোতো। কেন এত অসংখ্য লোক! ইচ্ছে করে খুন করে ফেলি।' জীবন বাঁশ হাতে লোকটাকে পুরোপুরি এড়াতে পারল না, গাড়ির জানালা দিয়ে লোকটা বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে সরে গেল। বাঁশের নোংরা ধারালো মুখটা তাঁর গাল আর থুঁতনি কেটে, গলায় ধাক্কা দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল। জীবন সিটের ওপর পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে বসে। মাথা ঠিক রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। তার চোখের সামনে হিজিবিজি, হিজিবিজি দোকানপাট, টেলিগ্রাফের পোস্ট, সিনেমার বিজ্ঞাপন আর অজস্র মানুষের মুখ একটা ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতার ভিতরে সরে যেতে থাকে। তার মাথা টলতে থাকে, ঘুড়ির মতো লাট খায়, সে সব ভুলে একবার সিগারেটের জন্য স্টিয়ারিং ছেড়ে হাত বাড়ায়, আবার স্টিয়ারিং চেপে ধরে। অপর্ণা কেবলই কী যেন বলছে, সে বুঝতে পারছে না। এখনও তার ট্যাঙ্ক ভর্তি পেট্রল। সে কল কল শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ক্রমে বাঘাযতীন, বৈষ্ণবঘাটা পেরিয়ে যায় জীবন। গড়িয়ার পর হু-হু করা রাস্তা। কিন্তু জীবনের কাছে ক্রমে সবকিছুই আবছা হয়ে আসছিল। হঠাৎ জীবন যেন শেষ চেষ্টায় ব্রেকে পা দেয়, তারপর স্টিয়ারিং ছেড়ে দু হাত শূন্যে তুলে বলে 'অপর্ণা, আমি আর পারছি না, পারছি না...', গাড়ি বেঁকে গেল, রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে এল মাঠের ওপর। উঁচু নিচু খোয়াইয়ের মতো জমির ওপর দিয়ে কয়েক গজ এগিয়ে কাত হয়ে থেমে পড়ল।

আস্তে আস্তে চোখ খোলে জীবন। অপর্ণা গাড়ির ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেছে। ছোট্ট ছাইরঙা একটা পুঁটুলির মতো দেখাচ্ছে তাকে। জীবন আপন মনে হাসে, দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এখনও সকালের মতো নরম রোদ, ধান কেটে নিয়ে যাওয়া ক্ষেত। জীবন হাত পা ছড়িয়ে একটু দাঁড়ায়, তারপর এসে দরজা খুলে অপর্ণাকে বের করে, মাঠের ওপর শুইয়ে দেয়। আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দেয় তাকে 'অপর্ণা, এই অপর্ণা...' গালে থুতনিতে তীব্র জ্বালা টের পায় সে। গলায় ডেলা পাকানো ব্যথা। মাথা এখনও অল্প ধোঁয়াটে। অপর্ণা চোখ খোলে, অনেকক্ষণ জীবনের দিকে অর্থহীন চেয়ে থাকে। জীবন হাসে 'ওঠো। উঠে বোসো। আমরা বেঁচে আছি।'

অপর্ণার চোখ জীবনের মুখ থেকে সরে আকাশের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্য উড়ে যায়। তারপর আঁচল সামলে সে উঠে বসে। তার মুখের কঠিন, একটু নিষ্ঠুর অথচ সুন্দর পাথরের মতো প্রোফাইল ঘাসের সবুজ পশ্চাৎভূমিতে জেগে ওঠে। জীবনের মন গুন গুন করে ওঠে 'ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' অপর্ণা দাঁড়িয়ে বলে 'এবার, তাহলে?' জীবনের দিকে চায় 'তোমার মুখের ডানদিক কী ভীষণ ফুলে লাল হয়ে আছে, কেটে গেছে অনেকটা!' জীবন হাতে অবহেলার ভাব ফুটিয়ে বলে 'ও কিছু না।' রাস্তা থেকে জমি পর্যন্ত এমন কিছু ঢালু নয়। জীবন ভেবে দেখে যে একাই গাড়িটা ঠেলে তুলতে পারবে। কয়েকজন পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে গেছে, মাঠের ওপর দিয়ে দূর থেকে দৌড়ে আসছে কয়েকটা কালো কালো ছেলে-মেয়ে। জীবন অপর্ণাকে বলে 'তুমি গাড়িতে উঠে বোসো, আমি এটাকে ঠেলে তুলছি।' অপর্ণা ভ্রূ কোঁচকায় 'তুমি একা পারবে কেন?' 'পারব।' অপর্ণা মাথা নাড়ে 'তা হয় না।' পরমুহূর্তেই একটু অদ্ভুত নিষ্ঠুর হাসি হাসে সে 'এক সঙ্গেই মরতে যাচ্ছিলুম দুজনে। তা ছাড়া আমি তো তোমার সহধর্মিণীও, অনেক কিছুই ভাগ করে নেওয়ার কথা আমাদের।' বলতে বলতে সে কোমরে আঁচল জড়ায়, গাড়িতে 'হেঁইয়ো' বলে ঠেলা দেয়, রাস্তার লোকেরাও কয়েকজন নেমে আসে। 'কোথায় যাবে এটাকে নিয়ে!' জীবন চিন্তিত মুখে বলে 'কিছু দূরেই বোধ হয় একটা পেট্রল পাম্প আছে।'

যারা ঠেলছিল তাদের একজন সায় দেয় 'হাঁ, আছে।'

বুড়ো মেকানিক খোলা বনেটের ভিতর থেকে মুখ তুলে জীবনের দিকে তাকায় 'কই! কিছু পাচ্ছি না তো! কোনও গোলমাল নেই ইঞ্জিনে।' জীবন চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে 'আমি জানি যে কোনও গোলমাল নেই।' মেকানিক ঝাড়নে হাত মোছে 'চালিয়ে দেখব?' জীবন মাথা নাড়ল 'না'। বলল 'বোধ হয় হর্নটায় একটু...', মেকানিক বলল, 'কানেকশনের গোলমাল? আচ্ছা দেখছি' কয়েক মিনিটেই কাজ সারা হয়ে গেল। অপর্ণা পেট্রল পাম্পের অফিস ঘরে বসে ছিল। জীবন ডাকতেই উঠে এসে গাড়ির কাছে একটু থমকে দাড়াল। জীবন তাকিয়ে ছিল। একটুও দ্বিধা না করে অপর্ণা গাড়িতে উঠে বসল। জীবন গাড়ি স্টার্ট দেয়।

সারা রাস্তায় আর কথা হয় না দুজনে।

সন্ধেবেলায় জীবন বসবার ঘরে সোফায় জানালার দিকে মুখ রেখে এলিয়ে পড়ে ছিল। মধু আর মিঠু আতরের সঙ্গে বেড়াতে গেছে পার্কে। জীবন মনে মনে ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। অপর্ণা এসে সামনেই দাঁড়াল। জীবন একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

অপর্ণা জানালার থাকের ওপর বসে বলে 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

জীবন দু'আঙুলে কপাল টিপে রেখে বলে 'বলো।'

অপর্ণার মুখ খুবই গম্ভীর 'যখন পেট্রল পাম্পে বসে ছিলুম, তখন ওখানকার লোকটার সঙ্গে কথা হল আমার। আমি গাড়ির কিছুই বুঝি না, কিন্তু লোকটাকে যখন আমাদের গাড়ির গোলমালের কথা বললুম, তখন সে খুব অবাক হয়ে বলল অত গোলমাল এক সঙ্গে একটা গাড়ির হতে পারে না। গাড়ি থামাবার অনেক উপায় নাকি ছিল।'

জীবন হাসে 'ঠিক। সে কথা ঠিক।'

'তবে গাড়ি থামেনি কেন?'

জীবন মাথা নাড়ে 'গাড়ি থামেনি গাড়ি থামানো হয়নি বলে।'

'কেন? তুমি কি ঠিক করেছিলে আমাকে নিয়ে সহমরণে যাবে! না কি এ তোমার খেলা?'

জীবন অস্থির চোখে অপর্ণাকে দেখে, 'খেলা!' পরমুহূর্তেই মুখ নিচু করে মাথা নাড়ে আবার 'কি জানি কেন আমি গাড়ি থামাতে পারিনি। থামানো সম্ভব ছিল না—এইমাত্র।'

'কেন?'

'কেন!' জীবন শূন্য চোখে চারপাশে চায়, ভেবে দেখবার চেষ্টা করে, তারপর অসহায়ভাবে বলে 'কেন, তা তুমি বুঝবে না।'

ভ্রূ কোঁচকায় অপর্ণা, 'বুঝব না কেন? বোঝাও। আমি বুঝবার জন্য তৈরি।'

জীবন অপর্ণার চোখ এড়িয়ে যায়, কী একটা কথা যেন বলবার ছিল কিন্তু তা খুঁজে পাচ্ছে না সে, তবু সে ম্লান হেসে হালকা গলায় বলে 'তুমি কোনওদিন আমাকে সুন্দর দেখোনি, তাই না। কিন্তু আজ যখন ওই ভিড়ের রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে অ্যাকসিডেন্টের ওই ভয়ের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম—আমার মনে হয়—তখন আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তুমি দেখোনি।'

জীবন মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে অপর্ণার মুখ রাগে ঝলমল করে উঠল 'সুন্দর! কিসের সুন্দর। তুমি জানতে না তোমার সংসার আছে? দুটো বাচ্চা শিশু মেয়ে তোমার? তোমার নিজের

Shahnaz

হাতে তৈরি কারখানা যা অনেক কষ্টে তৈরি করতে হয়েছে? কতগুলো মানুষ তোমার ওপর নির্ভর করে আছে, সে কথা তুমি কী করে ভুলে যাও?'

জীবন বুঝতে পারে সে অপর্ণার সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে, বস্তুত তার কোনও যুক্তিই নেই, তবু হাসি ঠাট্টার সুর বজায় রাখবার চেষ্টায় সে বলে 'বোধ হয় তোমার কাছে একটু বাহবাও পেতে চেয়েছিলুম। তুমি তা দাওনি। কিন্তু মনে রেখো রাস্তার ওই ভিড়, পর পর অত বিপদের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে গেছি, একবারও থামিনি। মনে রেখো, একবারও থামিনি।'

রাস্তার একটা ন্যাংটো পাগলের দিকে লোকে যেভাবে তাকায়, সেভাবেই অপর্ণা জীবনের দিকে এক পলক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর এই প্রথম সে জীবনকে নাম ধরে ডাকে 'জীবন, তুমি ছিলে রাস্তার ছেলে, প্রায় ভিখিরি। তোমার সঙ্গে কোনও ব্যাপারেই আমার মিল নেই। ভাগ্য তোমাকে এত দূর এনেছে। তবু আজ ওই কাণ্ড করে তুমি সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে চেয়েছিলে। ডোবাতে চেয়েছিলে নিজেকে, আমাদেরও। এর জন্যই কি তুমি বাহবা চাও?'

জীবনের মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। অপর্ণার কথার ভিতরে কোথায় যেন একটু সত্য ছিল, কিন্তু জীবন তা ধরতে পারে না। তার প্রাণপণ ইচ্ছে হয় অপর্ণার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে—তুমি ঠিক বলছ অপর্ণা। ঠিক বলছ। এই ঘর বাড়ি সংসার আমার নিজের বলে মনে হয় না। এখানকার খাবারে আমি এক কণা স্বাদ পাই না। আমার কেবলই ইচ্ছে এই সব কিছুর বুকের ওপর দিয়ে একবার জোরে চালিয়ে দিই, আমার গাড়ি। কিন্তু সে সব কিছুই বলে না জীবন, মুখে মৃদু হাসি টেনে আনে, তেমনই ঠাট্টার সুরে বলে 'জীবনে সে কয়টি মুহূর্তই দামি যে সব মুহূর্তে মানুষ মানুষকে সুন্দর দেখে। জন্ম থেকে তুমি কি কেবলই শিখেছ কী করে নিরাপদে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়?'

মাথার ভিতরে, বুকের ভিতরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা বোধ করে জীবন। অপর্ণা নিষ্ঠুর ধারালো চোখে কিছুক্ষণ চুপ করে তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর সামান্য বিদ্রূপের মতো করে বলে যায়, আমাদের কাবলি বেড়ালটারও সেই দামি মুহূর্ত বোধ হয় কাল রাতে এসেছিল যখন তাকে তুমি সুন্দর দেখেছিলে। আমি, আর তোমার দুই মেয়েও তো সুন্দর জীবন, তাদের জন্য এবার একটা বড় দেখে ফ্রিজ কেনো, দোহাই, জোরে গাড়ি চালিয়ে নাটক কোরো না।'

হঠাৎ তীব্র এক অসহায়তা সঙ্গীহীন জীবনকে পেয়ে বসে। তার মাথার ভিতরে কল চলবার শব্দ, বুকের ভিতরে কেবলই একটা রবারের বল লাফিয়ে ওঠে। তবু তার এই কথা বলবার ইচ্ছে হয়—ঠিক, তুমি ঠিকই বলছ অপর্ণা। আমার ওই রকমই মনে হয়। এই সব ভেঙেচুরে শেষ করে দিয়ে আমার আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে ছেলেবেলার সেই চায়ের দোকানের উনুনের পাশে, চট আর ছেঁড়া শতরঞ্জির বিছানায়, যেখানে দুঃখী রোগা এক মায়াবী বেড়াল আমার শিয়রের কাছে শুয়ে থাকবে সারা রাত। কিংবা ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই মোটর সারাই কারখানায়, যেখানে লোহার জোড় মেলাতে মেলাতে আমি কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল দেখে গান গাইব আবার। হ্যাঁ, অপর্ণা, আমি এখনও ছোটলোক, ভিখিরি। মুখে মৃদু হাসল জীবন, তার মুখ সাদা দেখাচ্ছিল, কোনওক্রমে সে গলার স্বরে এখনও সেই ঠাট্টার সুর বজায় রাখছিল 'কে জানে তোমার কাবলি বেড়ালটাও আত্মহত্যা করেছিল কি না!'

অপর্ণা কী বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে জীবন বলে 'চুপ, অপর্ণা!' তারপর স্খলিত গলায়

বলে 'তুমি সহমরণের কথা বলছিলে না! ধরে নাও আজ আমি তোমাকে সহমরণেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম। তুমি বুঝবে কি এসব অপর্ণা?'

অপর্ণা মাথা নাড়ে—না। তার চোখে জল, মুখের প্রতিটি রেখায় রাগ আর আক্রোশ। সে জীবনের দিক থেকে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে চলে যায়। জীবন বাধা দেয় না। শুধু এতক্ষণ অপর্ণা যে জায়গায় বসেছিল সেইখানে গভীর চোখে চেয়ে থাকে, যেন এখনও অপর্ণা বসে আছে।

ঘরে কেউ ছিল না, তবু হঠাৎ জীবন চমকে উঠে বলে 'কে?' তারপর শূন্য চোখে চারদিকে চায়। সিগারেট আর দেশলাইয়ের জন্য চারদিকে হাতড়ে দেখে। বড় ক্লান্তি লাগে জীবনের এলোমেলো অনেক কথা তার ভিতরে থেকে ঠেলে আসতে চায়। মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করতে থাকে। সে ভীষণ অন্যমনস্কের মতো বলে 'আঃ, অপর্ণা...' পরমুহূর্তেই চমকে ওঠে 'কেউ কি আছ?' কেউ ছিল না, তবু জীবন একবার পরম বিশ্বাসে দুটো হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে শূন্যে তুলে ধরে, যেন ভিক্ষুকের মতো বলতে চায়—আমাকে নাও।

দরজার কাছ থেকে মিঠু ডাকে, 'বাবা!'

অলীক আত্মসমর্পণের এক শূন্যতা থেকে জীবন আবার শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের বাস্তবতার ভিতরে দ্রুত ফিরে আসে।

দেশ, ৭ মাঘ, ১৩৭৩

Shahnaz

গঞ্জের মানুষ

রাজা ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর দিনটা শেষ হয়ে গেল। একটা একা শিরীষ গাছ সিকি মাইল লম্বা ছায়া ফেলেছিল। সেই ছায়াটাকে গিলে ফেলল আঁধার রাতের বিশাল পাখির ছায়া। ফকিরচাঁদের সাত ঘড়া মোহর আর বিস্তর সোনাদানা, হিরে-জহরৎ সব ওই ঢিবির ভিতরে পোঁতা আছে। আর আছে ফকিরচাঁদের আস্ত বসতবাড়িটা। ঢিবির ওপাশ দিয়ে রেল লাইন, এপাশ দিয়ে রাস্তা। পাথরকুচি ছড়ানো, গাছ-গাছালির ছায়ায় ভরা। এখন একটু অন্ধকার মতো হয়ে এসেছে, শীতের থম-ধরা বিকেলে একটু ধোঁয়াটে মতো চারধার। রাস্তার পাথরকুচিতে চটি ঘষটানোর শব্দ উঠছে। রবারের হাওয়াই চটি, এ পর্যন্ত সাতবার ছিঁড়েছে। তবু ফেলে দেয়নি নদীয়াকুমার।

তো এই সন্ধের ঝোঁকে আলো-আঁধারে নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায় তা ঠাহর করা মুশকিল। ভেলুরামের চোখে ছানি আসছে। নাতি খেলারাম বীরপাড়া গেছে তাগাদায়। সে এখনও ফেরেনি দেখে চৌপথীতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে এল ভেলু। বীরপাড়ার একটা বাস এসে ছেড়ে গেল। এ গাড়িতেও আসেনি। আরও খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে হত। নাতিটার জন্য বড্ড চিন্তাভাবনা তার। কিন্তু ভেলুরাম দোকান ছেড়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা পায় না। তার ছেলে শোভারাম চোর-চোট্টা-বদমাশ হয়ে গেছে। এক নম্বরের হেক্কোড়। নেশাভাঙ আর আউরাৎ নিয়ে কারবার করে। বহুকাল আগে শোভারামের বউ পালিয়ে গেছে। ভেলু কেবল নাতিটাকে রেখে শোভারামকেও ঘরের বার করেছে। কিন্তু ছেলে মহা হেক্কোড়, দুনিয়ায় কাউকে ভয় খায় না। দরকার পড়লেই এসে ভেলুর দোকানে হামলা করে মালকড়ি ঝেঁকে নিয়ে যায়। তাই চৌপথী থেকে পা চালিয়ে ফিরছিল ভেলু। রবারের চটির আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল।

নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায়? মুশকিল হল, নদীয়ার বউ আজকাল মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে, পিরান গায়ে দেয়, চুলও ছেঁটে ফেলেছে। কে বলবে মেয়েমানুষ? হাতে চুড়ি-বালা, সিঁথের সিঁদুর কিছু নেই। রাতবিরেতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা হয়েছে যে, সে পুরুষমানুষ, আর কালীসাধক। অবশ্য কালীর ভরও হয় তার ওপর। শুধু ভেলু কেন, গঞ্জের সবাই

নদীয়ার বউকে ভয় খায়। নদীয়া নিজেও।

ভেলু শেষবেলার আকাশের খয়াটে আলোটুকুও চোখে সহ্য করতে পারে না, চোখে হাত আড়াল দিয়ে দেখে বুঝে ভয়ে ভয়ে বলে—কে, নদীয়া নাকি?

—হয়। নদীয়া উত্তর দিল।

—কোন বাগে যাচ্ছ?

—বাজারের দিকেই।

—চলো, একসঙ্গে যাই।

—চলো।

দুজনে একসঙ্গে হাঁটে। ভেলুরামের নাগরা জুতোর ঠনাঠন শব্দ হচ্ছে, ফ্যাসফ্যাস করছে নদীয়ার চটি। ভারী দুঃখী মানুষ এই নদীয়া। বউ যদি পুরুষছেলে হয়ে যায় তো পুরুষমানুষের দুঃখ ঝুড়িভরা। কিন্তু ওই সাত জায়গায় ডিম-সুতোর বাঁধনঅলা হাওয়াই চটি দেখে যদি কেউ নদীয়ার দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করে তো সে আহাম্মক। নদীয়ার দুঃখ ওই চটি জুতোয় নয় মোটেই। দু'দুটো মদ্দ হালুইকর নদীয়ার শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে দু'বেলা খাটে। গঞ্জে বলতে গেলে ওই একটাই মিষ্টির দোকান। আরও কয়েকটা নদীয়ার ভাত মারবার জন্য গজিয়েছে বটে, তবু নদীয়ার বিক্রিবাটাই সবচেয়ে বেশি। দোষের মধ্যে লোকটা কৃপণ। জামাটা জুতোটা কিনবে না, পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোবে না। চটি ছিঁড়লে সেলাই করে পরবে। বউ কি সাধে পুরুষ সাজে!

যে যার নিজের জ্বালায় মরে। নদীয়া যেতে যেতে কাঁদুনি গাইতে লাগল—সামনের অমাবস্যায় আমার বাড়িতে মচ্ছব লাগবে, বুঝেছ? আমার বউ নিজের হাতে পাঁঠা কাটবে। শুনেছ কখনও মেয়েছেলে পাঁঠা কাটে?

দেহাতি ভেলুরামের তিন পুরুষের বাস এই গঞ্জে। সে পুরো বাঙালি হয়ে গেছে, তবু মাঝে মাঝে অভ্যাস রাখার জন্য সে দু'চারটে হিন্দি কথা ভেজাল দিয়ে নির্ভুল বাংলা বলে। যেমন এখন বলল—নদীয়া ভাই, আউরাৎ তোমার কোথায়? ও তো ব্যাটাছেলে হয়ে গেছে। সোচো মৎ।

—তুমি তো বলবেই। আমি মরি স্বখাত সলিলে, তোমরা মাগনার মজা দেখছ।

ভেলুরাম নাগরার শব্দে যথেষ্ট পৌরুষ ফুটিয়ে বলল—ও মেয়েছেলেক সোজা রাখতে হলে চার জুতি লাগাতে হয়।

বলে থেমে গিয়ে নিজের একখানা পা তুলে পায়ের নাগরা নদীয়াকুমারকে দেখিয়ে বলল—এইসন জুতি চাই। কিন্তু তুমি জুতি লাগাবে কি, তোমার তো একজোড়া ভাল জুতিই নেই। ওইরকম কুত্তার কানের মতো লটরপটর হাওয়াই চটি দিয়ে কি জুতো মারা যায়!

—রাখো রাখো! নদীয়া ধমকে ওঠে—শোভারামের মা যখন নোড়া তুলে তাড়া করেছিল তখন তো বাপু ন্যাজ দেখিয়েছিল, বুড়ো ভাম কোথাকার!

ভেলুরাম খুব হাসে। শোভারামের মা এখন আর বেঁচে নেই। নোড়া নিয়ে তাড়া করার সেই সুখস্মৃতিতে ভারী আহ্লাদ আসে মনে। এত আহ্লাদ যে চোখে জল এসে যায় ভেলুরামের।

আনাচে-কানাচে শোভারাম কুকুর বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করে। এমন অবস্থা ছিল না যখন মা গন্ধেশ্বরী জীবিত ছিল। তখনও বাপটা খড়মটা হুড়কোটা দিয়ে পেটাত বটে, কিন্তু তবু সংসারের বার করতে সাহস পেত না। মা গন্ধেশ্বরীকে ভূত-প্রেত পর্যন্ত ভয় পেত, কাবুলিওয়ালা কি দারোগা পুলিশকেও গ্রাহ্য করত না গন্ধেশ্বরী। ভেলুরাম তো সেই তুলনায় ছারপোকা। সেই গন্ধেশ্বরী ছিল শোভারামের সহায়। তখন শোভারামের মনখানা সব সময়ে এই গান গাইত—লুট

Shahnaz

পড়েছে, লুটের বাহার, লুটে নে রে তোরা। তাই বটে। বাপ ভেলুরামের পাইকারি মসলাপাতি, মনোহারী জিনিস, পাট, তামাকপাতা, তেলের বীজ ইত্যাদির কারবার থেকে সে মনের আনন্দে লুট করত। বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে শিখেছিল ইস্কুলের প্রথম দিকটা। ক্লাস থ্রিতে উঠলে লেখাপড়া সাঙ্গ হল। মাস্টাররা মারে ব'লে মা গন্ধেশ্বরী ইস্কুল থেকে ছাড়ান করাল। বাপের সঙ্গে কিছুদিন কারবার বুঝবার চেষ্টায় লেগেছিল। ভাল লাগত না। বাপটা পারেও বটে। দু'পয়সা চার পয়সার হিসেব নিয়ে পর্যন্ত মাথা গরম করত। শোভারামের এ সব পোষায় না। বয়সকালে বউকে গাওনা করে দেহাত থেকে আনাল মা। কিন্তু সে বউয়েরও কি বা ছিল! শোভারাম ইতিমধ্যে বখাটেদের সঙ্গে ভিড়ে বিস্তর মেয়েমানুষের স্বাদ সংগ্রহ করেছে। দেহাতি মেয়ে বড্ড নোনতা। ভারী ঝাঁঝ তাদের হাবেভাবে। সেটা অপছন্দ ছিল না শোভারামের। কিন্তু বউয়েরও তো পছন্দ বলে কিছু আছে! শোভারাম নেশার ঘোরে পড়ে গেছে, গাঁজা ভাঙ তো আছেই, বোতলের নেশাও ধরে ফেলেছে কবে। মেয়েমানুষটা টিকটিক করত। খেলারাম হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম। মা গন্ধেশ্বরী তখনও সহায়। ছেলের বউয়ের তেজ দেখে উদুখলের কোঁৎকাটা দিয়ে আচ্ছাসে ঝেড়ে দিল। সেই পেটানো দেখে শোভারাম মুগ্ধ। মায়ের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়েছিল সেদিন। বছরখানেকের খেলারামকে ফেলে বউ ভেগে গেল ছ'মাস পর। বাপ ভেলু অবশ্য বরাবরই শোভার বিপক্ষে। তক্কে তক্কে ছিল, কবে গন্ধেশ্বরী মরে। সেই ইচ্ছা পূরণ করে শোভারামকে জগৎসংসারে একেবারে দিগদারির দরিয়ায় ছেড়ে, গেল বছর মা গন্ধেশ্বরী সধবা মরল। গন্ধেশ্বরীর শ্রাদ্ধের দিন পার হতে না হতেই ভেলুরাম মহা হাঙ্গামা বাধায়। শোভারাম কিছু প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু বাপ ভেলুরাম মহকুমায় গিয়ে এস.ডি.ও সাহেবের কাছে পর্যন্ত ছেলের বিরুদ্ধে দরবার করে। লজ্জায় ঘেন্নায় শোভারাম গৃহত্যাগ করে।

কিন্তু ঘর ছাড়লেই কী! তিরপাইয়ের বস্তিতে জগনের ঘরে একরকম আদরেই আছে শোভারাম। কিন্তু সে আদরে তো মালকড়ি আসে না। নেশা-ভাঙ আর কাঁহাতক ভিক্ষেসিক্ষে করে চলে! কাজবাজ বলতে কিছু নেই, রোজগারপাতি ঢুঢু, চুরি-চামারিও বড় সহজ নয়। মহকুমার সদরে গিয়ে অনেক ঘুর ঘুর করেছে সে, কেউ কাজ দেয় না। তিন চার বাড়িতে চাকর খেটেছিল, চুরি করে মারধর খেয়ে পালিয়ে এসেছে, পুলিশেও খোঁজখবর করছে। বড় অব্যবস্থা চারদিকে। চুরির লাইনে পাকাপাকিভাবে ঢুকে পড়ার বাসনা ছিল। কিন্তু নেশা-ভাঙ করে শরীরে আর রস নেই, হাতটাত কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে, মাথা গুলিয়ে যায়। মদনা চোরকে দেখে বুঝেছে যে চুরিও বড় সহজ কাজ নয়। সংযম চাই, ত্যাগ চাই, আত্মবিশ্বাস আর বুদ্ধি চাই। মদনা রোজ সকালে ব্যায়াম করে, ঘোড়ার মতো ছোলা খায়, নেশাটেশাও বুঝে-সমঝে করে। তা ছাড়া সে নানান মন্ত্র জানে। ভূতপ্রেত তাড়ানোর মন্ত্র, কুকুরের মুখবন্ধন, ঘুমপাড়ানি মন্ত্র। মদনা যে আজ বড় চোর হয়েছে সেও মাগ্‌না নয়। যে দিকেই বড় হতে চাও কিছু গুণ থাকাই লাগবে। শোভারামের কিছু নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত ফের ভেলুরামের গদিতেই তাকে মাঝে মাঝে চড়াও হতে হয়। কাকুতি মিনিতেতে আজকাল কাজ হয় না, চোখ রাঙালেও না। ভেলুরাম তার ধাত বুঝে গেছে। খেলারাম বাপকে দূর-দূর করে। একটা বিলিতি কুত্তা রেখেছে, সেইটিকে লেলিয়ে দেয়। তবু দু'পাঁচ টাকা ওই বাপ কি ছেলেই ছুড়ে দেয় শোভারামকে আজও। সেই অপমানের পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে আসে শোভারাম। চোখে জল আসে। তারই বাপ, তারই ছেলে, পয়সাও হক্কের, তবু ভিক্ষে করে আনতে হয়।

আজও গদির চারধারে ঘুরঘুর করে বাতাস শুঁকছিল শোভারাম। মসলাপাতির একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এখানে। বাজারের পিছন সারির দোকান আর গুদামের জায়গাটা খুব নির্জন। খেলারামের কুকুরটা কাঠের দোতলার বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাচ্ছে। শোভারাম মুখ তুলে কুকুরটাকে দেখল। ভীষণ কুকুর। বলল—কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!

গদিতে খেলা বা ভেলু কেউ নেই। শুধু বুড়ো কর্মচারী বসে হিসেবের লাল খাতা খুলে শক্ত যোগ অঙ্ক কষছে। দু'চারজন খদ্দের মশা তাড়াচ্ছে। আর খেলারামের মাস্টার শ্রীপতি কর্মকার বসে আছে উদাসভাবে। শ্রীপতি মাস্টার লোকটি বড় ভাল। সারাদিন বসে কী যেন ভাবে। লোকে বলে গঞ্জে শ্রীপতির মতো এত লেখাপড়া জানা লোক আর নেই। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যে জীবনে কিছু হয় না, ওই শ্রীপতি মাস্টার তার প্রমাণ। মাইনর স্কুলে সামান্য বেতনের মাস্টারি করে, আর গোমুখ্য ভেলুরামের নাতি, গজমুখ্যু শোভারামের ছেলে আকাটমুখ্য খেলারামকে রোজ সন্ধেবেলা দু'ঘণ্টা পড়িয়ে মাসকাবারে বুঝি পঞ্চাশ টাকা পায়। আর ওই দু'ঘণ্টায় ভেলুরাম গদিতে বসে না হোক শতখানেক টাকা নাফা রোজ ঘরে তুলছে।

—রাম রাম মাস্টারজি। বলে শোভারাম গদির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাবখানা এমন যে তারই গদি, রোজই সে এখানে যাতায়াত করে। কর্মচারীটা একবার মুখ গম্ভীর করে তাকাল। হাতের কাছেই ক্যাশবাক্স, কিন্তু ওতে কিছু নেই, শোভা জানে। থাকলেও ক্যাশবাক্স তালা-দেওয়া, আসল মালকড়ি লম্বা গেঁজের মধ্যে ভেলুরামের কোমরে প্যাঁচানো থাকে।

শ্রীপতি মাস্টার চিনতে পারল না, অন্যমনস্ক মানুষ। চুলগুলো সব উলোঝুলো, গায়ে ইস্তিরি ছাড়া জামা, ময়লা ধুতি। উদাস চোখে চেয়ে বলল—কোন হ্যায় আপ?

শ্রীপতি দারুণ হিন্দি বলে। প্রথম দিন খেলারামকে পড়াতে এসে সে বড় বিপদে ফেলেছিল ভেলুরামকে। খটাখট উর্দু মেশানো চোস্ত হিন্দিতে কথা বলে যাচ্ছে, ভেলু হাঁ করে চেয়ে আছে, কিছু বুঝতে পারছে না। তিন পুরুষ বাংলা দেশে থেকে আর বাঙালির সঙ্গে কারবার করে করে হিন্দি-মিন্দি ভুলে গেছে কবে। উত্তরপ্রদেশে সেই কবে দেশ ছিল। মা গন্ধেশ্বরী কিছু কিছু বলতে পারত। খেলারাম এখন ইস্কুলে হিন্দি শেখে।

শ্রীপতির হিন্দি শুনে ভয় খেয়ে শোভারাম বলে—আমি খেলারামের বাপ মাস্টারজি। আমার কথা ভুলে গেলেন আপনি?

—ও। বলে বিরস মুখে বসে থাকে শ্রীপতি। গঞ্জে থেকে তার জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এমন কি সে যে এত ভাল হিন্দি জানে সেটুকু পর্যন্ত অভ্যাস রাখতে পারছে না, এমন লোকই নেই যার সঙ্গে দুটো হিন্দি বলবে। আর যা সব জ্ঞান আছে তার, সেগুলো তো গেলই চর্চার অভাবে। গবেট খেলারাম এমনই ছাত্র যে বাঁ বলতে ডান বোঝে। পড়তে বসে দশবার উঠে গিয়ে দোকানদারি করে আসছে। প্রতি ক্লাসে একবার দু'বার ঠেক খেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এর পরের চড়াই ঠেলে পার করা খুবই মুশকিল। তবু তার দাদু ভেলুরামের বড় ইচ্ছে যে খেলারাম বি.কম. পাস করে হিসেবের ব্যাপারটায় পাকা হয়ে আসুক। তাই শ্রীপতি মাঝে মাঝে ঠেস দিয়ে বলে, বুদ্ধি কম হলে কি আর বি.কম. হওয়া যায়।

শোভারাম খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করে—একা বসে আছেন, খেলাটা গেল কোথায়?

শ্রীপতি মুখটাকে খাট্টা করে বলে—কোথায় আর যাবে, বাকি বকেয়ার তাগাদায় বীরপাড়া না কোথায় গেছে শুনছি। আমার আটটা পর্যন্ত টাইম, ততক্ষণ বসে উঠে যাব।

—সে তো ঠিক কথা। বলে শোভারাম একটু বাপগিরি ফলিয়ে বলে—খেলারামটা

Shahnaz

লেখাপড়ায় কেমন মাস্টারজি?

শ্রীপতি বলে—কিছু হবে না।

শোভারাম শুনে খুশিই হয়। বলে—আমিও তাই বলি। ঝুটমুটে ওর পিছনে পয়সা গচ্চা যাচ্ছে।

বলতে বলতে শোভারাম চারদিকে নজর করছে। হাতের কাছে সরাবার মতো কিছু নেই। শোভা তাই হাতের কাছে ক্যাশ বাক্সটায় একটু তেরে কেটে তাক বাজায় অন্যমনে! বয়স কম হল না তার। পঁয়তাল্লিশ তো হবেই! খেলারামেরও না হোক বাইশ চব্বিশ হবে। এত বয়স পর্যন্ত এ গদিতেই কেটেছে তার। কাঠের দোতলার ওপর সে জন্মেছিল বিন্দি ধাইয়ের হাতে। এই বাজারের ধুলোয় পড়ে বড় হয়েছে। ভিতরবাগে একটা উঠোন আছে, সেখানে মা গন্ধেশ্বরী আচার রোদে দিত, পাঁপর শুকিয়ে নিত। কিন্তু এখন সে এই গদিতে বাইরের লোক। বাপ যে এত অনাত্মীয় হতে পারে কে জানত!

সন্ধে পার হয়ে গেল। ইঁটখোলার দিক থেকে পশ্চিমা গানের আওয়াজ আসছে। সাঁঝবাজারে কিছু লোক নদীর মাছ কিনতে এসে বকবক করছে। তাছাড়া বাজারটা এখন বেশ চুপচাপ। শীতটা সদ্য এসেছে, এবার জোর শীত পড়বে মনে হয়। গায়ের মোটা সুতির চাদরটা খুলে আবার ভাল করে জড়ায় শোভারাম। এইসব গায়ের বস্ত্র দিয়ে শীত আটকানোয় সে বিশ্বাসী নয়। শীত ঝেড়ে ফেলতে এক নম্বরী চাপানের মতো আর কি আছে! না হয় একটা ছিলিম বোমভোলানাথ বলে টেনে বসে থাকো, মা গন্ধেশ্বরীর হাতে ঠেঙা খেয়ে চোর বেড়াল যেমন লাফিয়ে পালাত, শীতও তেমনি পালাবে।

বাপ ভেলুরামের নাগরা জুতোর শব্দ আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। সেটা শুনতে পেয়েই উঠে পড়ল শোভারাম। টালুমালু অসহায় চোখে চারদিকে আর একবার তাকায়। কিছুই হাতাবার নেই। পাথরপোতার এক ব্যাপারী বাংলা সাবান কিনতে এসে বসে ঢুলছিল। জুতো জোড়া ছেড়ে রেখেছে বেঞ্চির সামনে। বেশ জুতো—ঝা চকচকে নতুন, না হোক ত্রিশ টাকা জোড়া হবে।

শোভারাম নিজের টায়ারের চটি আর পায়ে দিল না। দেখি না-দেখি না ভাব করে ব্যাপারীর জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল। একটা কাঠের বড় মুখ খোলা বাক্সে বিস্তর নোনতা বিস্কুটভরা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট। যাওয়ার সময়ে হাতছিপ্পু করে দু'প্যাকেট তুলে চাদরের তলায় ভরে ফেলল। সেই সঙ্গে এক মুঠো তেজপাতা আর এক গোলা বাংলা সাবানও। যা পাওয়া যায়।

বাপ ভেলুরামের সঙ্গে মুখোমুখিই পড়ে যেত শোভা। কিন্তু একটুর জন্য বেঁচে গেল। ভেলু এখন সবজিবাজারের কাছে দাঁড়িয়ে নদীয়ার সঙ্গে কথা বলছে। জবুথবু কয়েকজন সবজিওয়ালা টেমি জ্বেলে নিঝুম বসে আছে আলু কপি বেগুন সাজিয়ে। ব্যবসা মানেই হচ্ছে বসে থাকা। তাই শোভারাম মানুষের ব্যবসা করা দু'চোক্ষে দেখতে পারে না। নতুন জুতো জোড়া বেশ টাইট মারছে। কয়েক কদম হাঁটলেই ফোসকা পড়ে যাবে। শোভারাম খুঁড়িয়ে মেছোবাজারের দিকে অন্ধকারে সরে যায়।

চটিজোড়া এই নিয়ে আটবার ছিঁড়ল। বাজারের ওপ্রান্তে দোকান, এখনও বেশ খানিকটা দূর। নদীয়া ডানপায়ের চটিটা তুলে সবজিওয়ালার টেমির আলোয় দেখল। নতুন করে ছেঁড়েনি, রবারের নলী দুটো যেখানে ডিমসুতোয় বাঁধা ছিল সেই বাঁধনটাই ছিঁড়েছে। সুতোওয়ালারা আজকাল চোরের হদ্দ, এমন সব পচা সুতো ছেড়েছে বাজারে যে বাতাসের ভর সয় না। চটিটা

আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নদীয়া। নাঃ, গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে আদ্দেক। আর এক জোড়া না কিনলেই নয়। জুতো চটির যা দাম হয়েছে আজকাল। চটিটা ছেঁড়ায় ফের নিজেকে ভারী দুঃখী মানুষ বলে মনে হয় নদীয়ার। এ গঞ্জে তার মতো দুঃখী আর কে?

চামার সীতারামের দোকানটা সবজি বাজারের শেষে। দোকান না বলে সেটাকে গর্ত বলাই ভাল। একধারে লোহার আড়ৎ, অন্য ধারে ভূষি মালের দোকান। তার মাঝখানে বারান্দার নীচের দিকে একটা গর্ত মতো জায়গায় সীতারাম মুচির দোকান ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরনো। ছোট চৌখুপীটার মধ্যে চারধারে কেবল জুতো আর জুতো। সবই পুরনো জুতো। সামনের দিকে বাহার করার জন্য আবার জুতোর সারি ঝুলিয়ে রেখেছে সীতুয়া। তার বউ নেই, বালবাচ্চার কথাও ওঠে না। আছে কেবল পুরনো জুতো। সেই জুতোর মধ্যেই সে দিনরাত শোয় বসে, সেখানেই রান্না করে খায়। পেল্লায় বুড়ো হয়ে গেছে সীতুয়া, তবু এখনও গর্তের ভিতর থেকে শকুনের মতো তাকিয়ে খদ্দেরদের দেখে নেয়।

ছেঁড়া চটিটা নিয়ে দোকানের মধ্যে কুঁজো হয়ে মুখ বাড়াতে গিয়ে কপালে ঝুলন্ত কার-না-কার পুরনো জুতোর একটা ধাক্কা খেল নদীয়া। এমন কপালে জুতোই মারতে হয়। ইচ্ছে করেই নদীয়া কপাল দিয়ে আর একবার ধাক্কা মারে ঝুলন্ত জুতোয়।

সীতুয়া ছেনির মতো যন্ত্র দিয়ে চামড়া কাটছে। কাঠের একটা ক্ষয়া টুকরোয় খসখস করে দু'চারবার ঘষে নিচ্ছে ছেনিটা। মুখ তুলতেই নদীয়া বলে—দ্যাখ বাবা, চটিটার একটা বন্দোবস্ত করতে পারিস কিনা।

নদীয়াকুমার ভাল খদ্দের নয়, সীতারাম জানে। তাই গম্ভীরভাবে হাতের কাজ শেষ করে একবার খইনির থুক ফেলে হাওয়াইটা হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে—এ তো ভিখমাঙ্গাদের চটি, আপনি কোথায় পেলেন এটা?

নদীয়া রেগে গিয়ে বলে—বড্ড বকিস বলেই চিরকাল এমন রয়ে গেলি সীতুয়া। দে দুটো সুতোর টান মেরে।

সীতারাম মাথা নেড়ে বলে—ফুটো হবে কোথায়? বিলকুল পচে গেছে রবার। ফিকে ফেলে দেন। নতুন কিনে নেন একজোড়া।

নদীয়া পকেটে হাত দিয়ে দেখল। জানা কথা পয়সা নেই। পকেটে থাকেও না কোনওদিন। খরচের ভয়ে নদীয়া পয়সা নিয়ে বেরোয় না। মিনতি করে বলল—দে বাবা সারিয়ে, দোকানে গিয়ে পাঁচটা পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সীতুয়া তার যন্ত্র দিয়ে চটির রবার ফুঁড়ে সুতোয় টান দিয়ে বলল—দেখবেন নদীয়াবাবু, জুতো মাথায় মুখে লেগে যাবে। অত ঝুঁকবেন না।

—লাগবে কি, লেগেছে। বিরস মুখে বলে।

সীতুয়া মোষের শিঙের ফুটোয় যন্ত্রটা ঢুকিয়ে বের করে এনে ভুসভুসে রবার ফুটো করতে করতে বলে—বাবুলোকেরা মাথা নিচু করতে জানে না তো, তাই ওই সব জুতো তাঁদের কপালে লাগে।

—এ ব্যাটা ফিলজফার। বলে নদীয়া।

তারপর চটি পরে ফটাফট কাপ্তানের মতো হাঁটে।

দিনটাই খারাপ। খড়-কাটাই কলের সামনে নদীয়ার বউ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা আগে সহ্য হত না। আজকাল সয়ে গেছে। বউয়ের চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। মাথায় টেরিকাটা

Shahnaz

পুরুষমানুষের চুল, পরনে পাঞ্জাবি ধুতি, পায়ে চপ্পল, বাঁ হাতে ঘড়ি। দাড়িগোঁফ নেই বলে খুবই ডেঁপো ছোকরার মতো দেখতে লাগে। চেহারাটা মন্দ ছিল না মেয়েমানুষ থাকার কালে। বুকটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চেপে বেঁধে রাখে, তাই এখন আর মেয়েমানুষীর চিহ্ন কিছু বোঝা যায় না।

বউকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নদীয়া। মুখটা অন্য ধারে ঘুরিয়ে নেয়। সেই ঘটনার পর বছর ঘুরে গেছে। একদিন মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখছিল নদীয়া। সময় খারাপ পড়লে মানুষ স্বপ্নটাও ভাল দেখে না। তো সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই একটা লাথি খেয়ে জেগে উঠে হাঁ করে রইল। তার বউ মন্দাকিনী তার নাম ধরে ডাকছে—ওঠ, ওঠ রে নদীয়া। নদীয়ার মুখের মধ্যে একটা মশা ঢুকে পিনপিন করছিল, সেটাকে গিলে ফেলে নদীয়া ফের হাঁ করে থাকে। দেখে, বউ মন্দাকিনী মস্ত কাঁচি দিয়ে চুল সব মুড়িয়ে কেটে ফেলেছে, ঘরের মেঝেময় মস্ত মস্ত লম্বা সাপের মতো চুলের গুছি পড়ে আছে। নদীয়ার ধুতি পরেছে মালকোঁচা মেরে, গায়ে গেঞ্জি। তাকে জেগে উঠতে দেখে হাতের কাঁচিটা নেড়ে বলল—খবরদার আজ থেকে আর আমাকে মেয়েমানুষ ভাববি না। মা কালী স্বপ্ন দিয়েছে, আজ থেকে আমি তাঁর সাধক। নদীয়া তেড়ে উঠে বউয়ের চুলের মুঠি ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু সে আর ধরা হল না। চুল পাবে কোথায় ধরার মতো? তা ছাড়া বড় কাঁচিটা এমনধারা ঘোরাচ্ছিল যে খুব কাছে যেতে নদীয়ার সাহস হয়নি। সেই থেকে তার বউ মন্দাকিনী পুরুষমানুষ মেরে গেল। বাড়িতে থাকে, নদীয়ার পয়সাতেই খায় পরে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। পড়শিরা ডাক্তার কবিরাজ করতে বলেছিল। সে অনেক খরচের ব্যাপার, তবু নদীয়া শশধর হোমিওপ্যাথকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু ওষুধ খাবে কে? সেই বড় কাঁচিটা অস্ত্র হিসেবে সবসময়ে কাছে কাছে রাখে মন্দাকিনী। কাছে যেতে গেলেই সেইটে তুলে তাড়া করে। এখন ওই যে খড়কাটাই কলটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখনও ওর কোমরে পাঞ্জাবির আড়ালে কাঁচিটা গোঁজা আছে, নদীয়া জানে।

ব্যাটাছেলে মন্দাকিনীর দিকে যতদূর সম্ভব না তাকিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল নদীয়া। সময়টা খারাপ পড়েছে। সীতুয়া চামার পাঁচটা পয়সার ঋয়রাতিতে ফেলে দিল। এখন এই হাওয়াইটা যদি ফেলে দিতেই হয়, আর নতুন একজোড়া কিনতেই হয়, তো এ পাঁচটা পয়সা না হক খরচা হল।

—এই নদীয়া! বউ ডাকল।

নদীয়া এক পলক তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল তবু! মন্দাকিনী ফের হেঁকে বলল—শুনে যা বলছি, নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

মেয়েমানুষের স্বভাব যাবে কোথায়! ঝগড়ার ভয় দেখাচ্ছে। তবু নদীয়া কান পাততে উৎসাহ পায় না। ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর নাকি মায়ের মন্দির তুলে দিতে হবে, মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়েছে। প্রায়ই হয়। এসব কথা কানে তোলে কোন্ আহাম্মক!

মন্দাকিনী পিছন থেকে এসে পিরান টেনে ধরল, ঘন শ্বাস ফেলে বলল—তোরটা খাবে কে শুনি! ছেলে নেই, পুলে নেই, নিব্বংশ হারামজাদা, কবে থেকে মায়ের মন্দিরের জন্য দশ হাজার টাকা চেয়ে রেখেছি! রক্ত বমি হয়ে মরবি যে।

ফস্ করে নদীয়ার মাথায় বুদ্ধি আসে। বাঁই করে ঘুরে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে—ছেলেপুলে নেই তো কি! হবে।

—হবে? ভারী অবাক হয় মন্দাকিনী। কাঁচির জন্যই বুঝি কোমরে হাত চালিয়ে দেয়।

—আলবাৎ হবে। সদরে মেয়ে দেখে এসেছি। বৈশাখে বিয়ে করব। দেখিস তখন হয় কি

না হয়! তোর মতো বাঁজা কিনা সবাই!

এত অবাক হয় মন্দাকিনী যে আর বলার নয়। কাঁচিটা টেনে বার করতে পর্যন্ত পারে না। তার মুঠি আলগা হয়ে নদীয়ার পিরানের কোণটা খসে যায়। আর নদীয়া চটি ফটফটিয়ে হাঁটে।

না, নদীয়ার মতো দুঃখী আর নেই। দোকানে এসে দেখে ভেলুর অপদার্থ ছেলে শোভারাম চায়ের ভাঁড় হাতে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখেই নিজের দুঃখের ব্যাপকতা বুঝতে পারে নদীয়া। ওই যে চায়ের ভাঁড় ওর দাম কখনও উসুল হবে না। গঞ্জের একনম্বর হেক্কোড় হল ওই শোভারাম। খাবে, খাতায়ও লেখাবে, কিন্তু কোনওদিন দাম শুধবে না। বেশি কিছু বলাও যায় না, কবে রাত-বিরেতে এসে দলবল নিয়ে চড়াও হয়।

বাবাকেলে পুরনো তুষের চাদরটা গা থেকে খুলে সযত্নে ভাঁজ করে রাখল নদীয়া। পা ধুয়ে এসে ছোট্ট চৌকির ওপর বিছানায় ক্যাশবাক্স নিয়ে বসল। টিকে ধরিয়ে পেতলের ধূপদানিতে ধোঁয়া করে অনেকক্ষণ গণেশবাবাকে প্রণাম ঠুকল। দুনিয়ার সব মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি হোক বাবা।

শীতে খদ্দের বেশি ভেড়ে না। দোকান ফাঁকাই।

নদীয়া ভারী দুঃখী মানুষ। ঠাকুর পেন্নাম ভাল করে শেষও হয়নি, শোভারামটা চটির খোঁটা দিল—ই কি গো, নদীয়াদা! তোমার চটির হালটা এরকম হল কবে? এ পরে বেড়াও নাকি? খবর্দার রবারের চটি পরো না, চোখ খারাপ হয়। আর ওই কুকুরে খাওয়া চটি ভদ্রলোকে পরে?

শোভারামের পায়ে নতুন জুতো। নদীয়া আড়চোখে দেখে। বেশ বাহারি জুতো। চামড়ার ওপরে মাছের আঁশের মতো নকশা তোলা। রংটাও ভাল। নদীয়ারই সময় খারাপ পড়ে গেছে। শ্বাস ফেলে বলে—নতুন কিনলি বুঝি জুতো জোড়া?

শোভারাম বিস্তর রংঢং দেখিয়ে বলে—ঠিক কেনা নয় বটে। শোভারাম ভেবে চিন্তেই বলে। কারণ, সে নিজের পয়সায় জুতো কিনেছে এটা নদীয়া বিশ্বাস নাও করতে পারে।

নদীয়া রসিকতা করে বলে—কিনিসনি! তবে কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পেলি? না কি শেষ অবধি জুতো চুরি পর্যন্ত শুরু করেছিস।

অপমানটা হজম করে শোভারাম। কিন্তু লোক চরিয়েই সে খায়, খামোকা চটে লাভ কি! ভালমানুষের মতো বলে—না গো নদীয়াদা, সে সব নয়। গেল হপ্তায় বৈরাগী মণ্ডলের হয়ে সদরে একটা সাক্ষী দিয়ে এলাম। টায়ারের চটিটা ফেঁসে গিয়েছিল হোঁচট খেটে। তো বৈরাগী মণ্ডল জুতো জোড়া কিনে দিল। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, মনে হচ্ছে এক সাইজ ছোট কিনে ফেলেছি! বেদম টাইট হচ্ছে। দেখো তো, তোমার পায়ে লাগে কিনা—

বলে শোভা জুতো খুলে এগিয়ে দেয়। নদীয়া উদাস হয়ে বলে—লাগলেই কি! ওসব বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়!

শোভারাম অভিমানভরে বলে—তুমি চিরকালটা একরকম রয়ে গেলে নদীয়াদা! তাই তো তোমার বউ ওরকম ধারা ব্যাটাছেলে হয়ে গেল! নাও তো, পরে দেখো! পায়ে লাগলে এমনিই দিয়ে দেব। ত্রিশ টাকায় কেনা, তা সে কত টাকা জলে যায়। পরে দেখো।

নদীয়া এবার একটু নড়ে। বলে—কত টাকা বললি?

শোভারাম হাসে, বলে—ত্রিশ টাকা। মূর্ছা যেয়ো না শুনে। ওর কমে আজকাল জুতো হয় না।

নদীয়া উঠে এসে জুতো জোড়া পায়ে দিল। পাম্প-শুর মতোই কিন্তু ঠিক পাম্প-শু নয়। বেশ নরম চামড়া। দু-চার পা হেঁটে দেখল নদীয়া। আরে বা! দিব্যি ফিট করেছে তো! এই শীতে

Shahnaz

পায়ে বড় কষ্ট। চামড়া ফেটে হাঁ করে থাকে, ভিতরে ঘা, তাতে ধুলোময়লা ঢুকে কষ্ট হয়। তা ছাড়া পাথরকুচির রাস্তায় অসমান জমিতে পা পড়লে হাওয়াই চটিতে কিছু আটকায় না, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। এই জুতোজোড়া পরেই নদীয়া টের পেল আরাম কাকে বলে। পায়ে গলিয়ে নিলেই পা দু'খানা ঘরবন্দি হয়ে গেল। ধুলোময়লা, পাথরকুচি কিংবা শীত কিছুই করতে পারবে না।

শোভারাম খুশি হয়ে বলে—বাঃ গো নদীয়াদা, জুতোজোড়া যেন তোমার জন্যই জন্মেছিল। আমাদের ছোটলোকি পায়ে কি আর ওসব পোষায়! তুমিই রেখে দাও! আমি না হয় একজোড়া টায়ারের চটি কিনে নেব। বাজারের ওদিকে মহিন্দির টায়ারের চটির পাহাড় নিয়ে বসে আছে।

নদীয়া একটু দ্বিধা করে বললে—টায়ারের চটি কি সস্তা নাকি রে? হলে বরং আমিও একজোড়া—

—আরে না না! শোভারাম মাথা নেড়ে বলে—সে বড় শক্ত জিনিস। তোমরা পায়ে দিলে ফোস্কা পড়ে কেলেঙ্কারি হবে। কড়া আর জীবনে সারবে না। ওসব কুলিমজুরের জিনিস। তুমি এটাই রেখে দাও। যা হোক, দশ বিশ টাকা দিয়ে দিয়ো, তোমার ধর্মে যা সয়।

সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া জুতোজোড়া খুলে ফেলে বলে—ও বাবা, বলিস কি সব্বোনেশে কথা, ডাকাত কোথাকার! দশ বিশ টাকা পায়ের পিছনে খরচ! আমি আট টাকার ধুতি পরি।

শোভারাম অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে নদীয়ার দিকে। তারপর খুব ধীরে বলে—তোমার লাভের গুড় পিঁপড়ের খাবে নদীয়াদা। ফৌত হয়ে যাওয়ার আগে নিজের আত্মাটাকে একটু ঠাণ্ডা করো। খাও না, পরো না, ও কি রকম ধারা রুগী তুমি? দুনিয়ার কত কি আরামের জিনিস চমকাচ্ছে—তুমিই কেবল নিভে যাচ্ছ।

নদীয়া না-না করে। আবার জুতোটা তার বড্ড ভালও লেগে গেছে। ফের ছাড়া জুতো পায়ে পরে দেখে। বড় বাহার। আরামও কম কি! সেই কবে ছেলেবেলায় বাবা জুতো কিনে দিত, তখন পরেছে। নিজে রোজগার করতে নেমে আর পরেনি। বলল—দশ টাকা যে বড্ড বেজায় দাম চাইছিস রে!

—দশ কি বলছ? বিশ টাকা না হয় পনেরোই দিয়ো। সেও মাগনাই হল প্রায়। নেহাত জুতোজোড়া আমার ছোট হয়, আর তোমারও ফিট করে গেল। নইলে এখনও বাজার ঘুরলে বিশ পঁচিশ টাকায় বেচতে পারি।

—বারো টাকা দেব। ওই শেষ কথা। যা, ও মাসে নিবি।

হ্যা-হ্যা করে হাসে শোভারাম। বলে—বারো? তার চেয়ে এমনিই নাও না। ভেলুরামের ব্যাটা অনেক টাকা দেখেছে, বুঝলে নদীয়াদা!

সবশেষে তেরো টাকায় রফা হল। তাতে অবশ্য শোভারামের এক তিলও ক্ষতি নেই। যত তাড়াতাড়ি মাল পাচার করা যায়। নইলে বাংলা সাবান কিনতে আসা দোকানদারটা বাজারময় হাল্লাচিল্লা ফেলে দেবে। নগদ তেরো টাকা নিয়ে শোভারাম অন্ধকারে সাঁত করে মিলিয়ে গেল।

নদীয়া জুতোজোড়া লুকিয়ে ফেলল চৌকির পাশের ছায়ায়। বলা যায় না, শোভারাম শালা চোরাই মাল যদি গছিয়ে দিয়ে থাকে তো ফ্যাসাদ হতে পারে। থাক একটু লুকনো, নদীয়ার পায়ে দেখলে কেউ আর পরে সন্দেহ করতে পারবে না। দোকানের কর্মচারীটা ওদিকে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, সব শুনেছে কিনা কে জানে। নদীয়ার কোনও কাজই তো সহজপথে হয় না। সবই যেন কেমন রাহুগ্রস্ত। তার মতো দুঃখী, নদীয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আড়চোখে একবার

জুতোজোড়া দেখে নেয়। মিটিমিটিয়ে হাসে। খুব দাঁও মারা গেছে। তবু তেরোটা টাকা। ভাবা যায় না। কর্মচারীটা আবার জুতো কেনার সাক্ষী থাকল না তো!

দুটো গেঁয়ো লোক এই সময়ে উত্তেজিতভাবে এসে দোকানে ঢুকল। রাজভোগ সিঙাড়া আর চায়ের অর্ডার দিয়ে খুব গরম স্বরে কথা বলতে লাগল। দুজনের একজনের জুতো চুরি গেছে ভেলুরামের গদি থেকে। তাই নিয়ে আলোচনা। যার জুতো চুরি গেছে তার পায়ে শোভারামের নোংরা টায়ারের চটিটা। কান খাড়া করে শুনছিল নদীয়া। যা ভেবেছিল তাই।

নদীয়ার মতো দুঃখী কমই আছে দুনিয়ায়। সে একটা শ্বাস পেলে আড়চোখে জুতোজোড়া দেখে নিল। আছে।

শ্রীপতি সাড়ে সাতটায় উঠতে যাচ্ছিল, এ সময়ে দেখে, অন্ধকার ফুঁড়ে গরিলাটা গদিতে উঠে আসছে। বাইশ তেইশ বছরের আই জোয়ান চেহারা, যেমন মাথায় উঁচু তেমনি পেল্লায় শরীর। এই হল তার ছাত্র খেলারাম।

চেহারা পেল্লায় হলে কি হবে, ইঁদুর যেমন বেড়ালকে ডরায় তেমনি মাস্টারজিকে ভয় পায় খেলা। মাস্টারজি সটাং ফটাং ইংরিজি বোলি ছাড়ে, কষাকষ হিন্দি বলে, খেলা তার কিছু বোঝে না।

গরিলাটাকে দেখে ভারী বিরক্ত হয় শ্রীপতি। ঘড়ি দেখে বলে—মাই টাইম ইজ আপ খেলারাম। গুড নাইট।

গরিলাটা ভ্যাবলার মতো মুখ করে বলে—আজ্ঞে।

শ্রীপতি সন্দেহবশত বলে—কী বললাম বল তো।

খেলারাম গলার কম্ফর্টারটা খুলে পেলে অসহায়ভাবে দাদুর দিকে তাকায়। ভেলুরাম গদির ওপর বসে ছানিপড়া বড় চোখে নাতির দিকে ভ্রু কুঁচকে বলে—বল।

খেলারাম ঘামতে তাকে।

শ্রীপতি আনমনে বলে—কিছু হবে না।

গরিলাটার বাবা একটু আগে চোখের সামনে দিয়ে একজোড়া জুতো চুরি করে পালিয়ে গেল। একই তো রক্ত। মাথা নেড়ে শ্রীপতি বাজারে কুয়াশায় নেমে গেল। তার ভিতরে কত বিদ্যে গিজগিজ করছে, কাউকে দেওয়ার নেই।

আসতে আসতেই শুনল, দাদু ভেলুরাম নাতি খেলারামকে খুব ডাঁটছে—কোথায় সারাটা দিন লেগেছিল চুহা কোথাকার! বীরপাড়া থেকে আসতে এত দেরি হয়! পঞ্চাশ টাকার মাস্টার বসে বসে চলে গেল! জুতোচোরের ব্যাটা।

বাজারটা এখন নিঝুম কুয়াশার মাখা, একটু ফ্যাকাটে জ্যোৎস্নাও উঠেছে। বাতাসে একটু আঁশটে গন্ধ পায় শ্রীপতি মেছোবাজার পেরোবার সময়ে। তখনও কিছু লোক নদীর টাটকা মাছ নিয়ে বেচবার জন্য বসে আছে কুপী জ্বালিয়ে। এইসব লোকেরা শেলি কিটস পড়েনি, শেক্সপিয়রের নামও জানে না। ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রবি ঠাকুর কী বস্তু তা জানা নেই। আশ্চর্য, তবু বেশ বেঁচে-বর্তে আছে। তবে কি ওসবই জীবনের বাহুল্য শৌখিনতা মাত্র। না হলেও চলে? সত্য বটে একবার একজন অধ্যাপক শ্রীপতিকে বলেছিলেন—ইনফর্মেশন মানেই কিন্তু জ্ঞান নয়। যে লোকটা টকাটক নানা ইনফর্মেশন দিতে পারে তাকেই জ্ঞানী মনে কোরো না, যার উপলব্ধি নেই, দর্শন নেই, সে বিদ্যের বোঝা বয় বলদের মতো।

Shahnaz

উপলব্ধির ব্যাপারটায় একটু কোথায় খাঁকতি আছে শ্রীপতির, এটা সে নিজেও টের পায়। এই যে গঞ্জের পরিবেশ, ওই ম্লান একটু কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না, কিংবা ফকিরচাঁদের ঢিবিতে একা শিরীষের যে সৌন্দর্য এসব থেকে সে কোনও মানসাঙ্ক কষতে পারে না। বাইরের জগৎটা থেকে সে রস আহরণ করতে পারে না বটে মৌমাছির মতো, তবে সে বইয়ের জগতের তালেবর লোক। বিস্তর পড়াশোনা তার তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ জন্মায়নি এখানে। লোকে তাকে ভয়ও খায়। তবু কি একটা খাঁকতি থেকেই যাচ্ছে। সে কি ওই উপলব্ধি বা দর্শনের?

বাজার পার হয়ে নিরিবিলি ফাঁকা জায়গা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, একটু উপলব্ধির ব্যায়াম করা দরকার। সে জেদ ধরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মতো চারধারের জ্যোৎস্নামাখা শীতার্ত প্রকৃতি থেকে সেই উপলব্ধির গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল।

হচ্ছে না। মনের পর্দায় কিছুই ভেসে ওঠে না যে!

পাঁচ-সাতটা লোক হাল্লা-চিল্লা করতে করতে কাছে এসে পড়ল। সব কটা মাতাল। শ্রীপতি কিছু বুঝবার আগেই দলটা থেকে খেলারামের বাপ দৌড়ে এসে পায়ের উপর হুমকি খেয়ে পড়ে বলতে লাগল—রাম রাম মাস্টারজি, আমার খেলারামকে জুতো চুরির ব্যাপারটা বলবেন না। বাপকে তাহলে নিচু-নজরে দেখবে খেলারাম। অনেক পড়িলিখিওলা ব্যাটা আমার, আমি মুখ্যুর ঢিবি—

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো। বলে শ্রীপতি পা টেনে পিছিয়ে আসে।

বাতাস দূষিত করে মদের গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে শোভারাম বলে—এভাবে বাঁচা যায় মাস্টারজি? আমার বাপকে আর খেলারামকে একটু বলবেন, আমি সাফ-সুতেরো হয়ে গেছি। ভাল লোকের মতো থাকব, যদি আমাকে ফিরিয়ে নেয়।

নাকে রুমাল চেপে শ্রীপতি ঘাড় নাড়ল। পৃথিবীটা বড়ই পচা। দুর্গন্ধময়। এই পৃথিবী থেকে উপলব্ধি বা দর্শনের কিছু ছেঁকে নেওয়ার নেই। পুঁথিপত্রের মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর জগৎ।

লোকগুলো কোদাল গাঁইতি নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে শোভারাম হাতজোড় করে বলল—আশীর্বাদ করবেন মাস্টারজি। ফকিরচাঁদের ঢিবি খুঁড়তে যাচ্ছি আমরা, যেন কিছু পাই।

গম্ভীরভাবে শ্রীপতি বলে—হুঁ।

আজ পর্যন্ত বিস্তর হাঘরে ফকিরচাঁদের ঢিবিতে খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। সকলেরই আশা, সাতঘড়া মোহর আর বিস্তর হিরে জহরৎ একদিন ওখান থেকে বেরোবেই। পেল্লায় ঢিবি, খুঁড়ে শেষ হয় না। আজ পর্যন্ত সাপ ব্যাঙ আর ইঁট পাথর ছাড়া কিছুই বেরোয়নি। তবু অভাব পড়লেই কিছু লোক গিয়ে ঢিবিটা খুঁড়তে লেগে যায়।

নদীয়াকুমার তার দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ফিরছিল। নতুন জুতোজোড়া পুরনো খবরের কাগজে জড়িয়ে র‍্যাপারের তলায় বগলসাই করে নিয়েছে। পায়ের পুরনো হাওয়াই চটাস-পটাস শব্দ করে বোধহয় নদীয়াকেই গালমন্দ করছিল। করবেই। সময় খারাপ পড়লে সবাই করে ওরকম।

খুব একটা সাদাটে ভাব চারদিকে। কুয়াশায় জ্যোৎস্নায় যেন দুধে মুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। পাকা মর্তমানের মতো চাঁদ ঝুলছে আকাশে। পায়ের ফাটা জায়গাগুলোয় শীত সেঁধোচ্ছে। ভাল করে তুষের চাদরটায় মাথামুখ ঢেকে হাঁটছিল নদীয়াকুমার। চৌপথীর কাছে বাড়ি, মাঝপথে

ফকিরচাঁদের ঢিবিতে কারা যেন গোপনে কী সব করছে। দুচারটে ছায়াছায়া লোকজন দেখা গেল। নদীয়া কদমের জোর বাড়ায়। কোমরের গেঁজেতে বিক্রিবাটার টাকা রয়েছে। দিনকাল ভাল নয়। কপালটাও খারাপ যাচ্ছে। কেবল মাঝে মাঝে নতুন জুতো জোড়ার কথা ভেবে এত দুঃখেও ফুক ফাক করে সখের হাসি হেসে ফেলছে নদীয়া। বেশ হয়েছে জুতোজোড়া। দিন দশ বাদ দিয়ে পরবে। চোরাই জুতো এর মধ্যে যদি খোঁজখবর হয় তো গেল তেরোটা টাকা। দামটা বেশিই পড়ে গেল। তবু জুতো একজোড়া দরকার। ভেলুরাম বলছিল বটে, বউকে জুতোতে হলেও তো একজোড়া জুতো লাগে। ছেঁড়া হাওয়াই চটি দিয়ে কি আর জুতোনো যায়?

বাড়ির দরজায় পৌঁছে ভয়ে আঁতকে ওঠে নদীয়াকুমার। কে একটা মেয়েছেলে ঘোমটা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের জবা গাছটার তলায়। মেয়েছেলে, নাকি ভূত-প্রেত। তার বাড়িতে আবার মেয়েছেলে কে আসবে?

নদীয়া বলল—রাম রাম, কে?

—আমি।

নদীয়া ফের আঁতকে উঠে বলে—কে আমি?

—আহা। বলে মেয়েছেলেটা এগিয়ে আসে তার কাছে। মুখে জ্যোৎস্না পড়েছে, ঊর্ধ্বমুখে তার পানে থাকাতেই ঘোমটা খসে গেল। পুরুষমানুষের মতো চুলওলা মাথাটা বেরিয়ে পড়ল।

'আঁ, আঁ' করে ওঠে নদীয়াকুমার। এ যে মন্দাকিনী!

—তোমার এই সাজ? ভারী অবাক হয় নদীয়া।

মন্দাকিনী জ্যোৎস্নায় চোখের বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলে—কেন, আমি মেয়েমানুষ সাজলে তোমার খুব অসুবিধে হয় বুঝি! সদরের কোন ডাইনিকে পছন্দ করে এসেছ, তাকে বৈশাখে ঘরে এনে ঘটস্থাপনা করবে—তাতে বুঝি ছাই দিলাম। ঝাঁটা মারি—

এই সব বলতে বলতে মন্দাকিনী প্রায় নদীয়ার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে আর কি টেনে হিঁচড়ে। কিন্তু তাতে নদীয়া কিছু মনে করে না। কপালটা কি তবে ফিরল! নতুন জুতো! বউ!

গহীন রাতে মন্দাকিনী শান্ত হয়ে কাঁদতে বসল। তার আগে পর্যন্ত বিস্তর বাসন আছড়ে, বিছানা ছুড়ে, জামাকাপড় ফেলে রাগ দেখিয়েছে। নদীয়া খুব আহ্লাদের সঙ্গে দেখেছে। বছরটাক আগে তো এরকমই ছিল মন্দাকিনী। এই রকমই অশান্তি করত।

মন্দাকিনী কাঁদছে দেখে নদীয়া বলে—কাঁদো কেন? ঝাল তো অনেক ঝাড়লে। আমি বড় দুঃখী লোক, কেঁদো না।

মন্দাকিনী জলভরা চোখে কটাক্ষ হেনে বলে—আমি এখন চুল পাব কোথায়! কত লম্বা চুল ছিল আমার! তুমি কি এখন আর আমাকে ভালবাসবে চুল ছাড়া!

—দূর মাগী! নদীয়া আদর করে বলে—চুলে কি যায় আসে!

ভোর রাত পর্যন্ত সাত মাতালে ঢিবি খুঁড়ে পেল্লায় হাঁ বের করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কার কোদাল যেন ঠং করে লাগল পেতলের কলসি বা ঘড়ার গায়ে। দ্বিগুণ উদ্যমে সবাই খুঁড়তে লাগে আরও। হ্যাঁ, সকলের কোদালেই ঠনাঠন ধাতুখণ্ডের আওয়াজ বেরোচ্ছে। জয় মা কালী। জয় মা দুর্গা। জয় দুর্গতিনাশিনী!

সাত মাতালের বুকের ভিতরে জ্যোৎস্নার ভাসাভাসি। সাত মাতাল এলোপাথাড়ি কোদাল, গাঁইতি আর শাবল চালিয়ে যেতে লাগল। ভোর হতে আর দেরি নেই। শোভারাম আর তার স্যাঙাতদের রাতও বুঝি কেটে গেল।

Shahnaz

বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে। অল্প অল্প মাটি সরে, আর বস্তুটা বেরোয়। কী এটা? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। তবে ঘড়া বা কলসি নয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বড় জিনিস। ফকিরচাঁদের বসত বাড়িটা নাকি?

খোঁড়াখুঁড়ি চলতেই থাকে। হাতে ফোসকা, গায়ে এই শীতেও সপসপে ঘাম। কেউ জিরোতে চাইছে না। নেশা কেটে গিয়ে অন্যরকম নেশা ধরে গেছে।

ভোরের আবছা আলোয় অবশেষে বস্তুটা দেখা গেল স্পষ্ট। সাত মাতাল চারধরে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে—একটা কবেকার পুরনো রেলের মালগাড়ির পাঁজর আধখানা জেগে আছে মাটির ওপর; কবে বুঝি ডিরেইলড হয়ে পড়ে ছিল এইখানে। জংধরা লোহা হলদে রং ধরেছে।

কেউ কোনও কথা বলল না। হেদিয়ে পড়েছে।

খুব ভোরে খেলারামকে তুলে পড়তে বসিয়েছে ভেলুরাম!

খেলা দুলে দুলে ইংরিজি পড়ছে।

গদির পাশ দিয়ে হা-ক্লান্ত, মাটিমাখা সাত মাতাল ফিরে যাচ্ছে; তাদের মধ্যে একজন শোভারাম, একটু দাঁড়িয়ে খেলারামের ইংরিজি পড়া শুনল। খুব জোর পড়ছে খেলা! ব্যাটা বোধহয় ভদ্রলোক হবে একটা!

ভেবে এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে একটু হেসে ফেলল শোভারাম।

ঘণ্টাধ্বনি

সাঁঝবেলাতে গোয়ালঘরে ধুনো দিতে গিয়ে কালিদাসী শুনতে পেল, রামমন্দিরে খুব তেজালো কাঁসি বাজছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

গুন্টু দুপুর থেকে বাড়ি নেই। আলায় বালায় সারাদিন ঘোরে। মাথাগরম ছেলে। যখন তখন হাফ-পেন্টুল খুলে পুকুরে ঝাঁপায়। চৌপর দিন জলে দাপাদাপি করে। কবে জলের ঠাকুর টেনে নেয় ছেলেটাকে! তবে ভরসা এই, গুন্টুর প্রাণে ভক্তি আছে। সন্ধে হলেই রামমন্দিরে গিয়ে বুড়ো বাজনদার আফিংখোর গোবিন্দর হাত থেকে কাঁসি কেড়ে নিয়ে নেচে নেচে বাজায়। ওই বাজাচ্ছে এখন। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

কেলে গরুটার নাম শান্তি। ভারী নেই-আঁকড়া। কালিদাসীকে পেয়ে গলা এগিয়ে দিল। ভাবখানা—একটু চুলকে দাও। তা দেয় কালিদাসী। খানিকক্ষণ তুলতুলে কম্বলের মতো গলায় আঙুলের কাতুকুতু দিতে থাকে। অন্য গরু শিপ্রা ফোঁসফাঁস করতে তাকে। শিং নাড়া দেয়; কালিদাসী বলে—রোসো মা তোমাকেও দিচ্ছি। এ মুখপুড়ির আর কিছুতেই আরাম ফুরোয় না।

মন্দিরে আরতি হচ্ছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের এই সময়ে প্রায়দিনই ভাব হত। ভাব হলে হাত-পা টানা দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে মুখে গাঁজলা তুলে নানা কথা বলত। সে সব কথা স্বয়ং ভগবানের। একবার কালিদাসীকে বলেছিল—ও কালী, ভুরের পায়েস খাব, এনে দিবি?

তা ভুরে গুড় দিয়েছিল কালিদাসী। একটু আধটু নয়, আধ মণেরও বেশি হবে। তাই দিয়ে সেবার বিরাট পায়েস ভোগ লাগান হল মন্দিরে।

চক্কোত্তিমশাই এখন বয়সে পঙ্গু হয়ে টিনের চারচালায় দাওয়ায় চৌকি পেতে বসে থাকে দিন রাত। তামাক খায়। সেজো ছেলে মনোরঞ্জন এখন মন্দিরের সেবাইত। কালিদাসীর এখন আর যাওয়ার সময় হয় না। প্রায়ই ভাবে একদিন গিয়ে বসে আরতি দেখবে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার গোয়ালঘরে কালিদাসীর ভাল করে ঠাহর হয় না কিছু। টেমি হাতে এগিয়ে গিয়ে খড়ের গাদা গোছ করতে হাত বাড়িয়েই মধ্যের আঙুলে কাঁকড়াবিছের হুল খেয়ে উঁহু করে ওঠে।

Shahnaz

ত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম কাঁকড়াবিছের হুল খেয়েছিল কালিদাসী তখন যন্ত্রণার চোটে সে কি দাপাদাপি! হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল! পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সে বিষ ব্যথা থানা গেড়ে ছিল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে।

তারপর মাসটাক যেতে না যেতে ফের একদিন হুল দিল। আবার দাপাদাপি। আবার হাসপাতাল। কিন্তু কাঁকড়াবিছেরা কালিদাসীকে সেই থেকে কেমন যে পেয়ে বসল। কাছে পেলেই হুল দেয়। এই ত্রিশ বছর ধরে মাসে দু-তিনবার দিচ্ছে। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন, তেমন লাগে না।

কালিদাসী টেমি রেখে খানিক কাঁচা গোবর বাঁ হাতের আঙুলটায় বসাল ঠিক যেমন গোলাপগাছের কলমচারার ডগায় লোকে গোবরের টিবলি দেয়।

কালিদাসীর শরীরটা কাঁকড়াবিছের বিষে ভরে গেছে। এখন বিষে বিষক্ষয় হয়ে যায়।

আশ্চর্য এই বাচ্চা দেওয়ার সময়ে মেনি বেড়ালটা গোয়ালঘরে এসে ওই খড়ের গাদায় বাসা বাঁধে। ফুলি কুকুরটা তো ফি-বছর খড়ের মাচার নীচে গর্ত করে চার পাঁচটা ছানা বিয়োয়। গরু দুটো সম্বছর এই ঘরে রাত কাটায়। এগুলোকে কোনও দিন হুল দেয়নি পোড়ারমুখোরা। মানুষের ওপর যত ওদের রাগ। আর মানুষের মধ্যে আবার সবচেয়ে ঘেন্নার হুল ওদের কালিদাসী হতভাগী।

আঙুলে-গোবরে করে টেমি হাতে কালিদাসী গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঠের কপাটটা টেনে দিতে দিতে আপনমনে বকবক করছিল—ক্যাঁটাখেকো, কেলেঘেন্না, খালভরাগুলো কোথাকার! কালিদাসীর কাছে বড় জো পেয়েছিস।

নীচের তলার নতুন ভাড়াটে হেম ঘোষ, নতুন বিয়ে করেই মা-বাপ-ভাই ছেড়ে আলাদা বাসা করে উঠে এসেছে। তার বউ রেবা নাকি বড়ঘরের মেয়ে, কাজকর্ম করতে পারবে না। শ্বশুরবাড়িতে শুয়ে বসে থাকত বলে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া বেধে পড়ল। হেম ঘোষ বউয়ের পক্ষে। বাড়ি ছেড়ে উঠে এল। চাকরি তার তেমন কিছু নয়। দাশনগরে এক তালা তৈরির কারখানায় চাবির খাঁজ কাটে! ত্রিশ টাকার ঘর ভাড়াও দু'মাস বাকি ফেলেছে। তবু বউয়ের সুবিধের জন্য সব সময়ে কাজ করার বাচ্চা কি বহাল করেছে, তার ওপর ঠিকে কাজের লোক তো আছেই।

দাওয়ায় বসে লুঙ্গি পরে হেম বিড়ি খাচ্ছিল। কালিদাসীর বকবকানি শুনে বলল—কী হল দিদিমা? কাঁকড়াবিছে কামড়াল বুঝি?

কালিদাসী বলল—তা কামড়াবে না কেন বাবা? কালিদাসী যে ভালমানুষের মেয়ে হয়ে শতেক পাপ করেছে।

হেম ঘোষ বিড়িটা ফেলে একটু তটস্থ হয়ে বলে—এ তো বড় মুশকিলের কথা হল দিদিমা! এ বাড়িতে বড্ড দেখছি কাঁকড়াবিছের উৎপাত! রেবাকে যদি কামড়ায় তো রক্ষে নেই।

কালিদাসী মনে মনে বলে—বউকে তাজমহলে নিয়ে গিয়ে রাখো গে যাও। দেখালে বটে তোমরা বাপ! আজকালকার রত্তি মেয়েরা কী করে যে গোটাগুটি পুরুষ মানুষগুলোকে হজম করে বসে থাকে!

ওপরের বারান্দায় উঠে আসতে আসতে কালিদাসী ফের মন্দিরের শব্দ শোনে। গুন্টু কাঁসি বাজাচ্ছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

টেমি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় কালিদাসী। বুড়ো বয়সের ভুল। মন্দার মা বারান্দায় বসে উনুন

সাজাচ্ছে, এক্ষুনি দেশলাই চাইবে। টেমিটা না নেবালে, দেশলাইয়ের কাঠি বাঁচত। ছাদে গিয়ে উনুন ধরাতে মন্দার মা না হোক চার পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবে।

এ সবই কালিদাসীর জ্বালা। সংসারে আছে এক উড়নচণ্ডী ছেলে, আর মেয়ের ঘরের নাতি ওই গুন্টু। তবু সংসারের হাজার চিন্তায় কালিদাসীর ডুবজল।

২

কানাই মাস্টারের আজ সারা দিন বড় হতভম্ব লাগছে।

এমনিতে কানাই বড় নিরীহ লোক। তিন বছর হল তার দশ বছর বয়সী ছেলেটা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী প্রায়। শরীরের সব কটা হাড়ের জোড়ে বিষযন্ত্রণা। হাঁটু, কনুই, কবজি সব ফুলে আছে। শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ঠারেঠোরে বলেছে, ভাল হওয়ার রোগ নয়।

কানাই মাস্টারের একটাই ছেলে, আর মেয়ে দুটো। তার নিজের বয়স বেশি নয়, চল্লিশ-টল্লিশ হবে। কিন্তু এ বয়সেই বড় বুড়োটে মেরে গেছে কানাই। ছেলের চিন্তা উদয়াস্ত ভিতরটা কুরে খায়। তার ওপর কটা টিউশনি করে রসকষ আরও মরে যাচ্ছে ক্রমে।

আজ হল কি, ইস্কুলের আট ক্লাসে থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস নিচ্ছে। মদন নামে ধেড়ে ছেলে আছে একটা। তার গলায় আবার কালো তাগায় বাঁধা রুপোর তক্তি। রাঙামুলো চেহারা। কোনওকালে পড়াশুনোর ধার মাড়ায় না। পড়া জিজ্ঞেস করলে শুভদৃষ্টির সময়ে নববধূ যেমন চোখ নামায় তেমনি নতচোখে চেয়ে থাকে মেঝের দিকে। তার বাপ বড় কারবারি, তাই মাসকাবারে ইস্কুলের বেতন কখনও বাকি পড়ে না। সেই কারণে কেউ বড় একটা ঘাঁটায়ও না মদনকে। আছ মদন, থাকো মদন গোছের ভাব করে সবাই তাকে এড়িয়ে যায়। প্রতি ক্লাসে তিন চার বছর করে থাকলে মদনের বাবদ ইস্কুলের একটা স্থায়ী আয় তো বহাল রইল। এমনিতে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ষাট সত্তরজনই ডিফলটার। কারও সাত আট মাসের বেতন বাকি পড়ে আছে। ধমক চমক করলে গারজিয়ানরা এসে হেডস্যারের হাতে পায়ে ধরে। সেই সব গারজিয়ানরাও 'দিন আনি, দিন খাই' গোছের। কেউ বিড়ি বাঁধে, কারও তেলেভাজার দোকান, একজন গামছা ফিরি করে ময়দানে। এই রকম সব। তাদের মধ্যে মদনের বাবা হচ্ছে নৈবেদ্যর কলা।

মদনা ক্লাস এইটে পড়লেও তো আর ছেলেমানুষ নয়। বয়সের ডাক দিয়েছে। শরীর জাম্বুবানের মতো বড়সড়।

বয়সের দোষই হবে। রোজই ইস্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে বীণাপাণি ইস্কুলের মেয়েরা যায়। ইস্কুলের বড় ক্লাসের ধেড়ে ছেলেরা এই সময়টুকুতে রাস্তার মোড়ে, সামনের বারান্দায়, পাশের মাঠে জমে থাকে। কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট টানে, কেউ সাইকেলে করে বোঁ চক্কর মারে। যার যা আছে সব দেখায় মেয়েদের। হাসি-টাসি তো আছেই। ছেলেদের এইসব বোকামি দেখে মেয়েদের কেউ কেউ হাসিতে ঢলাঢলি করে যায়, কেউ গম্ভীর মুখে দৌড়ে-হেঁটে পালায়, দু-একজন 'জুতো মারব, লাথি মারব' গোছের কথা বলে শাসিয়েও গেছে। নিত্যিকার ঘটনা, কারও গায়ে লাগে না। আজ হল কি, থার্ড পিরিয়ডে যখন কানাই ক্লাস নিচ্ছে তখন টুকটুক করে একটা ফুটফুটে বছর দশেকের মেয়ে সোজা সরল পায়ে ক্লাসের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পাখির কণ্ঠে বলল, মাস্টারমশাই!

Shahnaz

কানাই অবাক। মেয়েটার পরনে ইস্কুলের সাদা ইউনিফর্ম, হাঁটু পর্যন্ত বাহারি মোজা। মুখচোখ ভারী তিরতিরে সুন্দর।

কানাই মাস্টার মুগ্ধ হয়ে বলল, এসো মা। কী হয়েছে বলো তো?

মেয়েটা ক্লাসে ঢুকে একটা ভাঁজকরা কাগজ কানাইয়ের সামনের টেবিলে রেখে বলল, মাস্টারমশাই একটা দুষ্টু ছেলে আমি ইস্কুলে যাওয়ার সময় আমার হাতে এটা দিয়ে বলল, এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পোড়ো। কী সব বাজে কথা লেখা আছে দেখুন। ওই ছেলেটা। বলে মেয়েটি মদনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—

কানাই চিঠিটা খুলে দেখে তাতে লেখা—প্রীয়তম রোজী আমি তোমাকে ভালবাসে আমার মোনের কথা তুমি কী বুঝিতে পারো না? কিস জানিবে। তোমার প্রীয় মদন।

চিঠির ওপর শ্রীকালী লিখতেও ভুল হয়নি।

কানাই দুটো কারণে চটে গিয়েছিল। এক তো মেয়েদের চিঠি দেওয়া সাঙ্ঘাতিক বেয়াদবি। তার ওপর এইটুকু একটা চিঠিতে এতগুলো বানান ভুল!

—তুমি এসো মা, আমি দেখছি। এই বলে কানাইমাস্টার রোজিকে বিদায় করে মদনকে ডাকল। যখন ডাকল তখনই একটা বেসামাল রাগ পেটের ভিতর থেকে উঠে আসছিল তার। সেই রাগে হাত থরথর করে কাঁপে, মাথাটা ঘোলা লাগে, দাঁতে দাঁতে বাতাস পেষাই হয়।

মদন কাছে আসতেই বিনা প্রশ্নে প্রথমে চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ঠক করে টেবিলে ঠুকে দিল কানাই। সেই সঙ্গে পিঠে যত জোরে সম্ভব এক কিল। বোঝা গেল মদনের চেহারাটা বড়সড় হলেও গাটা নরম। কিলটা নরম চর্বির থাকে এমন পড়ল যেন জলে কিল মারবার মতো হল।

মদন এমনিতে ঠাণ্ডা ছেলে, সাত চড়ে রা কাড়ে না। আজও কাড়ল না। তাইতেই কানাইয়ের মাথাটা আরও বিগড়ে গেল। হারামজাদা, গিধ্ধড়, পাজি, বদমাশ, নরাধম ঠিক নামতার মতো মুখে বলে যাচ্ছে কানাই আর মারছে। সে কী মার! মারের চোটে একবার গিয়ে দেয়ালে পড়ল, একবার ব্ল্যাকবোর্ডে, ফার্স্ট বেঞ্চের ডেস্কের কোণায় লেগে কপালটা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সমস্ত ক্লাস পাথরের মতো নিশ্চল। শুধু সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বেধড়ক ঠ্যাঙানি চলেছে তো চলেইছে। ডাস্টারটা দিয়েও কানাই মাস্টার মদনের চোয়াল, মাথা কান ফাটিয়ে দিয়েছিল আজ।

এরকম মার বড় একটা দেখা যায়নি স্মরণকালে। নিজের ছেলের অসুখ হওয়ার পর থেকেই মারধর করা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকের খ্যাপা মার দেখে আশপাশের ক্লাস ফেলে মাস্টারমশাইরা ছুটে এসে দরজার কাছে ভিড় করে ফেললেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে বা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হেডস্যার এসে মাঝখানে পড়ে সেই আসুরিক ব্যাপার থামালেন। মদন তখন রক্ত মাখা মুখে, ফাটা ঠোঁটে, ফোলা গাল, ছেঁড়া চুল আর তোবড়ানো জামাকাপড়ে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে—স্যার, আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! জুতো মারুন স্যার, আমি আজই সুইসাইড করব স্যার।

মদন এত কথা কখনও বলে না। মার খেয়ে আজ তার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। মার খাবার পরও তার চেঁচানি আর থামে না। কেবল কাঁদে আর আরও মারতে বলে, সুইসাইড করবে বলে চেঁচায়। নিজের ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে সে সারা ইস্কুলময় দৌড়োদৌড়ি করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

কানাই মাস্টারের কুপিত বায়ু যখন ঠাণ্ডা হল তখন সে মদনের আচরণ দেখে ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। ছেলেটার হল কী?

টিচার্স রুমে কানাই মাস্টারকে সবাই ধরে এনে পাখার তলায় বসিয়েছে। ইস্কুলের সামনে পাবলিকের ভিড় জমে গেছে। এই অবস্থায় মদন দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে মাস্টারমশাইদের পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে বলছে, লাথি মারুন স্যার, জুতো মারুন স্যার। আবার উঠে গিয়ে আর একজনের পায়ে পড়ে ওরকম বলে।

হেডমাস্টারমশাই এসে কানাই মাস্টারের কানে কানে বললেন—ছেলেটার ব্রেনটা বোধ হয় ড্যামেজ হয়েছে। আপনি আর স্পটে থাকবেন না, বাড়ি চলে যান।

শুনে কানাইয়ের শরীর হিম হয়ে এল। আর বুকের কি ধড়ফড়ানি! শশী বেয়ারা রিকশা ডেকে দিল। কানাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই শয্যা নিয়ে রইল। সারাদিন ভাবছে—এ আমার আজ কী হয়েছিল? এ আমি করলাম কী?

বিকেলের দিকে একবার উঠে এসে নিজের ছেলের বিছানায় বসল কানাই। কৃশ করুণ মুখ তুলে ছেলেটা চাইল বাবার দিকে। একটু হাসল। সে হাসি কান্নার ওপরকার সরের মতো। বড় সহ্যশক্তি ছেলেটার। কত সহ্য করছে! কানাই ভাবে, ওর ব্যথাগুলো কেন আমার হয় না?

ভাবতে ভাবতে বিছের হুলের মতো মদনের কথা মনে পড়ে। বড় যন্ত্রণা হয় বুকের মধ্যে। এত পাপ কি ভগবান সইবেন। মদনের যদি ভালমন্দ কিছু হয় তো তার কর্মফল কানাইকেও অর্সাবে। যদি সেই পাপ ছেলেটার ওপর এসে পড়ে?

বাইরে কে ডাকছে। কানাইয়ের বউ দিনরাত কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে আজকাল বড় রোগা হয়ে গেছে। চেনা যায় না! সে এসে বলল, ইস্কুলের ছেলেরা এসেছে।

বুক কেঁপে গেল। তবু নিজেকে শক্ত করে উঠে এল কানাই।

বড় ক্লাসের কয়েকটা ছেলে গম্ভীরমুখে বাইরে দাঁড়িয়ে। একজন মাতব্বর গোছের ছেলে বলল—স্যার মদনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—হাসপাতাল! বলে কানাই হাঁ।

অন্য একটা ফচকে ছেলে বলল—আপনি ঘাবড়াবেন না স্যার। কয়েকটা স্টিচ পড়েছে মাত্র। আর কিছু নয়।

ছেলেরা চলে গেলেও হতভম্ব ভাবটা যায়নি কানাই মাস্টারের। ঘর থেকে কয়েকদিন না বেরোনই ভাল। ছেলেগুলো নিশ্চয়ই ক্ষেপে আছে। কে কোথা থেকে আধলা ছুড়বে হয়তো। নাহলে ধরে ঠ্যাঙালেই বা কি করার আছে! সবচেয়ে চিন্তির হয় যদি মদনের বাবা পুলিশের কাছে যায়। যায়নি কি আর! গেছে। পুলিশও বোধহয় এতক্ষণে রওনা হওয়ার জন্য কোমরের কষি বাঁধতে লেগেছে। রক্তপাতে ফৌজদারি হয় সবাই জানে।

ছেলের মা এসে বলল, বাজারে যাও। তেল মসলা কিছু নেই।

শ্বাস ছেড়ে কানাই ওঠে। সন্ধের মুখে রামমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। সঙ্গে ঠনঠন কাঁসির আওয়াজ রোজ ভাল লাগে না। আজ লাগল। ঘণ্টা ডাকছে।

কানাই বেরিয়ে পড়ে। চোখে জল আসছে। বুকটা কেমন করে। কোনওকালে মন্দিরে যায় না কানাই মাস্টার। আজ ভাবল একবার যাবে। বুড়ো চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। সবাই বলে লোকটা খুব বড় মানুষ। এককালে তাঁর ভর হত। জিজ্ঞেস করবে—আমার পাপ কি ছেলেতে অর্সাবে ঠাকুর?

Shahnaz

৩

রেবার গানের মাস্টারমশাই এসেছে। লোকটা ছোকরা, তার উপর গান শেখায়। এসব লোক বড় বিপজ্জনক হয়।

তাই প্রথম প্রথম গানের মাস্টার এলেই হেম গিয়ে ঘরে মোড়া পেতে বসে সব লক্ষ করত। গানের আড়ালে আবডালে দুজনের কোনও হেলন দোলন নজরে পড়ে কি না।

একদিন রেবা ধমক দিল মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর। বলল—সুরের কিছু বোঝ না, তবু সামনে গিয়ে অমন হাঁ করে বসে থাকো কেন বলো তো? তুমি সামনে থাকলে আমার গাইতে বড় লজ্জা করে। আর কখনও ওরকম করবে না বলে দিচ্ছি।

কপাল এমনই যে হেমের বউ রেবা বেশ সুন্দরীই। সাদাটে রং, লম্বাটে গড়ন, মুখখানা মন্দ নয়, তার ওপর চোখ দুখানা ভারী মিঠে। এমন করে তাকায় যেন সব সময় বড় অবাক হয়ে আছে। এইরকম বউ যার থাকে তার বড় জ্বালা।

হেমের আজকাল বার বার ডাইসে হাত পড়ে যায়। গরম লোহার ছেঁকাও বিয়ের পর থেকে বড্ড বেশি খাচ্ছে হেম। কারখানায় কাজের সময়ে অন্যমনস্ক থাকলে আরও কত বিপদ হতে পারে। রেবার মতো সুন্দরী বউ জুটবে এমন ভরসা তার ছিল না কখনও, তবু কোন পুরুষ না বিয়ের আগে সুন্দরী বউয়ের কথা ভাবে। হেমও ভাবত। কিন্তু এ জ্বালা জানলে বিয়েতে বসবার আগে আর একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখত সে।

বিয়ের পর একদিন হাওড়ার খুরুট রোডের কাছে সিনেমা দেখতে গেছে। টিকিট কাটবার পর শো শুরু হতে দেরি আছে দেখে হেম রেবাকে নিয়ে লেমোনেড খেতে গেল। রেবা লেমোনেড দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি খেল। রেবার বড়ি খাওয়ার দৃশ্যটা হাঁ করে দেখছিল হেম। দেখতে গিয়ে এত মজে গিয়েছিল যে সে নিজেও রেবার মতো ঘাড় উঁচু করে হাঁ করে বড়ি গেলার মতো ভাব করে ফেলেছিল নিজের অজান্তে। তারপর যখন রেবা লেমোনেডের ঝাঁঝে মুখচোখ কোঁচকাল তখন তাই দেখে হেমেরও কোঁচকাল। আর এইসব হওয়ার সময়ে দোকানের চওড়া আয়নায় হেম হঠাৎ দেখতে পায় তিন চারটে বখা ছেলে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রেবার দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি বলাবলি করছে।

ভ্রূ কুঁচকে খানিক চেয়ে থাকে সে। মাথা বিগড়ে গেল। সে গুণ্ডা নয়, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, হলে ভাল হত। তার বৌয়ের দিকে নাহক লোকে তাকাবে—এ কেমন কথা?

হলে ঢুকবার পর গণ্ডগোলটা পাকাল। সেই তিনটে ছোঁড়া একেবারে পিছনের সিটে। হেম ছবি দেখবে কী, বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখছে। নিউজরিল শেষ হয়ে ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলবার সময়ে দেখল এক ছোকরা রেবার সিটের পিছনে হাত রেখেছে। আর যাবে কোথায়!

—কিরকম ভদ্রলোক হে তুমি? ভদ্রমহিলার একেবারে ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছ? এই বলে খেঁকিয়ে উঠেছিল সে।

ছেলেগুলো আচমকা ধমক খেয়ে প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপরই তেড়ে ফুঁড়ে উঠে তারাও তড়পাতে থাকে—কে মেয়েছেলের ঘাড়ে হাত রেখেছে? আপনি তুমি-তুমি করে বলছেন কেন? অত ছুঁচিবাই থাকলে মেয়েছেলে সিন্দুকে ভরে রেখে আসবেন। লেডিজ সিটে গিয়ে বসবেন এবার থেকে।

হেম হাতফাত চালিয়ে দিত ঠিক। রেবাই তাকে সামলায়। পরে বাড়ি ফেরার সময় বলেছিল—ওরা কিছু তো করেনি, তুমি রেগে গেলে কেন?

রাগ যে কখন হয় হেমের, তা কারও বোঝার নয়। এই জীবনটা এই রকম জ্বলে পুড়ে যাবে।

ছোকরা গানের মাস্টার ঘরে সন্ধের আলো জ্বালবার মুখটাতেই এসে হাজির। রেবা প্রায় দুপুর-দুপুর বেলা থেকে খুব সেজে বসে আছে। কোলে খোলা গানের খাতা নিয়ে বিছানায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে তখন থেকে 'তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায় কেউ বা সিরাজি মাগে' লাইনটায় সুর লাগাচ্ছে। হেমকে দেখেও দেখছে না।

হেম ঘোষের গলায় এক সময়ে সুর ছিল। না ঠিক গানের গলা নয়! তবে সিনেমা বা রেডিওর গান গুনগুন করতে করতে প্রায় সুরটা এনে ফেলত।

আচ্ছা, এমন হতে পারে না কি যে, হেম খুব গোপনে কোনও বড় ওস্তাদের কাছে গিয়ে গান শিখে খুব বড় গাইয়ে হয়ে গেল একদিন। রেবা টেরও পেল না এত কাণ্ড। তারপর কোনওদিন হয়তো রেবার মাস্টার গান শেখাতে এসে সুর তুলতে গলদঘর্ম হচ্ছে, এমন সময়ে সাদামাটা চাবির কারিগর হেম ঘোষ হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিখুঁত সুরে গানটা গেয়ে দিল! রেবা তখন যা অবাক হয়ে তাকাবে না। সেই দিনই মাস্টারকে অহঙ্কারের সঙ্গে বলে দেবে—আর আপনাকে দরকার হবে না প্রভাসদা। তারপর হেমের সঙ্গে যখন একা হবে রেবা তখন দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে হেমের কালো মোটা ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলবে—তোমার ভিতর কত জাদু আছে বলো তো! তখন হেম খুব হাসবে। খুব হাসবে। একেবারে হেঃ হেঃ করে পেট ভরে হেসে নেবে একচোট।

দাওয়ায় বসে খানিকক্ষণ এইসব ভাবল সে। ঘর থেকে গান আসছে, গোয়াল থেকে মশা। আর শুকনো গোবরের গন্ধ। কাঁকড়াবিছের চিন্তাটাও বড্ড পেয়ে বসেছে হেমকে। চক্কোত্তিমশাই অনেক ওষুধ জানেন। দিনেকালে কত শক্ত রোগ ভাল করেছেন বলে শোনা যায়। একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে গিয়ে কাঁকড়াবিছে কামড়ালে কী ওষুধ দিলে আরাম হয় তা ফাঁকমত জেনে আসবে হেম। রেবার যা সুখের শরীর, একবার বিষবিচ্ছুর কামড় খেলে ফুলের মতো শরীরটা নীলবর্ণ হয়ে নেতিয়ে পড়বে না? ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

...'কেউ বা সিরাজি মাগে—এ-এ' গানের মাস্টারের ভরাট গলার সঙ্গে ডুয়েটে রেবার কোকিলস্বর জড়ামড়ি করছে। সইতে পারে না হেম ঘোষ। বিড়িটা নিবে গিয়েছিল, আর ধরাতে ইচ্ছে হল না। ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরোবে।

হেমের পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। গেঞ্জির ওপর জামাটা চড়িয়ে নিলে হত। কিন্তু এ সময়টায় ঘরে ঢুকতে সাহস হয় না। রেবা রেগে যাবে ঘরে ঢুকলে।

উঠোন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের গায়ে বেরোনোর দরজা। ঠিক দরজার চৌকাঠে মুখোমুখি কালিদাসীর ছেলে অভয়পদর সঙ্গে দেখা। অভয়পদর হাতে একঠোঙা ঝালমুড়ি। ঝালের চোটে শিস টানছিল। হেম ঘোষকে দেখে ঠোঙাটা এগিয়ে ধরল। হেম হাত পাতলে ঠোঙা উপুড় করে দেয় অভয়। তলানি মুড়িতে যত কুঁড়ো মিশে আছে। তাই মুখে ফেলে হেম ঘোষ বলে—খবর কী?

—আর খবর! অভয়পদ বলে—আজও মোহনবাগানের একটা পয়েন্ট গেল।

হেম ঘোষ খেলার মাঠের খবর রাখে না। তবু অভয়পদকে তোয়াজ করবার জন্য বলল—এঃ হেঃ'! একটা পয়েন্ট চলে গেল?

অভয়পদর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাওড়ার বিখ্যাত মাতব্বর জ্ঞান সরকারের শাগরেদ।

Shahnaz

জ্ঞানদা ওর মাথাটা খেয়ে রেখেছে। ঘুমে জাগরণে সবসময়ে ওর মুখে জ্ঞানদা আর মোহনবাগানের কথা। কবে জ্ঞানদা ডেকে অভয়পদর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেছে, কবে যেন বলেছে—অভয়, আমার বাড়িতে একটা বাচ্চা চাকর ঠিক করে দিস তো, কবে হয়তো জ্ঞানদার গাড়িতে উঠে বড়বাজারের লোহাপট্টিতে গেছে এ সবই অভয়পদর বলবার মতো কথা। আজকাল অভয়পদকে দেখলেই লোকে সটকাবার তাল করে। কাঁহাতক জ্ঞানদার বৃত্তান্ত শোনা যায়!

হেম ঘোষের সেই ভয়। তবে কিনা অভয়পদর আর কোনও দোষ নেই। বরং জ্ঞানদার শাকবেদি করে সে চিরকুমার রয়ে গেছে, মেয়েমানুষকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে, লোকের বেবিফুড জোগাড় করে দেয়, ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে আসে পাঁচজনের। মড়া পোড়াতে যায়। বাড়ি ভাড়ার টাকা তুলে, দুধ আর ঘুঁটে বেচে মা কালিদাসী সংসারটাকে কষ্টেসৃষ্টে টেনে নেয়। নিষ্কর্মা অভয়পদ তাই বড় সুখে আছে।

অভয়পদ বলল—আজ একটা মিটিং আছে জ্ঞানদার বাড়িতে, বুঝলে? চা-টা খেয়েই বেরোব।

—খুব ভাল। বলে হেম বেরিয়ে আসছিল।

মানুষ যে কেন খামোখা মিটিং করে মরে আজও হেম বোঝে না। যত সব ফালতু কারবার। দশটা মাথা এক হয়ে যত সব গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর।

সিঁড়ির মুখ থেকে অভয়পদ ফিরে এসে বলল—ও হেম, শোনো।

হেম ভয়ে সিটিয়ে যায়। মিটিং-এর কথা না ফেঁদে বসে। ওসব কথায় বড্ড মাথা বিগড়ে যায় তার।

অভয়পদ গলার স্বর নামিয়ে বলে—তোমার বউ কি সিগারেট-টিগারেট টানে নাকি! রাতে ওপরের বারান্দা থেকে যেন দেখলুম উঠোনে রেবা সিগারেটে টান মারতে মারতে পায়চারি করছে।

কী কেলেঙ্কারী! হেমের ভিতরটা যেন লজ্জায় গর্তের মতো হয়ে যায়। কাল তখন অনেক রাতে তারা স্বামী-স্ত্রী জ্যোছনা দেখতে উঠোনের দিকে দাওয়ায় এসে বসেছিল একটু। এমনিতে হেম ঘোষ সিগারেট খায় না, রেবার চাপাচাপিতে ইদানীং খেতে হচ্ছে। কাল রাতেও খাচ্ছিল। সদ্য ধরানো সিগারেটটায় দু টান দিতে না দিতেই রেবা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল—আমি খাব।

হেম অবাক। দেখে, রেবা দিব্যি ফসফস টান মারছে। কাশিটাশি নেই, চোখে জলও এল না ধোঁয়ায়। বলল—আগে খেতেটেতে নাকি?

—কত? বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে অনেক খেয়েছি। বেশ লাগে।

বলে রেবা সিগারেট টানতে টানতে উঠোনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে সময়ে বাড়ির কারও জেগে থাকবার কথা নয়। তারাও কিছু টের পায়নি। রামচন্দ্র হে! অভয়পদ দেখে ফেলেছে তবে!

হেম ঘোষ হেসে আমতা আমতা করে বলে—ওই শখ করে দুটো টান দিয়েছিল আর কি! তারপর কেশে-টেশে ফেলে দেয়।

অভয়পদ আদর্শবাদী লোক। মুখটা কেমনধারা করে বলল—দেশটা যে একেবারে সাহেব হয়ে গেল হে হেম! ভারতবর্ষের কত সম্পদ ছিল!

কথাটা ভাল বুঝল না হেম। অভয়পদও বুঝিয়ে বলল না। চলে গেল।

রেবাকে সিগারেট খেতে অভয় দেখেছে, লজ্জা শুধু সেজন্যই নয়। হেম ঘোষ আর একটা কথা ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে জিভ কাটল। কী কেলেঙ্কারি। কাল জ্যোছনায় তাদের দুজনেরই বড় রস উস্কেছিল। নিরিবিলি, নিশুতি জ্যোছনায় পরীর মতো বৌটাকে দেখে খুব দু-চারটে দেহতত্ত্বের কথা হেসে হেসে বলে ফেলেছিল হেম। রেবাও দু-চারটে ভাল টিপ্পনী ঝেড়েছিল। দোষের কথা নয়। স্বামী-স্ত্রী একা হলে এরকম কথা হয়! কিন্তু সেসবই যে শুনে ফেলেছে অভয়পদ! কী লজ্জা। কী লজ্জা!

এই জিভ কাটা অবস্থায় হেম ঘোষ যখন দাঁড়িয়ে ঠিক তখনই এক জোড়া মাঝবয়সী স্বামী-স্ত্রী ভুঁইফোড়ের মতো তার সামনে কোত্থেকে হাজির হয়ে আচমকা বলল—আচ্ছা মশাই, গুন্টু কি বাড়িতে আছে?

আর এক দফা লজ্জা পেয়ে হেম বলে—না, সে মন্দিরে কাঁসি বাজাতে গেছে।

৪

গুন্টু যখন কাঁসি বাজায় তখন সে নিজেই শব্দ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কী রকম হয়, কাঁসি বাজাতে বাজাতে শব্দটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। কাঁইনানা কাঁইনানা হয়ে বাজতে বাজতে কানে তালা ধরে আসে, শরীর ঝিমঝিম করে। তারপর শব্দটা যেন তার চারধারে লাফাতে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে বহুদূর চলে যায়। আবার ফিরে আসে। তারপরই সে পরিষ্কার টের পায় শব্দটা আকাশ বাতাস সব হাঁ করে গিলে ফেলল। প্রকাণ্ড হয়ে গেল। দুনিয়াভর হয়ে গেল। আকাশভর হয়ে গেল। তারপর আর গুন্টু নিজেকে টের পায় না। বড় মজা হয় তখন। গুন্টু শব্দ হয়ে যায়।

মাস দুই আগে গুন্টু চৌধুরিদের প্রকাণ্ড বাগানে পেয়ারা চুরি করতে ঢুকেছিল, দুপুরবেলা। কোথাও কিছু না, হঠাৎ একটা শিরীষগাছে এক হনুমানকে দেখতে পেল সে, বুকে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে।

যে কোনও কিছুকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়া গুন্টুর স্বভাব। বে-খেয়ালে কত সময় কত মারাত্মক জায়গায় ঢিল ছুড়েছে সে। চলন্ত গাড়ির হেডলাইট ফাটিয়েছে একবার, রাস্তার আলো ভেঙেছে কতবার, জ্ঞান সরকারের বাইরের ঘরের দেওয়ালঘড়িটা রাস্তা থেকে ঢিল ছুড়ে ভেঙেছিল।

সেই স্বভাববশে হনুমানটার দিকেও খামোকা একটা মুঠোভর ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল। হনুমানটার তেমন লাগেনি তাতে। কিন্তু হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেটা হড়হড় করে গাছ থেকে নেমে এসে তাড়া করল গুন্টুকে। গুন্টু দৌড় দৌড়। জংলা বাগানটার মাঝ বরাবর পুরনো পুকুর, তাতে সবুজ শ্যাওলা থিকথিক করছে, বড় বড় মাছ। অন্যদিকে পথ না পেয়ে গুন্টু সেই পুকুরে ঝাঁপ খায়।

গুন্টু সাঁতরায় ভালই। কিন্তু ত্যাঁদড় হনুমানটার জ্বালায় কিছুতেই আর জল ছেড়ে উঠতে পারে না। যেদিক দিয়ে উঠতে যায় সেদিকেই সেটা গিয়ে হুপ হুপ করে হাঁক ছাড়ে। সেই হাঁক-ডাকে আরও কয়েকটা হনুমান কোত্থেকে এসে জুটল। অগত্যা জলের মধ্যে গুন্টুকে সারাক্ষণ হাত পা নেড়ে ভেসে থাকতে হয়েছিল। ফলে পচা আঁষটে গন্ধ, শ্যাওলার লতা বারবার পায়ে হাতে জড়াচ্ছে, বড় বড় জাহাজের মতো মাছ মাঝে মাঝে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘষটে যাচ্ছে। কয়েকবার লেজের ঝাপটা খেল। এক হাত তফাত দিয়ে সাঁতরে চলে গেল একটা জলঢোঁড়া।

Shahnaz

পায়ের বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ডুব দিয়ে বহুবার থই খুঁজে পেল না গুন্টু। তার কচি বুকে দম বেশি ছিল না তো। তাই এক সময়ে হঠাৎ চোখের সামনে সূর্য নিবু নিবু হয়ে গেল, বুকে বাতাসের টান, হাতে পায়ে খিল। সে তখন বিড়বিড় করে বলেছিল—আমি যে রোজ সন্ধেয় তোমার মন্দিরে আরতির সময়ে কাঁসি বাজাই!

তারপরই হঠাৎ যেন এক পাতালপুরীর হাত এসে গুন্টুকে টেনে নিল জলের তলায়।

সেইখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। মরলে তো সবাই তাঁর দেখা পায়। গুন্টু গিয়ে দেখে আরেব্বাস। সেখানে পেল্লার চৌকি পেতে বুড়ো চক্কোত্তিমশাই বসে তামাক খাচ্ছেন। তাকে দেখে বলে উঠলেন—গুন্টু রাজার গালে হাত! গুন্টু রাজার গালে হাত! গুন্টু রাজার গালে হাত!

তা গালে হাত দেওয়ারই দাখিল। যা অবাক হয়েছিল। তবু গুন্টু চক্কোত্তিমশাইকে অচিন জায়গায় পেয়ে ভারী খুশি। প্রণাম করে ফেলে ভাল করে তামাক সেজে দিল। চক্কোত্তিমশাই বললেন—তা শব্দ হওয়া ভাল। দুনিয়াটা হলই তো শব্দ থেকে। যেখানে সেখানে ভাল করে যদি শুনিস তো দেখবি, দুনিয়ায় সব শব্দ। তুইও শব্দ, আমিও শব্দ। মনে করিয়ে দিস, তোকে ভাল দিন দেখে একটা শব্দ দেব'খন। সে এমন শব্দ যে কাঁসির শব্দ তার কাছে কোথায় লাগে! এখন যা।

ডোবার আধঘণ্টা পর গুন্টু ফেরে ভেসে উঠেছিল। পেটে জল, মুখে গাঁজলা, চোখের মণি ওল্টানো, জ্ঞান নেই, মৃত্যুক্ষীণ নাড়ী চলছে না। তাই দেখে হনুমানগুলো এমন হাল্লাচিল্লা ফেলে দিয়েছিল যে চৌধুরি বাগানের বুড়ো মালী এসে পড়েছিল দুপুরের ঘুম ভেঙে। সেই তোলে গুন্টুকে। পেটের জল বার করে সেঁক তাপ দেয়। ডাক্তার-বদ্যি করতে হয়নি, হাসপাতালেও যেতে হয়নি। কেউ তেমন টেরও পায়নি ঘটনা।

বেঁচে গিয়ে তেমন অবাক হয়নি গুন্টু। কেমন করে যেন মনে হয়—মরলেই হল আর কি! চক্কোত্তিমশাই সব জায়গায় পাহারা দিচ্ছে না! যেখানেই যাও গিয়ে দেখবে ঠিক বুড়ো মানুষ আপদবিপদের দোর আগলে চৌকি পেতে বসে তামাক খাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

রাম মন্দিরে আরতির সময় এখনও বেজায় ভিড় হয়। নতুন ঠাকুরমশাই আরতিও করেন ভাল, তবে কিনা চক্কোত্তিমশাইয়ের আরতি যারা দেখেছে তাদের চোখে অন্য কিছু আর লাগে না। তবু অভ্যাসবসে মানুষ এসে দাঁড়ায় খানিক।

এখান থেকে চারচালাটা বেশি দূর নয়। নাটমন্দিরের পর একটা মাঠ তারপর একটা কাঁচা রাস্তা, সেটা পেরিয়েই বাগানের বাঁশের বেড়ার গায়ে কাঠের ফটক। কয়েকটা ফুল গাছের ঝোপ, জোনাকি পোকার আলো, একটু অন্ধকার। খোলা দাওয়ায় একটা চৌকি পাতা, সাদা বিছানা, মেঝেয় চটি জোড়া নিখুঁতভাবে রাখা, একপাশ গড়গড়া। বিছানায় চক্কোত্তিমশাই দুটো বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে থাকেন। গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ হয়।

আউন্তি যাউন্তি মানুষজন দু দণ্ড দাঁড়ায় এসে সামনে। বলে—চক্কোত্তিমশাই, মন্দিরের পুজোয় আর যে যান না।

বুড়ো মানুষটি একগাল হেসে বলেন—রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মেয়েরা ততদিনই পুতুল খেলে যতদিন বে না হয়। বিয়ে করে আসল ঘরসংসার পেলে আর পুতুল খেলে কে রে?

লোকে একটু-আধটু বোঝে না যে তা নয়।

গুন্টু বোঝে। আরতির পর গুন্টুর অনেকক্ষণ সাড় তাকে না। মগজে তখন কেবল ঘণ্টার

শব্দ, কেবল কাঁসির আওয়াজ।

একদিন বলে ফেলেছিল গুন্টু—আরতির পর আমি এক অন্যরকম ঘণ্টার শব্দ শুনি। সে আওয়াজ মন্দিরের নয়, অন্য জায়গা থেকে আসে।

চক্কোত্তিমশাই সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—খুব মনপ্রাণ দিয়ে শুনবি। কাউকে বলিস না।

গুন্টুর মায়ের কথা মনে নেই। সে মায়ের পেট থেকে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মা মারা যায়। সেই থেকে সে দিদিমার কাছে। তার বাবা আবার বিয়ে করেছে। মাঝে মাঝে ঝাড়গ্রাম থেকে বাবা তাকে দেখতে আসে। ভারী নিরীহ, ভীতু মানুষ, দ্বিতীয় পক্ষের দাপটে অস্থির। দ্বিতীয় পক্ষ আসতেও দেয় না বড় একটা। কিন্তু বাবা এলে গুন্টুকে দেখে ভারী খুশি হয়। এক গাল হাসে, বড় চোখে হাঁ করে এমনভাবে দেখে যেমন লোভী লোক খাবারের দোকানের দিকে চায়।

বাবা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—বলো তো বাবা, তোমার কে কে আছে?

গুন্টু ভেবেচিন্তে বলেছিল—দিদিমা, মামা আর চক্কোত্তিমশাই।

বাবা অবাক হয়ে বলে—চক্কোত্তি আবার কে?

—সে আছে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—আর আমি?

গুন্টু তখন লজ্জা পেয়ে বলে—হাঁ বাবা, তুমিও। আর সৎমা।

—ছিঃ বাবা, সৎমা বলতে নেই। লোকে খারাপ ভাবে। শুধু মা। আরও বলি বাবা, তোমার কিন্তু আর দুটি বোন আছে। তারা তোমাকে ভারী দেখতে চায়। তোমার মাও বলে, এবার গুন্টুকে নিয়ে এসো।

গুন্টুর যেতে অনিচ্ছে তা নয়। কিন্তু দিদিমা ছাড়তে চায় না। কথা উঠলে বলে, আঁতুড় থেকে মানুষ করছি, ওর নাড়ী আমি ছাড়া আর তো কেউ চিনবে না। অন্যের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু মুশকিল হল, গুন্টু শুনেছে, তার সৎমায়ের দুটি মাত্র মেয়ে, আর নাকি ছেলেপুলে হবে না। কিন্তু সৎমায়ের খুব ছেলের শখ। তাই এখন প্রায়ই গুন্টুর বাবাকে বলে, সতীনপোকে নিয়ে এসো, তাকে নিজের ছেলে করে নেব।

তাই বাবা আজকাল খুব ঘন ঘন আসে। গুন্টুও জানে, একদিন তাকে হয়তো ঝাড়গ্রামে চলে যেতে হবে। সৎমাকে সে দেখেনি। তবে 'মা' বলে কাউকে ডাকতে খুব ইচ্ছে করে তার। আবার এ জায়গা ছেড়ে, দিদিমা মামা আর চক্কোত্তিমশাইকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছেও করে না। গুন্টুর আজকাল তাই মনটা দুভাগ হয়ে গেছে।

মামা প্রায়ই গুন্টুকে বলে—তোকে যা একটা লিডার তৈরি করব না গুন্টু, দেখে নিস। একটু বড় হ, তখন জ্ঞানদার কাছে নিয়ে গিয়ে এমন ট্রেনিং দেওয়াব। জ্ঞানদার হাতে কত লিডার তৈরি হয়েছে।

গুন্টুর লিডার হতে খুব ইচ্ছে।

আরতির শেষে আজ বড় একা একা লাগছিল গুন্টুর। কাঁসি বাজানোর সময় আজ তিনধা নাচন নেচেছে। এখন তাম্রপাত্র নিয়ে নাটমণ্ডপের ধারে বসে হাজারটা হাতের পাতায় তামার কুশি দিয়ে চরণামৃত দিচ্ছে। কত হাত! হাতগুলোতে ভয় লোভ হিংসে মাখা। এক-আধটা হাত ভারী মায়া। দেখে দেখে আজকাল বুঝতে পারে সে।

Shahnaz

একটা সাদা কাঁপা-কাঁপা হাত থেকে খানিক চরণামৃত চলকে পড়ে গেল। মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই গুন্টুর। কিন্তু সে ঠিক টের পায় এ হাতটা হল কানাই মাস্টারের। কানাই স্যারের প্রাণে আজ বড় কষ্ট।

একটা ছ্যাঁকা খাওয়া, কড়া পড়া বিদঘুটে হাত দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল গুন্টু, এ হল হেম ঘোষ। হেম ঘোষের হাতটা কাকে যেন খুন করতে চায়।

একবার চক্কোত্তিমশাই একটা কচি বেলগাছ দেখিয়ে গুন্টুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বল তো কত পাতা আছে গাছটার।

ভেবেচিন্তে গুন্টু বলে—হাজার দুই হবে।

—দেখ তো গুনে।

সে বড় কষ্ট গেছে। এক মানুষসমান উঁচু গাছটার নীচে টুল পেতে তার ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাতা গুণতে হল। দাঁড়াল চার হাজারের ওপর। তবু একটা আন্দাজ হল।

সেই থেকে চক্কোত্তিমশাই এরকম হরেক জিনিস আন্দাজ করে শেখান গুন্টুকে। করতে করতে গুন্টুর আন্দাজ ভারী চমৎকার হয়েছে। খুব ঝুপসি গাছ হলেও তা দেখে টকাস করে বলে দিতে পারে তাতে পাতা কত। জানে, গুণে দেখলে ঠিক মিলে যাবে।

চক্কোত্তিমশাই শিখিয়েছেন, রোজ রাতে শোওয়ার আগে বিছানায় বসে সারা দিনের কথা ভাববি। সকাল থেকে কী করলি, কী খেলি, সব হুবহু মনে করা চাই। এ না করে ঘুমোবি না।

তাই করত রোজ গুন্টু। ছ মাস পর তার বেশ তড়তড়ে মনে হল। টক করে সব মনে পড়ে যেতে থাকে। তখন চক্কোত্তিমশাই শেখালেন, এবার রোজকার কথা, আর তার সঙ্গে আগের দিন, আগের আগের দিন এইভাবে মনে করবি। করতে করতে দেখবি একদিন তোর আর জন্মের কথা মনে পড়ে যাবে।

—তাতে কী হয় চক্কোত্তিমশাই?

—তাহলে আর মানুষ মরে না। দেহ ছাড়ে, কিন্তু মরে না।

গুন্টুর দিকে আর একটা হাত এগিয়ে আসে। হাতে শাঁখা, তাতে সিঁদুরের দাগ। গুন্টু যেন এ হাত চেনে। কুশি তুলেও গুন্টু থেমে থাকে। এ হাত কি চরণামৃত চায়? না। এ হাত একটা ছেলে চায়। এ হাতের বড় আকুলি বিকুলি।

হাতটা ওই অত হাতের ভিড়ের ভিতর থেকে একটু ওপরে উঠে এসে গুন্টুর থুতনি ধরে মুখখানা ওপরে তুলল। আর তখন নাটমন্দিরের জোর আলোয় একজোড়া জল টলটলে চোখ দেখতে পায় গুন্টু। ঘোমটার নীচে ফর্সা মুখ। ঠোঁটে একটা কান্নায় ভেজা হাসি। পিছনেই বাবা দাঁড়িয়ে। ভারী তটস্থভাবে বাবা মহিলাটির কাঁধে হাত দিয়ে বলল—এখন না। ও এখন ব্যস্ত। বাড়িতে যাক, ভাল করে দেখো।

চোখ বুজে মহিলাটি বলে—এ যে দেবতার মতো ছেলে। আমার সতীন বড় ভাগ্যবতী ছিল।

গুন্টু ভারী লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি হাতে হাতে চরণামৃত ঢেলে দিতে থাকে সে। মাথা নিচু। কারও মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই।

৫

রেবা ঝুঁকে গানের খাতা দেখছিল। গানের মাস্টার প্রভাস খানিকক্ষণ তবলায় আড়া চৌতাল তুলবার চেষ্টা করে এইমাত্র একটা সিগারেট ধরাল। নতমুখী রেবার দিকে চেয়ে রইল খানিক। বেশ দেখতে মেয়েটা। মাঝে মাঝে এমন করে তাকায় যে ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

প্রভাস অনেকদিন ধরেই বুঝবার চেষ্টা করছে, রেবার হাবভাবে কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা। মাঝে মাঝে যেন মনে হয়, আছে। আবার কখনও মনে হয়, না, নেই।

আছে কি নেই সেটা বুঝবার জন্যও একটা কিছু করা দরকার। ধসা কানা হয়ে বসে থেকে কোনওদিনই তা বোঝা যাবে না।

ভাবতে ভাবতে প্রভাস একবার বাঁয়ায় একটা টুম শব্দ তুলল। রেবা তাকাল না। বাঁ হাতখানা হারমোনিয়মের ওপর দিয়ে এসে ঝুলছে। কী চমৎকার আঙুল! এই মেয়ের বর কিনা হেম ঘোষ! কাকের মুখে কমলালেবু।

প্রভাস আন্দাজ করে, হেম ঘোষের বৌ হয়ে রেবা নিশ্চয়ই খুব সুখী নয়। তাহলে রেবা প্রভাসকে একেবারে হ্যাটা করবে না।

ভেবেচিন্তে প্রভাস আজ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। একটা কিছু হোক। হয়ে যাক।

গানের সময়ে আজকাল ঘরের লোকজন তাড়িয়ে দরজা দিয়ে জানলার পর্দা টেনে-টুনে দিয়ে বসে রেবা। সেটাও কি একটা ইঙ্গিত নয়? কোন বোকা এসব ইঙ্গিত ধরতে না পারে?

খুব সাহস হল প্রভাসের। আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল।

একটু ঝুঁকে প্রভাস হঠাৎ রেবার ঝুলন্ত হাতকানা খপাৎ করে চেপে ধরে ডেকে উঠল—রেবা!

জানলার পর্দার ওপাশে অভয়পদ একটা অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা শ্বাস ছেড়ে বেশ জোরে বলে উঠল—আগেই বলেছি কিনা মা, যে মেয়ে সিগারেট খায়, তার চরিত্র ভাল হতে পারে না! এসে দেখে যাও এখন স্বচক্ষে।

ঘরের ভিতর প্রভাস তখন ছিটকে নেমে পড়েছে চৌকি থেকে। টর্চ জ্বেলে তাড়াহুড়ো করে চটি খুঁজছে। মনের ভুল। ঘাবড়ে গিয়ে ভুলে গেছে যে, চটি দরজার বাইরে ছেড়ে আসে রোজ।

রেবা সাদা মুখে প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল—কী করলেন বলুন তো প্রভাসদা! এখন এ বাড়িতে কি আর থাকা যাবে! কত কষ্টে বাপের বাড়ির কাছে এই বাসা খুঁজে বের করেছি। এখন যদি ছাড়তে হয় তবে ও ঠিক আবার ওদের সংসারে নিয়ে গিয়ে তুলবে।

প্রভাস দরজার কপাট হাতড়ে ছিটকিনি খুঁজছে তাড়াতাড়ি।

রেবা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—এ বাসায় কত সস্তায় ছিলাম জানেন! এ অঞ্চলে পঁচিশ টাকায় ঘর আর পাওয়া যাবে? বাড়িউলি মানুষটা কত ভাল ছিল। ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কি করলেন বলুন তো!

প্রভাস ছিটকিনি খুলে চটি খোঁজার জন্য আর ঝামেলা করল না। দুই লাফে উঠোন পেরিয়ে খালি পায়ে রাস্তায় নেমেই একটা রিকশায় উঠে পড়ল। বলল—জোরে চালাও ভাই।

রেবা দরজার কাছ বরাবর গিয়ে সজল চোখে তাকিয়ে থাকল একটু। তারপর কেঁদে ফেলল। ইস, অভয়দা দেখে ফেলেছে। এখন ঠিক বাড়ি-ছাড়া করবে তাদের।

উঠোনের ওপাশের অন্ধকার থেকে কালিদাসীর গলা আসছিল—তোরই বা উঁকি মারতে

Shahnaz

যাওয়ার কি দরকার! ওসব লোক ওরকমই হয় বাবু। তুই নিজের কাজে যা।

—যাচ্ছি।

—গুন্টুটাকে ডেকে দিস তো। দুপুর থেকে ছেলের টিকি নেই।

রেবার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল—মাসিমা, আমাদের বাসা ছাড়তে বলবেন না। আমি গানের মাস্টারকে ছাড়িয়ে দেব।

কিন্তু তা আর বলা হল না। সিঁড়িতে শব্দ করে কালিদাসী উঠে গেল।

গুম হয়ে বসে রইল রেবা। এ বাড়িতে যে কত সুবিধে! খুব সস্তায় কালিদাসীর কাছ থেকে ঘুঁটে কেনে রেবা। আড়াই টাকা সের দরে খাঁটি গরুর দুধ কেনে।

৬

নাটমন্দিরের নীচে নেমে এসে কানাই মাস্টার হাজার জোড়া জুতোর মধ্যে নিজের জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছিল না। জায়গাটা একটু অন্ধকার মতোও বটে।

হেম ঘোষ নেমে এসে বলল—কী খুঁজছেন মাস্টারমশাই, জুতো? বলে ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরল।

কানাই জুতো খুঁজে পেয়ে হেম ঘোষকে বলল—যাবেন নাকি বাজারের দিকে?

একা চলাফেরা করতে আজ কানাইয়ের ঠিক সাহস হচ্ছে না। মারাটা বড় খারাপ হয়েছে মদনকে। একবার যাবে চক্কোত্তমশাইয়ের কাছে, ফাঁকমত।

হেম ঘোষ উদাস গলায় বলে—সকালেই বাজার করেছি। তা আমার আর কাজ কি, চলুন বরং বাজার থেকে ঘুরেই আসি একটু। বাজার জায়গাটা ভাল।

হেমের মনে একটা পোকা কামড়াচ্ছে তখন থেকে। একা ঘরে রেবা আর গানের মাস্টার। চোখে চোখে কথা হচ্ছে না তো! কিংবা হারমোনিয়মের রিডে একজনের আঙুলে অন্য জনের আঙুলে ছোঁয়া লাগে যদি! এর চেয়ে নিজেদের সংসারে বেশ ছিল। দশ জোড়া পাহারা দেওয়ার চোখ ছিল সেখানে। কাঁকড়াবিছের কথাও ভাবে হেম ঘোষ। ওষুধটা চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

মনের কথা মনে রেখে দুজনে অন্য সব কথা বলতে বলতে বাজারপানে যেতে থাকে।

৭

কালিদাসী ডাক শুনে বারান্দায় এসে দেখে উঠোনে জামাই দাঁড়িয়ে। সঙ্গে বৌ আর দুটো মেয়ে।

কালিদাসী শ্বাস ছাড়ে। জামাই আসবে জানাই ছিল। গুন্টুকে বুঝি এবার নিয়ে যায়।

—এসো। বলে নীরস গলায় ডাকে কালিদাসী।

ওরা উঠে আসে।

জামাই প্রণাম করতে করতেই বলে—গুন্টুকে নিয়ে যেতে এলাম মা। অনেকদিন হয়ে গেল। আপনারও কষ্ট বুড়োবয়সে।

কালিদাসী মন্দার মাকে মিষ্টি আনতে পাঠায়। তারপর গম্ভীরমুখে এসে সামনে বসে। বলে—যার ধন সে তো নেবেই। ঠেকাব কোন আইনে। এই বুঝি মেয়ে দুটি? বেশ মিষ্টি হয়েছে দেখতে। আর এ আমার নতুন মেয়েটিও বেশ।

এ সবই মুখের ভদ্রতা। বুকের ভিতরে ভিতরে জ্বলে যায়। কাঁকড়াবিছে কোন ফাঁকে পাঁজর

কেটে বুকের ভিতর সেঁধিয়েছে। এ ছলের বড় জ্বালা।

খানিকক্ষণ বসে গল্পগাছা করে ওরা চলে গেল। কাল সকালে গুন্টুকে ওরা নিতে আসবে।

কালিদাসী একটা চাদর গায়ে নীচে নেমে এসে ডাকল—রেবা। ও রেবা!

রেবা শুয়ে ছিল বিছানায়। ডাক শুনে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। এই বুঝি বাড়ি ছাড়বার কথা বলতে এসেছে!

কিন্তু না। কালিদাসী বলল—আমাকে একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে যেতে হবে। মন্দার মা গাড়ি গেল, তা তুমি যদি একটু সঙ্গে চলো মা। আমার তো চোখে ভাল ঠাহর হয় না রাতবিরেতে।

—যাচ্ছি মাসিমা। বলে রেবা তক্ষুনি চটি পায়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে অবশ্য জিভ কাটল রেবা। চটিজোড়া তার নয়, প্রভাসের। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় বুঝতে পারেনি। এখন আর কিছু করার নেই।

রেবা বলল—মাসিমা, আমার কি দোষ বলুন। লোকটা যে ওরকম তা কি জানতাম!

কালিদাসীর বুকভরা তখন গুন্টুর চিন্তা। বলল—সে জানি বাছা। আজকালকার লোক বড় ভাল নয়। সাবধানে থাকবে।

রেবা কালিদাসীকে ধরে খুব যত্নে কাঁচা ড্রেনটা পার করাল। মনে মনে বলল—চক্কোত্তিমশাই, দেখো বুড়ি যেন আমাদের না তাড়ায়।

৮

গুন্টুকে নিয়ে রেলগাড়ি হাওড়া ছেড়েছে অনেকক্ষণ। জানলার ধারে বসে সে এখন বাইরে গ্রাম আর ক্ষেত দেখছে। গা ঘেঁষে ছোট বোন দুটি বসে। মা একটু তফাত থেকে মাঝে মাঝে মুগ্ধচোখে তার মুখের দিকে চাইছে। আর বার বার জিজ্ঞেস করছে, খিদে পেয়েছে বাবা তোমার? কিছু দিই? সন্দেশ আছে, রসগোল্লা, লুচি। কত এনেছি দ্যাখো। বাবা একবার কানে কানে জিজ্ঞেস করেছিল—মাকে তোর পছন্দ হয়েছে তো গুন্টু?

গুন্টু ঘাড় নাড়ল। বেশ মা। বোন দুটিও বড় ভাল। এ রকম মা বোন তার ছিল না তো এতদিন! দিদিমা বড় কেঁদেছে ভুঁয়ে পড়ে। মামা স্টেশন পর্যন্ত শুকনো মুখে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসেনি। মনটা বড় খারাপ লাগে। আবার ভাবে, নতুন একটা জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে না জানি কত ফুর্তি হবে। কত খেলা!

৯

দিন ফুরোয়। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে। কানাই মাস্টার টিউশনিতে বেরোল। হেম আজ গেল রেবাকে নিয়ে সিনেমায়। অভয়পদ পরোটা খেয়ে পুজো কমিটির মিটিং-এ যাওয়ার সময় বলে গেল—মা, যাই। কালিদাসী শুনতে পেল না, সে তখন গোয়ালঘরে গরু দুটোর সঙ্গে রাজ্যের কথা ফেঁদে বসেছে।

দিনটা গেল, যেমন যায়।

Shahnaz

ঘরের পথ

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। মা গিয়েছিল পাহাড়ে পাতা কুড়োতে। কেউই আর ফিরল না।

আমাদের বাড়িটা ছিল মাটির। তাতে ফাটল ধরেছিল। যখন বাতাস বইত তখন সেই ফাটলের মুখে শিস দেওয়ার মতো শব্দ হত। যেন বাইরে থেকে কেউ ডাকছে। কখনও কখনও রাত্রিবেলা সেই শব্দে ভয় পেয়ে আমি মাকে জড়িয়ে ধরতাম, মা আমাকে। মাটির দাওয়ায় কিংবা দেওয়ালে অশ্বত্থ গাছের চারা দেখলেই মা আমাকে সেটি কেটে ফেলতে বলত। অশ্বত্থ চারা কাটতে কাটতে আমার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবসর পেলেই আমি দা হাতে অশ্বত্থ চারা খুঁজে বেড়াতাম।

ঘরের চালে ভাল খড় ছিল না। বর্ষাকালে জল পড়লে আমাদের ভিজতে হত। সারা ঘর যখন জলে থইথই করত তখন মা আমাকে আধখানা আঁচলের আড়ালে রেখে আমাদের আগের দিনের সুখের গল্প বলত। আমাকে আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল মার স্বভাব। শীতে কিংবা বর্ষায় কিংবা ঝড়ে আমি মার আঁচলের আড়ালে চাপা থাকতাম। আমার বাবার একটা বড় ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা কোনও কাজ করত না। আমি ঘাস কেটে এনে ওকে খাওয়াতাম। ঘোড়াটাকে বাবা খুব ভালবাসত। আমি বাবাকে দেখিনি। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। তারপর আর ফেরেনি। আমি বাবার ঘোড়াকে ভালবাসতাম। ওর গায়ের গন্ধে আমার বাবার কথা মনে পড়ত।

বাবা ফিরল না দেখে মা পাহাড়ে কাঠপাতা কুড়োতে যেত। আমাদের গাঁয়ের গরিব মানুষেরা সবাই কাঠ কুড়োত। মা তাদের সঙ্গে খুব ভোরে চলে যেত। ফিরত সন্ধেবেলায়, কখনও কখনও রাত্রি হত। যাওয়ার সময় মা বলত, সারাদিন ঘর পাহারা দিয়ো। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিয়ো। সন্ধেবেলায় শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটা আগুন জ্বেলে তার পাশে বসে থেকো। পাহাড় থেকে আগুনটি দেখতে পেলেই আমি বুঝব তুমি ভাল আছ, ঘরে আছ। তা হলেই আমার ভাবনা থাকবে না।

আমি সারাদিন ঘরে থাকতাম। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিতাম। আর সন্ধে হলেই শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটি মস্ত আগুন জ্বালতাম। আগুনের পাশে বসে দেখতাম দূরে বহু দূরে নীল পাহাড় দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁদিকে মস্ত মাঠের ওপাশে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পাহাড়টি মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যেত। তবু পাহাড়টি আমার চোখ থেকে কখনও হারিয়ে যায়নি। ছবির মতো হয়ে পাহাড়টা আমার চোখের ওপর স্থির থাকত। আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিবে আসত। পাহাড়টিকে আমার বড় ভয়। ওই পাহাড় পেরিয়ে আমার বাবা চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। মা কখন ফিরবে ভাবতে ভাবতে আমি কখনও কখনও ঘুমিয়ে পড়ে মা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখতাম।

কখনও কখনও মা আমাকে বাবার গল্প বলত। ওই পাহাড়ের ওপাশে অনেক নদী-নালা খাল-বিল পেরিয়ে বাবা বিদেশে গেছে। সেখানে যেতে হলে ক'টা নদী ক'টা পাহাড় পার হতে হয় মা জানে না। মা শুধু জানে, একদিন বাবা অনেক রোজগার করে ফিরে আসবে। তখন আমি নতুন জামা জুতো পরে একটা বাচ্চা ঘোড়ায় চড়ে বাবার বুড়ো ঘোড়াটার পাশে পাশে টগবগিয়ে কোথাও চলে যাব।

মা কখনও কখনও পাহাড়টাকে অভিশাপ দিত, ওটা গোটা পৃথিবীটাকে আড়াল করে বসে আছে বলে। আবার কাঠ-পাতা কুড়োতে ওই পাহাড়েই যেত।

একদিন মা আর ফিরল না। অনেকক্ষণ জ্বলে জ্বলে আগুনটা নিবল। দূরের নীচে পাহাড় মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হল। মা আর ফিরল না।

ভোর হতেই আমি মার খোঁজে বেরোলাম।

যারা কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরেছে, শুধু আমার মা বাদে। তাদের মধ্যে একজন বলল, তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। তুই ছিলি গলার কাঁটা, তাই তোকে ফেলে গেছে।

আমার বিশ্বাস হল না। ওরা হাসল প্রাণ খুলে। আমার পিঠে চওড়া হাতের চাপড় মেরে বলল, 'তার জন্য ভাবনা কি, তুইও তো জোয়ান মরদ হয়ে উঠবি দু-দিন বাদে। খেটে খেতে পারবি না? চিরকাল কি মায়ের আঁচলে-চাপা থাকে কেউ, না কি আমাদের তাই করলে চলে?'

মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে ভেবে সারা গাঁ পাতি পাতি করে খুঁজলাম। ওরা বলল, 'খুঁজে কী করবি! তার চেয়ে পাহাড়ে চল। পাতা কুড়োবি।'

আমি পাহাড়ে গেলাম। কিন্তু কাঠ-পাতা কুড়োতে মন গেল না।

ওরা বলল, 'তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। আয়, কাঠ কুড়োবি।'

আমি জেনেছিলাম যে আমি আছি বলেই মার সুখ। সুখ মানেই দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। আমি আছি বলেই মার সেই শক্তি আছে। অনেক বড় হয়ে জেনেছিলাম যে আমিই মার দুঃখ, আমি ছিলাম বলেই মা সুখের খোঁজে চলে যেতে পারছিল না। দুঃখ মানেই সুখের পথ আগলে যে দাঁড়ায়।

আমার বাবা গেল পাহাড়ের ওপারে, আমার মাও আর ফিরল না। রইল শুধু ঘোড়াটা। সেই ঘোড়াটাও বুড়ো হয়েছে। কাজকর্ম করতে পারে না। কখনও মাঠে চরতে যায়, বেশির ভাগ সময়েই ঘরে বসে ঝিমোয়। আমি ঘাস কেটে এনে খাওয়াই, জল দিই। যেমন বাপ বুড়ো হলে ছেলে তার কাজকর্ম করে। মাঝে মাঝে ওর প্রকাণ্ড বুড়ো মাথাটি আমার কাঁধে নামিয়ে রাখত। তখন ওর ঘন, গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। সে নিশ্বাসে ওর গায়ের চামড়া থরথর করে

Shahnaz

কাঁপত। ওর মুখে, চোয়ালে, ঘাড়ে শিরাগুলো থাকত ফুলে, ওর ভাঙাচোরা মুখটা ছিল গাছের কাণ্ডের মতো এবড়োখেবড়ো। ওর প্রকাণ্ড ঘাড়টা দু হাতে জড়িয়ে থেকে আমার মনে হত যেন বহুদিনের পুরনো একটা বটগাছ শাখাপ্রশাখা মেলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে।

একদিন ঘোড়াটিকে দেখে গাঁওবুড়ো বলল, 'ঘোড়াতে চেপে তোর বাপ বিয়ে করতে গিয়েছিল। ঘোড়াটি তোর বাপের মতন। ওকে যত্ন-আত্তি করিস!'

ঘোড়াটিকে নিয়ে ছিলাম মেতে। বাদবাকি সময়টা কাটত চুপচাপ দাওয়ায় বসে। সারা দিন বাতাস আমাদের ফাঁকা বাড়িটায় শিস দিয়ে খেলা করত। দেখতাম, গুড়মি শাকের জঙ্গলে চড়াই নেচে বেড়াচ্ছে, ধনে পাতার গন্ধে বাতাস ভারী, সরসর করে গাছের শুকনো পাতায় বাতাস বইছে। কুয়োর পারের ছোট্ট একটু গর্তে জমে থাকা জলে শালিক চান করছে জল ছিটিয়ে। ও চলে গেলে জলের কয়েকটা সরু রেখা থাকত মাটিতে, কয়েকটা পালক বাতাসে। আমার চকচকে দা'টাতে মরচে পড়ল। সারা বাড়িটায় অশ্বত্থ চারা উঠল গজিয়ে।

দিন কাটে। সন্ধে হলে পাতা জড়ো করে আগুন জেলে চুপ করে শুয়ে থাকি। আগুনটা মরে এলে তার নরম আঁচ অনেকটা মার শরীরের তাপের মতো মনে হয়। তাই কখনও ঘুম আসে শরীর অবশ করে দিয়ে।

যে দাই আমার নাড়ী কেটেছিল সে এসে একদিন বলল, 'এমনি করে কি না খেয়ে মরবি? তার চেয়ে আমার কাছে চল। আমার তো ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। দু'জনে বেশ থাকবি।'

'উহু। আমি রাতে স্বপ্ন দেখি বাবা ফিরে আসছে।'

'হ্যাঁ যেমন তোর মা মুখপুড়ী ফিরল। তা খাস কী?'

'শাকপাতা যখন যা হয়।'

বুড়ি গজগজ করে আমাকে বকতে বকতে চলে গেল।

তারপর থেকে দাইমার মেয়ে চন্দ্রা আমার জন্য ভাত আনত রোজ। ভাতের থালাটা মাটিতে রেখে বেড়ালের মতো খাপ পেতে আমার দিকে চেয়ে থাকত চন্দ্রা, যেন শহরের মানুষ দেখছে।

একদিন আমি বললাম, 'কী দেখছিস? কী দেখিস রোজ?'

ও বলল, তোকে। তুই একটা বুড়ো জানোয়ারের সঙ্গে থাকিস কেন?'

'ওকে আমি আমার বাপের মতো ভালবাসি।'

ও খিলখিল করে হাসল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে থামল। বলল, 'ভালবাসার আর লোক পেলি না। ওটা চড়ে তুই কোন দেশ জয় করতে যাবি?'

আমি ভাবলাম, যাব, একদিন যাব। পুবদিকে যাব—যে দিকে সূর্য ওঠে। একদিন আমি রাজা হয়ে ফিরব, দেখিস। আমি বললাম, 'জানি না রে।'

ও হাত তুলে আমাকে আমার ঘর দেখাল। বলল, 'ওই দেখ গাছের শেকড়গুলো সাপের মতো দেওয়ালের মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। তোর চারপাশের দেয়াল আর বেশিদিন থাকবে না; ধসে পড়বে। সময় থাকতে শত্তুরগুলোকে মুড়িয়ে কাট।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'ওরা আমার মায়ের মতো। কেটে ফেললে বাইরে থেকে ডালপালা দেখা যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে ওদের শেকড় থাকে।'

শুনে ও রাগ করে চলে গেল। বলে গেল, 'তোর মরণ এসেছে ঘনিয়ে। একদিন তুই দেয়ালচাপা হয়ে মরবি।'

আমি ভাবলাম, শেকড়গুলো গর্ত খুঁড়বে, আরও গভীর হবে। মনের দেয়ালে চিড় ধরবে, ফাটল হবে। তারপর একদিন চৌচির হয়ে ভাঙবে। সেদিন আমি আমার বুড়ো ঘোড়ায় চেপে পুবদিকে রওনা দেব। গাঁয়ের লোকেরা দেখবে আমার লাঠির আগায় বাঁধা পুটলিটা আস্তে আস্তে দূর থেকে দূরে পাকা ধানের ক্ষেতের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ওরা জানবে, আমি ফিরে আসব একদিন। রাজা হয়ে।

একদিন চন্দ্রা আমার ভাত নিয়ে এল না। ফাগনলালের ঘরের পাশ দিয়ে মৌরিক্ষেতের কিনারায় কিনারায় যে পথটা ধরে চন্দ্রা আসে, সেদিকে চেয়ে সারা দুপুর কাটল। চন্দ্রা এল না। তার পর দিনও না। চন্দ্রা এল না দেখে আমি উঠে খুঁজে-পেতে আমার পুরনো মরচে ধরা দা'টা বের করে পাথরে শান দিতে বসলাম।

সারাটা দুপুর পাথরে মুখ ঘষে দা'টা ঝকঝক করে হেসে উঠল, ওর গায়ে আগুন ছুটল। দা'য়ে শান দিয়ে দিয়ে আমার হাতপায়ের মাংসগুলো ফুলে উঠল, শিরায় শিরায় গরম রক্ত ছুটল টগবগিয়ে। কেমন যেন খুশি লাগল, নেশা পেল।

ভেবেছিলাম সূর্য ডোবার আগেই অশ্বত্থের চারাগুলো কেটে ফেলব। এমন সময় চন্দ্রা এল হাতে ভাতের থালা নিয়ে। রোজ যেমন আসত।

আমি বললাম, 'এতদিন আসিসনি কেন?'

ও গম্ভীর হয়ে বলে, 'একটা বাঘ রোজ আমার পথ আগলে থাকে। বলে, কোথায় যাচ্ছিস? থালা নামিয়ে রাখ আমার সামনে আর বসে বসে আমার লেজে হাত বুলিয়ে দে। নইলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাব। রোজ এমনি করে বাঘটা তোর ভাত খেয়ে ফেলে।'

আমি বললাম, জানি। এ গল্প আমি মার কাছে শুনেছি। এক বুড়ি রোজ তার ছেলের কাছে খাবার নিয়ে যেত, আর পথ আগলে থাকত বাঘ।'

'হ্যাঁ, শুনেছিস। তাতে কী? এমন বুঝি হয় না?'

আমি ভেবেছিলাম, বড় হয়ে আমি বাঘটাকে মেরে ফেলব, খিদেকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই, তেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। পথ আগলে যেই থাকবে তাকে সাফ করে দাও।

চন্দ্রা খিলখিল করে হাসল মুখ আঁচল দিয়ে। বলল, 'তুই বাঘটাকে মারবি, না ওর লেজে হাত বুলিয়ে দিবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

ও বলল, 'মা দেখছিল, তুই খিদের জ্বালায় আমাদের বাড়ি যাস কিনা। মা তোকে যাচাই করছিল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মা বলেছে তুই মানুষ নয়। তোর বাপটা ছিল এমনি গোঁয়ার, তাই একমুখো চলে গেছে। ঘরের পথ ফিরে চিনল না। তুইও যাবি, যাবি। কাঁদতে কাঁদতে মা ভাত বেড়ে দিল।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে চন্দ্রা বলল, 'কিন্তু আমি জানি তুই যাবি না।'

এই বলে ও চলে গেল। আমি আমার দা'টা হাতে নিলাম। এক এক কোপে অশ্বত্থের মোটা মোটা ডালগুলো খসে পড়তে লাগল। আমার শরীর গরম হল, ছলাৎ-ছল করে রক্ত বইল শিরায় শিরায়। আমি আপন মনে হাসতে লাগলাম। শীতকালে আমাদের বুড়ো ঘোড়াটার গা থেকে ধোঁয়ার মতো একটা ভাপ বেরোত। সেই ভাপে ওর রক্তমাংস আর ঘামের গন্ধ পাওয়া যেত। নিজের শরীর থেকে আমি তেমনি এক গন্ধ পেলাম। মদের যেমন স্বাদ নেই, এ গন্ধেরও তেমন ভালমন্দ নেই। এ শুধু আমাকে মাতাল করে। আমি আপন মনে হাসলাম। যেন আমার নেশা

Shahnaz

হল। আমার ইচ্ছে হল নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করি। মাটির দাওয়ায় আমি শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম। আমার শরীরের ঘাম মাটির সঙ্গে মিশল। শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে আমার কাছে এক বাঁশিওয়ালা এল। তখন বাতাসে টান লেগেছে। শুকনো পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে ঝরে শেষ হয়েছে। ক্ষেতে মটর শাকে পাক ধরল। যারা শুকনো কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত তাদের দিন গেল।

এমনি একদিন শেষ দুপুরে অনেক দূর থেকে বাঁশিওয়ালা এসে আমার দাওয়ায় বসল। তার গায়ে একশো রঙের একশো তালি দেওয়া একটা জোব্বা, মাথায় একটা মস্ত পাগড়ি। সেই পাগড়িটা তার কপালটিকে ঢেকে ফেলছে। রোগা দুটো পা রাঙা ধুলোয় মাখা। আমি কখনও এই বাঁশিওয়ালাকে দেখিনি।

সে বলল, 'আমি বাঁশি বিক্রি করিনি। বাঁশির সুর বিক্রি করি।' এই বলে সে তার বাঁশিতে একটা অদ্ভুত সুর বাজাল।

আমি বললাম, 'বাঁশিতে তুমি ওটা কী সুর বাজালে? আমি তার কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না।'

বাঁশিওয়ালা তার ঘন ভ্রূর নীচে গভীর গর্তের মতো চোখ দুটো দিয়ে আমায় দেখল। বলল 'এ সুর আমি কোথাও শিখিনি বাবা, কেউ আমাকে শেখায়নি। আমার কোনও গুরু নেই। আমি হাটে মাঠে ঘাটে যা শুনি তাই বাজিয়ে বেড়াই। কখনও নোঙর-করা নৌকোয় জলের ঢেউ লাগবার সুর, কখনও শীতের শুকনো পাতায় বাতাস লাগবার সুর।'

সে আবার তার বাঁশিতে ফুঁ দিল। শেষে শীতের শুকনো বাতাসে বাঁশির টান লাগল। কয়েকটা সুর তীরের মতো আকাশে ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে দুপুরটা মাতালের মতো টলতে লাগল। যেন অনেক দূর পথ! আমাদের এই মৌরি ক্ষেত ডিঙিয়ে ধানের আবাদের পাশ দিয়ে পাহাড় পেরিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কত গঞ্জ, কত ব্যাপারীর আস্তানা, কত বন্দর, ঘাট মাঠ পেরিয়ে যাওয়া দেশ। বাঁশির সুর সেই দূর দুরান্তের আভাস মাত্র নিয়ে কোকিলের অস্পষ্ট ডাকের মতো নরম, বিষণ্ণ হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। সেই পথ ধরে, অনেক আলো, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন আসছে— আসছে—আসছে।

বড় ক্লান্ত পথ! বড় দীর্ঘ পথ! আমি চোখ বুজে ভাবলাম, সে আমার বাবা। কত দিন গেল, কত রাত গেল। ঘোড়াটি বুড়ো হল। বাবা আর ফিরল না।

বাঁশিওয়ালা সুর পাল্টে নতুন সুর ধরল। কখন আমার চোখ ছাপিয়ে কান্না এসেছে। এ কেমন সুর যা দিনের আলোকে অন্ধকার করে দেয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'এর মানে কী? আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

বাঁশিওয়ালা থামল না।

যেন এতদিন মাঠটা ছিল রোদে পোড়া, ফাটা ফাটা। একদিন পাহাড়ে মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল। অঝোর ধারে বৃষ্টি। মাটির কোষে কোষে জল ঢুকল। বীজধান ফুলে উঠল। বুক ফাটিয়ে শীষ বার করল আকাশে।

বাঁশিওয়ালা থামল। বলল, 'এর অর্থ যেমন করে কুঁড়ি থেকে ফুল হয় আস্তে আস্তে, তোমার চোখের আড়ালে অন্ধকারে যেমন করে আস্তে আস্তে পাপড়িগুলো মেলে দেয়, যেমন করে শুকনো পাতা ঝরে পড়ে আবার নতুন পাতায় ছেয়ে যায় গাছ—তেমনি করে তোমার দেহেও একটা ঋতু আসে আর একটা যায়।'

এই বলে বাঁশিওয়ালা আবার তার বাঁশিতে সুর দিল। যেন বলল, বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ করো না। এক-একটি ঋতু যায়, আর একটি আসে। দুঃখকে সহ্য করো। ক্ষেতে আগুন লাগলে ফসল ভাল হয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'এ সুর তুমি কোথায় পেলে?'

সে দাঁড়িয়ে উঠে হাসল।

আমি বললাম, 'আমাকে এ সুর শিখিয়ে দাও। আমি তোমার মতো জোব্বা পরে বাঁশি বাজিয়ে বেড়াব।'

বাঁশিওয়ালা ফিরে বলল, 'তুমি আমাকে অবাক করলে বাবা, এ জোব্বা কি তোমাকে মানায়! আমি যেখানে যখন যেমন পেয়েছি তেমন কুড়িয়ে ঘুড়িয়ে এই কাপড়ের টুকরোগুলো জুড়ে সেলাই করে জোব্বা বানিয়েছি। যারা সুখে আছে এ জোব্বা তারা সাধ করে পরে না। আমার মনে রং নেই, তাই বাইরে এত রঙের বাহার।'

বাঁশিওয়ালা চলতে লাগল, আমি দেখলাম শীতের ঘন রোদে রোগা দুটো পায়ে রাঙা ধুলো মেখে সে আস্তে আস্তে আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ডাকছে না। শেষ শীতের গরম দুপুরে সেই অদ্ভুত বাঁশিওয়ালা আর তার সুর দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাবলাম, এ সুর তুমি কোথায় পেলে বাঁশিওয়ালা? আমার সারাটা দিন যেন টালমাটাল-টালমাটাল। যেন আমি বিনিমদের মাতাল। যেন আমি এক পাগল বাঁশিওয়ালা। শিরা ছিঁড়ে সুর তৈরি করে—সে সুরে আমি সারাদিন গাই। কাঁদি। কেন বাঁশিওয়ালা আমাকে দিল সারাদিন বাজাবার এই বাঁশি? আমি যে একে তাড়তে পারি না। এ যে আগুনে দিলে পোড়ে না, ঝড়ে ওড়ে না। পোষা কবুতরের মতো নড়ে-চড়ে ঘুরে বেড়ায়। উড়ে যায় না।

উঁচু-নিচু পথ। পাথর ছড়ানো। চড়াই উৎরাই ভেঙে বাঁশিওয়ালা চলেছে। শুকনো হাওয়ায় তার চামড়া ফেটেছে, পাথরে তার পা ফেটেছে। তবু তার চলবার শেষ নেই। সে পুব থেকে পশ্চিমে গেল। যেদিকে সূর্য ওঠে সেদিক থেকে যেদিকে সূর্য ডোবে সেদিকে গেল, যে পথে আমার বাবা গেছে তার বুড়ো ঘোড়া রেখে, যেদিকে মা গেছে আগুনের পাশে তার ছেলেকে বসিয়ে রেখে।

বুড়ো ঘোড়টার জন্য দুঃখ কোরো না। ক্ষেতে আগুন দিলে ফসল ভাল হয়। মাটির কোষে কোষে বৃষ্টির জল ঢুকবে, বীজধান কেঁচোর মতো ফুলবে, বুক ফাটিয়ে শীষ বের করে আকাশে। আমি জানি বাঁশিওয়ালা আর ফিরবে না। কোনওদিন না। দাওয়ায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন আমার দিন গেল।

একদিন সকালে ঘোড়াটাকে দেখে মনে হল আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমার সামনেই বুড়ো ঘোড়াটা কখন যেন আরও একটু বুড়ো হয়ে গেছে। ওর গায়ে হেলান দিয়ে আমি আমার মাকে ভাবলাম। কিন্তু মার মুখ আমার মনে এল না। রোদ লেগে ঘাসের বুক থেকে শিশির যেমন ভাপ হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মার মুখটা হারিয়ে গেছে। শাড়ির আঁচল, পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা শান্ত ছায়ায় ডাকা দিঘির মতো সেই চোখ আমি আগের জন্মে দেখেছিলাম।

গাঁওবুড়ো আমায় দেখে চোখ কুঁচকে বলল, 'তুই যে আড়েদিঘে মতো পুরুষমানুষ

Shahnaz

হয়ে উঠলি! কখন এত ঢ্যাঙা হয়ে উঠলি, বেড়ে উঠলি আমাদের চোখে সামনে, টেরও পেলাম না।'

আমি লজ্জা পেলাম।

গাঁওবুড়ো বলল, 'তোর গড়নপেটন হয়েছে তোর বাবার মতন, চোখ দুটো পেয়েছিস মার। তা এবার তো জোয়ান হলি, কাজকর্মে লেগে যা। বসে থাকিস না। দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস, ঘর সামলে রাখিস।'

আমি ভাবলাম গাঁওবুড়োকে বাঁশিওয়ালার কথা বলব।

আমার চোখের দিকে চেয়ে গাঁওবুড়ো হাসল, 'জানি রে জানি, তোর কাছে এক বাঁশিওয়ালা এসেছিল। সে মাত্র একবারই আসে। মাত্র একবার।' গাঁওবুড়ো তার নড়বড়ে মাথাটা দোলাল, 'তাই তো বলছি দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বসে থাকিস না। ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। ঘরদোর সামলে রাখিস।'

চন্দ্রা এসে বলল, 'তুই নাকি পয়সা দিয়ে বাঁশির সুর কিনেছিস?'

আমি বলি, 'হু।'

চন্দ্রা আমার কাছে এসে বসল, 'পাখি কিনেছিস, আর খাঁচা কিনিসনি? সুর কিনেছিস আর বাঁশি কিনিসনি? তবে তোর ঘরে রইল কী, তোর নিজের বলতে থাকল কী? কিনতে হয় এমন জিনিস কিনবি যা হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া যায় চোখ দিয়ে দেখা যায়, যাকে ধরে ছুঁয়ে দেখে মনের সুখ, ভাল না লাগলে যাকে বেচে দিয়ে আবার পয়সা পাওয়া যায়।'

এই বলে ও হাসল। বলল, 'আমি আর কতকাল তোর জন্য ভাত বয়ে আনব? তোরই তো ভাত দেওয়ার বয়স হল। তুই কাজকর্ম করবি, না সারা দিন দাওয়ায় বসে হাঁ করে আকাশ গিলবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

'গাঁওবুড়ো বলছিল ঘরে মেয়ে না দিলে জোয়ানগুলো কাজকর্মে মন দেয় না।'

এই বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ওর বাসন্তী রঙের ডুরে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়তে উড়তে ফাগনলালের দাওয়া পেরিয়ে মৌরিক্ষেতের পাশ দিয়ে ওর শরীরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল। খুব পাতলা বুটিদার একটা মেঘ রোদের মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। সেই ছায়াটা একটু সময়ের জন্য ওর মুখের ওপর থাকল। বাতাস ওর চারদিকে একটু খেলা করল। ওর চারপাশে উড়ে বেড়াতে লাগল কয়েকটা মৌমাছি।

আমি বাঁশির সুর কিনেছি বলে গাঁয়ের বুড়োরা আমার নিন্দে করল। দুঃখ করে বলল, আমার ঘরে কিছুই থাকবে না। যেমন করে আমার বাবা থাকল না, মা থাকল না। গাঁয়ের জোয়ান মরদরা এসে আমায় পিঠ চাপড়ে গেল! এই তো চাই। বাঁশির সুর কিনবি, পাখির ডিম কিনবি। যেমন করে পারিস উড়িয়ে দিবি রোজগারের টাকা। আমরা জোয়ান মরদ, আমাদের রোজগারের ভাবনা কি? দেখছিস না বুড়োগুলোর দশা, দু'আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুরো আয়ুটা খরচ হয়ে গেল। ওরা আমাদের বেহিসেবী বলে। কিন্তু সামনের শীতে ওরা যখন মরবে তখন তো আমরাই থাকব। এই শুনে আমি বুড়ো ঘোড়াটার কাছে গেলাম। ও আমার কাঁধে ওর প্রকাণ্ড মাথাটা রাখল।

কখন আমার শরীর দীঘল হয়েছে, হাত পা কোমর হয়েছে সরু, আমার চামড়ায় টান

লেগেছে, রুক্ষ হয়েছে মুখ তা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ও যেন টের পেল। আমার কাঁধে মুখ ঘষে শরীর কাঁপিয়ে ওর খুসি জানাল। ওর গাছের কাণ্ডের মতো এবড়ো-খেবড়ো মুখে আমার গাল রাখলাম। রেশমের মতো কেশর আমার হাতে খেলা করল। আমি বললাম, 'বুড়ো, তুই আমার বাপ। কোনও ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।'

এই শুনে পাঁজর কাঁপিয়ে ও নিশ্বাস ছাড়ল। ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে বলে দুঃখ কোরো না। ও বুড়ো হচ্ছে তার মানে তুমি বড় হয়েছ। কবে শীত আসবে তার জন্য দুঃখ করে দিনগুলোকে চলে যেতে দিয়ো না। মনে রেখো, দু' আঙুলের ফাঁক দিয়ে স্রোতের জল বয়ে যায়। আটকানো যায় না। সামনের শীতে ঘোড়াটা যদি মরে, তুমি থাকবে।

'বুড়ো, তুই আমার বাপ।' আমি বললাম, 'কোন ভাবনা করিস না বুড়ো, আমি তোকে দেখব।'

ঘোড়াটা পুরনো ঠাণ্ডা শরীর দিয়ে আমার শরীর থেকে তাপ নিল। আমি দু হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে চোখ বুজে রইলাম। যেন আমি পুরনো প্রকাণ্ড একটা বটগাছের আশ্রয়ে আছি।

চন্দ্রা এসে বলল, 'সারা দিন ঘরে বসে কী বকিস একা একা?'

আমি শান্তভাবে ওর দিকে তাকালাম। ওর শরীর ঘামে ভিজে তেল-তেল করছে। দু'চোখে মিটিমিটে আলো। এ কেমন আলো? আমি কোনওদিন এমন আলো দেখিনি। ওর শরীর থেকে কেমন একটা মাতাল মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম বোধহয় কোনও ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। এ কেমন ফুল? জানি না। কেমন তার রং? জানি না।

ও আমার হাত টেনে বলল, 'চল, তোকে আজ একটা নতুন জিনিস দেখাব।'

'কী জিনিস?'

ও ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'সে একটা রাজার বাড়ি। খুব অদ্ভুত।'

'কোথায় সেটা?'

ও হাসল, 'আছে আছে। তোর খুব কাছেই। আছে। অথচ তুই দেখিসনি।'

চন্দ্রা ওর বুকের কাপড় সরিয়ে নিল। তারপর কাপড়টা ওকে একা রেখে মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখে হাত চেপে ও বলল, 'এ এমন রাজা যে দখল নেয় না, দখল ছাড়েও না। আমি সারাদিন সব কাজ ফেলে তার বাড়ি পাহারা দেব কেন?'

ওর বেলেমাটির মতো শরীরের দিকে চেয়ে আমি ভয় পেলাম।

চোখে হাত চেপে ও কাঁদছিল, 'আমার সারা দিনের কাজ পড়ে থাকে। আনমনে আমার বেলা বয়ে যায়। তোর বাঁশিওয়ালা কি তোকে এ কথা বলেনি?'

সেই অচেনা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। এ কেমন ফুল জানি না। কেমন তার গন্ধ জানি না। আমার বুক ফেটে কান্না এল। আমি ভেবেছিলাম, যে বাঘটি রোজ পথ আগলে থাকে, বড় হয়ে তাকে মেরে ফেলব। কিন্তু কটা বাঘকে মারব আমি? গাঁওবুড়ো বলেছিল, ঘরদোর সামলে রাখিস। গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল বাঁশির সুর কিনিস না।

চন্দ্রা দু'হাতে আমার মাথাটা টেনে নিল। বলল, 'আমি তোকে কতক বুঝি কতক বুঝি না।'

ওর বুক, ছিঁড়ে-নেওয়া ফুলের বোঁটার মতো আমরা কপালে, চোখের পাতায় নরম হয়ে লেগে লেগে মুছে গেল।

Shahnaz

ও বলল, 'একদিন তুই পাহাড়ে যাবি কাঠ কুড়োতে। সেদিন আমি তোর ঘর পাহারা দেব। পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালব বাইরে, যেন তুই পাহাড় থেকে দেখতে পাস।'

বাঁশিওয়ালা তার প্রথম সুরে বলেছিল, ঘর বলতে তোর কোনও কিছুই নেই। কোনওদিন ছিল না। বৃথাই তুই সারা বিকেল আগুন জ্বেলে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলি। যারা পাহাড়ের ওপারে গেছে তারা আর ফিরবে না। আমি কাঁদতে লাগলাম।

চন্দ্রা কেঁদে কেঁদে বলল, 'তুই যদি আমাকে ছেড়ে না যাস, আমিও যাব না। আমরা ঘর বাঁধব।'

ওর চোখের জলে আমার মাথা ভিজল। আমি ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। চুমু খেল আমার ঠোঁটে। জন্মের পর আমরা যেমন ছিলাম তেমনি হয়ে শুয়ে রইলাম।

বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার বুড়ো ঘোড়াটা আরও বুড়ো হয়েছে। কুটকুট করে সারাদিন ঘাস খায়, কখনও ঝিমোয়।

বাতাসে গরম হলকা ছুটল। বুড়োরা বলল, 'এইবার আকাল এল। ঘাট শুকোবে, মাঠ ফাটবে। সেই বর্ষা যতদিন না আসছে।'

কাছাকাছি মাঠের ঘাসগুলো হলদে হয়ে এল। তাই আমি একদিন বুড়ো ঘোড়াটাকে দূরের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। সন্ধেবেলা ও নিজেই খুটকুট করে ঘরে ফিরতে লাগল। কিন্তু একদিন ও ফিরল না। সারা সন্ধে আমি দাওয়ায় বসে রইলাম পথের দিকে চেয়ে। দূরের পাহাড় ঝাপসা হয়ে এল। ও এল না। আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় বান ডাকল দিগন্ত জুড়ে। কিন্তু পেটের নীচে নিজের বাঁকাচোরা বুড়ো ছায়াটা নিয়ে টুকঠুক করে ও ফিরল না। অনেক ভেবে আমি হাতে দড়ির ফাঁস নিলাম। তারপর পথে নামলাম। মনে মনে বললাম : যখন আমি ছোট ছিলাম তখন কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বুড়ো, তোকে আমি চলে যেতে দেব না। আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। চলতে চলতে আমি ধানক্ষেত ছাড়িয়ে, মরা মটর শাকের পাশ দিয়ে, বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান পেরিয়ে গেলাম। তারপর দিগন্ত জোড়া মাঠ। মাঠে বান-ডাকা সমুদ্রের মতো টলমল করছে জ্যোৎস্না। কিন্তু তার কোথাও আমার বুড়োর ছায়া নেই।

আমি পাগলের মতো সারা মাঠ বুড়োকে খুঁজতে লাগলাম। আমার ভাঙা গলার ডাক আমাকে ঘিরেই ঘুরতে লাগল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'বুড়ো, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব।'

আমি মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আমার চারধারে ঘন গাছ। আলো আর ছায়ার মধ্যে আমি হাঁটতে লাগলাম। তারপর আমি ভয় পেলাম। আমার মনে হল কেউ যেন আছে। কাছেই—পাশেই। মৃত শুকনো পাতাগুলোতে শব্দ হল। মনে হল, যেন কোনও আত্মা আমার পিছু নিয়েছে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। যেন সেই আত্মা আমার হাত ধরল, তারপর আমাকে চেনা পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলল কোথাও। আমি ভাঙা গলায় বুড়োকে ডাকতে লাগলাম। বন পার হয়ে আমি একটা জলার ধারে এলাম। তাকিয়ে দেখলাম, আমি এর আগে কখনও এখানে আসিনি। এত জ্যোৎস্না আমি কোনওদিন দেখিনি। জলাটা মস্ত বড়। তার ওপাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও যেন কিছু দেখছে। আমি ডাকলাম, 'বুড়ো, বুড়ো!'

ও শুনল না। তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম, ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, 'বুড়ো, তোকে আমি পেয়েছি।'

ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখাল। তারপর ভয় পেয়ে ও সরে গেল। আমি বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারল না। আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ও চিৎকার করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। ওর ছায়াটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর টাল খেতে লাগল। আমি ওর পিছনে ছুটলাম। প্রাণপণে ওকে ডাকলাম। সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার মধ্যেও বুড়ো আমাকে চিনতে পারল না। আমি দড়ির ফাঁসটা মুঠো করে ধরলাম। তারপর শেষবারের মতো ওকে ডাকলাম। ও শুনল না। কাকে যেন ও দেখতে পেয়েছে। কে যেন ওকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি ফাঁসটা ছুড়ে দিলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাতধরা দড়িটা থরথর করে কাঁপল। আমি বুঝলাম ফাঁসটা ওর গলায় পড়েছে।

আমি বললাম, 'বুড়ো আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।'

আমি কাছে এগোতেই বুড়ো চিৎকার করে ছুটতে চাইল। ফাঁসের দড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বুড়ো দড়িটা ছিঁড়ে চলে যেতে চাইল। আমি দড়িটা ছাড়লাম না। বললাম, 'বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।'

ও চিৎকার করে বারবার যেন আমাকে অভিশাপ দিল। আমি বললাম, 'বুড়ো, আমি শেষপর্যন্ত লড়াই দেব।'

বুড়ো শুনল না। ছেড়ে যেতে চাইল। আমি ধরে রইলাম।

কিন্তু বুড়োকে একসময়ে থামতে হল। চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ফাঁসটা ওর গলায় আটকে গেছে। ও দম নিতে পারছে না। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, 'বুড়ো, তোকে আমি যেতে দেব না। আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দিয়েছি।

এই বলে আমি ওর গলার ফাঁসটা খুলতে চাইলাম। কিন্তু ফাঁসটা খুলল না। নিচু হয়ে দেখলাম দাড়ির গায়ে ছোট্ট একটা গিঁটে ফাঁসটা আটকে গেছে, গভীর হয়ে বসেছে বুড়োর গলায়।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম। কপালে বিনবিনে ঘাম ফুটল। কিন্তু ফাঁসটা নড়ল না। বুড়ো ছটফট করতে লাগল। আমি দড়িতে দাঁত দিলাম। দড়িটা লোহার মতো বসেছে। আমার গলার রগ ফুলল, রক্তে ভরে গেল সারাটা মুখ। বুড়ো আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এল। আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'বুড়ো, আমি ফাঁসটা খুলব, খুলব।'

বুড়ো আমার দিকে তাকাল। আমার পা থেকে পিতৃহত্যার সমস্ত পাপ মুছে নিতে চাইল। তারপর সেই ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার ভেতর ওর দুটো চোখ ঘোলা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'বুড়ো, এই ফাঁসটা দিয়ে আমি তোকে ধরতে চেয়েছিলাম।'

আমি দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। ভাবলাম—আমার হাত দিয়ে কে তোকে মেরেছে আমি তা জানি না। জানি না।

Shahnaz

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে রোজগার করতে। আমার মা গিয়েছিল পাহাড়ে পাতা কুড়োতে। আমাদের ঘোড়াটা গিয়েছিল জলার ধারে, ঘাস খেতে। কেউই আর ফিরল না।

গাঁওবুড়ো একদিন সবাইকে ডেকে বলল, 'শোনো তোমাদের এক গল্প বলি। গাছের তলায় ধুনি জ্বেলে একটা সাধু বসে থাকত। তাকে মস্ত বড় সাধু ভেবে গৃহস্থরা তার চারধারে হাতজোড় করে থাকত। একদিন একটা লোক এসে বলল, সাধুবাবা, আমার ইচ্ছে তোমাকে কিছু খাওয়াই। সাধু রাজি হল। লোকটি কিছু রুটি কিনে আনাল। তারপর আবার বলল, সাধুবাবা, তুমি এই শুকনো রুটি কী করে খাবে? তোমার লোটাটা দাও, দুধ নিয়ে আসি। সাধু খুশি হয়ে লোটা দিল। লোটা নিয়ে লোকটা সেই যে চলে গেল আর ফিরল না।'

সবাই বলল, তারপর?'

গাঁওবুড়ো বলল, তারপর লোটার শোকে সাধুর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সে কি কান্না। সবাইকে ডেকে ডেকে বলল, 'দেখ দেখ, চোট্টার কাণ্ড দেখ, আমাকে এক পোড়া রুটি খাইয়ে আমার রুপোর লোটাটা নিয়ে ভেগেছে।'

সবাই বলল, 'তারপর?'

গাঁওবুড়ো হাসল, 'যার লোটা চুরি যায় সে বোকা। কিন্তু সেই লোটার শোকে যে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে সে আরও বোকা।'

এই বলে শীত আসবার আগেই গাঁওবুড়ো মরে গেল। গাঁয়ের বুড়োরা জমায়েত হয়ে বলল, 'জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম। ঠিক যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ। চলতে চলতে পড়ে যাওয়া, আবার ওঠা। কে যেন আমাদের নিয়ে দিনরাত এই খেলা খেলছে। এ খেলার শেষ নেই।'

শীত আসছে শুনে বুড়োরা ভয় পেল। বলল, 'এবার ঘর ছাড়তে হবে।'

কেউ বলল, 'ঘর আর কোথায়! ওই তো নড়বড়ে পাতার ছাউনি, রোদ মানে না, জল মানে না।'

বুড়ো ঘোড়ার মতো খুট খুট করে শীত এল। তারপর বুড়োদের কাঁধে মাথা রেখে তাদের দেহ থেকে তাপ শুষে নিতে লাগল। বুড়োরা পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালল। গোল হয়ে ঘিরে বসল। তারপর প্রাণপণে বলতে লাগল, 'কে যেন জন্মের পর স্রোতে ভাসিয়েছিল! তাই চেয়ে দেখলাম মাথার ওপর ছাদ নেই, চারিদিকের দেয়াল নেই।'

কেউ বলল, 'অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলছিলাম কোনও ভিন-গাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে। তারপর অন্ধকার হল যারা ছিল সাথের সাথী তাদের মুখ দেখা যায় না, পাশে কে চলছে জানা যায় না। অন্ধকারকে গাল পাড়ি, কিন্তু ঠাহর করে দেখলে এ অন্ধকারও সুন্দর।'

কেউ বলল, 'যাব আর কোথায়, সেই ফিরে আসতেই হয়। অণু অণু হয়ে আমি বাতাসে মাটিতে মিশব। কিন্তু দেখো, তারপর একদিন পাহাড়ে মেঘ জমবে, বৃষ্টি আসবে, বাতাস ভিজবে, মাটির কোষে কোষে ঢুকবে জল। তখন আমি ফুল হয়ে ফুটব, নদীর জল হয়ে বয়ে যাব, বাতাস হয়ে খেলব, মেঘ হয়ে ভাসব।' এইসব শুনে গায়ের জোয়ানগুলো হাসল।

তাই আমি চন্দ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম।

আমার মা বলেছিল, 'বাইরে একটি আগুন জ্বেলে রেখো। পাহাড় থেকে আমি যেন দেখতে পাই তুমি ঘরে আছ, তুমি ভাল আছ। ঘর সামলে রেখো, কোথাও যেয়ো না।'

দাইমা বলেছিল : আমার কাছে চল। আমার ছেলে নেই, তোকে ছেলের মতো পালব।

বাঁশিওয়ালা বলেছিল : বৃষ্টির জল লেগে বীজধান ফুলবে। বুক ফাটিয়ে শীষ বের করবে আকাশে। বড় ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। একটা ঋতু আসে আর একটা যায়।

গাঁওবুড়ো বলেছিল : ঘরদোর সামলে রাখিস। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। মনে রাখিস বাঁশিওয়ালা মাত্র একবার আসে।

গাঁয়ের বড়রা বলেছিল : বাঁশির সুর কিনিস না। তা হলে তোর ঘরে কিছুই থাকবে না।

আমি বলেছিলাম : বুড়ো, তুই আমার বাপ। ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।

আমি আগুন জ্বেলেছিলাম। ঘর আগলে ছিলাম। তবু কেন যে আমার বাবা গেল বিদেশে, রোজগার করতে! আমার মা গেল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে! আমার ঘোড়াটা গেল জলার ধারে, ঘাস খেতে।

Shahnaz

ট্যাংকি সাফ

ট্যাংকি সাফ করতে ষাট চেয়েছিল মাগন। চল্লিশ টাকায় রফা হয়েছে। তো মাগন সেপটিক ট্যাংকির লোহার চাক্কি কোদাল মেরে খুলে বুরবকের মতো চেয়ে রইল। আই বাপ! হাউস ফুল!

হাউস ফুল না হলে ট্যাংকি সাফ করায় কোন আহাম্মক? কিন্তু মুশকিল হল, মাগনের আজ কোনও পার্টনার নেই। কাল হোলি গেছে, আজ রবিবার, মরদরা আজও সব ঢলাঢল জমি ধরে নিয়ে পড়ে আছে। এ বাত ঠিক যে মুর্দার কানে কানে টাকার কথা বললে মুর্দাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু মাতালরা তো মুর্দা নয়। আর তাদের উঠিয়েও কোনও লাভ নেই। টাকার লোভে কেউ হয়তো গাদা সাফ করতে এসে ট্যাংকির মধ্যে পড়ে গজব হয়ে যাবে।

প্রথম ট্যাংকিতে ময়লা, দু-নম্বরে জল, তিন নম্বরেও জল। তিন নম্বরে পয়লা বালতি মেরে গান্ধা জল তুলে ড্রেনে ঝপাং করে ফেলে মাগন আপনমনে বলে—আই বাপ! হাউস ফুল! চালিশ টাকার তো স্রিফ পাসীনা চলে যাবে। ফিন ভিটামিন উটামিন দিবে কৌন?

বারান্দা থেকে দত্তবাবু দেখছেন, হেঁকে বললেন—কী বলছিস রে ব্যাটা?

মাগন ঝপাং করে দুসরা বালতি মেরে মুখ তুলে এক গাল হেসে বলে—একটা বাংলা সাবুনের দাম দিবেন তো বড়বাবু? আর চায় পীনেকো পয়সা! আউর হোলির বখশিশ।

—ব্যাটা নাত-জামাই এলেন।

—এমন সাফ করে দিব না বড়বাবু। একদম বেডরুম।

—বকবক করিস না, হাত চালা। বেলা ভর তোর কাজ দেখতে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

তিন নম্বর বালতি মেরে মাগন বলে—গিয়ে আরাম করুন না, কুছ দেখতে হবে না। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

দত্তবাবু স্টেটসম্যানটা খুলে পড়তে গিয়ে দেখলেন প্লাস পাওয়ারের দশমাটা চোখে নেই। চেঁচিয়ে বললেন,—মুনমুন, আমার পড়ার দশমাটা দিয়ে যা তো।

বলে কাগজের বড় হেডিংগুলো দেখতে লাগলেন। মন দিতে পারলেন না। চল্লিশ টাকার

কাজ হচ্ছে সামনে। দু ঘণ্টা বড় জোর তিন ঘণ্টা কাজ করে ব্যাটা চল্লিশ চাক্কি ঝাঁক দিয়ে নিয়ে যাবে। রোজ একটা করে সেপটিক ট্যাংক যদি সাফ করে তবে মাসে কত রোজগার হয়?

ভাবতে গিয়ে ফোঁস করে একটা শ্বাস বেরিয়ে গেল। বারোশো টাকা!

দত্তবাবু খুব জোর হেঁকে বললেন—জোরসে চালা! জোরসে!

ট্যাংকির ভিতরে বক বক করছে জল। গহীন গান্ধা জল। ঝপাঝপ বালতি মারে মাগন আর বলে—চালাচ্ছে বাবা। বহুৎ গান্ধা বাবা, বহুৎ কাদো। চালিশ রুপিয়া স্রিফ পাসীনা মে গিয়া বাবা। ভিটামিন দিবে কৌন?

২

মুনমুন সাজছে। সময় নেই।

ক'দিন আগেও চুলের গুছির গোড়ায় একটা গার্ডার বেঁধে বেরিয়ে পড়তে পারত। আজকাল আর তার জো নেই। মাধবপুরের জল এত খারাপ যে গত দু-বছরেই চুল উঠে উঠে এই কটা হয়ে গেছে। এখন মাথায় হাত বোলালেও চুল উঠে আসে, একবার চিরুনি চালিয়ে আনলে উঠে আসা চুলের গোছা দিয়ে দড়ি পাকানো যায়। এখন বব করেছে। তবু চুলের পিছনে খাটতে কম হয় না। শুধু চুল? গায়ের রং মেটে হয়ে গেল। যে দেখে সে-ই বলে—ইস। কী কালো হয়ে গেছিস! কতবার বলেছে বাবাকে, এবার যাদবপুর ছাড়ো। আর নয়, এর পর মাথায় টাক পড়বে, গায়ের রং হয়ে যাবে টেলিফোনের মতো। পাত্রপক্ষ দেখতে এলে ভুল করে বলে উঠবে, হ্যালো!

সময় নেই। শুধু শাড়িটা পরা বাকি।

—ব্লাউজের হুকগুলো লাগিয়ে দিবি লক্ষ্মীটি? বলতে বলতে গিয়ে সে হুস করে চুনুর সামনে পিছু হয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে।

চুনুর মুখ দেখে তার মন বোঝা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে সে এইটে অভ্যেস করেছে। মুখে একটা ভালমানুষী, আর বড় বড় চোখে ভাসানো দৃষ্টিতে সে চায় সব সময়ে। দিদিকে আসতে দেখেই চুনু একটা কাগজ লুকিয়ে ফেলল ফ্রকের ঘেরের নীচে।

—একক সংগীত তোর ভাল লাগে? বাব্বা! আড়াই ঘণ্টা ধরে একক গলার গান শুনতে শুনতে মাথা ধরে যায় না?—ইস, হুকগুলো সব চেপটে গেছে। লন্ড্রিতে দিয়েছিলি বুঝি ব্লাউজটা? আছড়ে কেচেছে, হুকের মাথাগুলো সব বসে গেছে।

মুনমুন অধৈর্য হয়ে বলে—তাড়াতাড়ি কর না।

—করছি তো! হুকগুলো ঘরে ঢুকছে না যে! একটা সেফটিপিন দে, খুঁটে তুলি।

মুনমুনের নতুন প্রেমিক এসে দাঁড়িয়ে থাকবে রবীন্দ্রসদনে। মুনমুন খুব ভাল জানে এও বেশিদিন টিকবে না। শেষপর্যন্ত কে যে পাবে তাকে তা কী এখনই বলা যায়। সতেরো বছর বয়সে কী করে বলবে, আসল লোকটা কে! এখনও কত জন আছে, কত রোমাঞ্চ আছে, কত রহস্য ও ঘটনা! তবু এখনকার মতো এই প্রেমিকটিকেও সে উপেক্ষা করতে পারে না।

সব সময়েই একটু দেরি করে যাওয়া ভাল। তা বলে বেশি দেরিও নয়। তাতে উৎকণ্ঠার বদলে বিরক্তি এসে যায়। মুনমুনের একটা হিসেব আছে। সে হিসেব মতো একটু বেশিই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সে এক ঝটকায় সরে এসে বলে—ছাড় তো! তোর কম্ম নয়।

Shahnaz

বলে সে নিজে নিজে ড্রেসিং টেবিলের দিকে পিছু ফিরে হাত পিছনে ঘুরিয়ে টপাটপ হুক লাগিয়ে ফেলে, বলে—কোথায় হুক চেপটে গেছে। আমার হাতে লাগল কী করে? মারব থাপ্পড়—

চুনু ভাসা চোখে চেয়ে থাকে ভালমানুষের মতো। যেন জানে না, হুক ঠিক ছিল। বলল—সুচিত্রার গান রোজ তো শুনছিস বাবা, রেডিওয়, গ্রামোফোনে, মাইকে। আর কত? ডাল-ভাত হয়ে গেছে।

—সুচিত্রা কখনও ডাল-ভাত হয়ে যায় না। আর হলেই কী? তুই রোজ ভাত খাস না? খারাপ লাগে? ভাত না পেলে তো কুরুক্ষেত্র করিস!

হঠাৎ কুঁকড়ে গিয়ে চুনু ফ্রক তুলে নাক চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে বলে—এঃ মা! কী গন্ধ আসছে।

প্রচণ্ড সেন্ট মেখেছে মুনমুন। প্রথমে সে পায়নি, এখন পেল গন্ধটা! একটা 'ওয়াক' তুলে দৌড়ে গিয়ে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে এসে 'উঃ উঃ' করে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বলল—সেপটিক ট্যাংক খুলেছে। শীগগির জানলা বন্ধ কর।

৩

—একটা দড়ি দিবেন বড়বাবু? আব পানি নীচা হয়ে গেল, বালতিতে দড়ি লাগাতে হবে।

—ওঃ, দড়ির কথা আগে বলবি তো! দাঁড়া দেখি আছে কি না।

মাগন একগাল হেসে বলে—বারো আনা পয়সা দিন তো লিয়ে আসি।

—পয়সা দিলে পাওয়া যায় সে জানি! চালাকি করিস না। দেখছি দাঁড়া।

দত্তবাবু চেঁচালেন—কোথায় গেলে গো? এ ব্যাটা দড়ি চাইছে। আছে নাকি?

লীলাময়ী রান্নাঘরে নেই। খুঁজতে গিয়ে দত্তবাবু দেখেন, ফাঁকা রান্নাঘরে উনুনের ওপর ডাল ফুটছে। ডালের ফেনা উথলে উনুনের গায়ে পড়ে পড়ে ছ্যাঁক-ক্ ছ্যাঁক-ক্ শব্দ উঠছে।

দত্তবাবু ফিরে দাঁড়াতেই অন্যায়ের দৃশ্যটি দেখতে পেলেন।

দত্তবাবু তাঁর শ্বশুরমশাইকে 'বাবা' ডাকেন না বলে লীলাময়ীর বড় অভিমান। কিন্তু এ লোককে 'বাবা' ডাক যায়? দত্তবাবু দেখতে পেলেন, ভিতরে দু'ঘরের মাঝখানকার প্যাসেজে তাঁর রোগা খুনখুনে বুড়ো শ্বশুরমশাই খুব গোপনে একটা গামছায় নাক ঝাড়ছেন।

শ্বশুরমশাইয়ের ভয়ে দত্তবাবু তাঁর পরিষ্কার গামছাখানা সবসময়ে লুকিয়ে রাখেন। কারণ শ্বশুরমশাইয়ের নিজের দুখানা গামছা থাকা সত্ত্বেও সে গামছায় তিনি নাক ঝাড়েন না বা পায়ের তলা মোছেন না। ও দুটো কাজের জন্য তিনি সব সময়েই অন্যের গামছা চুরি করেন। এখনও করছেন। আরও আছে। নিজের হাওয়াই চপ্পল থাকা সত্ত্বেও পায়খানা যাওয়ার সময় শ্বশুরমশাই লুকিয়ে জামাইয়ের হাওয়াই দুটো পায়ে দিয়ে যান।

কার না রাগ হয়? কিন্তু মুখোমুখি চোটপাট করে কিছু বলাও যায় না। কুটুম মানুষ।

দত্তবাবু প্যাসেজটার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে বললেন—গামছাটা আপনি পেলেন কোথায়?

'বাবা' ডাকেন না বলে যে শ্বশুরমশাই দত্তবাবুকে কম খাতির করেন তা নয়। বরং বেশিই করেন। বাবা ডাকেন না বলেই খাতির করেন। খাতিরের চেয়েও বেশি। ভয় পান।

বুড়ো মানুষ ভয়ে হাঁ করে আছেন। আড়ষ্ট হাতে জামাইয়ের গামছা সামলে নিয়ে বললেন—এইখানেই ছিল। সরিয়ে রাখছি। দেখো, তোমার গামছায় যেন কেউ হাত না দেয়।

কাউকে হাত দিতে দেবে না। আমিও সবাইকে বারণ করি, অধীরের গামছায় তোমরা কেউ...

দত্তবাবু মুখটা কুঁচকে সরে এলেন। গামছাটা আজ আর একবার কাচিয়ে নিতে হবে। সরে আসতে আসতেই শুনতে পেলেন, 'হ্যাক' করে থুতু ফেলার শব্দ। পিছনে আর তাকালেন না। তাকালে আর সারাদিন জল খাওয়া হবে না। প্যাসেজেই জলের কুঁজো রাখা। শ্বশুরমশাই সারাদিন বাড়ির সর্বত্র থুতু ফেলছেন। সর্বত্র।

লীলাময়ী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরের ঘরের দরজার পাশে। একটু গোপনীয়তার ভঙ্গি মাখানো তাঁর শরীরে।

গোপনীয়তাটা বাহুল্যমাত্র। বাইরের ঘর থেকে যে আসছে তা শোনবার জন্য কান পাততে হয় না।

৪

যতটা সুভদ্রাকে ততটা আর কোনও মেয়েমানুষকে ঘেন্না করে না অধীপ। গুয়ের পোকাও কি ওর চেয়ে ভাল নয়?

সুভদ্রা খাটে বসে আছে, সামনের দিকে জোড়া পা ছড়ানো, পিছনে হাতের ভর। মুখ সাদা, চোখ জ্বলছে। বলল—ন্যাকা—জানো না?

—তুমি বলতে পারলে? কোনও ভদ্রলোকের মেয়ে বলতে পারে ওকথা?

—নিজেরা কী? লোকে শুনলে থুতু দিয়ে যাবে গায়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে! আমি ভদ্রলোকের মেয়ে না তো কী, তোমার মতো ইতরের বাচ্চা?

মেয়েমানুষকে মারা ভাল নয় অধীপ জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে বুঝতে পারে, মার—মারের মতো এমন নিরাময় আর কিছুতেই নেই। মারাই বোধ হয় সবচেয়ে শান্তি। এক পা এগিয়ে সে শরীরে রিম-ঝিম রাগের নাচ শেষ কয়েক মুহূর্তের জন্য সহ্য করে প্রায় রুদ্ধস্বরে বলল—এই বজ্জাত মাগী! মুখ ঘষে দেব দেয়ালে!

দাও না দাও! বলে চোখের পলকে উঠে আসে সুভদ্রা। একদম কাছে এসে চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—ছোটলোকের ইতরের গর্ভে যার জন্ম তার কাছে আর কী আসা করব? মারো!

অধীপ কথা বলতে পারে না। কাঁপে। স্ট্রোক হয়ে যাবে! পাগল হয়ে যাবে! ডিভোর্স...

সুভদ্রা ধকধক করতে করতে বলে—ন্যাকা! জানো না, তোমার শরীরে কিসের রক্ত! গুষ্টিসুদ্ধ বদমাইশ তোমরা, জানো না? তোমার ওই আদরের লেংড়ী বোন চুনু কেন আমাকে বিয়ের পরদিনই বলেছিল—এই বৌদি, তুমি কেন আমার দাদার সঙ্গে শোবে!

অধীপের এ কথাটা মাথায় ঢোকে কিন্তু সুভদ্রাই কথাটা বলতে—এটা যেন বিশ্বাস হয় না। তার সমস্ত বিশ্বাসের ভূমি থেকে কে যেন তাকে তুলে ছুড়ে দেয় অন্য একটা হীন আর ক্লীব জগতে। সে কাঁপতে কাঁপতে কসাইয়ের গলায় বলে—কেন বলেছিল?

সুভদ্রা সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে দিগবসনা আক্রোশে প্রায় নেচে উঠে বলে—সহ্য হবে কেন? আদরের দাদার সঙ্গে অন্য কেউ শোয় তাতে বুক জ্বলে যাবে না? ছিঃ ছিঃ! তোমরা লোকসমাজে মুখ দেখাও কী করে?

অধীপ হঠাৎ পাথরের মতো শান্ত হয়ে গেল! খুন করার আগে যেমন মানুষ কখনও কখনও হয়! একটু বাদেই সুভদ্রা তার হাতে খুন হবে, সুতরাং সে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পর ঠাণ্ডা গলাতেই বলল—তুমি নর্দমার পোকা।

Shahnaz

—তা তো বলবেই। নিজেরাই কিনা। শ্বশুর আমাকে ভালবাসে বলে তোমার মা বলেনি, শ্বশুর বলেই কী, পুরুষ তো। যুবতী বউয়ের সঙ্গে অত মাখামাখি কিসের? তুমিও বলোনি, সুভ, তুমি বাবার সঙ্গে অত মেলামেশা কোরো না। বলোনি?

বলেছে। ঠিক কথা, মায়ের কাছে শুনে তারও এক সময়ে বিশ্বাস হয়েছিল, বাবার সঙ্গে সুভদ্রার অত স্নেহের সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা অসঙ্গতি আছে। বলেছে। কিন্তু মানুষের কি ভুল হয় না!

সুভদ্রা ঝোড়ো দ্রুতবেগে বলে—সন্দেহ করোনি নিজের বাবাকে? অমন মাতৃভক্তির কপালে ঝাঁটা। ডাইনি মুখে পোকা পড়ে মরবে, পচে-গলে মরবে।

ঠিক এই সময়ে দুর্গন্ধটা আসে। বহু দিনকার জমানো মল, ময়লা, জলের প্রচণ্ড গ্যাস। ঘরটার বাতাস পলকে বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু তারা দু-জন গন্ধটাকে টেরই পায় না; কিংবা পেয়েও উপেক্ষা করতে পারে। কিংবা হয়তো তারা ঠিক এই মুহূর্তে দুর্গন্ধটাকে উপভোগই করে।

আশ্চর্যের বিষয়, অধীপ হাসল। অবশ্য এটা হাসি নয়। খুন করার আগে অভ্যস্ত খুনি কখনও-সখনও এরকমই হাসে হয়তো।

তারপরেই সে চড়টা মারল। সুভদ্রা যে পাঁচ মাসের পোয়াতি তা মনে রইল না। লক্ষও করল না যে তার দু বছরের ছেলে দৃশ্যটা দেখছে।

৫

—চালা! জোরসে চালা জলদি।

—হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। পাম্প তো নেহি যে ভটভট করে গাদা খিঁচে লিবে!

দুনম্বর ট্যাংকিতে ঘপ করে বালতি মারে মাগন। হাউস ফুল।

দত্তবাবু চেঁচিয়ে বলেন—এই ব্যাটা ময়লা ফেলার গর্ত করবি না?

—হাঁ হাঁ, গোর্তো হোবে, গোর্তো ভী হোবে। এক বোতল সরাবের দাম দিবেন তো বড়বাবু?

—নালীতে ময়লা ফেলবি তো পয়সা কাটব। নালী আটকালে বাড়িওলা পাঁচ কথা শোনাবে। খুব সাবধান।

—কোই চিন্তা নাই বড়বাবু। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

গ্লাস পাওয়ারের চশমাটা পরেও স্টেটসম্যানের খবরগুলো দেখতে পান না দত্তবাবু। পুরোটাই আবছা, অস্পষ্ট, হিজিবিজি এবং অর্থহীন তবু মুখের সামনে কাগজটা ধরে রাখেন। মুখোশের মতো।

মুনমুনকে চিঠি দিয়েছিল বাড়িওলার ছেলে মিলন। সেই চিঠি বাড়িওলা রসিকবাবুর হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন দত্তবাবু। সেই থেকে গণ্ডগোলের শুধু। রসিকবাবুর স্ত্রী ওপরতলা থেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দিলেন—এ হতেই পারে না। নষ্ট মেয়েটার পাল্লায় পড়ে মিলুও গোল্লায় যাচ্ছে। তুলে দাও।

দত্তবাবুর কিছু বলার দরকার হয়নি, লীলাময়ী নীচতলা থেকে গুষ্টি উদ্ধার করলেন ওঁদের। কয়েকদিন দত্তবাবু বুকের প্যালপিটিশনে কষ্ট পেলেন খুব। তাঁর খুব ইচ্ছে করে, যে বাড়িওলার যুবক ছেলে নেই তার বাড়িতে উঠে যান। কিন্তু ইচ্ছে তো আর পক্ষিরাজ নয়।

এক বছর আগেকার সেই ঘটনা থেকেই অশান্তি চলছে। রান্না করতে করতে মাঝখানে

কলের জল বন্ধ হয়ে যায়। আঁচাতে দিয়ে বেসিনে জল পাওয়া যায় না। লীলাময়ী নীচে থেকে দাপিয়ে চেঁচান। আর দত্তবাবুর ঝি বাসন মেজে কলতলায় ছাই ফেলে এলে ওপর থেকেও দাপানো আর চেঁচানোর শব্দ হয়।

শ্বশুরমশাই বকের মতো পা ফেলে বাথরুমে যাচ্ছেন জল ঘাঁটতে। এ বাড়ির জলকষ্টের মূলে এই লোকটার অবদান বড় কম নেই। সারাদিন জল ঘাঁটছে লোকটা। হাঁপানি আছে। সর্দির ধাত আছে। সারা রাতের কাশি আছে। আর সেই সঙ্গে জল ঘাঁটাও আছে। জল ঘাঁটুক, তাতে দত্তবাবুর আপত্তি নেই। তিনি শুধু শ্বশুরমশাইয়ের পায়ের চপ্পলটা লক্ষ করলেন। দত্তবাবুর চপ্পলের স্ট্র্যাপ নীল রঙের, শ্বশুরেরটা খয়েরি।

খয়েরি দেখে দত্তবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে আবার স্টেটসম্যানের মুখোশ পরলেন, পরার দরকার ছিল। কারণ লীলাময়ী আসছেন।

এসে একটা মুখ ছেঁড়া খাম দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এই সেই চিঠি!

—কিসের চিঠি?

—বউমার বাক্স থেকে বোধ হয় চুনু নিয়েছিল।

—কেন?

—অন্যায় করেছে নিয়েছে। হয়তো লোভ সামলাতে পারেনি। এই নিয়েই অধীপের সঙ্গে ওই ঝগড়া।

দত্তবাবু চিঠিটা হাতে নিয়ে বলেন—কবেকার চিঠি?

—বিয়ে আগে অধীপ বউমাকে যে-সব চিঠি লিখত তারই একটা। কী দরকার ছিল পুরনো চিঠি জমিয়ে বুকে করে রাখবার? পুড়িয়ে ফেলা যেত না! ঘরে বয়সের ননদরা রয়েছে, কোলের ছেলেও বড় হচ্ছে...

—তুমি চিঠিটা পড়েছ?

খুব দৃঢ় গলায় নয়। ঝংকার দিয়ে লীলাময়ী বললেন—পড়ব কেন?

—পড়োনি?

—ওপর ওপর দেখেছি একটু। কী এমন কথা যার জন্য মাগীর আঁতে ঘা পড়ল।...ওঃ, এই দুর্গন্ধের মধ্যে বসে আছ কী করে? তুমি মানুষ না কি?

দত্তবাবু বললেন—পড়ে ভাল করোনি।

—কেন? ভাল না করারই কী? তুমিও দেখো না। বলে লীলাময়ী খাম থেকে চিঠিটা খুলে নিয়ে দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বলে—পড়েই দেখ।

—বউমা কী করছে?

—কাঁদছে, ঘরে দরজা দিয়ে।

—তুমি যাও।

লীলাময়ী চলে গেলে দত্তবাবু চিঠিটা খোলেন। ...অশ্লীল, খুবই অশ্লীল চিঠিটা।

মন থেকে আজ কেমন জোর পাচ্ছেন না। মনের জোরের জন্য খানিকটা নৈতিকতা দরকার। হ্যাঁ, মর‍্যালিটি তা কি তাঁর আছে?

লীলাময়ী দুর্গন্ধের কথা বলে গেলেন। কিন্তু তিনি দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন না।

Shahnaz

৬

ডাক্তারকে খবর দেওয়া ছিল। সদর থেকে তাঁর হাঁক শোনা গেল এইমাত্র—কই বউমা কোথায়?

বাইরের বারান্দাটাই এখন বসার ঘর। অধীপের বিয়ের পরই বাইরের ঘরটার দরকার হল। তখন বারান্দাটা প্লাইউড দিয়ে ঘিরে সোফা সেট পাততে হল।

লীলাময়ী প্রমাদ গুনলেন। বউমাকে দেখতে এসেছে। সর্বনাশ! তার বাঁ গালে অধীপের পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে আছে এখনও, তার ওপর নাগাড়ে কাঁদছে। বাইরের লোকের সামনে বেরোবে না কিছুতেই। যদিও বা বেরোয় তো ডাক্তার সবই লক্ষ করবে।

উঠে গিয়ে তিনি ঘোমটা টেনে বললেন—বসুন।

—বেশি বসবার উপায় নেই। চেম্বারে রুগী বসে আছে।

লীলাময়ী নিঃশব্দে গিয়ে দরজায় সামান্য শব্দ করে চাপা গলায় ডাকেন—বউমা! বউমা! ডাক্তারবাবু এসেছেন, দরজা খুলে দাও। ঠিকঠাক হয়ে নাও।

সুভদ্রা পাঁচ মাসের পোয়াতি। বড় ছেলে দুই পেরিয়েছি। সে হতে বড় কষ্ট গিয়েছিল। অধীপ তাই ঘন ঘন ডাক্তার ডেকে চেক আপ করায়। কিন্তু অধীপটা রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছে। অবস্থাটা সামাল দেবেন কীভাবে তা ভাবতে ভাবতে লীলাময়ী গিয়ে চায়ের জল চাপান। চৌধুরি পারিবারিক ডাক্তার, তাঁর কাছে তেমন লজ্জা নেই। তবু তো লজ্জা! আজকালকার বউয়েরাও ভারী নির্লজ্জ। কথায় কথায় পরপুরুষ ডাক্তারদের কাছে নিজেদের খুলে দেয়। ডাক্তাররা গোপন জায়গায় হাত দেয়, টিপ দিয়ে দেখে, অসভ্য সব প্রশ্ন করে। মাগো! লীলাময়ী মরে গেলেও পারবেন না। তাঁকে কয়েকবার লেডি ডাক্তাররা দেখেছিল। তাতেই কী লজ্জা!

শচীলাল ডাক্তারের গন্ধ পেয়েছেন। থুতু ফেলার জন্য তাঁর একটা টিনের কৌটো আছে। সেইটে গিয়ে গোপনে বেসিনে ধুচ্ছিলেন। জল ঘাঁটছেন টের পেলে মেয়ে আজকাল বড় বকে।

ডাক্তারের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি কৌটো রেখে বাইরের বারান্দায় এসে বসেই বললেন—বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গত দু বছর যাবৎ আমার পেটের কোনও গোলমাল নেই।

চৌধুরি হেসে বলেন—বাঃ খুব ভাল।

—যা খাই সব হজম হয়। ইঁটের মতো শক্ত পায়খানা। আপনি আমাকে রোজ সকালে দুটো করে মুরগির ডিম খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে যান।

—সে আমি বুঝব খন। শ্বাসের কষ্টটা কেমন আছে?

—এটাই যা একটু কষ্ট দেয়, আর সব ভাল।

লীলাময়ী চা নিয়ে এসে বাবাকে দেখে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলেন—তোমার আবার কী?

শচীলাল একগাল হেসে চৌধুরিকে বলেন—বুঝলেন ডাক্তারবাবু লীলা ভাবে আমি পেট খারাপের কথা লুকোই। কাল তাই প্যানের ওপর পায়খানা করে ডেকে দেখলাম। বল না লীলা ডাক্তারবাবুকে কেমন পায়খানা!

চৌধুরি বলেন—আচ্ছা, দেখা যাবে।

লীলাময়ীর মুখ ফেটে পড়ছে রাগে, চাপা গলায় শচীলালকে বলেন—এখন ঘরে যাও তো!

—চা করলি?

—তুমি এখন খাবে না চা। স্নান করো গে। একেবারে ভাত দেব।

—চালকুমড়ো পাতার পুর করবি না?

লীলাময়ীর হাত পা নিশপিশ করে। গোপনে আবার এসে, বউমার ঘরের দরজা নাড়া দেন—শুনছ বউমা!

ঘরে ছেলেটা কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে। বাপ মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখেই শুরু করেছিল। তারপর থেকে ভ্যাবাচ্ছেই।

সুভদ্রার কান্না থেমেছে। গম্ভীর গলায় বলল—ডাক্তার বিদেয় করে দিন গে। আমি দেখাব না। আর বিরক্ত করবেন না আমাকে।

ভারী অসহায় বোধ করেন লীলাময়ী। কী করবেন? চৌধুরি এসেছেই যখন রুগী দেখুক আর না দেখুক, ভিজিটের টাকাটা দিতেই হয়। কিন্তু অধীপ ভিজিটের টাকা রেখে যায়নি।

৭

—ইসি ট্যাংকিমে আর কুছু নাই বড়বাবু।

—নেই মানে? ইয়ার্কি পেয়েছিস? ভাণ্ডা মার, মার ডাণ্ডা। দেখি কতখানি আছে।

মাগন বলে—হাঁ হাঁ দেখে লিন।

ডাণ্ডা মারতেই সেটা ভচাক করে দু-হাত পুরু ময়লায় ডেবে গেল।

—ওই তো। এখনও অর্ধেক রয়ে গেছে। চালাকি করার আর জায়গা পাস না? চল্লিশ টাকা কি এমনি এমনি দেব?

ডাণ্ডা তুলে ময়লার দাগ দেখিয়ে মাগন বলে—বাস এইটুকু তো সব ট্যাংকিতে থাকে। ট্যাংকি কি কখনও পুরা সাফা হয় বড়বাবু? কুছু তো থেকেই যায়। ই তো স্রিফ বালু আছে।

—বকবক না করে কাজ কর তো।

—হাঁ হাঁ কাম তো করছে বড়বাবু।

দু নম্বর ট্যাংকিতে জলের নীচে ময়লা এখনও থকথক করছে। শক্ত মাল। বালতি মারলে ডোবে না। পা গর্তে ঢুকিয়ে চেপে বালতি ডোবায় মাগন। বলে—বহোত পরেসান বাবা। একটা পুরানা জামা দিবেন তো বড়বাবু? ট্যাংকি বেডরুম বানিয়ে দিব।

লীলাময়ী আসছেন টের পেয়েই দত্তবাবু স্টেটসম্যানের মুখোশটা পরে নিলেন।

কিন্তু লীলাময়ী এলেনই। নাকে চাপা আঁচলের ফাঁক দিয়ে বললেন—চৌধুরি এসেছে। বউমা ডাক্তার দেখাবে না বলছে। কিন্তু ভিজিটটা তো দিতে হয়। অধীপ টাকা রেখে যায়নি।

বিরক্ত দত্তবাবু বলেন—আমার ব্যাগ থেকে নিয়ে দিয়ে দাও গে। অধীপ এলে চেয়ে রেখো।

—চাইব, কিন্তু সে দেবে কেন? তার বউকে তো আর দেখেনি।

—সেই তো ডেকেছে, আমরা তো কল দিইনি। রেসপনসিবিলিটি তার।

লীলাময়ী নাকটা ছেড়ে একটু দম নিতে গিয়েই দুর্গন্ধে শিউরে উঠে 'হ্যাক' শব্দ করে আবার নাকে চাপা দিয়ে বলেন—বলছি কী, ভিজিট যখন দিচ্ছিই তখন আর মাগনা ছাড়ি কেন। প্রেসারটা দেখিয়ে নিই। বাবার বুকটাও পরীক্ষা করুক। তুমিও তো পরশুদিন মাথা ঘোরার কথা বলছিলে, দেখিয়ে নেবে নাকি?

ঠিক এই সময়ে ওপর থেকে রসিকবাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠে বলেন—এই জমাদার! নর্দমায় ময়লা ফেলছ যে বড়? নালী আটকে যাচ্ছে না?

Shahnaz

মাগন মুখ তুলে বলে—নালী টেনে দিব মা। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

—কেন, গর্ত করতে কী হয়? বলা হয়নি তোমাকে গর্ত খুঁড়তে? টাকা মাগনা আসে?

—হাঁ হাঁ, গাড্ডা ভী হোবে।

রসিকবাবুর স্ত্রী বেশ চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—ছ-মাস আগে ট্যাংক পরিষ্কার করানো হয়েছে, এর মধ্যেই যে কী করে ভরে যায় তা তো বুঝি না।

কথাটা গায়ে না মাখলেও হয়। কিন্তু লীলাময়ী মাখলেন।

—শুনলে?

দত্তবাবু স্টেটসম্যানের মুখোশ পরে ফেলেন! লীলাময়ী মুখটা সিলিং-এর দিকে তুলে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন—ময়লা কি শুধু আমাদের একার? ওপরতলায় বুঝি সব দেবতারা থাকেন, তাঁরা কেউ হাগেন মোতেন না? আর জমাদারের টাকার অর্ধেক তো আমাদেরও দিতে হবে। মাগনা কাজ হচ্ছে নাকি?

রসিকবাবুর স্ত্রী নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। সব কথা বোঝা যায় না। শুধু স্পষ্ট করে শুনিয়ে বললেন—ওই তো ছেলে ধরতে বিবি বেরিয়ে গেলেন। আর দোষ হল কি না আমার মিলনের! গুষ্টিসুদ্ধি তেড়ে এসেছিলেন ঝগড়া করতে। বলি, মেয়ে কোথায় যায়, কার সঙ্গে কী রকম ঢলাঢলি তার খবর রাখছে কে? সে বেলা তো চোখে তুলসীপাতা এঁটে থাকা হয়।

লীলাময়ী এখন আর দুর্গন্ধটা পাচ্ছেন না। নাকের কাপড় কখন খসে গেছে। বড় বড় চোখে লীলাময়ী স্বামীর দিকে তাকান। মুখে কথা নেই।

দত্তবাবু এমন মুখের ভাবখানা করেন, যেন তাঁর মেয়ে বা তাঁর পরিবার নিয়ে কথা হচ্ছে না। এ যেন অন্য কারও কথা। প্রচণ্ড জিদবশত তিনি কাগজে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ দাঙ্গার খবর পড়তে থাকেন। একবর্ণও বুঝতে পারেন না।

একবার ভাবলেন ডাক্তার চৌধুরিকে প্রেশারটা দেখিয়ে নেবেন।

৮

চুনুর একটা পা শুকনো কাঠি। একটা হাতও কমজোরী। বড় কষ্ট তার হাঁটাচলার। যে তাকে দেখে সে-ই দুঃখ পায়।

আর অন্যের এই দুঃখবোধটা খুব ভাল কাজে লাগাতে শিখে গেছে চুনু।

জানলার কাছে একটা সাইকেল থেমে আছে। সাইকেলের ওপর শিবাজী।

—ডলিকে আমি নিজের চোখে দেখেছি পাম্প ছাড়তে। চুনু খুব ভাল মানুষের মতো বলে।

—কিন্তু আমার পিছনের চাকাটায় তো লিক বেরোল।

—লিক? তবে ঠিক সেফটিপিন ফুটিয়ে দিয়েছিল। তুমি তখন মাস্তদের বাড়িতে ক্যারাম খেলছ। খেলছিলে না?

—ক্যারাম?

—মিথ্যে কথা বোলো না।

শিবাজী হেসে বললে—খেলছিলাম! তুমি ডলিকে বলেছ?

—না, মাইরি, কালীর দিবি।

—তবে বললে কে? ডলি জানল কী করে?

—বলব সত্যি কথা একটা? কিছু মনে করবে না তো?

—বলো না।

—মাস্ত। ঠিক মাস্তই বলেছে। মাস্ত আজকাল ইউনিভারসিটির ঝিলে গিয়ে কার সঙ্গে বসে থাকে জানো? তপন।

—সেই বদমাশটা? গেলবারও আমাদের হাতে মার খেয়েছিল?...এই তোমার বাবা!

বলেই শিবাজী জানলার নীচে ডুব দেয়। পরক্ষণেই তার সাইকেলের ঘণ্টি দূরের রাস্তার দমকলের মতো ঘন ঘন রি রি রিং রি রিং বাজতে থাকে।

চুনু আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। তার মুখে কোনও অপরাধবোধ নেই। বউদির চিঠি চুরির জন্য মা তাকে বকেনি। আসলে বকতে সাহস পায়নি। বাবাও পাবে না।

দত্তবাবুও জানেন চুনুকে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাউকেই শাসন করার ক্ষমতা নেই। এ বাড়ির কেউই তাঁর কথা শোনে না।

—এ চিঠিটা চুরি করেছিস?

ঠাণ্ডা গলায় চুনু বলে—বেশ করেছি। একশো বার করব।

এই মেয়ের জন্যই দত্তবাবু আর লীলাময়ী গত পাঁচ বছর এক বিছানায় শুনতে পারেননি। চুনু তখন থেকেই তার মাকে প্রায়ই বলত—লজ্জা করে না তোমরা বুড়ো বয়সে একসঙ্গে শোও? কেন শোবে?

কী লজ্জা! সেই লজ্জায় লীলাময়ী দত্তবাবুকে বলেছিলেন—মেয়ে যখন চায় না তখন থাক না হয়।

দত্তবাবু গম্ভীর হয়ে ছিলেন। কিছু বলেননি। লীলাময়ীই আবার নিজে থেকে বলেন—ও তো জানে ওর সাধ আহ্লাদ মিটবে না! তাই বোধ হয় হিংসে।

হবে। কিন্তু সেই আক্রোশটা দত্তবাবুর যায়নি এখনও। দাঁতে দাঁতে পিষে বললেন—কী বললি?

তাঁর চেহারাটা কেমন দেখাল কে জানে! হয়তো খুবই ভয়ংকর। দত্তবাবু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

ভয় পায় না, তবে এখন পেল। পিছনে হাত নিয়ে জানলার গ্রিল চেপে ধরে তবু ত্যাড়া ঘাড়ে চুনু বললে—গায়ে হাত দেবে না বলে দিচ্ছি! ইঃ তেজ দেখাতে এলেন! মুরোদ জানা আছে। কই, বউদিকে তো চোখ রাঙাতে পারো না, যখন মাকে যা তা বলে মুখের ওপর! তোমার উইকনেস জানি। বেশি তেজ দেখাতে এলে সবাইকে চেঁচিয়ে বলব।

দত্তবাবু অবশ হয়ে যান। ঘেমে যান। মুহূর্তের মধ্যে। মারবেন বলে হাত তুলেও ছিলেন। সেই হাত সজোরে নেমে ঝুলে পড়ল ফাঁসির মড়ার মতো।

আস্তে আস্তে ফিরে এসে স্টেটসম্যানের মুখোশ পরলেন।

এই সেদিন অধীপ যখন বিয়ে করবে বলে মাকে গিয়ে ধরেছিল সেদিন লীলাময়ীর কাছে সব শুনে কী রাগটাই না করেছিলেন তিনি। ছেলে তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। ঢুকেই বিয়ে। পার্মানেন্ট হ। মাইনে একটু ভদ্রগোছের হোক। নইলে তো হ্যাপা সামলাতে হবে বাপকেই।

কিন্তু দত্তবাবুর ইচ্ছেয় কিছু তো হয় না এ বাড়িতে। যার যা ইচ্ছে তাই করে। অধীপেরও বিয়ে হল।

নতুন বউকে দেখে ভারী মুগ্ধ হয়ে গেলেন দত্তবাবু। বহুকাল এমন মিষ্টি মুখ দেখেননি। বউভাতের পরদিনই মাথাখানা বুকে টেনে বলেছিলেন—এখন তুমিই সংসারের কর্ত্রী।

Shahnaz

আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সেই থেকে সংসারে অশান্তির সূত্রপাত।

মনের মধ্যে পাপ আছে কি?

কে জানে বাবা! কে জানে! তবে পাপের চেয়েও লজ্জা অনেক বেশি।

শ্বশুরমশাই কী একটা পিছনে লুকিয়ে নিয়ে চুপিসাড়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছেন!

উঁকি মারলেন দত্তবাবু। দেখলেন, তাঁর নীল স্ট্র্যাপের হাওয়াই চপ্পল।

৯

লীলাময়ী দুটো প্রেসারের বড়ি একসঙ্গে খেলেন। বেড়েছে।

একটা ছিটকিনি খোলার আওয়াজ পেয়েছিলেন যেন একটু আগে। মনের ভুলও হতে পারে। তবে কান খাড়া রাখছেন।

শচীলাল স্নান সেরে এসে নিজেই আসন পেতে জল থালা আর নুন নিয়ে বসে পড়েছেন ভিতরের বারান্দায়। ডাকছেন—লীলা, দিবি নাকি?

ঠিক এই মুহূর্তে লীলাময়ীর রাগ হল না। কদিন আগেও শচীলাল জামাইয়ের সঙ্গে ছাড়া খেতেন না। ভদ্রতাবোধ বরাবরই প্রবল। ইদানীং এই সব হচ্ছে। লীলাময়ী বললেন—বসে থাকো একটু। যাচ্ছি।

শচীলাল বসে থাকেন। দুর্গন্ধ পাচ্ছেন ঠিকই। গা করছেন না। বড় মেয়ে হিরণ্ময়ী বলেছে, নিয়ে যাবে শীগগিরই। হিরণ্ময়ীর অবস্থা ভাল, দুবেলা মাছ হয়, মাঝে মাঝেই পোলোয়া। কতকাল পোলোয়া খান না শচীলাল!

লীলাময়ী টের পান, সুভদ্রা দরজা খুলল। প্যাসেজ দিয়ে নাতিটার পায়ের আওয়াজ ধেয়ে আসছে, কচিগলার ডাক এল—ঠানু। ও ঠানু আমরা যাচ্ছি।

সুভদ্রা গর্জায়—এই! খবরদার যাবি না। গলা টিপে মেরে ফেলব তাহলে।

ছেলেটা ফিরে যায়। একটু কাঁদে কি? লীলাময়ী উঁকি মেরে দেখেন প্যাসেজ দিয়ে বাথরুমের দিকে গেল সুভদ্রা। ছেলের নড়া শক্ত হাতে ধরা। সাজগোজ সব হয়ে গেছে। যাওয়ার জায়গা বলতে বাপের বাড়ি। তা যাক। বাড়িটা জুড়োবে!

—লীলা দিবি? শচীলাল ডাকেন।

এবারে রাগেন লীলাময়ী! চাপা গর্জনে বলে—বড়দিরও আক্কেল দেখছি! কবে থেকে বাবাকে নিয়ে যাওয়ার কথা। সব যে যার স্বার্থ দেখছে। এই বুড়োর হ্যাপা যত আমাকেই সামলাতে হবে বরাবর? শরীর আমার বারো মাস খারাপ থাকে! স্বার্থপর, সব স্বার্থপর।

দ্রুত পায়ে বারান্দায় গিয়ে তিনি শচীলালের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—কেন তোমার গুণধর ছেলে বাবাকে নিয়ে কদিন রাখতে পারে না? নাকি তাতে বউয়ের মাথা ধরার ব্যামো বাড়বে।

১০

উঠোনে কোমর পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে মাগন। ঘামে জবজব করছে। পায়ে কাঁচের টুকরো ফুটেছে একটা। সেটা নখে টেনে তুলে ফেলল। কাটা জায়গাটা হাত দিয়ে ঘষে রক্ত লেপটে দিল।

—কী রে দিন কাবার করবি নাকি?

—হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। মাগন গর্ত থেকে উঠে এসে এক নম্বর ট্যাংকিতে বালতি নামিয়ে বলে—আভি দেখে লিন, সব সাফা।

রসিকবাবুর স্ত্রী ওপর থেকে এবং দত্তবাবু নীচে থেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন—অনেক ময়লা রয়েছে এখনও!

মাগন হাসে। বলে—ময়লা তো আছে মালিক, কিন্তু উ তো সব শুখা মাল আছে। মালটা শক্তো হয়ে গেছে বড়বাবু, উঠবে নাহি।

—নাম ব্যাটা ট্যাংকে, নেমে কোদাল মেরে চেঁছে তোল। টাকা কি গাছে ফলে?

—হাঁ হাঁ বাত তো ঠিক আছে বড়বাবু। লেকিন পাঁচ রুপেয়া বকশিশ দিয়ে দিবেন। চালিশ টাকার তো পাসীনা চলিয়ে যাচ্ছে। ভিটামিন দিবে কৌন?

মাগন ট্যাংকে নামে। গার্দা সব পাথরের মতো বসে গেছে। থকথক করছে পোকা, জল। বহোত গান্ধা।

কোদালে ময়লা চাঁচতে চাঁচতে মাগন আপনমনে বলে—কাম পুরা করে পয়সা লিব মালিক। বহোত গার্দা বাবা, বহোত গান্ধা। সব গার্দা সাফ থোড়াই হোবে বাবা। গার্দা কুছ জরুর থেকে যাবে মালিক! সব গার্দা কখনও সাফা হয় না।

Shahnaz

পোড়ারমুখো—'

বাবার রুদ্র মূর্তির কথা মনে পড়তেই টুনু শিউরে উঠল। আস্তে আস্তে বলল—'আর একবার খুইজ্যা দ্যাখবা না?'

মা বলে—'হ, আর একবার খুজুম। তুইও চ' দেখি আমার লগে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলে—'ঘাটে কেউ নাই অখন। একলা ডুব দিতে ডর করে।'

টুনু মনে-মনে হাসে। মা সাঁতার জানে, কিন্তু ডুব দিতে মার ভীষণ ভয়।

ঠিক দুপুর। নিস্তরঙ্গ সবুজ জল। কয়েকটা শুকনো পাতা জলের ওপর ভাসছে। খুব নির্জন চারদিকে। কেউ কোথাও নেই।

টুনু বলে—'কোনখানে?'

কাটা সুপুরিগাছ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি করা সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে পা দিয়ে মা ইতস্তত করে। চারদিকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

টুনু আবার বলে—'কোনখানে মা?'

মাঝখানের জলটা সবুজ, আর ঘাটের কাছে ঘোলা। কেউ বাসন মেজে গেছে সেই ছোবড়াগুলো ছাই-কাদার মধ্যে পুকুরপাড়ে পড়ে আছে। কেমন যেন আঁষটে গন্ধ।

ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে মা বলে—'এইখানেই পড়ছে। কিন্তু—'

আঁষটে গন্ধটা এড়াবার জন্যেই টুনু ঘাটের কাছ থেকে সরে এসে ঢেঁকির শাক আর কচুর জঙ্গলের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল।

মা ঠিক কোমরজলে দাঁড়িয়ে আছে। পা ঘষে ঘষে খুঁজছে দুলটাকে। টুনু তাকিয়ে রইল। মা আর একধাপ নামল। জলের দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে আছে মা। কিন্তু জলটা ঘোলা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না মা।

—'এমনই কপাল! দুল কি পাওন যাইব! তিন আনি আর তিন আনি—এই ছয় আনি সোনাই আছিল ঘরে। পোড়ার কপালে ছয় আনির তিন আনি গেল।' ঠিক গলাজলে দাঁড়িয়ে মা বলে—'ইচ্ছা করে বাকি তিন আনিও উদ্দা মাইরা ফ্যালাইয়া দেই।'

কচুগাছের পাতা হাওয়ায় দুলে টুনুর পায়ে লাগে। কেমন সুড়সুড় করে যেন। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাকে দেখে টুনু। জলগুলো গোল চাকতির মতো মার চারদিকে, বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। মা'র মাথাটা একটুকরো কাঠের মতো জলের ওপর ভাসছে।

মার থুতনির কাছে জল এখন।

হঠাৎ মা চিৎকার করে—এই যে, কী জানি একটা পায়ে লাগল রে!'

মা ডুব দেয়। ছলাৎ করে খানিকটা সবুজ জল ফেনা তুলে সরে যায়। টুনু একলাফে ঘাটের কাছে এগোয়। জলের ঠিক ওপরের ধাপে কুঁজো হয়ে হাঁটুতে হাতের ভর দিয়ে তাকিয়ে দেখে মার সাদা শাড়িটা। সবুজ জলের ভিতরে মাছের মতো ডুবে যাচ্ছে। টুনু দম বন্ধ করে থাকে।

কিছুক্ষণ জলটা অল্প ঢেউ তুলল। টুনু তাকিয়ে রইল।

হুস করে মাথা তুলল মা! মুঠো-করা হাতটা জলের ওপর তুলে আঙুলগুলো আলগা করে দিল। মার হাতের চেটোয় ছোট্ট একটা লোহার স্ক্রু।

হাসি পায় টুনুর, কিন্তু হাসে না।

মা'র মুখটা এখন আরও সাদা, ঠোঁট দুটো চেপে লেগে আছে। মা জোরে জোরে নিশ্বাস

ফেলছে এখন।

স্ক্রুটা খুব জোরে আরও গভীর জলের দিকে ছুড়ে দেয় মা। ক্লান্ত সরে বলে—'দ্যাখ তো বুলকি আর পানু এদিকে আছে নাকি আইলে কইস কিন্তু। আমি আর একটু খুঁজি।'

—'আইচ্ছা' জবাব দেয় টুনু। চারদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই।

মার সরু রোগা দেহটা আরও গভীর জলের দিকে সরে যাচ্ছে ঢেউ তুলে। ডিঙি নৌকোর মতো স্বচ্ছন্দ গতি, দুপাশে সরু রেখার তো ঢেউ তুলে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। জোড়া হাতে আর পায়ের আঘাতে জলে ছপছপ শব্দ হচ্ছে আর ঢেউ উঠছে জলে। পায়ের কাছে দুটো ট্যাংরা মাছ মুখ তুলল। টুপ করে ডুবে গেল আবার।

—'আর দূরে যাইও না, মা।' টুনু চিৎকার করে বলে। ভয় করে তার।

—'আরে ডরস ক্যান'। গাঙপারের মাইয়া আমি, এত সহজে ডুবুম না।' মা বলে। জলের ওপর দিয়ে তার গলার স্বরটা কাঁপতে কাঁপতে এল। খুব ক্লান্ত স্বর। জলের জন্যেই বোধহয় ঠিক কাঁশির মতো শব্দ হল।

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে টুনু দেখে মা টপ করে ডুবে গেল। জলের নীচে এখন আর মাকে দেখা যাচ্ছে না। তবু টুনু চোখ দুটো স্থির করে পলক না ফেলে তাকিয়ে রইল। দুপুরের রোদ ওপারে নারকোল গাছের পাতায় লেগে ঝিকমিক করছে।

চোখ দুটো করকর করে তার। চোখে জল আসে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ ঘষে টুনু তারপর আবার তাকায়।

এবার প্রথমে মা'র হাতদুটো সরু দুটো কাঠির মতো জলের ওপর ভেসে উঠল। তারপর মাকে দেখা গেল। টুনু নিশ্বাস ফেলে নড়ে চড় দাঁড়ায়।

মা চিৎ হয়ে পা দিয়ে জল কাটে। চিৎ-সাঁতার দিয়ে পাড়ের দিকে এগোতে থাকে। টুনু বুঝতে পারে যে, মা আর দম পাচ্ছে না।

পাড়ে এসে কাদার মধ্যে সুপুরিগাছ আর বাঁশের সিঁড়িতে বসে হাঁফাতে থাকে মা। দুটো হাত দিয়ে ভর দেয় ছাইমাখা ছোবড়া ছড়িয়ে থাকা নোংরা জায়গাটায়। শাড়িটা কাদায় মাখামাখি।

—'আর পারি না।' ভীষণভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে মা বলে—'দম পাই না আর। পোড়া কপাইল্যা দুল! শরীলটায় পিছা মারে।'

—'আমি একবার দেখুম, মা?'

—'দূর! জলে লামলে ঠাণ্ডা লাগব তার। আরে, কপালে নাই ঘি, ঠক ঠকাইলে হইব কি!' খুব ক্লান্ত সুরে মা বলে। পা দুটো জলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নোংরা মাটিতে হাতের ওপর শরীরের ভার রেখে মাথাটা ডান কাঁধে কাত করে দিয়ে মা বলে। মাথার চুলগুলো একদিকে সরানো। মা'র সরু ঘাড় আর ঘাড়ের ওপর লিটে ঢিবির মতো উঁচু হাড় দেখতে পায় টুনু। মার জন্য কেন যেন ভীষণ কষ্ট হয় তার।

—'মা'—টুনু মার খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে মার পাশেই উবু হয়ে বসে চাপা গলায় বলে—'পরাণ মাঝিরে ডাকুম একবার?'

—'কী হইব হ্যারে ডাইক্যা?'

—'একবার খুইজ্যা দেখব।'

—'পয়সা নিব না? তখন পয়সা পামু কই?'

একটু চিন্তা করে টুনু। বলে—'বেশি লাগব না। দুলটা যদি পাওন যায়—'

Shahnaz

—'হু, দে একবার খবর। বেশি জানাজানি হইলে কিন্তু আমার কপালে কষ্ট আছে।' মা খুব আস্তে আস্তে বলে। জল থেকে পা দুটো টেনে আনে মা। পা দুটো ভেজা, পায়ের পাতার নীচের চামড়াটা সাদা, কোঁচকানো—কাদার মতো নরম। মা একটা হাত উঁচু করে টুনুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—'একবার ধর তো আমারে টুনু। শরীলটা য্যান কাঁপে আমার।'

টুনু মা'কে ধরে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না মা। পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। মাথাটা নুয়ে পড়ছে সামনের দিকে।

—'ওয়াক্'—হিক্কা ওঠে মা'র। টুনু মাকে জড়িয়ে থেকে টের পায় যে মার শরীরের ভিতরটা গুরগুর করে কাঁপছে। মা'কে শক্ত করে ধরে থাকে সে। মাথার ভেজা চুলগুলো সামনের দিকে দড়ির মতো দুলছে। মুখটা সাদা।

আর একবার হিক্কা তোলে মা। খানিকটা হলুদ জল বেরোয় মুখ দিয়ে। তারপর মা হাঁফাতে থাকে। টুনু চিৎকার করে—'কীগো মা কী হইছে তোমার?'

মা এবার তার কাঁধে ভর দেয়—' কিছু না, কিছু হয় নাই। সারাদিন খাই নাই তো কিছু। পিত্তি পড়ছে। গিয়া একটু শুইয়া থাকলেই সারব।'

—'হ তোমারও মাথা খারাপ। এই শরীল লইয়া কেউ জলে ডুবায়?' টুনু বলে। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় যেন।

—'কিন্তু দুলটা'—হাঁফাতে হাঁফাতেই বলে—'আমায় বিয়ার দুল। তর বাবায় দিছিল। বড় শখের দুল রে! সব তো গেছে। এই দুলজোড়া আছিল।' মা কাঁদতে থাকে, আর হাঁফাতে থাকে আর কাঁপতে থাকে।

টুনু ধমক দেয়—'কান্দনের কী হইছে! বাবায় ট্যার পাওনের আগেই দুল পাইয়া যাইবা। অখন গিয়া শুইয়া থাক। আমি পরাণ মাঝিরে একবার খবর দেই।'

মা'কে ধরে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চলতে থাকে টুনু। মা'র গা থেকে ভিজে জলের আর বমির কটু গন্ধ তার নাকে এসে লাগে। একটু গা ঘিন্‌ঘিন্ করে তার।

উঠোনের আগলটা হাত বাড়িয়ে ধরে মা বলে—'তুই এইবার মাঝির কাছে যা। আমি একলাই ঘরে যাইতে পারুম।' তারপর ঘরের দিকে তাকিয়ে দুর্বল স্বরটায় যতদূর সম্ভব জোর দিয়ে মা ডাকে—'বুল্‌কিরে, পানুরে, এদিকে আইয়া ধর দেখি আমারে একটু।'

টুনু বলে—'শয়তান দুইটা পাড়া বেড়াইতে বাইর হইছে বোধ হয়।'

মাকে ধরে মাটি-লেপা দাওয়ায় বসিয়ে রেখে টুনু বলে—'ঘরে গিয়া শুইয়া থাক, আমি পরাণ মাঝিরে খবর দেই।'

পরাণ মাঝি পুকুর থেকে চোখ ঘুরিয়ে টুনুর দিকে তাকাল। একটু হেসে বলল—'না কর্তা, আট আনায় হইব না। পুরা একখানা ট্যাহা দিলে লামতে পারি জলে।'

—'ক্যান মাঝি, জল দেইখ্যা ভয় পাইলা নাকি?' মনে মনে যেন একটু রাগ করেই বলে টুনু। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড চেহারা নিয়ে লোকটা হাসছে।

—'ভয়? কত পদ্মা ম্যাঘনা পার হইলাম কর্তা, অখন হালার পুষ্কর্ণীরে ভয়! দিয়েন কর্তা, বারো আনাই দিয়েন।'

পরাণ মাঝি মাথার গামছাটা খুলে কোমরে জড়াল। এবার খালি মাথাটা দেখতে পেল টুনু। চুলগুলো প্রায় সাদা হয়ে এসেছে, গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলোও সাদায় কালোয় মেশানো।

শরীরটা মস্ত বড় পরাণ মাঝির, কিন্তু চামড়াটা ঢিলে, কোঁচকানো। খাটো একটা কাপড় আঁট করে পরা। পায়ের অনেকটা দেখা যাচ্ছে। কেঁচোর মতো শিরাবহুল মোটা গোড়ালি। পাগুলো সরু সরু।

খুব আস্তে আস্তে জলটাকে একটুও ঘোলা না করে মাঝি জলে নামতে লাগল। গলাজলে দাঁড়াল মাঝি। এক ঝাঁটি বিচালির মতো সাদা মাথাটা জলে ভাসছে।

টুনু দেখে মাঝির কালো লম্বা শরীরটা প্রকাণ্ড একটা বোয়াল মাছের মতো নড়ছে জলের নীচে।

হুস করে ডুব দেয় মাঝি। অনেকক্ষণ পর ভেসে ওঠে। টুনুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ পাওয়া যায়নি। মুখ থেকে খানিকটা জল 'পিড়িক' করে ছুড়ে দিয়ে আবার ডুব দেয় মাঝি। দুপুরের কড়া রোদে সবুজ, ঘন জলের নীচে অনেক নীচে একটা প্রকাণ্ড মাছের মতো পরাণ মাঝির শরীরটা নেমে যেতে থাকে। তারপর তাকে আর দেখতে পায় না টুনু।

পরাণ মাঝিকে কুশলী ডুবুরীর মতো লাগে টুনুর। যে সব ডুবুরী (সে বইতে পড়েছে) একটুও ভয় না করে সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলে আনে। সেই ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো। মুক্তো দেখেনি টুনু, ডুবুরীও না। পরাণ মাঝিকে দেখে শুধু ডুবুরীর কথা মনে হয়।

পরাণ মাঝির মাথাটা এবার প্রায় মাঝ-পুকুরে ভেসে ওঠে। হাতের মুঠো থেকে খানিকটা কাঁদা ছুড়ে ফেলে পরাণ মাঝি আবার ডুব দেয়। সেই ছুড়ে দেওয়া কাদার মধ্যে কয়েকটা শামুক।

এবার পাড়ের কাছে মুখ তোলে মাঝি। ভীষণভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—'না কর্তা, ঠিক কুনখানে পড়ছে হেঁরে না জানলে হইব না।'

টুনু মনে মনে ভয় পায়। ব্যস্ত হয়ে বলে—'এইখানেই পড়ছে। তুমি আর একটু খুইজ্যা দ্যাখো। ছানের সময় বেশি দূরে যায় নাই মা।'

পরাণ মাঝি হতাশভাবে জলের দিকে একবার তাকায়। ঘাটের সিঁড়িতে ভর দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলে—'দেখি আর থ্যাকবার! হালার দমে কুলায় না, না হইলে হালার পুষ্কর্ণীরে—' কথাটা শেষ না করেই পিচ্ছিল গতিতে সাপের মতো জলে নামে মাঝি।

এবার পরাণ মাঝিকে স্পষ্ট দেখতে পায় টুনু। ঘাটের খাড়া পাড়ের কাছে জলটা গভীর। পরাণ মাঝি প্রকাণ্ড দুটো হাত মাছের পাখনার মতো নাড়তে নাড়তে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু গতিটা এবার আর সহজ নয়। খুব আস্তে আস্তে নামছে মাঝি। সবুজ জলের ভিতরে তার পায়ের সাদা তলাটা নড়ছে। পা দুটো ওপর দিকে আর মাথাটা নীচের দিকে মাঝির।

অনেকটা নেমে প্রায় পুকুরের তলায় মাঝি থেমেছে। টুনু দেখতে পায়, মাঝি খুব সন্তর্পণে মাটিটা দেখছে। একটু পরেই জলটা আস্তে আস্তে ঘোলা হয়ে গেল। কাদা কাদা হয়ে গেল ওপরটা। মাঝিকে আর দেখতে পেল না টুনু।

অনেকখানি জল ছিটিয়ে মাঝি ভেসে উঠল আবার। এবার পাড়ের খুব কাছে। মুখ তুলে দম নেয় মাঝি। বলে—'আর একটু কর্তা, দেখি একবার। মনে লয় পাইয়া যামু।' কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলতে পারল না মাঝি। হাঁফাতে হাঁফাতে কেটে কেটে বলল। বলেই আবার ডুবে গেল জলের মধ্যে। জলের ওপর সাদা কতগুলো বুদবুদ জমা হল। আরও বুদবুদ উঠে এল জলের ভিতর থেকে। কাচের মার্বেলের মতো সেগুলো ভাসতে লাগল জলের ওপর।

টুনু তাকিয়ে দেখে মাঝি উঠে আসছে। টুনু চেয়ে দেখল মাঝির হাতে মুঠো করা কাদা-মাটি।

Shahnaz

পরাণ মাঝি ভেসে উঠল জলের ওপর। ক্লান্ত হাতে জলে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল ওপরে।

'কর্তা'—দম নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে মাঝি বলে—'দ্যাখেন তো এইগুলির মধ্যে আছে নাকি!'

কাদার মুঠোটা খুলে মাঝি তাকে দেখায়। টুনু কাদার দলাটা হাত বাড়িয়ে নেয়। খানিকটা কাদা কয়েকটা পচা গাছের পাতা, একটু শ্যাওলা শামুক। আর কিছু নেই। টুনু নিশ্বাস ছাড়ল।

—'না মাঝি নাই তো এর মধ্যে।'

কোমরের গামছাটা খুলে মাটিতে বসে সেটা নিংড়োতে থাকে মাঝি। বলে—'দ্যাখলাম য্যান দুলের মতোই। খাংলা দিয়া তুললামও। কপালে নাই কর্তা, কী করব্যান!'

পরাণ মাঝির গলার স্বরটা যেন অনেক দূর থেকে আসছে ঠিক এমনি ক্ষীণ স্বরে সে বলে—'পারি না কর্তা আর। যখন মাঝি আছিলাম শরীরের জোর আছিল। একদমে নদীর তল থিক্যা মাটি উঠাইতাম। গাঙ পার হইতাম ভরা বর্ষায়। হেইদিন গেছে। অখন মাঝির নাম ঘুচাইয়া রিফিউজি হইছি।'

গা মুছতে মুছতে পরাণ মাঝি টুনুর দিকে তাকায়। টুনু মাঝিকে দেখে। প্রকাণ্ড শরীর কড়া পরা হাত। অথচ মাঝির হাত দুটো যেন কাঁপছে।

মাটিতে ফেলে রাখা ময়লা সাদা জামাটার পকেট থেকে বিড়ি বার করে পরাণ মাঝি। সেটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া টেনে বলে—'আছিলাম পরাণ মাঝি, একডাকে মাইনষে চিনতে পারত। কুয়ার মইধ্যে লাইম্যা ঘটি বাটি গলার হার তুলছি, অখনে অ্যাক বুক জলে ডুব দিতেই দম শ্যাষ। বয়স বাড়ছে অখন, শরীলে আর হেই তাকত নাই, প্যাটে ভাত নাই কর্তা।'

মাঝি ধোঁয়া ছাড়ে। আর পুকুরপাড়ে ভেজা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে টুনু বাবার কথা ভাবে। বাবা ফিরে এলে যদি জানতে পারে তবে মা আজ আর বেঁচে থাকবে না। গাটা সিরসির করে তার। বড় দুঃখী মা, টুনু ভাবে মা বড় দুঃখী। লোহার মতো শক্ত হাত বাবার, রোমশ বুক, পেট। খালি গায়ে যখন উঠোনে কিংবা দাওয়ায় বসে তামাক খায় বাবা, তখন তারা কেউ কাছাকাছি যায় না। মাঝে মাঝে যখন মাকে মারে বাবা, বিশ্রী গালাগাল দেয়, তখন মা কুঁইকুঁই করে ইঁদুর ছানার মতো কাঁদতে থাকে। বাবার প্রকাণ্ড দেহের দুটো হাতের ভিতর মাকে তখন ইঁদুরের মতোই ছোট্ট আর অসহায় মনে হয় তার।

পরাণ মাঝি উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা গায়ে দেয়। বলে 'চলি কর্তা — কাইল আইয়া আর একবার দেখুম অনে।'

টুনু চেয়ে থাকে। জামরুল গাছটার তলা দিয়ে বিন্দু-পিসির ঘরের বেড়ার কাছ ঘেঁষে আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে পরাণ মাঝি চলে গেল। টুনু ভাবে ঠিক তার রোগা, ছোট্ট মায়ের মতোই পরাণ মাঝিও যেন দুর্বল। খুব দুর্বল।

টুনু জলের দিকে তাকায় এবার। সবুজ জল, ঘন শ্যাওলা। দুপুরের সূর্য অনেকটা হেলেছে পশ্চিমের দিকে। কিন্তু এখনও দুপুর। গরম লাগছে টুনুর। সে আস্তে আস্তে জলের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

গায়ের শার্টটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল সে ঘাসের ওপর। একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল জলে। কচু গাছ হাওয়া দুলছে। কেমন বিশ্রী একটা আঁষটে গন্ধ। পানা পুকুরের জলে তার ছায়া পড়ল।

টুনু তার ছায়ার দিকে তাকায়। রোগা লম্বাটে একটা ছেলের ছায়া। ছায়াটা জলের ভিতরে। একটা ডুবুরীর মতো জলের মধ্যে থেকে ছায়াটা তাকে দেখছে। মায়ের কথা ভাবল সে, পরাণ মাঝির কথাও। আজ সন্ধ্যাবেলা কিংবা অন্য কোনও দিন যখন বাবা টের পাবে তখন মাকে বাবা মারবে। হয়তো এবার মেরেই ফেলবে। কেননা, দুলটা সোনার আর সোনা বলতে তাদের ঘরে ওই দুলজোড়া-ই।

নিচু হয়ে জলটা দেখতে লাগল টুনু। ইচ্ছে হল একবার পরাণ মাঝির মতো ডুবুরী হয়ে খুঁজে দেখে দুলটাকে। কিন্তু সে সাঁতার জানে না। সাঁতার জানলে পাথর নুড়ি, শ্যাওলা আর গাছের পচা পাতার মধ্যে গিয়ে সবুজ জলে ডুবুরীর মতো সে দুলটাকে একবার খুঁজে দেখত।

একটা পা বাড়িয়ে নিয়ে সিঁড়িতে রাখে সে। ঠাণ্ডা জলটা সুড়সুড়ি দেয় পায়ে। টুনু আর এক ধাপ নামে। আর এক ধাপ। হাঁটুর ওপরে জল এবার। টুনু নিচু হয়।

ঘোলা জলটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন সেই ঘন সবুজ রং। জলের নীচে অনেকটা দেখা যাচ্ছে। টুনু চোখটা বড় বড় করে তাকায়। চোখটা সরিয়ে আনে সিঁড়িগুলোর দিকে। একটা, দুটো, তিনটে সিঁড়ি স্পষ্ট এবং তারপর আরগুলো ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িগুলো গুনতে শুরু করে টুনু—তারপর—

চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজের মুখে হাতচাপা দেয় টুনু। স্পষ্ট পরিষ্কার জলের নীচে চতুর্থ সিঁড়িটার ঠিক শেষে বাঁকা আর সুপুরি গাছের দড়ির বাঁধনটার কাছে সোনার দুলটার ছোট হুকটা চিকমিক করছে। কী আশ্চর্য! কেউ দেখতে পায়নি। টুনু মস্ত বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে। বুকটা ঢিপঢিপ করে তার।

টুনু ঝপ্ করে আর এক ধাপ নামল। কোমরের কাছে জল এবার। প্যান্টটা ভিজে গেল। ঠিক এই ধাপে দাঁড়িয়েই রোজ স্নান করে সে। এর বেশি নামতে সে ভয় পায়। সিঁড়িগুলো উঁচু উঁচু। আর এক ধাপ নামলেই গলা জল।

কিন্তু দুলটা সে নিজেই তুলবে। চারদিকে তাকায় টুনু। কেউ নেই। আরও দু ধাপ নামলে দুলটা।

টুনু পা বাড়ায়। গলা জল।

টুনু নিশ্বাস টানে। পচা শ্যাওলা আর পানাপুকুর আর মাটির গন্ধ। টুনু পা বাড়ায়।

ঝপ্ করে পরের সিঁড়িটায় পা রাখতে না রাখতেই টুনু ডুব দেয়।

দুলটা! হাতের কাছেই।

কিন্তু নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে টুনুর।

সে মাথা তোলে।

পায়ের নীচেই সিঁড়িটা। ওপরের ধাপ। গলা জলে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস টানে টুনু। বুক ভরে বাতাস নেয়। দুলটা তাকেই তুলতে হবে। টুনু তাকায়। জলে ঢেউ। জল ছলছল করছে গলার কাছে। সেই ঢেউ আর সবুজ শ্যাওলার ভিতর দিয়ে দুলটা চিকচিক করছে।

টুনু নিচু না হলে হাতে পাবে না।

ডুব দেয় সে। জলের ভিতরে অন্ধকার। জলের ভিতরে সবুজ রঙের অন্ধকার। পায়ের তলা দিয়ে একটা কী-যেন সরাৎ করে সরে গেল। বোধ হয় মাছ। চমকে ওঠে সে।

হাত বাড়ায় সে। আরও এক ধাপ।

মুখ থেকে বুদবুদ বেরিয়ে গাল ঘেঁষে জলের ওপর উঠে যাচ্ছে।

Shahnaz

পরের ধাপে পা দেয় টুনু। নিচু, আরও নিচু হয়।

আর মাত্র এক বিঘত দূরে দুলটা! দম পায় না টুনু। বুকটা ফেটে যেতে চাইছে।

কোমরের নীচের দিকটা হালকা হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তার মাথাটা নীচে। পরাণ মাঝির মতো হাত দুটো দুদিকে দোলায় টুনু। খুব তাড়াতাড়ি।

দুলের কাছেই হাতটা এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে। শেষবারের মতো দাঁতে দাঁত চাপে টুনু।

দুলটা! কাছেই।

দু আঙুলে মধ্যে হুক-টা!

একটা হ্যাঁচকা টানের সঙ্গে সঙ্গে দুলটা তার হাতের মুঠোয় এসে যায়।

যেন অনেক ভার বুকে। টুনু মুঠো-করা হাতটা বুকের কাছে চেপে ধরে। হাতের আঙুল আর চামড়া কেটে দুলটা যেন তার হাতের মধ্যেই বসে যাবে।

সিঁড়িটায় পায়ের চাপ দিয়ে টুনু সরে যায়। কোনদিকে যে সরছে, তা বুঝবার আগেই চোখে সূর্যের আলো লাগে।

বাতাস! আঃ!

হাঁ করে বুক ভরে নিশ্বাস টানে সে। হাত-পায়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলো শিথিল।

কিন্তু তারপরেই আবার টুনু ডুবে থাকে। এক পলকের জন্য সে দেখতে পায় হাত দশেক দূরে ঘাট। ঘাটে কেউ নেই। সে অনেকখানি সরে এসেছে। হাতের মুঠোয় দুলটা।

প্রাণপণে হাত আর পা দিয়ে জলে আঘাত করে সে। তারপর ডুবে যেতে থাকে। হাতের মুঠোটা শিথিল হয়ে আসছে।

আবার মাথা তোলে। ঘাট এখন হাত-কয়েকের মধ্যেই। কিন্তু টুনুর মনে হল, পুকুরটা যেন বহুবিস্তৃত সমুদ্রের মতো বড় হয়ে গেছে। যেন কূল-কিনারা কিচ্ছু নেই পুকুরটার। থই নেই পায়ের নীচে। হাতের মুঠোয় দুলটাকে প্রাণপণে চেপে রাখবার চেষ্টা করে।

গাঁটে গাঁটে অসংখ্য ফোঁড়ার যন্ত্রণা। সমস্ত শরীরটা শিথিল। হাত পা নাড়তে পারছে না সে। চোখের সামনে সূর্যের আলোটা নিভে গিয়েই জ্বলে উঠছে। কানে শুধু কলকল ছলছল জলের শব্দ।

না, আর জোর নেই শরীরে। আর কিছু নেই। হাতের পেশিগুলো সঙ্কুচিত হচ্ছে না। মুঠোটা আলগা হয়ে আসছে। প্রাণপণে আঙুলগুলোকে বাঁকিয়ে রাখতে চাইছে সে। পারছে না।

প্রাণপণে চিৎকার করতে গেল টুনু। মুখে জল ঢুকল। টুনু ঢোঁক গেলে।

জল তাকে ঘিরে যেন ঘুরছে। তাকে টেনে নিচ্ছে পাতালের দিকে। কত নীচে যে তলিয়ে যাচ্ছে সে! বেঁকানো আঙুলগুলো জট ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। বুক থেকে সমস্ত নিশ্বাস শুষে নিচ্ছে জল। দম নেবার জন্যে সে হাঁ করে। জল ঢোকে মুখে।

মাথাটা ডুবে যাওয়ার আগে হাতচারেক দূরে ঘাট দেখতে পায় সে। দেখতে পায় একপাঁজা বাসন হাতে বিন্দুপিসি আসছে ঘাটের কাছে।

তারপর জল আর পাতাল। ঝাঁকড়া মাথা বিরাট একটা দৈত্যের মতো কার মুখ যেন জলের ভিতরে।...ঝপ্ করে একটা শব্দ। একটা চিৎকার।

শেষবারের মতো ক্লান্তি, ঘুম আর অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে সে টের পায়, তার শরীরটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। বুকটা হালকা। আর ডান হাতের তেলোয় তার মুঠোর মধ্যে শিথিল আঙুলের ফাঁক থেকে গড়িয়ে পড়বার আগ মুহূর্তে দুলটাকে সে অনুভব করে। দুলটা

আছে! হাতেই!

তারপর একটা ছুড়ে-দেওয়া কালো চাদরের মতো অন্ধকারটা তাকে ঢেকে ফেলল।

টুনু চোখ মেলে চায়। অল্প অন্ধকার। ঘরে আলো জ্বলছে। অনেক লোক তাকে ঘিরে, তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। টুনু বুঝতে পারে না কিছু। মার মুখটা সবচেয়ে কাছে। মা কাঁদছে। আর অন্য সকলের ভিড়ের ভিতরে বাবা দাঁড়িয়ে। বাবার পাশেই বিন্দুপিসি। তাকে দেখছে সবাই। সবাইকে একসঙ্গে দেখে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে তার। তারপর আস্তে আস্তে মাথার ঝিমুনি ভাবটা কেটে যায়। মনে পড়ে যায় আজ দুপুরবেলায়, ঠিক দুপুরবেলায় জলের অনেক নীচে সে আর সোনার দুলটা একই সঙ্গে ডুবে যাচ্ছিল।

টুনু চোখ বোজে। ক্লান্তি আর ঘুম।

অনেকক্ষণ পরে তাকায় সে। তার পাশে বাবা। আর কেউ নেই।

আবছাভাবে লণ্ঠনের অল্প আলোয় বাবার মুখটা দেখতে পাচ্ছে সে। মুখটা তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। অল্প দাড়ি বাবার মুখে। কোমল, শান্ত দুটো চোখ। বাবার রোমশ কঠিন একটা হাত আলতোভাবে তার কাঁধের ওপর, আর একটা হাত তার মাথার চুলের ভিতরে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে।

খুব নম্র শান্ত গলায় বাবা বলে—'কেমন আছস রে বাবা?'

—'ভাল—ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয় টুনু।

—'বাঘের বাচ্চা'—বাবা বলে—'বাঘের বাচ্চা তুই।'

সব কথা বুঝতে পারে না টুনু। তবু চুপ করে থাকে।

রান্নাঘর থেকে মা এ-ঘরে এল।

'টুনু, টুইন্যারে, তর দুধ আনছি'—এই বলে মা তার শিয়রের কাছে বসে। মা'র চুলগুলো ছাড়া। আবছা আলো-আঁধারেতে মা'র মুখটা দেখতে পায় সে। আর দেখতে পায় মা'র বাঁ কানের লতিটা আর শূন্য নেই। সেখানে ঝকঝক করে জ্বলেছ দুলটা। মা'র মুখটা হাসছে। যেন ভাঙাচোরা হাড়-উঁচু মুখটা বদলে গেছে হঠাৎ। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মা'কে। মা'র মুখটা অনেক উঁচুতে। দুল দুটো যেন মুক্তো—যে মুক্তো সমুদ্রের অনেক নীচে থেকে কুড়িয়ে আনে ডুবুরীরা।

টুনু নড়ে।

—'না, তুই উঠিছ না'—বাবা বলে।

মা তার কপালের ওপর ঈষৎ তপ্ত একটা হাত দিয়ে চাপ দিয়ে বলে—'উঠিছ না তুই, আমি তরে ঝিনুক দিয়া খাওয়াইয়া দিতাছি।'

টুনু তাকায়। ওপাশের মাচাইয়ে বুলকি আর পানু ঘুমোচ্ছে।

টুনু হাঁ করল। দুটো ঠোঁটের কোণে ঝিনুকটা আর মার কয়েকটা আঙুল। অল্প গরম দুধটা তার জিভ বেয়ে গলার কাছে নেমে এল। হাসি পেল টুনুর, যেন সে অনেক অনেক ছোট হয়ে গেছে। যেন সে মার কোলে, আর মা তাকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাইয়ে দিচ্ছে।

শেষবার তার ঠোঁটের পাশ থেকে ঝিনুকটা সরিয়ে নিতে নিতে মা বলে—'এই ঝিনুকটা দিয়া ছোটবেলায় তরে দুধ খাওয়াইতাম। তর কি আর মনে আছে? মা'র গলাটা কাঁপছে অল্প অল্প। মা'র চোখে বোধহয় জল।

—'হ অর কি মনে থাকনের কথা।' বাবা বলে।

Shahnaz

বাবা যেন একটা কাচের ওপাশ থেকে কথা বলছে। গলার স্বরটা ক্ষীণ। বাবা যেন দুর্বল, কথা বলতে পারছে না। বাবা কাঁদছে? না, বাবা কাঁদছে না। বাবা কোনওদিকে তাকিয়ে নেই। গায়ের চাদরটা দিয়ে দেহটা ঢাকা। চোখ দুটো বন্ধ। ভেজা-ভেজা। অল্প অল্প দুলছে বাবা। ছবিতে দেখা যিশুখ্রিস্টের মতো মুখ বাবার।

হঠাৎ টুনুর মনে হল, খুব সুন্দর তার বাবা। খুব সুন্দর। বহু-পরিচিত পুরনো বাবাকে যেন চিনতে পারছে না সে। এখন এই আধো-অন্ধকার ঘরে শিয়রের কাছে মা, আর পাশে খুব কাছেই বাবা। খুব কাছাকাছি দুজন। মা আর বাবা। দুজনেই তাকে ছুঁয়ে আছে।

খুব ক্ষীণ স্বরে, যেন একটা কাচের ওপাশ থেকে বাবা বলে—'মধ্যে মধ্যে মনে লই যে মরি। অখন মরণ হইলেই ভাল। কিন্তু মাইজ্যা বউ, এত সহজে আমরা মরুম না। আমরা—'

আর শুনতে পায় না টুনু। ঘুমে জুড়ে আসে চোখ। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়, মা বাবা আর পরাণ মাঝি যেন একই রকমে দুঃখী, অসহায় দুর্বল। তারা কেউ নিষ্ঠুর নয়।

তারপর সুখী টুনু, তার দুঃখী মা-বাবার মাঝখানে থেকে তাদের শরীর ওম-এর ভিতরে ডুবুরী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে, আর তার দুঃখী মা-বাবা তার ছোট রোগা নরম শরীরে তাদের নিজেদের দেহের তাপ সঞ্চার করে দিতে দিতে একটা বৃহত্তর কূল-কিনারাহীন অথই অন্ধকারের সমুদ্রের ভিতরে পৃথিবীর আরও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে একই দুঃখ-বেদনায় জ্বলতে জ্বলতে খুব ছোট্ট সোনার টুকরোর মতো সুখস্বপ্নের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে ডুবে যেতে লাগল।

তোমার উদ্দেশে

"In search of you, in search of you...

ওইখানে তুমি থাকো। ওই সাদা বাড়িটায়, যার চূড়ায় শ্বেতপাথরের পরিটাকে বহু দূর থেকে দেখা যায়। নির্জন তোমাদের ব্যালকনি, বড় বড় জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে, দেয়ালে লাগানো এয়ারকুলার। মসৃণ সবুজ লনে বুড়ো একটা স্প্যানিয়েল কুকুর ঘুমিয়ে আছে।

পরিষ্কার বোঝা যায়, এসব এক পুরুষের ব্যাপার নয়। জন্মের পর থেকেই তুমি দেখেছ খিলান-গম্বুজ, বড় ঘর, ছাদের ওপর ডানা মেলে-দেওয়া পরি—যা কেবলই উড়ে যেতে চায়। যায় না।

বিকেলের রাস্তায় ক্বচিৎ চোখে পড়ে কালো যুবতী আয়া মন্থর পায়ে প্র্যাম ঠেলে নিয়ে চলেছে। কদাচিৎ দু-একজন ভবঘুরে লক্ষ্যহীন চোখ চেয়ে হেঁটে যায়। বড় সুন্দর অভিজাত নিস্তব্ধতা তোমাদের। তাই যদিও আমার পথে পড়ে না, তবু আমি মাঝে মাঝে তোমাদের এই নির্জন পাড়ার রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে যাই।

আজ দেখলুম তোমাকে। তুমি একা হেঁটে যাচ্ছিলে।

যখন ক্বচিৎ কখনও তুমি এরকম হেঁটে যাও, তখনই বলতে কি তোমার সঙ্গে এক সমতলে আমার দেখা হয়। আজ যেমন। নইলে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখি তোমাদের মভ্ রঙের মোটরগাড়িতে। হু হু করে চলে যাও।

তোমাদের পুরনো মোটর গাড়িটার কোনও গোলমাল ছিল কি আজ! কিংবা নিকেলের চশমা চোখে তোমাদের সেই বুড়ো ড্রাইভারটার!

অনেকদিন দেখা হয়নি। দেখলুম এই শীতকালে তুমি বেশ কৃশ হয়ে গেছ। সাদা শাড়ি পরেছিলে, তবু কচি সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছিল তোমাকে। সুন্দর অভ্যাস তোমার—শাড়ির আঁচল ডান ধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত শরীর ঢেকে দাও, মুখ নিচু করে হাঁটো—যেন কিছু খুঁজতে খুঁজতে চলেছ। নাকি পাছে কারও চোখে চোখ পড়ে যায় সেই ভয়েই তোমার ওই

Shahnaz

সতর্কতা। ও-রকম মুখ নিচু করে যাও বলেই বোধহয় তুমি কোনওদিন লক্ষ করোনি আমায়। আজকেও না।

মোড়ের মাথায় রঙ্গন গাছের ছায়ায় যে লাল ডাকবাক্সটা আছে তুমি সেটা পেরিয়ে গিয়ে বাঁক নিলে। তোমাকে আর দেখা গেল না। এত কাছ দিয়ে গেলে আজ যে, বোধহয় তোমার আঁচলের বাতাস আমার গায়ে লেগেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল একটুক্ষণের জন্য তোমার পিছু নিই। নিলুম না। কেননা ফাঁকা রাস্তার মোড় থেকে বেঁটে, মোটাসোটা, কালো টুপি পরা লাল ডাকবাক্সটা স্থির গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল তোমার পিছু নিতে গেলেই সে গটগট করে হেঁটে এসে আমার পথ আটকাবে।

একটু আগে আমি ওই মোড় পেরিয়ে এলুম। বাঁক ছাড়িয়ে কিছুদূরে এক গাড়িবারান্দার তলায় দেখলুম জটলা করছে পাড়ার বকাটে ছেলেরা। বড় রাস্তাতেও রয়েছে নির্বোধ পুরুষের ভিড়। একা ওইভাবে কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? আমার কাছ থেকে তুমি যত দূরে আছ, সুরক্ষিত আছ, অনেকের কাছ থেকে কিন্তু তুমি তত দূর নও। আমি তাই অনেকক্ষণ ভাবলুম তুমি ঠিকঠাক চলে যেতে পেরেছিলে কি না।

তোমাদের পাড়া ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই কয়েকটা ভিখিরির ছেলেমেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। রুক্ষ চুল, করুণ চোখ, কৃশ চেহারা। লক্ষ করলুম একটি ছেলের মাথায় ঠোঙার মুকুট। একটি মেয়ের গলায় শুকনো গাঁদা ফুলের মালা। কাছেই ফুটপাতের কোথাও বসে এতক্ষণ বর-বউ খেলছিল বোধহয়। কিছু সময় তারা আমার পিছু নিল। 'দাও না, দাও না।' উলটো দিক থেকে ধীর গতিতে হেঁটে আসছিল একজন পুলিশ। কাছাকাছি হতে হঠাৎ কি ভেবে সে তার হাতের ব্যাটনটা দুলিয়ে বলে, 'ভাগ।' বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেলে সে একবার আমার দিকে চেয়ে একটু তৃপ্তির হাসি হাসল। আমিও হাসলুম। বাচ্চাগুলো দূর থেকে চেঁচিয়ে বোধহয় আমাকেই বলছিল 'ভাগ। ভাগ।'

২

রাত সোয়া ন'টায় সোমেনের পড়ার ঘরের পাশে হলঘর থেকে ওদের পুরনো প্রকাণ্ড দেয়াল ঘড়িটায় পিয়ানোর টুংটাং বেজে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে হাই তুললাম। সোমেন তার বইপত্র গুছিয়ে রাখছিল।

চলে আসছিলুম, সোমেন ডাকল, 'মাস্টারমশাই।'

'বলো।'

'কাল সবাই বরানগর যাচ্ছি, মাসিমার বাড়ি। পড়ব না।'

'আচ্ছা।'

'আর মাস্টারমশাই...' বলে ও লাজুক মুখে একটু হাসল।

'কী হল?'

কথা না বলে ও ইঙ্গিতে হলঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিল। হলঘর পেরিয়ে ওদের অন্দরমহল। আজ হলঘরটা অন্ধকার। মাঝে মাঝে অন্ধকার থাকে। বললুম, 'তুমি না এস. ও. পি. সি.-তে বক্সিং করো! একটা অন্ধকার হলঘর পার হতে পারো না! বলতে বলতে কাঁধে হাত রাখলুম। কিছুদিন আগে পৈতে হওয়ার পর মাথার চুল এখনও ছোট ছোট—আর দণ্ডীঘরের ব্রহ্মচর্যের আভা এখনও ওর সমস্ত শরীরে ফুটে আছে।

'এই ঘরে তোমার দাদু মারা গিয়েছিলেন না! বেঁচে থাকতে যিনি তোমাকে অত ভালবাসতেন, মরার পর কি তিনি তোমামাকে ভয় দেখাতে আসবেন?'

শুনে সামান্য শিউরে উঠল সোমেন। আমি ওর মাথায় হাত রাখলুম। কখনও যখন হোম-টাস্কের খাতার দিকে ঝুঁকে থাকা ওওর মনোযোগী মুখে টেবিল বাতির সবুজ ঢাকনার আলো এসে পড়ে, কিংবা যখন কখনও ভুলে যাযাওয়া পড়া মনে করার চেষ্টায় ও দাঁতে ঠোঁট চেপে, হাত মুঠো করে অসহায় চোখে টাল-মাটাল তাতাকায় তখন আমার কখনও কখনও মনে হয়—এই সুন্দর, পবিত্র ছেলেটি আমার। এই আমার ছেলে সোমেন—যার হাতে রাজ্যপাট দিয়ে খুব শীগগিরই একদিন আমি বানপ্রস্থে যাব।

আমি হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালুম। সোমেন এক ছুটে অন্ধকার হলঘর পার হয়ে গেল।

আমাদের বাসার সদর দরজার ছিটকিনিটা বাইরে থেকেই খোলা যায়। প্রথমে দরজাটা টেনে বন্ধ করো। তারপর ডানদিকের পাপ্পাটা আস্তে চেপে ধরো। খুব অল্প একটু ফাঁক হবে। সেই ফাঁকে সাবধানে ঢুকিয়ে দাও বাঁ-হাতের ৪ আঙুল। এইবার আঙুলটা ডানদিকে বেঁকিয়ে দিলেই তুমি ছিটকিনির মুখটা নাগালে পাবে। সেটাটা ওপরে তুলে ঘোরাও। তারপর ছেড়ে দাও। ঠক করে ছিটকিনি খুলে যাবে।

রাত সাড়ে দশটায় কৌশলে সদরের ছিটকিনি খুলে, অন্ধকার প্যাসেজ পার হয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম। বাতি জ্বলছে। মা'র বিছানায় মশারি ফেলা। মার জেগে থাকার কোনও শব্দ শোনা যায় না।

রান্নাঘরে আমার ভাতের ঢাকনা খুলে বেড়ালে মাছ খেয়ে গেছে। মা টেরও পায়নি। আজকাল বড় সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে মা। বয়স হচ্ছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ বুকের ওপর ঝুঁকে নেমে আসা মাথা। খেয়াল হতে চমকে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করে, 'কী বলছিলাম যেন!' আমি হেসে বলি, 'কিছু না মা, ঘুমো না।'

রান্নাঘরের জানালার একটি শার্সি ভাঙা। মেঝের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঝোল, আর তার সঙ্গে এখানে-ওখানে বেড়ালের পায়ের ছাপ। ভাঙা শার্সিওলা জানালাটা পর্যন্ত গেছে। ভাতের পাশে কালচে আর মেরুন রঙের দুটো তরকারি, হাতল ভাঙা কাপে হলুদ ডাল। রাতে ঠাণ্ডা এই খাবরের দিকে চেয়ে মনে হয় মুখে দিলে বড় বিস্বাদ লাগবে।

খেয়ে ঘরে এসে একটা সিগারেটে ধরাব, মা ঘুমের মধ্যেই অঃ' শব্দ করে পাশ ফিরল।

'কে!'

'আমি।'

মা চৌকির শব্দ করে উঠে বললল, 'দেখ তো, একটা চিঠি এসেছে বিকেলে। চোখে ভাল দেখি না। দেখ তো। কর্তার চিঠি মনেন হয়।'

মশারির ভিতর থেকে হাত বেরার করে মা আমার হাতে চিঠি দিল, 'জোরে পড়।'

কালচে রঙের পাকিস্তানি পোস্টকার্ডের ওপরে ইংরেজিতে লেখা—'কালী। তার নীচে পাঠ : 'পরমকল্যাণবরেষু বাবা রু, ইইতিপূর্বে তোমার নিকটে কার্ডে পত্র দিয়াছি তাহা পাইয়াছ কিনা জানাইও। তোমাদের চিঠি না পাইলে চাঞ্চল্য ও চিন্তা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখুনি অসুখ অশান্তি দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খারাপ হইয়া যায়—চোখে ভালরূপ দেখিতে পারি না বলিয়া নানারূপ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বর্তমান অবস্থা ব্যবস্থা দৃষ্টে

Shahnaz

প্রতীয়মান হয়, তাড়াতাড়ি কোনো কিছু না হইলে অবস্থা ক্রমশ জটিল ও সঙ্কটাপন্ন হইবে। তোমার কাগজাত ঢাকা আসিলে অবশ্য খবর পাওয়া যাইত। অনিলের সহিত যোগাযোগ করিও। ঐ সঙ্গে কলিকাতা পাকিস্তানী হাই-কমিশনার বরাবর দরখাস্ত দিয়া তাহাতে অনুমতি পাইবার ব্যাপারে রিকমেন্ড করাইয়া পাঠাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। কারণ এখানকার ডি আই জি হইতে পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও দুষ্প্রাপ্য জানিবা।...বলিয়াছিলাম, বরং মুসলমান হইব তবু ভিটা ছাড়িব না।...অসুখে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি...তোমরা নিকটে না থাকায় অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল বোধ করি। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, রিকমেন্ড থাকিলে কাজের সুবিধা হইবে। দেরী হইলে আরও বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়া পড়িব...তোমাদের সহিত আর দেখা হইবে না। হিন্দুস্থানে মরিতে চাহি। তোমার গুড়া কাকিমার মাথার কিছু বিকৃতি দেখা দিয়াছে—আজ চার-পাঁচ মাস যাবৎ নানারূপ চিকিৎসা চলিতেছে। সোনারপুরে আমাদের যে জমি তাহাতে অন্তত দুইখানি দুই চালা তোলার চেষ্টা করিও। বর্তমান যে দুঃসময় দেখা দিয়াছে তাহাতে মিতব্যয়ী না হইলে নিরুপায় হইবা। সাবধানে থাকিও ও মঙ্গল জানাইও। অন্যান্য এক প্রকার। ইতি আং তোমার বাবা।"

চিঠি শুনে মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সারাদিন তুই করিস কি? সার্টিফিকেটটার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করলে যদি হয়, করিস না কেন! অনিলের কাছে যা—ও অত বড় চাকরি করে, ঠিক বের করে দেবে।'

'যাব।'

'যাস! বুড়ো বয়সে এখন জেদ কমেছে লোকটার, এইবেলা নিয়ে আয়।'

মা মশারির ভিতরে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। বলল, চোখে কেন কুয়াশার মতো দেখি আজকাল। কর্তা আসবে, তার আগেই একবার হাসপাতালে নিয়ে যাস তো!'

আমি মা'র মশারি তুলে দিয়ে ভিতরে পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে শুলুম। 'মশা ঢুকছে না!' বলে ছোট্ট একটু ধমক দিয়ে মা আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'কী এত খরচ করিস! এতদিন একটু আধটু জমালে দুটো দোচালা সত্যিই উঠে যেত। একটু গাছ-গাছালি লাগাতে পারতুম। নিজেদের বাগানের ফল-পাকুড় খাই না কত দিন!'

'একটু আদর করো না সোনা মা!'

৩

আমার সামনের রাস্তায় হঠাৎ পড়ে লাফিয়ে উঠল একটা লাল বল। এমন চমকে উঠেছিলুম! তারপরই শোনা গেল সামনের হলুদ বাড়িটার দেওয়ালের আড়াল থেকে বাচ্চা ছেলেদের চিৎকার, 'ওভারবাউন্ডারি...ওভারবাউন্ডারি!...মিলনের একুশ।' শুনে আমি আপন মনে হেসে উঠলুম।

পিছনের পার্কটায় দেখে এলুম এক পাল কাকের সভা বসেছে। আর খোলা মাঠে ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে খেলছে বাতাস। মোড় ফিরতেই মুখোমুখি দেখা হল সেই মোটা, লাল ডাকবাক্সটার সঙ্গে। দূরে দেখা যায় তোমাদের বাড়ির চূড়ায় পরিটাকে—আকাশের দিকে বাড়ানো এক হাত—অন্য হাতে সে তার বাঁদিকের স্তন ছুঁয়ে আছে।

এখন দুপুর। রাধাচূড়া গাছের তলায় জলের ড্রাম, পেতলের থালা, আর ছাতুর ঝুড়ি সাজিয়ে বসেছে এক অল্পবয়সী চাতুওয়ালা। তাকে ঘিরে রিকশাওয়ালাদের ভিড়। এক হাত

খাবারের থালায় রেখে অন্য হাতে লোভী পাখিপক্ষীদের তাড়াতে তাড়াতে যখন মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে তখন মনে হয় ওই খাবারের সঙ্গে আকাশ, মাটি ও উদ্ভিদের বড় মায়া মিশে আছে। ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে বসে যাই।

চমৎকার দিন আজ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। শীতের খর বাতাস বইছে।

তুমি আজ কোথাও ছিলে না। যখন তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেলুম তখন দেখি একটা ঘাস-ছাঁটা কল বাগানময় ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে তোমাদের মালী। ব্যালকনিতে দুটো ডেকচেয়ার। তোমাদের অর্ধবৃত্তাকার গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটা একটা স্কুটার, যার রং ছানার জলের মতো সবুজ।

সারা দুপুর আমি আজ আর ভুলতে পারলুম না—ওই ঘাস-ছাঁটা কল, দুটো ডেকচেয়ার, আর ওই সবুজ একা একটা স্কুটার।

৪

আজ প্রথম পিরিয়ডে আমি ক্লাসে ছাত্রদের ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখের ভিতরে তখনকার গার্হস্থ্য চিত্র আর সমাজজীবন বিষয়ে একটা প্রশ্ন লিখতে দিয়ে জানালার কাছে এসে যখন দাঁড়ালুম তখন দেখা যাচ্ছে আকাশে নিচু একটু মেঘ। বৃষ্টি হবে কি! বৃষ্টির আগে ভেজা মাটির যে গন্ধ পাওয়া যায় আমি তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম। বৃষ্টি এল না! শেষ ক্লাস ছিল সেভেন-এ। ওরা গেল ক্লাস লিগে ক্রিকেট খেলতে। টিফিনে তাই ছুটি পেয়ে বেরিয়ে আসছি, গিরিজা হালদার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, সই করুন।' চটপট সই করে দিলুম! হালদার গজগজ করতে করতে কমনরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'কিসে সই করলেন, একবার পড়েও দেখলেন না।' চেঁচিয়ে বললুম, 'যে কোনও আন্দোলনই করুন—আমি সঙ্গে আছি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।' বেরিয়ে এসে খুশি মনে দেখলুম ঝকঝক করছে দিন।

পাবলিক ইউরিন্যালের নোংরা দেয়ালে পেন্সিলে লেখা অনেক অশ্লীল কথার মধ্যে কে লিখে গেছে—গোপাল আর নাই। 'গোপাল' থেকে পেন্সিলের হালকা রেখা 'নাই'-তে এসে গম্ভীর। যেন বা হতাশা থেকে ক্রমে ক্রোধ! লেখা নেই, তবু মনে হয় হতাশার 'হায় গোপাল' থেকে শুরু, শেষে এসে রাগ—'নাই কেন?' লেখা আছে—গোপাল আর নাই। আমি পড়লুম—'হায়! গোপাল!' পড়লুম, 'গোপাল আর নাই কেন?'

বেরিয়ে আসছি, দেখি দেশপ্রিয় পার্কের কাছ ট্রামের স্টপে ভিড়ের মধ্যে একটা চেনা মুখ! সুধাকর না! কলেজ টিমের দুর্দান্ত লেফট আউট ছিল! দেখি গায়ে চর্বি জমেছে, থলথল করছে ভুঁড়ি, কাঁধে ঝুলছে শান্তিনিকেতনের ঝোলা ব্যাগ। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল।

ফার্স্ট ডিভিশনেও কিছুদিন খেলেছিল সুধাকর। তখন ওর দৌলতে ডে স্লিপে কত খেলা দেখেছি। মনে পড়ে লাইটহাউসে দুজনে দশ আনার লাইন দিতে গেছি, দুটো অচেনা ছেলে লাইন থেকে ডেকে বলল, 'আপনি এস সেন না?' সুধাকর মাথা নাড়ল—'হ্যাঁ'। 'আসুন না, এখানে জায়গা করে দিচ্ছি।' লাইনে দাঁড়িয়ে সুধাকর চাপা গলায় বলেছিল, 'কিরে শালা দেখলি!'

চার বছর আগে শেষ দেখা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের সামনে। তখন ওর মায়ের ক্যানসার। ইউটেরাসে। দুজনে চৌরঙ্গি পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলুম। বললে, 'খেলা ছাড়ার পরই একটা মজার চাকরি পেয়ে গেছি ভাই। কনস্ট্রাকশনে। কাজকর্ম কিছু বুঝি না, কিন্তু এধার-ওধার

Shahnaz

থেকে কেমন করে যেন পয়সা এসে যায়!' পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি ইমমর‍্যাল নই, খেলার মাঠেও মার না খেলে কখনও মারিনি।' তখন শীত শেষ হয়ে কলকাতায় গরম পড়ে গেছে, তবু সুধাকরের গায়ে ছিল একটা পুরনো ব্লেজার—বুকের কাছে মনোগ্রাম করা, যেন চোখ পাকিয়ে বলছিল—আমি খেলোয়াড় সুধাকর।

আমি ওকে ডাকলুম না। দূর থেকে দেখলুম ধুতি-পাঞ্জাবি-চপ্পল পরা মোটা থলথলে সুধাকর যেন সবাইকে দেখিয়ে চলন্ত ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে চটপটে পায়ে পা-দানিতে উঠে গেল।

সন্ধেবেলায় কফি হাউসে অনেকের সঙ্গে দেখা। অমর ফিরেছে বিলেত থেকে অনেক দিন পর। আড্ডা তাই জজমাট ছিল। অমররা সিং। পাঞ্জাবি শিখ, বাঙালি হয়ে গেছে। আগে দাড়ি গোঁফ পাগড়ি ছিল না।

আজ দেখি জালে ঢাকা দাড়ি, মাথায় জরির চুমকি দেওয়া পাগড়ি, বললুম, 'আগে না তুই ছিলি মেকানাইজড শিখ! তবে আবার কেন দাড়ি গোঁফ পাগড়ি, হাতে কেন তোর বালা?'

হাতজোড় করে বলল, রিলিজন নয় ভাই, এ আমার পলিটিক্স। বিলেতে গিয়ে দেখি ইন্ডিয়ানদের পাত্তা দেয় না। আমার গায়ের রং ফরসা, অনেকেই সাহেব বলে ভুল করে, খাতির যত্ন পাই। কেমন লেগে গেল সেন্টিমেন্টে। তাই দাড়ি গজিয়ে পাগড়ি বেঁধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম—ইন্ডিয়ানদের যে পাওনা তাই দাও আমাকে। খাতির চাই না।

রাত আটটার সময় ওরা উঠে গেল মদের দোকানে। সেলিব্রেট করবে। আমি গেলুম না। যাওয়ার সময় তুলসী আড়ালে ডেকে বলে গেল, অনিমেষকে একবার দেখতে যাস। ওর অসুখ।'

'কী অসুখ!'

মুখ টিপে হেসে বলল, 'বলছিল, অসুখের নাম মীরা। দেখিস গিয়ে।'

৫

রাত সাড়ে ন'টায় আমি লন্ডনের এক অচেনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। চারদিক হিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ পড়বে। একটা দোতলা বাস হল্টে থেমে আছে, বাস-এর পিছনে বিজ্ঞাপন—'সিনজানো'। চোখ পড়ে অদ্ভুত পুরনো ধরনের গথিক লাইটপোস্ট, ভিকটোরীয় দালানের ভারী স্থাপত্য, পিছনে দূরে বহুতল স্কাইস্ক্র্যাপারের জানালায় আলোর আভাস। ওভারকোটের পকেটে আমার দুই হাত। আমি হেঁটে যাব। সামনের যে কোনও পাব-এ রহস্যময়ভাবে ঢুকে আমি খেয়ে নেব এক গ্লাস বিয়ার, অল্প গুনগুন করে গাইব ওই অচেনা শব্দটি যা কিনা কোনও মদের নাম—'সি-ই-ন-জা-আন্-ও-ও'। ঘরে ফেরার আগে আমি কোনও হোটেলের বলরুমে ঢুকে নেচে নেব। দু চক্কর নাচ, 'হেঃ এ, টুইস্ট, টুইস্ট, টুইস্ট।'

আমি দূর বিদেশে পৌঁছে গেছি আজ। ঘন কুয়াশার পর্দা সরালেই দেখা যাবে আমার চারধারে জীবন্ত এই ছবি।

চেনা রাস্তাঘাট আজ আর চেনা যাচ্ছিল না। বিবর্ণ দেয়াল, ছেঁড়া পোস্টার, কালো ক্ষয়া চেহারার মানুষ—এই সবই ঢাকা পড়েছিল। কলকাতায় বড় সুন্দর ছিল আজকের কুয়াশা। হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি ধরিয়ে নিলুম একটা সিগারেট। ট্রাফিকের সবচেয়ে সুন্দর আর ক্ষণস্থায়ী হলুদ বাতিটি ঝলসে উঠলে স্টেটবাসের গিয়ার বদলানোর শব্দ হয়েছিল। জ্বলে উঠল সবুজ। 'আস্তে ভাই ট্যাক্সিওয়ালা' বলতে বলতে আমি ডান হাত ট্রাফিক পুলিশের ভঙ্গিতে তুলে ধরে দুই

লাফে রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

আমার যাওয়ার কথা বকুলবাগান, সেদিকে না গিয়ে আমি মোড় নিলুম ডাইনে, এসে দাঁড়ালুম আদিগঙ্গার পোলের ওপর। আমার পায়ের তলা দিয়ে অন্ধকার রেলগাড়ির মতো বয়ে চলেছে জল। না, গঙ্গা কোথায়! এ তো রাইন! অদূরে ট্রাফলগার স্কোয়ার থেকে ভেসে আসছে রাতের ঘুমভাঙা কবুতরের পাখার শব্দ, আমার পিছনে অস্পষ্ট ইফেল টাওয়ার, সামনে বহুদূরে স্ট্যাচু অব লিবার্টি, বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে শম্ভুগঞ্জের দিকে ভেসে চলেছে গুদারা নৌকা। কুয়াশার আবডাল সরে গেলেই সব দেখা যাবে। কিংবা বলা যায়, কুয়াশার আবডালেই বহু দূরের সব কিছু পুরনো এই কলকাতার হৃদয়ের বড় কাছাকাছি এসে গেছে। কাছে আসবার এই তো সুসময়—বর্ষায়, বা ঝড়ে, বা কুয়াশায়! ভালবাসায় একাকার হয়ে যায় পৃথিবী, সমুদ্র তার তট অতিক্রম করে উত্তাল হয়ে আসে স্থলভূমির দিকে, আমাদের চেনা শহরে ফুটে ওটে অচেনা বিদেশের ছবি।

আজ রাতে তুমি একবারও খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে কি? যদি দাঁড়াও, তবে—আমার মনে হয়, তুমি টের পাবে তোমাদের বাড়ির চূড়ার শ্বেতপাথরের পরিটা কুয়াশার আড়ালে তার মার্বেলের ভিত ছেড়ে উড়ে গেছে মোড়ের ওই লাল রঙের বেঁটে ডাকবাক্সটার কাছে। বহুকালের পুরনো তাদের প্রেম—কেউ কখনও টেরও পায়নি। এখন পায়ের কোনও শব্দ না করে যদি তুমি ছাদে উঠে যেতে পারো তবে দেখবে—পরিটা সত্যিই নেই।

নাকি রাতের ডাকে চিঠিপত্র চলে গেছে বলে হালকা সেই ডাকবাক্সটাই বেলুনের মতো উড়ে এসেছে তোমাদের ছাদে! পরিটার কাছে! এখন তাই ডাকবাক্সটা খুঁজে না পেয়ে পৃথিবীর ভুলো মানুষেরা ভাবছে—কোথায় গেল আমাদের এতকালের চেনা সেই ডাকবাক্স! নাকি আমাদেরই রাস্তা ভুল!

৬

অনিমেষ একা থাকে। অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম।

শুয়ে আছে। দেখলুম নাকটা অল্প ফুলে লাল হয়ে আছে। মুখের এখানে ওখানে ফাটা-ছেঁড়া, কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত টানা লম্বা একটি কালশিটের দাগ।

আমাকে দেখে কনুইয়ে ভর রেখে উঠবার চেষ্টায় মুখ ভয়ঙ্কর বিকৃত করে বলল, 'চারটে লোক! বুঝলি, চারটে লোক ফিলজফি পালটে দিয়ে গেল।'

'কী হয়েছে তোর?'

'কি জানি। একা পড়ে আছি, সিগারেট এনে দেওয়ারও লোক নেই। আর শালা দুপুরটা যে কি লম্বা মনে হয়!'

'চারটে লোক কারা?'

পাশ ফিরে বলল, 'চিনি না! নাইট শো দেখে ট্যাক্সিতে ফিরছি, তখন রাত বারোটা। আমার ঘরের সামনে ওই যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, মাঠের মতো, বড় রাস্তায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে যেই মাঠে পা দিয়েছি, টের পেলুম ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে চারটে লোক। তক্ষুনি কেন যেন মনে হল—বিপদ। ফিরে দেখলুম ট্যাক্সিটা ব্যাক করে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ভাবলুম ট্যাক্সিওয়ালাকে একবার ডাকি। ততক্ষণে চারটে লোক চটপটে পায়ে এসে আমার চারধারে দাঁড়াল। মুখোমুখি যে, তার হাতে একটা সাইকেল চেন। জিজ্ঞাসা করল—তুমি শালা অনিমেষ

Shahnaz

চৌধুরী? মীরার সঙ্গে তোমারই ভাব? বোঁ করে চেনটা এসে মুখে লাগল। পড়ে যাচ্ছিলুম, ধরে বলল, ঘরে চল। ঘরে নিয়ে এল। আমি তালা খুললে চারজনেই ঢুকল ঘরে। বলল, তোমাকে কাট মারতে হবে। আমি অল্প টলছিলুম, মাথার ভিতরটা ধোঁয়াটে লাগছিল, তবু ওদের কথা বুঝলুম। বললুম, কেন? বলল, মীরার সঙ্গে বিয়ে হবে হরির। ছেলেবেলা থেকে ওদের ভাব, মাঝখানে তুমি কে? হরিকে আমি চিনি, মীরাদের বাসায় কাজকর্মে আসে, ছুতোরের কাজ করে, জগুবাজারে দোকান আছে। আমি মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বললুম, মীরা শিক্ষিতা মেয়ে, হরিকে বিয়ে করবে কেন? আমার বুকে আঙুল ঠুকে বলল, কেন, শালা শিক্ষিতা মেয়ের শরীরে ফুল ফোটে না! পাতা গজায় না? হাসল, বিয়ে করতে না চায়, আমরা জোর করে দেব। সমাজের ব্যবস্থা আমরা পালটে দিচ্ছি শীগগিরই। তোমাকে চিঠি লিখতে হবে। লেখো। ওরা বলে গেল, আমি লিখলুম—প্রিয় মীরা, তোমার সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নেই। কাল থেকে তোমার সঙ্গে কাট। দেখা হলে আমাকে না চিনবার চেষ্টা কোরো। আমি তোমাকে আর ভালবাসি না। ইতি অনুতপ্ত অনিমেষ। লেখা হলে ওরা একটা খাম বের করে দিয়ে বলল, নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দাও। দিলুম। তারপর ওরা আমাকে মারল, মেরে শুইয়ে দিয়ে গেল মেঝেয়। বলে গেল, 'যদি কথার নড়চড় হয় তবে আবার দেখা হবে, না হলে গুডবাই।'

অনিমেষ আমার দিকে চেয়ে চকমকে চোখে হাসল, মীরা এসেছিল দু'দিন পর। দরজা খুললুম না। বাইরে থেকেই বলল, 'অফিসে তোমাকে ফোন করে পাইনি। তুমি এত খারাপ বাংলা লেখো, জানতুম না। এ চিঠি তুমি লিখেছ?' শান্তভাবে বললুম, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করল, কেন? বললুম—

'কী বললি!'

ধপ্ করে বালিশ মাথা থেকে ফেলে অনিমেষ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, 'দুর শালা! সে অনেক কথা। ছেড়ে দে। তোর কাছে যে ক'টা সিগারেট আছে দিয়ে যা।'

আমার সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বালিশের পাশে রাখল, মীরার কথা এখন আর ভাবছিই না। ভাবছি ওই চারটে লোকের কথা। কী আত্মবিশ্বাস! আমাকে দিয়ে ওই চিঠি লিখিয়ে নিল, আর ঘরে ঢুকে মেরে গেল আমাকে, বুঝিয়ে দিয়ে গেল আমার জোর কতখানি। আমি শালা হারামির বাচ্ছা এতদিন ভদ্রলোক...'

রাতে বেড়াল খুঁজতে গিয়ে মা পড়ে গিয়েছিল উনুনের ধারে। হাঁটুতে চোট। একটা আঙুল সামান্য পুড়েছে। ডাক্তার বলে গেল—হাই প্রেসার, সাবধানে রাখবেন। খুব বিশ্রাম। আর নুন বারণ।

পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম, 'কেন মা, এত কাজকর্ম করতে যাও?'

মা মিনমিন করে বলল, 'বউ আন।'

স্বপ্ন দেখলুম।

আমার চোখের সামনে দেয়ালের পর দেয়ালের সারি। আর সেই অসংখ্য দেয়ালের গায়ে কে যেন অবিশ্রাম চক দিয়ে লিখে যাচ্ছে—গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। কোথাও লেখা—'হায় গোপাল!' কোথাও বা—'গোপাল আর নাই কেন?' আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিয়ের 'স্বাগতম' লিখবার লাল শালুতে উড়ছে কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন, বসন্ত—টীকা নিন। বিপদ্—টীকা নিন। ভয়—টীকা নিন।

৭

দেখলুম স্টিয়ারিং হুইলে তোমার দুই অসহায় হাত, অহঙ্কারে একটু উঁচু তোমার মাথা। কপালের ওপর নেমে এসে দুলছে চুলের একটা ঘুরলি। দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসছ। তোমার কপালে ঘাম। তোমার মুখ লাল। পাশে খাকি শার্ট পরা নিকেলের চশমা চোখে বুড়ো সেই ড্রাইভার। একটু ডান দিকে হেলে সে তার একখানি সাবধানী হাত বাড়িয়ে রেখেছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর তোমার হাতের দিকে।

বড় ভালবাসায় তোমাকে আগলে নিয়ে গেল তোমাদের পুরনো মভ্ রঙের গাড়ি। মোড়ের বেঁটে মোটা লাল ডাকবাক্সটা তার কালো টুপি পরা মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চিৎকার করে বলল, 'হ্যাপি মোটরিং মাদমোয়াজেল, হ্যাপি মোটরিং।' বাড়ির চূড়া থেকে শ্বেতপাথরের পরিটা পুব থেকে পশ্চিম মাথা ঘুরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত একবার দেখে নিল—কোনও বিপদ আছে কি না। যত দূরেই যাও, সে তোমাকে ঠিক চোখে চোখে রাখে।

যদিও একটু টাল খাচ্ছিল তোমার গাড়ি, তবু বলি, তুমি অনেকটা শিখে গেছ। আর কদিন পরেই তুমি তোমার গাড়ি একা চালিয়ে নিয়ে যাবে।

চোখ বুজে দেখলুম, দূরে রাসবিহারীর জংশনে ট্রাফিকের লাল আলোয় থেমে আছ তুমি।

থেমেছিলে? নাকি অপেক্ষা করেছিলে?

দেখো একদিন আমি ঠিক রাস্তার মাঝখানে দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দাঁড়াব তোমাদের ওই মভ্ রঙের মোটর গাড়িটার মুখোমুখি। চেঁচিয়ে হয়তো বলব, 'বাঁচাও', কিংবা হয়তো বলব, 'মারো আমাকে।' কুয়াশায় বা ঝড়ে বা বৃষ্টিপাতে কোনওদিন সেই সুসময় দেখা দিলে, তখন আর ওই দুই শব্দের আলাদা মানে নেই।

৮

ফেব্রুয়ারি। কলকাতায় এবারের শীত শেষ হয়ে এল। বাতাসে চোরা গরম। রাস্তায় খুব ধুলো উড়ছে। চারদিকেই রাগী ও বিরক্ত মানুষের মুখ।

বিদায়ী শীতের সম্মানে একদিন স্কুল কামাই করা গেল। 'ম্যাটিনি'তে বেলেল্লা একটা হিন্দি ছবি দেখলুম। আমি আর তুলসী। বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি। লবিতে দাঁড়িয়ে তুলসী হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরছিল। বললুম, 'তোর জমবে না কিছুই। তোর হাতে জল দাঁড়ায় না।' অসময়ে বৃষ্টি, তবু রাস্তায় জল জমে গেল। ট্রাম বাস বন্ধ। হাতে স্যান্ডেল, কাপড় গুটিয়ে দুজনে ছপ করে জলে নামলুম। হঠাৎ অকারণে খুশি গলায় তুলসী বলল, 'পৃথিবী জায়গাটা মন্দ নয়, কি বলিস!'

পাড়ার চেনা ডাক্তার ধরে একদিন টি. এ. বি. সি. দিয়ে দিল। দু'দিন জ্বরে পড়ে রইলুম। মা কাছাকাছি ঘুরঘুর করে গেল বারবার। এমন ভাব—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস, হতভাগা ছেলে, এবার পেয়েছি তোকে। তৃতীয় দিনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলুম। সকালেই দেখি, মা বাক্স খুলে কবেকার পুরনো লালপেড়ে গরদের শাড়িটা বের করে পরেছে। 'কী ব্যাপার?' মা অপ্রস্তুত মুখে একটু হাসল 'কাল রাতে একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি।' মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোর জ্বরটাও সারল। কালীঘাটে একটু পুজো দিয়ে আসি।'

Shahnaz

আমি আর গিরিজা হালদার স্কুল থেকে একসঙ্গে বেরোলুম একদিন। হালদার গলা নামিয়ে বলল, 'আমার জীবনে একটা ট্র্যাজেডি আছে মশাই। আপনাকে বলব একদিন।' পরমুহূর্তেই রুমাল বের করে বলল, 'গরম পড়ে গেল।' রেস্টুরেন্টে বসলুম দুজনে, গিরিজা হালদার কাটলেট খেল না, আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দুটো টোস্ট। আমার মশাই নিরামিষ। দেখেন না হিন্দুর বিধবারা কতদিন বাঁচে।' হালদার প্রাণায়াম-টানায়াম করে। দম বন্ধ করে এক গ্লাস জল খেয়ে মুখ মুছে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লক্ষ করেছেন কলকাতায় অনেকদিন কিছুই ঘটছে না! না লাঠিচার্জ, না গোলাগুলি, না কারফিউ! তেমন বড়সড় একটা মিছিলও দেখছি না বহুকাল। লোকগুলো মরে গেছে, কি বলেন!' অন্যমনস্কভাবে বললুম, 'হুঁ।' হালদার টেবিলে আঙুল বাজিয়ে গুন গুন করল, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে...'

দূর গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপরে উড়োজাহাজের বিষণ্ণ শব্দ। অন্যমনে সাড়া দিই—'যাই।'

রাতে হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসলুম, 'মা, ও মা, তুমি আমায় ডাকলে।' মা জেগে উঠে অবাক গলায় বলল, 'না তো।' বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র পড়ে বলল, 'ঘুমো।' চৌকির শব্দ করে পাশ ফিরল মা, বলল, 'বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না রে!' আমি নিঃশব্দে হাসলুম, 'না তো!'

তারপর অনেকক্ষণ জেগে থাকি। মা'রও ঘুম আসে না। বলে, 'সারাদিন কী যে করিস। ঘুরে ঘুরে আত্মীয়স্বজনদের একটু খোঁজখবরও তো নিতে হয়! আমি মরলে আর কেউ তোকে চিনবেই না। দেখলেও ভাববে কে না কে!' মা'র দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, 'বুঝতেও পারি না, কে বেঁচে আছে, আর কে মরে গেছে। একটু খোঁজ নিস।' জবাব দিই, 'কে কোথায় থাকে মা!' মা আস্তে আস্তে বলে যায়, 'কেন, মাঝেরহাটে তোর রাঙা কাকিমা, কাঁচড়াপাড়ায় সোনা ভাই...' শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মনে পড়ে, ছুটির এক দুপুরে বসে ছিলুম ছোট একটা চায়ের দোকানে। চারটে টেবিল, প্রতি টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার, আর সবুজ পর্দাওলা দুটো কেবিন খালি পড়ে আছে। মাছি ওড়ার শব্দ শোনা যায়। দেয়ালে ভয়ঙ্কর সব যুবতীদের ছবিওলা ক্যালেন্ডার! দুপুরের ঝিমঝিম ভাবের মধ্যে অনেকক্ষণ একা বসেছিলুম। এ সময়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন সাদা চাদর গায়ে বুড়ো এক ভদ্রলোক। চোখে চোখ পড়তেই আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলুম। বড় দয়ালু ওঁর চোখ। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম উনি মনে মনে বললেন, 'এই যে, কী খবর?' তটস্থ আমি তৎক্ষণাৎ মনে মনে উত্তর দিলুম 'এই যে, সব ভাল তো?' পরমুহূর্তেই উনি চোখ সরিয়ে নিলেন, গিয়ে বসলেন কোণের একটা চেয়ারে, পত্রিকা খুলে মুখ আড়াল করে নিলেন। আমি টেবিলের কাছে আমার অন্ধকার ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম। সেই ভাবটুকু তারপর কেটে গিয়েছিল, যখন সদ্য ঘুম-থেকে-ওঠা বাচ্চা বয় খালি গায়ে হাই তুলতে তুলতে এসে চা দিয়ে গেল।

একদিন স্কুলে এল টেলিফোন! 'শীগগির বাড়িতে আসুন।' শরীর হিম হয়ে এল। রিসিভার নামিয়ে রাখলুম আস্তে আস্তে। দীর্ঘদিন ধরে যেন এ রকম একটি আহ্বানেরই ভয় ছিল আমার। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে 'মা' এই শব্দ বেজে উঠেছিল। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আমি এসে দেখলুম ঘরে চার-পাঁচজন পাড়া পড়শি, বালিশে মার নিবন্ত মুখ, আধখোলা চোখ ভয়ঙ্কর লাল, ঠোঁট ফ্যাকাসে। ডাক্তার ব্লাডপ্রেসারের পারদের দিকে চেয়ে আছে। বলল—'তাড়াতাড়ি করুন।' বুঝতে না পেরে আমি চারদিকে চেয়ে বললুম, 'কী?' আবার কে যেন বলল, 'তাড়াতাড়ি

করুন।' আমি বুঝতে পারলুম না, বাচ্চা ছেলের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কী?' বাড়িওয়ালার বউ আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে বলল, 'যা তারকেশ্বরে মানত করে আয়!'

পরদিন। আমি তারকেশ্বর থেকে ফিরছিলুম। ভিড়ের ট্রেন। আমি বসবার জায়গা পাইনি। ট্রেন থামছে। প্রতিবার আমি মফস্সলের লোকের মতো নিজেকেই জিজ্ঞেস করছি, 'এটা কি হাওড়া? এই কি হাওড়া?' অনেক ঘাড়, অনেক মাথার জঙ্গল সামনে, আমি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করছিলুম। হঠাৎ এক ঝলক তেতো জলে ভেসে গেল মুখ, কষ বেয়ে জামা-কাপড় ভাসিয়ে দিল, 'এটা কি হাওড়া' আবার এই প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখি চোখের সামনে নড়ছে কালো-চাদর, ঝড়ের মতো ছুটছে ট্রেন, অথচ যেন বাতাস লাগছে না। পড়ে যাচ্ছি, কয়েকটা হাত আমাকে ধরল। টের পেলুম, আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে পৃথিবীর সব শব্দ—যেন আমি আবার মায়ের কোলের সেই শিশু রম—এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। তবু সেই আধ-চেতনার মধ্যে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'আপনারা সবাই শুনুন। আমি রমেন। আমার মায়ের বড় অসুখ। দুদিন আমি তাই কিছুই খাইনি।' আমি বলতে চাইছিলুম, 'আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের সকলের কাছে অপরাধী।' আমার প্রাণপণে বলবার ইচ্ছে হয়েছিল, 'আমি আজ আপনাদের ইচ্ছাশক্তিগুলি ভিক্ষা চাই। আপনাদের আশীর্বাদগুলি ভিক্ষা চাই।' ট্রেনের মেঝেয় ঘোর অন্ধকারের ভিতরে দুটো সাদা পা। যেন চেনা। মুখ দেখা যায় না, তবু বুঝলুম সেই বুড়ো ভদ্রলোক। আজও তার চোখ কথা বলছিল। 'আমি তোমার জন্যই এসেছি রমেন। তুমি ভাগ্যবান। চলে এসো।' আমি কাঁদছিলুম, 'আমার মা'র বড় অসুখ। আমার বাবা বিদেশে পড়ে আছে।' সহজ উত্তর দিল না তার চোখ, বলল, 'জীবন ও মৃত্যুই কিছু লোকের দেখাশোনা করে; কিছু লোককে দেখে ভাগ্য; কিছু লোককে ধর্ম এসে নিয়ে যায়।'

ভাল হয়ে গেলে মা একদিন চিন্তিত মুখে বলল, 'চোখে ভাল দেখি না। কিন্তু মনে হচ্ছে তুই বড় রোগা হয়ে গেছিস!' হাসলুম, 'কই!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলল, আর কর্তার সার্টিফিকেটটা? সেটা পেলি না!'

৯

তখন বিকেল। পাকিস্তানি হাই কমিশনারের অফিস থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে যাব, এমন সময় হঠাৎ দেখি—তুমি! শিকড়সুদ্ধ আমার ডালপালা নাড়া খেয়ে গেল।

বলতে কি, স্কুটারের পিছনের সিটে তোমাকে মানায় না। এত খোলামেলা আর এত ভিড়ের মধ্যে।

দেখলুম সবুজ রুমালে ঘিরেছ মুখ, আজ নীল শাড়ি পরেছিলে, স্কুটারের পিছনের সিটে তুমি জড়োসড়ো, টালমাটাল। চওড়া পুরুষের কাঁধ আঁকড়ে ধরে হাসছিলে ভয় পাওয়া হাসি—'পড়ে গেলু—উ-উম!'

তারপরই অবহেলায় আমাকে পিছনে ফেলে রেখে ছুটে গেল তোমাদের স্কুটার। যেতে যেতে আচমকা ঘুরে গেল বাঁয়ে—পড়ো পড়ো হল, পড়ে গেল না। তোমরা গেলে পার্ক স্ট্রিটের দিকে।

আমি গড়িয়াহাট রোড ধরলুম। অপরাহ্নের আলোয় ফুটপাথে আমার দীর্ঘ ছায়ার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে অচেনা মানুষ। তাদের ছায়া ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। সামনেই ট্রাফিক পুলিশের

Shahnaz

উত্তোলিত হাত, আর গাড়ির মিছিল দাঁড়িয়ে আছে। একজন হুকার আমাকে উদ্দেশ করে ধীর গম্ভীর গলায় হাঁকল 'গেঞ্জি...!' এসব কিছুই আমি তেমন খেয়াল করলুম না। আমার মন গুনগুন করছিল, কেন তুমি কোনওদিনই লক্ষ করলে না আমায়! 'হায়, আমি যে আছি তুমি তো জানোই না।'

রাতে ঘুম না এলে জেগে থেকে মাঝে মাঝে বড় সাধ হয়। তুমি এসে একদিন বলবে, 'আমাকে চাও?'

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আমি শান্ত চোখে চেয়ে বলব, 'চাই না।'

দেশ, ২১ আশ্বিন ১৩৭৩

দুর্ঘটনা

ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে অংশু যখন নানা ব্যথা বেদনা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াতে পারল তখনও ধাঁধার ভাবটা তার যায়নি। সাধারণত দুর্ঘটনায় পড়লে খুব জোরাল ধাক্কায় মনের ক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বাপর কিছু মনে পড়ে না। মন যুক্তিহীন আচরণ করতে থাকে। তবে এ স্মৃতিভ্রংশ নয়। অংশু জানে।

নিজের ছোট্ট প্রিয় ফিয়াট গাড়িটার ছয় ছত্রখান চেহারাটা অংশু খুব মন দিয়েই দেখল। যাকে বলা যায় টোটাল ডিজইন্টিগ্রেশন। চেসিস চাড়া কিছু আস্ত নেই বা যথাস্থানেও নেই। একটা দরজা উপুড় হয়ে পড়ে আছে ঢালু জমির ঘসের ওপর। দরজার একপ্রান্ত দিয়ে একজোড়া ভারী সুন্দর পা ও গোলাপি সালোয়ারের প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। আঙুলে রুপোর চুটকি, নখে পালিশ।

নিচু হতে খুব কষ্ট হচ্ছিল অংশুর। কোমরটার জখম বোধহয় বেশ গভীর। তার বয়স বিয়াল্লিশ। এ বয়সে এ ব্যথা সহজে সারবার নয়। তবু নিচু হয়ে অংশু দরজাটা তুলবার চেষ্টা করল। প্রথমবারে পারল না। দ্বিতীয় চেষ্টায় পারল।

অংশুর ভিতরে কোনও শব্দ এমনিতেই ছিল না। দরজার তলার দৃশ্যটা দেখে তার ভিতরটা যেন আরও নিস্তব্ধ ও চিন্তাশূন্য হয়ে গেল। রাণু বেশি যন্ত্রণা পায়নি নিশ্চয়ই। মাথাটা তুবড়ে গেছে। পিছন থেকে। মৃত্যু ঘটেছে তৎক্ষণাৎ।

অংশু দরজাটা ছেড়ে দিলে সেটা ফের রাণুর ওপর ধর্ষণকারীর মতো চেপে বসে যায়। অংশু হাইওয়ের দিকে মুখ তুলে তাকায়। হাইওয়ের এই অংশটা খুবই নির্জন। টানা লম্বা রাস্তার দুদিকটাই ফাঁকা। তবু দুর্ঘটনার গন্ধে লোক জুটবেই। এখনও জমেনি। একটু পর পর দু দুটো লরি ঝড়ের বেগে চলে গেল।

তার গাড়িটাকে মেরেছে একটা লরি। তার দোষ সে লরিটাকে ওভারটেক করার চেষ্টা করেছিল। কয়েকবার চেষ্টা করেও প্রথমদিকে পারেনি। লরিটা সাইড দিচ্ছিল না। কত রকমের বদমাশ ড্রাইভার থাকে। অংশুর সন্দেহ লরিওলা তার গাড়ির আয়নায় সামনের সিটে বসা অংশুর পাশে রাণুকে দেখছিল। রাণু তো দেখবার মতোই। মেয়েছেলে দেখলে কিছু কিছু পুরুষ অদ্ভুত

Shahnaz

আচরণ শুরু করে দেয়। লরির ড্রাইভার সম্ভবত সেরকমই একজন। বহুক্ষণ ধরে লরিটা অংশুর পথ আটকে রেখে যাচ্ছিল। কখনও খুব স্পিড দিচ্ছিল, কখনও ঢিলাঢালাভাবে এগোচ্ছিল।

ঠিক এই জায়গাটাতেই অংশু একটু ফাঁক পেতে অত্যন্ত তীব্র গতিতে লরিটাকে পাশ কাটাচ্ছিল। না কাটালেও ক্ষতি ছিল না। তবে রাণু বারবার বলছিল, উঃ সামনের লরিটার ডিজেলের ধোঁয়া আমার একদম সহ্য হচ্ছে না। ওটাকে কাটাও তো। তাই কাটাচ্ছিল অংশু। তবে এ সময়ে সে একটা মারাত্মক ভুল করে। ড্রাইভারের কেবিনটা সমান্তরালে চলে আসতেই অংশু বাঁদিকে চেয়ে একটু নিচু হয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে গাল দিয়েছিল, এই শুয়ারকা বাচ্চা, মাজাকি হো রহা হ্যায়?

ড্রাইভারটা কোন্ দেশি তা বলা শক্ত। লরিওয়ালাদের কোনও দেশ থাকে কি? বিশেষ করে দূরপাল্লার লরিওয়ালাদের? অংশু দীর্ঘকাল হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এইসব লরিওয়ালা যে-দেশেরই হোক চণ্ডীগড় থেকে ডিব্রুগড় বা দিল্লি থেকে বাঙ্গালোর টিপ মেরে মেরে এদের গা থেকে প্রাদেশিকতা মুছে গেছে, এদের দেশ, ঘর সব এখন এক লরির প্রশস্ত কেবিন। ফিয়াটের ঘাতক লরিওয়ালার মুখটায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল, মুখখানা ছিল প্রকাণ্ড, মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল, রোমশ হাত। একবার জানালা দিয়ে তাকাল ছোট্ট ফিয়াটের দিকে। তারপর আচমকা লরিটা ডানদিকে ঘেঁষতে শুরু করল অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে। অংশু তখনও পুরোপুরি কাটাতে পারেনি, পিছোনোরও উপায় নেই।

কী হচ্ছে তা বুঝবার আগেই রাণুর দিকটায় লরিটা প্রথম ধাক্কা মারে। সেটা এমন কিছু গুরুতর ছিল না। অংশু সামাল দিতে পারত। রাণু একটা তীব্র চিৎকার করে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাও পারত অংশু। কিন্তু লরিটা রসিকতা করছিল না। টাটার সেই অতিকায় হেভি ডিউটি ট্রাক অংশুর দেওয়া গালাগালটা ফেরত দিল দ্বিতীয় ধাক্কায়। সেটা ঠিক ধাক্কাও নয়। রোড রোলার যেমন থান ইট ভেঙে চেপে বসিয়ে দেয় রাস্তায় অবিকল সেইভাবে পিষে দিল প্রায়।

অংশু নিজের ট্রাউজারের ভেজা ভাবটা টের পেল এতক্ষণে। না, রক্ত নয়। গাড়িটা যখন তাকে আর রাণুকে গর্ভে নিয়ে চক্কর খেয়েছিল তখন অংশুর পেচ্ছাপ হয়ে যায়। অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে একটা। অংশুর একটু গা ঘিনঘিন করল।

বলতে কি এই গা ঘিনঘিন করাটাই দুর্ঘটনার পর অংশুর প্রথম প্রতিক্রিয়া। এছাড়া তার মন সম্পূর্ণ ফাঁকা, সুখ-দুঃখ শূন্য।

একটু খোড়াঁতে খোঁড়াতে অংশু তার গাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে সরে এল। নীচের দিকে ঢালু জমি গড়িয়ে গিয়ে একটা চওড়া নালায় শেষ হয়েছে। নালাটা জলে ভর্তি। দুটো ছাগল নির্বিকারভাবে আগাছা চিবোতে চিবোতে উঠে আসছে। অংশু একটা গাছের তলায় ছায়ায় বসল। কিছু করা উচিত। কিন্তু কী তা সে স্থির করতে পারছিল না।

একটা সমস্যা অবশ্যই রাণু। বেশ বড় রকমের সমস্যা। বেঁচে থাকলে রাণু সমস্যা হত না। যেমন করেই হোক নানারকম অনভিপ্রেত প্রশ্ন তারা দুজন মিলে এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু রাণু এখন মৃত। অর্থাৎ নিরেট একটি বোঝা বা ভার মাত্র। অংশুর গাড়িতে তার উপস্থিতি নিয়ে যাবতীয় প্রশ্নের জবাব অংশুকে একাই দিতে হবে। রাণুর বদলে যদি সে নিজে মারা যেত বা দুজনেই, তাহলে কোনও সমস্যা ছিল না। সে মরে রাণু বেঁচে থাকলে রাণু শুধু ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়লেই হত। দুজনে মরলে অবশ্য প্রশ্ন উঠত কিন্তু জবাবদিহি করার কিছু ছিল না।

অবশ্য এসব সমস্যা খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে না অংশু। তার ফাঁকা অভ্যন্তরে কিছু গুঞ্জন

উঠছে মাত্র। বেকুব এবং রাগী এক লরিওলা যে কীকী ঘটিয়ে গেল তা সে নিজেও জানে না। তবে প্রতিশোধটা সে বড় বেশি নিয়েছে। দূরপাল্লার লরি ড্রাইভারদের এত আত্মসম্মানবোধ থাকার কথা নয়। "শুয়ার কি বাচ্চা" বা ওই ধরনের গালাগাল তাদের কাছ জলভাতের সামিল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এত বড় প্রতিশোধের পিছনেন কারণ একটাই। দূরপাল্লার নারীবর্জিত দৌড়ে লোকটার ভিতরে একটা পুঞ্জিভূত যৌন কাতরতা ছিল। সেটাকে উসকে দিয়েছিল রাণু। আর সেই বেসামাল কাম থেকে এসেছিল ক্রোধ। ক্রোধ থেকে হিংসা। ইন্ধন ছিল অংশুর নিতান্তই বহু ব্যবহৃত এবং বিষহীন একটি গালাগাল।

একটু দূর থেকে অংশু ধ্বংসস্তূপটা দেখতে পাচ্ছে। রাণুর পা দুটো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। অংশুর মনে হচ্ছিল, তার এখান থেকে অবিলম্বে সরে পড়া উচিত। কিন্তু কাজটা খুব বাস্তব বুদ্ধিসম্মত হবে না। ওই ধ্বংসস্তূপ হাজারটা আঙুল তুলে তাকে নির্দেশ করবে, চিহ্নিত করবে।

হাইওয়ের ওপর পাঁচ সাতজন লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু তিনটে গাড়ি এবং লরিও থামল। ঢালু বেয়ে উঠে আসছে কাছাকাছি গ্রামের কিছু লোকজন। তাদের ভয়, বিস্ময় ও কাতরতার স্বাভাবিক উক্তিগুলি শুনতে পায় অংশু।

একজন স্যুটপরা বয়স্ক ভদ্রলোক অংশুর সামনে এসে দাঁড়ায়। অংশু চোখ তুলে করে তোলে না। একপলক তাকিয়ে মুখটা নামিয়ে রাখে।

লোকটা জিজ্ঞেস করে, গাড়ি কে চালাচ্ছিলেন? আপনি?

হ্যাঁ। বলেই অংশু টের পায় তার গলার স্বরর ভাঙা এবং বিকৃত। কেমন কেটে যাচ্ছে।

কী করে হল বলুন তো!

লরি। ফের গলার স্বরে একটা কাঁপুনি টের পায় অংশু।

ভদ্রমহিলা...! বলে ভদ্রলোক কথাটাকে ভাসমান রাখেন।

অংশু গলা খাঁকারি দেয়। এতক্ষণে সে শরীরেও কাঁপুনিটা টের পাচ্ছে। বলে, কী অবস্থা?

ভাল নয়। হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে।।

অংশু নড়ে না। মাটির দিকে চেয়ে থাকে।

আপনার ইনজুরি কীরকম?

কিছু বলতে তো হবে! শেষ অবধি সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে পারল অংশু। দয়া পরবশ একজনের গাড়ি হাসপাতালে পৌঁছে দিল তাদের। তাকে ও মৃত রাণুকে।

ডিসিজড-এর নাম?

রাণু সরকার।

ঠিকানা?

ম্যাকওয়ের অ্যান্ড কোম্পানি। সিকস্টিন...

এটা তো অফিসের ঠিকানা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হোম অ্যাড্রেস?

দেখুন, উনি ছিলেন, আমার কলিগ। আমরা একটা প্ল্যান্ট ভিজিট করতে যাচ্ছিলাম অন অফিসিয়াল স্ট্যাটাস। ওঁর হোম অ্যাড্রেসটা আমার জানা নেই।

অফিসে নিশ্চয়ই আছে!

Shahnaz

আছে। বলে হাঁফ ছাড়ল অংশু।

আপনিওতো বেশ ইনজিয়োরড, না?

একটু তো লাগবেই। অত বড় অ্যাকসিডেন্ট।

আপনি কি ভর্তি হবেন না?

না। তার দরকার নেই। ওয়ান টেটভ্যাক উইল বি এনাফ। আমি কি যেতে পারি এখন?

কোথায় যাবেন?

বাড়ি। আমার একটু রেস্ট দরকার।

পুলিশ এনকোয়ারি হবে, জানেন তো!

জানি।

অংশু আরও কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে বেরিয়ে এল। রিকশা ধরল একটা।

সমীরণের বাগানবাড়িটা ভারী ছিমছাম, নির্জন, সুন্দর। বিশাল বাগানে অনেক পাখি ডাকছে। অংশু স্নান করেছে। প্যান্ট, আন্ডারওয়্যার ধুয়ে রোদে শুকোতে দিয়েছে। একটা মস্ত তোয়ালে জড়িয়ে বসে আছে বারান্দার বেতের চেয়ারে। দু কাপ চা খেয়েছে সে। শরীর বা মনের অস্থিরতার কোনও উপশম ঘটেনি।

সমীরণের বাগানবাড়িটা মোটামুটি ভাবে ফুর্তিরই জায়গা। সমীরণ নিজে তার মেয়ে-মানুষদের নিয়ে এখানে আসে মাঝে মাঝে। সুতরাং এখানে একটি বার আছে। অংশু মদ খায় না। সে আর রাণু এসে বড় জোর চা বা কফি খেয়েছে, মুর্গির ঝোল দিয়ে ভাত সেঁটেছে, তারপর একটা শোওয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। সেই আসঙ্গই ছিল মদ।

আজ দু কাপ চায়ের পরও তার অন্য কিছু প্রয়োজন বলে মনে হল।

অংশু ডাকল, বিশু।

বিশু এলে বলল, কী আছে তোমাদের বলো তো! হুইস্কি বা ব্র্যান্ডি!

সব আছে।

একটু ব্র্যান্ডি দাও তো। সোডা মিশিয়ে কিন্তু।

বিশু চলে গেল। অংশু পাখির ডাক শুনতে লাগল। পাখি, অনেক পাখি।

বারান্দার সামনেই একটা ঢ্যাঙা লোহার ফ্রেমে শেকল বাঁধা একটা দোলনা ঝুলে আছে। তারা দুজনে—অর্থাৎ অংশু আর রাণু যে দোলনায় চড়ত তা নয়। তবে মাঝে মাঝে রাণু গিয়ে বসত ওখানে। সে বসত পা মুড়ে। হাতে থাকত স্কেচের প্যাড আর পেনসিল। অনেক পাখির স্কেচ করেছিল।

ওর ব্যাগটা কোথায় গেল? ভেবে অংশু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে। তারপর ভাবে, যেখানেই থাক তাতে কী আর যায় আসে? ভেবে ফের গা ছেড়ে দিল সে।

ব্র্যান্ডিতে প্রথম চুমুক দিয়ে তার খুব ভাল লাগল না। এর আগে এক আধবার সে সামান্য খেয়েছে। কোনওবারই ভাল লাগেনি বলে অভ্যাস করেনি। আজ ভাল না লাগা সত্ত্বেও সে ধীরে ধীরে, জোর করে পুরোটা খেয়ে নিতে পারল। বেশি নয় অবশ্য। এক পেগ হবে।

মাথাটা একটু কেমন লাগছে কি?

অংশু চোখ বুজে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

খাবেন না স্যার! লাঞ্চ রেডি।

অংশু একটু চমকে ওঠে। সামান্য সেই চমকে শরীরটা নড়তেই কোমর থেকে ব্যথাটা চিড়িক দিয়ে উঠে আসে মেরুদণ্ড বেয়ে। স্পাইনাল কর্ডে যদি লেগে তাকে তবে ভয় রয়ে গেল। ঘাড়ের দিকেও একটা ব্যথা মাথাচাড়া দিচ্ছে। যদি স্পন্ডিলাইটিসের মতো ব-লার নিতে হয়?

আজ স্যার দিদিমণি এলেন না?

ডাইনিং হল-এর দিকে যেতে যেতে অংশু বলল, না।

আপনি কি স্যার অসুস্থ?

অংশু একটা শ্বাস ফেলে বলল, একটু চোট হয়েছে। তেমন কিছু নয়।

গাড়িও আনেননি আজ স্যার।

সার্ভিসিং-এ গেছে।

এসব প্রশ্নের উত্তর দিকে অংশুর রাগ হচ্ছিল না। কারণ, এসব সৌজন্যমূলক প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশু তো আর জেরা করছে না। জবাব দেওয়াই উচিত। চেপে গেলে সন্দেহের বীজ বপন করা হবে।

অংশু প্রকৃত মুশকিলে পড়ল খেতে বসে। চমৎকার সরু চালের সাদা গরম ভাত, কাঞ্চনবর্ণ মুরগির কারি, ধোঁয়া ওঠা ডাল, মুচমুচে আলু ভাজা, মাছের ফ্রাই, চাটনি দেখে আজ তার বারবার ওয়াক আসছিল। এতক্ষণে রাণুকে কাটাছেঁড়া করা হচ্ছে কি? নাকি ঠাণ্ডা ঘরে ফেলে রেখেছে। ওর সৎকারেরই বা কী হবে? কে এসে নেবে ডেডবডি? ওর স্বামী? কিন্তু ওই বডির কিছু দায়িত্ব তো অংশুরও আছে। অংশু তো কম ভোগ করেনি ওই শরীর, যতদিন জ্যান্ত ছিল।

অংশু বিস্তর নাড়াঘাঁটা করে সব ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়ল।

খেলেন না স্যার?

আজ পারছি না। একটা পান আনো তো বিশু। জর্দা দিয়ে।

এসব খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য প্রতি রবিবার অংশুকে পঞ্চাশটা করে টাকা দিতে হয়। আজ আবার এক পেগ মদের দাম আছে। খরচটা আপাতত বেঁচে যাচ্ছে অংশুর। সামনের রবিবার সে অবশ্যই আসছে না।

বারান্দায় যেতে গিয়েই হলঘরের টেলিফোনটা নজরে পড়ল তার। একটু থমকাল সে। তাদের কলকাতার বাড়িতেও টেলিফোন আছে। কথা বলবে কি, একটু ইতস্তত করে অংশু। তারপর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয়, বলবে। বলাই উচিত। ফিরলে সকলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনার কথা বলতে তার ভীষণ অস্বস্তি হবে। মুখ না দেখেই বলে দেওয়া ভাল। বলতে যখন হবেই।

কিছুক্ষণের চেষ্টায় সে বাড়ির লাইন পেল। ধরল তার বোন রীতা।

শোন, আজ একটা বিচ্ছিরি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

অ্যাকসিডেন্ট—বলে রীতা একটা আর্তনাদ করে উঠল ওধারে।

শোন, ডোন্ট বি নারভাস। আমার কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি?

আমার কিছু হয়নি, তবে গাড়িটা গেছে। আর...

আর কী?

আমার সঙ্গে আমার একজন কলিগ ছিল। তার অবস্থা ভীষণ খারাপ।

বাঁচবে না?

বোধহয় না।

Shahnaz

সে কী?

চেঁচাস না। ঠাণ্ডা হয়ে শোন। আমি ব্যান্ডেল থেকে কথা বলছি।

ব্যান্ডেল থেকে? ব্যান্ডেল থেকে কেন? তুমি তো প্ল্যান্টে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ। প্ল্যান্টেই ভদ্রমহিলা ধরলেন আমাকে। ব্যান্ডেলে ওঁর কে একজন আত্মীয় থাকেন, গুরুতর অসুস্থ। আমাকে একটু পৌঁছে দিতে বললেন।

ভদ্রমহিলা! কে গো?

আমাদের পাবলিসিটি অফিসার। রাণু সরকার।

তুমি ব্যান্ডেল গেলে পৌঁছে দিতে?

কী আর করব। ট্রেনের নাকি আজ কি সব গণ্ডগোল ছিল হাওড়ায়, তাই।

ট্রেনের গণ্ডগোল। তাহলে কী হবে। মা আর বউদি যে বড়দার সঙ্গে তারকেশ্বর গেল।

তারকেশ্বর। ও গড! অংশু হাল ছেড়ে দিল প্রায়।

কী বলছ?

অংশু মনে মনে নিজেকে বলল, ইডিয়ট, এর চেয়ে ঢের বেশি চক্করে পড়েও দুনিয়ার চালাক লোকেরা বেরিয়ে আসে। তুমি কি গাড়ল? চালাও, চালিয়ে যাও।

অংশু একটু ধীর স্বরে বলল, ট্রেনের গণ্ডগোল ছিল কি না তা তো আমার জানার কথা নয়। ভদ্রমহিলা বলছিলেন, তাই ধরে নিয়েছি আছে।

ব্যান্ডেলে কোথায় আছ তুমি এখন? কোথা থেকে কথা বলছ?

অংশু এত মিথ্যে কথা একসঙ্গে জীবনে বলেনি। একটু ঢোঁক গিলে বলল, হাসপাতালের কাছ থেকে।

ভদ্রমহিলার কী রকম লেগেছে?

মাথাটা থেঁতলে গেছে।

উঃ মাগো।

একটু চুপ করে থেকে রীতা বলল, কী হয়েছিল মেজদা?

লরি। একটা লরি এসে মেরেছিল বাঁ দিকে।

বাঁচার কোনও চান্স নেই?

না।

গাড়িটা?

গেছে। একদম গেছে।

তুমি তাহলে কী করে ফিরবে?

দেখছি। ফেরার জন্য চিন্তা নেই। পারব।

শোনো মেজদা, ছোড়দা একটু আড্ডা মারতে বেরিয়েছে সকালে। ও ফিরলে তোমাকে গিয়ে তুলে আনবে। ও ওর গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছে। নইলে আমিই চলে যেতাম—

না, তার দরকার নেই।

বাবাকে বলব তো?

বলিস। তবে আগে বলিস যে আমার কিছু হয়নি।

সত্যিই হয়নি তো?

হলে কি আর ফোন করতে পারতাম?

তুমি কখন ফিরবে?

রাণুর একটা ভালমন্দ খবর পেলেই। ছাড়ছি। ভাবিস না।

তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো।

অংশু ফোন রেখে দিল। শোওয়ার ঘরে এসে সে দরজা বন্ধ করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। শরীরের ভার আর বহন করা যাচ্ছে না।

বিছানাটা নরম ফোম রবারের। ভারী নরম। এই বিছানাতেই সে আর রাণু—। কিন্তু রাণুর স্মৃতি তাকে একটুও তাড়া করছে না। তবে এতক্ষণে দুর্ঘটনার পুরো ভয়াবহতা সে একা ঘরে স্মরণ করতে পারল। ওইরকম ভাবে চুরমার হয়ে যাওয়া একটা গাড়ির ভিতরে থেকেও কী করে সে বেঁচে গেল সেটা এখনও ভেবে পাচ্ছে না সে। বাঁচলেও এমন আস্ত অবস্থায় তো কিছুতেই নয় তবু আশ্চর্য কিছু ব্যথা-বেদনা নিয়ে সে বেঁচেই আছে। ভাবতেই শিউরে উঠল সে। তার শরীর থেকে রক্তপাতও হয়েছে সামান্য। মাত্র চার জায়গায় ছড়ে বা চিরে গেছে, জামাকাপড় অবশ্য ছিঁড়েছে কিন্তু তা ব্যবহারের অযোগ্য নয়। এত বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট যাতে রাণু তৎক্ষণাৎ মারা গেল, ফিয়াটটা হয়ে গেল খণ্ড খণ্ড, তাতে পড়েও সে এমন ফুলবাবুটির মতো অক্ষত, অনাহত রয়ে গেল কেন?

ক'দিন আগেই রিপ্লের "বিলিভ ইট আর নট'-এ সে পড়েছিল একজন লোক মোটর গাড়িতে লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় একটা ট্রেন এসে সেটার ওপর পড়ল এবং প্রায় ছ'শো মিটার মোটরগাড়িটাকে থেঁতলাতে থেঁতলাতে পিষে দলা পাকিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে। আশ্চর্য এই যে মোটরচালক সামান্য কিছু কাটা ছেঁড়া নিয়ে তা সত্ত্বেও দিব্যি বেঁচে গিয়েছিল, হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়নি। অংশুর ব্যাপারটাও তাই নয় কি?

এ বাড়িতে যে এত পাখি ডাকে তা আগে কখনও লক্ষ করেনি অংশু। আজ সঙ্গে রাণু নেই বলেই বোধহয় করল। পাখিদের গণ্ডগোলেই বোধহয় তার ঘুম এল না। শরৎকালের দিব্যি মনোরম আবহাওয়াটি ছিল আজ। ভারহীন কিছু মেঘ পায়চারি করে ফিরছে আকাশে। এবার বাদলাটা গেছে খুব। তাই চারিদিকটা ধোয়া মোছা চমৎকার। কিন্তু এমন মনোরম আবহাওয়া পেয়েও তার ঘুম এল না এক ফোঁটা। অবশ্য তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পেটে ভাত পড়েনি, রাণু মারা গেছে, ঘুম আসার কথাও তো নয়। তবু চুপচাপ চোখ বুজে অংশু পাখিদের গণ্ডগোল শুনতে লাগল।

ঘুম তো নয়ই, একে বিশ্রামও বলে না। মন প্রশান্ত না থাকলে বিশ্রাম ব্যাপারটাও একটা শক্ত ব্যায়াম মাত্র। এই বিশ্রামের ব্যায়ামটা তাকে করতে হচ্ছে একটাই মাত্র কারণে। তার প্যান্ট এখনও শুকোয়নি। না শুকোলে বেরোবে কী করে?

নিজের ফিয়াট গাড়িটার কথা শুয়ে শুয়ে ভাবল অংশু। সেকেন্ড হ্যান্ড কিন্তু চমৎকার অবস্থায় ছিল কেনার সময়। তার হাতে সেট হয়ে গিয়েছিল। ইনসিওর করা আছে, কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে অংশু। তবে গাড়িটা তো আর ফিরবে না। পার্টসগুলো চুরি হয়ে যাবে অ্যাকসিডেন্ট স্পট থেকে। চাকা, ব্যাটারি।

অংশু ফের উঠে হলঘরে আসে। খুবই কষ্টে। তারপর থানায় ফোন করে।

আপনারা অ্যাকসিডেন্ট স্পট-এ কোনও পাহারা রেখেছেন?

না স্যার।

একটু পাহারা রাখলে ভাল হত না? পার্টস চুরি যাবে যে!

Shahnaz

আমাদের লোক বড্ড কম।

তাহলে?

কিছু করার নেই স্যার। চুরি যাওয়ার হলে এতক্ষণে হয়ে গেছে।

হোপলেস। বলে অংশু ফোন রেখে দেয়।

ট্রাউজার এখনও শুকোয়নি। কোমরের কাছে বেশ ভেজা। তবু অংশু প্যান্ট পরে নেয়, জামা গায়ে দেয়, বিশুকে একটা রিকশা আনতে বলে বারান্দায় বসে পাখির ডাক শোনে।

রাত আটটা নাগাদ যখন বাড়ি ফিরল অংশু তখন সে অনেকটাই বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত, হা-ক্লান্ত। তবে বিপর্যয়ের ভাবটা সে ইচ্ছে করেই একটু বাড়িয়ে তুলেছিল। যাতে বেশি প্রশ্নের জবাব দিতে না হয়।

বাইরের ঘরেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল সবাই। পারিবারিক ডাক্তারও তৈরি হয়েছিলেন। সে বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র মা এসে তাকে প্রথম ধরল।

একটি প্রশ্নেরই জবাব দিতে হল তাকে।

মেয়েটা কি মারা গেছে?

হ্যাঁ।

ইস্।

ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ দিলেন। নাড়ি টাড়ি দেখলেন একটু। তারপর ঘুমের হাতে ছেড়ে দিলেন।

অংশু ঘুমোল। প্রচণ্ড গভীর টানা ঘুম। পরের দিনটাও পড়ে থাকতে হল বিছানায়। মাঝে মাঝে অফিস এবং থানা থেকে ফোন এল বাড়িতে। ভাগ্য ভাল যে, তাকে ফোন ধরতে হল না। সে অসুস্থ, শয্যাগত এবং আন্ডার সেডেসন, সুতরাং জবাব দেওয়ার দায় নেই। বাড়ির লোকেরা সারাদিন প্রায় নিঃশব্দে রইল।

কিন্তু এই অবস্থা তো স্থায়ী হবে না। তাকে জাগতে হবে এবং মুখোমুখি হতে হবে সকলের। অনেক প্রশ্ন আছে ওদের। সঙ্গত প্রশ্ন, বিপজ্জনক প্রশ্ন। প্রশ্ন করবে পুলিশ, প্রশ্ন করবে অফিসের সহকর্মীরা। একটু নিটোল, ছিদ্রহীন মিথ্যে গল্প বানানো খুব সহজ হবে না। কোনও মিথ্যেই তো ছিদ্রহীন নয়।

চোখ খুলতেই লজ্জা করছিল অংশুর। আলপনার মুখ শুকনো, চোখ সজল। মুখ দেখে মনে হয়, সারা রাত তার পাশে বসে জেগে কাটিয়েছে। তার ছোট ভাই অ্যাকসিডেন্ট স্পট থেকে ঘুরে এসেছে, এটাও সে টুকরো টাকরা কথা থেকে টের পেল। থানা পুলিশ ইনসুরেন্স সবই সে সামলাচ্ছে।

পরের রাত্রিটাও গভীর ঘুমে কেটে গেল অংশুর। জাগল বেলায়। আলপনা তার গায়ে মৃদু নাড়া দিয়ে বলল, তোমার অফিস থেকে ফোন এসেছে। জরুরি দরকার।

কে ফোন করছে?

ডিরেকটর নিজে। আধ ঘণ্টা পর আবার ফোন করবে।

অংশু চুপচাপ চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে পর্দা উঠছে রঙ্গমঞ্চের। হাজার জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে থাকবে। সে রঙ্গমঞ্চে একা।

আধ ঘণ্টা পরই ফোনটা এল।

অংশু ?

বলছি।

কেমন আছ?

একটু ভাল।

বেলা বারোটায় একবার অফিসে আসতে পারবে?

পারব।

আজ মিসেস সরকারের ডেডবডি রিলিজ করেছে সকালে। সোজা অফিসে আসছে। এখান থেকেই ক্রিমেশনে নিয়ে যাবে।

অফিসের সিঁড়িতে তারা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে লরি, লরির ওপর খাটে রাণু শুয়ে আছে। অফিস থেকে বিশাল একটা টায়ারের আকৃতির মালা দেওয়া হয়েছে তার বুকের উপর।

প্রতীকটা চমৎকার। এক লরি মেরে দিয়ে গেছে রাণুকে। আর এক লরির ওপর এখন সে শোওয়া। বুকে ফুলের চাকা। চমৎকার।

এতগুলো লোকের এই সমবেত নিস্তব্ধতা ভারী অস্বস্তিকর। অংশুর অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। লরিটা চলে যাচ্ছে না কেন? কেন চলে যাচ্ছে না?

ডিরেকটর চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিং সিক অংশু?

একটু।

স্বাভাবিক। ইট ওয়াজ এ গ্রেট শক। মিসেস সরকারের হাজব্যান্ড আর বাচ্চাকে আনতে গাড়ি পাঠানো হয়েছে। দে আর বিয়িং লেট।

অংশু বুকের দুটো বোতাম খুলে ফেলল। স্ট্যানস পান্টাল পায়ের। তারপর একটা গাড়ি এসে থামল লরিটার পেছনে।

অংশু স্থির হয় এবার। পিছনের দরজাটা খুলে একজন রোগা ও পাগলাটে চেহারার লোক নেমে আসে। পরনে পায়জামা, হ্যান্ডলুমের খয়েরি পাঞ্জাবি। চুল বড় বড়। সামান্য দাড়ি আছে। চুল দাড়ি কাঁচা পাকা, কিন্তু লোকটার বয়স খুব বেশি নয়, পঁয়ত্রিশ টয়ত্রিশ হবে। অংশুর বাঁ পাশ থেকে কে যেন চাপা স্বরে বলে উঠল, এ রাসকাল। ডাউনরাইট রাসক্যাল।

লোকটার পিছনে একটা বাচ্চা নেমে এল। নীল প্যান্ট, সাদা জামা। বেশ রোগা। বছর পাঁচেকের বেশি বয়স নয়। মুখটায় কেমন ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। চোখে ভয়।

নিস্তব্ধটা ভাঙল আচমকা। নিখুঁত একটা বিদ্যুৎগতি ছুঁচের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। কানে হাতচাপা দিয়ে অংশু একটা কাতর শব্দ করল, উঃ!

ছেলেটাকে কে যেন লরি ওপর তুলে দিয়েছে। রোগা, হাড্ডিসার, হতভম্ব ছেলেটা আর কোনও শব্দ বা কথা খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু তীক্ষ্ণ পাখির স্বরে ডাকছে, মা... মা... মা.... মা....

অংশু ধীরে ধীরে বসে পড়তে থাকে। দুহাতে প্রাণপণে বন্ধ করে থাকতে চেষ্টা করে শ্রবণ। কিন্তু সব প্রতিরোধ ভেঙে সেই তীক্ষ্ণ পাখির ডাক তার ভিতরে সূচীমুখ হয়ে ঢুকে যায়। লণ্ডভণ্ড করে দিতে থাকে তার অভ্যন্তর। মা...মা...মা...মা....

অংশু মাথা নাড়ে। শব্দটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে সে। তবু দম আটকে আসতে থাকে। সে হাত তুলে বলতে চেষ্টা করে, ডেকো না! ওভাবে ডেকো না! আমি পারছি না...

কিন্তু কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না অংশু। দু হাতে কান চেপে সে অভিভূতের মতো চেয়ে থাকে। একটা শব্দের বুলেট বারবার এসে বিদ্ধ করে তাকে। ঝাঁঝরা করে দিতে থাকে।

Shahnaz

দুঃখরোগ

যদিও অনেকক্ষণ হল ভোর হয়েছে এবং এখন সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলল তবু বাদল চোখ বুজে শুয়ে ছিল। নোনা ধরা দেয়ালে রোদ পড়ে ভেজা শ্যাওলা থেকে যে বাষ্প উঠছে তার সঙ্গে ধুলো আরশোলা আর ইঁদুরের গন্ধ মিশে আছে। এই গন্ধকে চোখ বুজে সকালের কুয়াশা আর জলজ উদ্ভিদের গন্ধ, পানাপুকুরের আঁশটে গন্ধ মনে হয়। মনে হলেই ভাবে এখন সদ্য ভোর হতে চলল—ভাল করে আলো ফোটেনি, বাইরের মাঠের ঘাসের ওপর এখনও টলটল করছে শিশির। 'কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আছি' ভাবল বাদল, 'নড়ছিও না।' নড়লে কিংবা পাশ ফিরলে চৌকিটাতে মড়মড় করে শব্দ হয়, আর সেই শব্দে পরিবেশের ভিতরে কাচের মতো শৌখিন কী একটি জিনিস ভেঙে যায়।

বাদল নড়ল না। শরীরের ভঙ্গি বদলাতে তার ভাল লাগে না। একভাবে থাকতেও যে তার ভাল লাগে তা নয়, কারণ কিছুক্ষণ একভাবে থাকলে কোনও হাড়ের সন্ধিতে যে সামান্য চিনচিনে ব্যথাটা দেখা দেয় সেটা সারা শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে, আর তখনই তার মনে হয় যে গত বছর শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে তার যে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল তা কখনও সারেনি।' বাস্তবিক সারা বছরই যেন সে ভুগছে এবং এখন সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা মধ্যযুগের নিপুণ সওয়ারের মতো তার ওপর চেপে বসেছে। তার শরীরে জ্বর নেই, গাঁটে গাঁটে সেই অসহ্য ব্যথাও নেই যাতে নিজের শরীরে হাড় মট্‌মট্ করে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। বাস্তবিক তার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল মাত্র একবার—গত বছর শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে। কিন্তু সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলো তার শরীরের ইনফ্লুয়েঞ্জা সেরে যাওয়ার পরও প্রকট। সারা বছর ধরে সে যেন একটি মাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে। তার মনে হল তার চোখ সত্যিই জ্বর আসবার কয়েক ঘণ্টা আগেকার মতো জ্বালা করে, হাতের তেলো গরম আর লাল, কোমরে পায়জামার কষির নীচে একটু একটু ঘাম জমে আছে। কাশতে গিয়ে তার মনে হল তার কাশির শব্দটাও অদ্ভুত। কোনও ধাতুর শব্দের মতো। কেমন ঝিমঝিমিনি ভাব। মনে হয় যেন সারা রাত তার ঘুম হয়নি।

'হয়তো সত্যিই আমি রাতে ঘুমোই না' সে ভাবল, 'শুধু ঘুমোই বলে নিজেকে ফাঁকি দিই।'

হয়তো সারারাত সে চোখ বুজে কিছু ভেবেছে—সেই ভাবনা এমন গভীরভাবে তাকে আচ্ছন্ন করেছিল সে সেগুলোই চলচ্চিত্রের মতো স্বপ্ন হয়ে চোখের সামন ঘুরে গেছে। এই সংশয় ছুরির মতন তার বুকে বেঁধে। কে তাকে বলে দেবে রাতে সে ঘুমোয় কি না?

এই মুহূর্তে বাদল রাতে না ঘুমোনো অসুস্থ বাদলের জন্য ভীষণ দুঃখ অনুভব করতে লাগল। সে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না সত্যিই সে রাতে ঘুমিয়েছে কি না। কেননা তার মনে হল সারারাত ধরে সে ইঁদুর আরশোলা আর জমে থাকা ধুলোর গন্ধ পেয়েছে।

সে ভাবে 'আসলে আমার কিছুই হয়নি। এ আমার দুঃখরোগ' সে ভাবল, 'এ আমার নিয়তি।' অনেক বেলাতে ঘুম ভাঙলে পাশ পালিশ জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে শুয়ে 'এখনও ভোর হয়নি, বাইরের মাঠে এখনও শিশির'—ভাবতে পারা কি সুন্দর! 'এইখানে কাছাকাছি কোথাও একটা ফাঁকা মাঠ এমনি পড়ে আছে শুধু শিশির পড়বে বলে, যে মাঠটা আমি কখনও দেখিনি, দেখব না, খুঁজব না। জানি মাঠটা আছে—বোধহয় আছে।' দুঃখরোগগ্রস্ত বাদল ভাবল। 'আমি বোধহয় সত্যিই রাতে ঘুমোই না—শুধু ঘুমোই বলে নিজেকে ফাঁকি দিই, আসলে সারা বছর ধরে গত বছরের ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছি।' বাদল ভাবল। সে ভেবে পেল না যে-বাদল অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে ভোরের শিশিরের গন্ধ পায় এবং ভাবে এইখানে কাছাকাছি কোথাও একটা মাঠ পড়ে আছে এবং যে-বাদল গত বছরের ইনফ্লুয়েঞ্জাতে সারা বছর ভুগছে তারা এক কি না।

নিজেকে নিয়ে এ তার ভীষণ সংশয়। বাদল ছটফট করতে থাকে। বেলা গড়িয়ে গেল আস্তে আস্তে। ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে গেল। সারাদিন সে পাশের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনল। কেউ এল, কেউ গেল, কেউ ঘুরে ফিরে কী যেন দেখল। সারাদিন সকলেই কাজ নিয়ে আছে। শুনল—কারও দাঁতে বুরুশ ঘষবার শব্দ, কেউ গানের একটা কলি গাইল, তারপর কথা ভুলে গিয়ে ঘুরে ফিরে শুধু সুরটা ধরে রইল। জল ঢালবার শব্দ।

বাদল কাজে গেল না। প্রায়ই সে যায় না। তার মনে হল প্রবল জ্বরের ঘোরে সে রয়েছে। একটা আলো আঁধারির মধ্যে দিনটা কেটে যেতে লাগল। যেন তার চারদিকে অর্থহীন ভাঙাচোরা ত্রি-কোণ, অর্ধবৃত্ত, সরলদণ্ডের মতো আলো আর ছায়া হয়ে জ্বরটাই তাকে ঘিরে আছে। তার চোখের পাশে আলো আর ছায়া দিয়ে কারা যেন খিলানের পর খিলান ভাঙা স্তম্ভের সারি তৈরি করে রেখেছে।

'এ আমার দুঃখরোগ' সে ভাবল ' এ আমার নিয়তি।' সে নিজেকে নিয়ে ভাবতে লাগল।

নিজেকে নিয়ে ভাবতে গেলেই বাদল তার জনৈক বন্ধু সুধাবিন্দু হয়ে যায়। স্পষ্ট করে দেখতে পাবে বলে বাদল অন্য কেউ হয়ে নিজেকে ভাবে। যেন সে বাদলের কেউ না,—সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় জনৈক বন্ধু মাত্র যার নাম দেওয়া যায় সুধাবিন্দু।

বাদল সুধাবিন্দু হয়ে ভাবে : বাদল একটি সাদা রঙের ছেলে—এত সাদা যে দেখলে ঘিন ঘিন করে। তার মুখে কণ্ঠায় কবজিতে কৃমির মতো আঁকাবাঁকা নীল শিরা দেখা যায়। নানা উপসর্গ তার আছে। সে অনেক কিছুকে ভয় পায়,—যেমন নিজেকে। তার অনেক সংশয়—যেমন সে কবিতা লেখে, কিন্তু গোপনে। তার কবিতা আমি কমই পড়েছি। সম্ভবত তাতে জল, জলজ উদ্ভিদ এবং গ্রামীণ মেয়েদের কথা থাকে। আমার মনে হয় বাদল কবি-টবি কিছু নয়। ও অসুস্থ মানুষ। কোনও কোনও বিষয়ে তার গভীর অভাববোধ আছে মাত্র। বাদল কারুরই প্রিয়পাত্র নয়। ওর

Shahnaz

ঘিনঘিনে সাদা রং এবং নীল শিরা ছাড়াও ওর চোখে মুখে একটা উগ্র ক্ষুধা এবং তার অবদমনের চেষ্টা একসঙ্গে ফুটে থাকে। হয়তো সে কারণেই যে স্কুলে ও একশো টাকা মাইনের একটা চাকরি করে সেখানেও ওকে কেউ পছন্দ করে না এবং বেনেটোলা লেন এ যে মেস-এ থাকে সেখানে সে অস্থির হয়ে দিন কাটায়। বাস্তবিক সে প্রায় সঙ্গীহীন। স্কুলে তার সঙ্গী ছাত্ররাই। ক্লাসে বাদল পাঠ্য বই কদাচ স্পর্শ করে না, শুধু অনর্গল আজে বাজে কথাবার্তা বলে ছাত্রদের ঠাণ্ডা রাখে। এই নিয়ে স্কুল কমিটির মিটিঙে দু'বার তাকে তাড়িয়ে দেবার কথা হয়েছে, কিন্তু বাদল শেষ পর্যন্ত টিকে আছে। হয়তো স্কুল কমিটি ভাবে যে ছাত্রদের এমনিতেও কিছু হবে না, মাস্টার বদল করতে গিয়ে অনর্থক বিজ্ঞাপনের টাকা গচ্চা যাবে। স্কুলে তাই তার সঙ্গী ছাত্ররাই—তার মধ্যে বুড়ো বাচ্ছা সব ধরনের ছেলেই আছে। আমার মনে হয় তার সঙ্গী সেই সব ছাত্ররাই যারা বাথরুম বা পায়খানার দেয়ালে অশ্লীল কথা লিখে রাখে। বাদল ভাব হয়তো সে একটা কিছু করবে। হয়তো সে এম. এ. পরীক্ষা দেবে। কিন্তু কোনও একটা ভাবনা নিয়ে থাকা তার স্বভাব মাত্র। হয়তো সে কোনও দিনই পরীক্ষা দেবে না।

সংশয় কাঁটা হয়ে তার বুকে ফোটে। যেন সে দীর্ঘ দীর্ঘ দিন বেঁচে আছে। যেন বহু বহু পুরনো হয়ে যাওয়া সবকিছু তাকে ঘিরে আছে। 'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।' সারা দিন সে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে বিচিত্র শব্দ শুনল। কাজে গেল না—প্রায়ই সে যায় না।

বিকেলে কোথাও যাবে বলে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

২

দশ টাকার নোটটা এগিয়ে দিতে গিয়েই বাদল বুঝল ভুল হয়ে গেছে। এখন আর ফেরবার উপায় নেই।

কন্ডাকটার হাত বাড়িয়ে ভাঁজ করা নোটটা নিল। বাদলের দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখ সরাল না। বাদল ওর মুখের দিকে তাকাল না। ওর হাতের শিরা দেখেছিল। যেন লোকটা সারাদিন তেতে পুড়ে ভীষণ রেগে আছে, ওর মুখের দিকে তাকালেই বাদল সেই রাগ দেখতে পাবে। এই সামান্য কারণেই তার চোখমুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল।

কন্ডাকটার তার হাতটা নিজের দিকে সরিয়ে নিল না। বাঁ হাত দিয়ে দ্রুত ঘন্টি বাজিয়ে একটা স্টপেজ ছেড়ে দিল। আঙুল দিয়ে টিকিটে 'টিরিক' শব্দ তুলল। নোটটা বাদলের দিকেই বাড়িয়ে রেখে বলল, 'খুচরো দিন। বাস-এ এ-নোটের ভাঙানি পাওয়া যায় না।'

'নেই। খুচরো করতে ভুলে গিয়েছিলাম।' বাদল ভাবল সবাই তার কথা শুনতে পাচ্ছে। সে সারি সারি জামা আর হাতের অংশ দেখতে পাচ্ছিল। খুব ভিড়। বাস পরের স্টপেজে থামছে, কিংবা সামনেই হয়তো ট্রাম। গতি শ্লথ। কন্ডাকটর তার দিকে নোটটা বাড়িয়ে রেখে পিছন ফিরে পার্টনারকে কী যেন বলল। বাদল শুনতে পেল না। খুব গরম লাগছে। ঘাম শুকিয়ে যাওয়া জামার নোনা গন্ধ। চারদিকে ময়লা মুখ, ধুলো লাগা, কালো কালো। সব মুখ একরকম, যেন দশবার দেখলেও মনে থাকবে না। বাদল কোনও মুখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে ছিল।

'খুচরো দিন।' কন্ডাকটর মাথা ঝাঁকিয়ে রাগ দেখাল।

'নেই। খুচরো করতে ভুলে গিয়েছিলাম।' বাদল বলল।

'কোথায় যাবেন?'

'যাদবপুর।'

'তবে আর কী করবেন এমনিই চলুন।' বাঁ হাতে মাথার ওপর নোংরা তেলচিটে প্রায় কালো দড়িটা দ্রুত বাজাল কন্ডাকটার। 'টিরিক' করে শব্দ তুলল। 'এটা নিন'—নোটটা বাড়িয়ে দিল তেতেপুড়ে রেগে যাওয়া রুক্ষ চুলওয়ালা কর্কশ কন্ডাকটর।

অবিলম্বে বাদল সাদা হয়ে গেল। নোটটা নিল মুঠো করে। প্রায় ফিস ফিস করে বলল 'আমি নেমে যাচ্ছি।'

'আপনার ইচ্ছে।' কন্ডাকটর ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগোতে এগোতে বলল। বিড় বিড় করছিল—'বহুবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে এ সব নোটের ভাঙানি ট্রামে বাসে পাওয়া যায় না।'

'আপনার নোটটা দিন, ভাঙিয়ে দিচ্ছি।' কেউ বলল। ভিড়ের ভিতর প্রথমে বাড়িয়ে দেওয়া হাতটাই দেখতে পেল বাদল। হাত বেয়ে বেয়ে মুখটা গেল। এক বুড়ো ভদ্রলোক তার একটা হাত গলাবন্ধ কোটের ভিতরের পকেটে ঢোকাচ্ছেন। বাসটা ঝাঁকানি দিল। ভদ্রলোক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। কয়েকটা হাত তাকে ধরল। তার ভঙ্গি দেখে বাদলের মনে হল যে এতে তার কিছু মোটা লাভ হবে। সে হাসল। ইচ্ছে হল হাতের নোটটা ভদ্রলোকের মুখে ছুড়ে মারে তারপর দুরদার ঘুঁষি চালিয়ে এই ভিড়ের ভিতর রাস্তা করে নেমে যায়।

'না, আমি নেমে যাচ্ছি।' বাদল বলল।

'কেন?'

'এমনিই, কাজ আছে।'

'কী হল?'

'কিছু না,তবু নেমে যাচ্ছি দেখছেন না?' সে গলায় রাগ আনল।

সারিবাঁধা মানুষদের নিতম্ব, যেন মাংসের স্তূপ ঠেলে ঠেলে যে গেটটার কাছে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের লাথি মেরে শুইয়ে দিয়ে যায়। জামা শার্টে পুরনো ঘামের গন্ধ। গুমোট। মুখ ফিরিয়ে কেউ বলল 'কাত হয়ে যান,' 'আস্তে যান।' রাস্তা কেউ দিচ্ছে না। কেউ কেউ সামান্য শরীর বাঁকাচ্ছে।

'রাস্তা দিন।'

'রাস্তা করে নিন। দেখছেন তো—' কেউ বলল।

টুং করে ঘন্টি বাজল। প্রায় ধাক্কা খেয়ে বাদল নামল। তাকে কেউ ফিরেও দেখল না। বাসটা নির্বিকারভাবে চলে গেল।

এখন সে নিজেকে নেড়ি কুকুরের মতো অপমানিত বোধ করতে লাগল।

'আমার একটা কিছু করা উচিত ছিল' সে ভাবল 'অন্য কেউ হলে করত।' কী করত তা বাদল বুঝতে পারল না কিন্তু উত্তেজিত হল—এত উত্তেজিত যে স্থিরভাবে কোনও কিছুর দিকে তাকাতে পারছে না, বুঝতে পারছে না কোথায় এসেছে। মনে হল কেউ তাকে চুরমার করে দিচ্ছে। যেন তার কোনও কিছুই তার বশে নেই। হাত পা সব অন্য লোকের। দুঃখটা শুধু তার। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে বাদল।

সে এক পাও নড়ল না। যেন সে অন্য কেউ। সে ভাবতে চাইল না কিছু। ভাবল। আমি বাদল। তুমি বাদল? বেশ! এ রকম কোটি কোটি লোক আছে যারা জানে না যে তুমি বাদল—বাদল বলতে তোমাকে বোঝায়, তারা তোমাকে কখনও দেখেনি। কখনও দেখবে না।

Shahnaz

তুমি আছ কি নেই তারা জানে না। বাস-এ ভিড়ের ভিতর এরকম লোক ছিল। কী ভীষণ ইনসিগনিফিক্যান্ট তুমি।

নিজেকে নিয়ে সে ভীষণ সঙ্কটে পড়ল এইবার। সে অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে। বার্নিশের গন্ধ—কতগুলো নিচু আলোকিত কাঠের আসবাবপত্রের দোকান। কাদের ছায়া কচকে আলমারির কাঠের পালিশ করা তক্তার ওপর ঘুরছে। সে নিবিষ্ট হয়ে ঝকঝকে আসবাবপত্রের দোকান দেখে। এখন সন্ধে। আলো। লোকজন। বড় রাস্তা। একটা লোক বিকারহীন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আকাশ দেখছে। কোথায় আছে ঠিক করতে পারল না। কোথায় তার দুঃখ তাকে বলছিল 'তোমাকে অপমান করা কত সহজ। খুব সামান্য কারণেই তোমাকে অপমান করা যায় কারণ তুমি ভিড়ের ভিতরে একজন মাত্র—প্রায় অস্তিত্বহীন কোনও বিষয়ের ওপর মনকে স্থির রাখা প্রায় অসম্ভব মনে হল।

তবে বেঁচে থেকে কী লাভ যদি সামান্য কারণেই নিজেই নেড়ি কুত্তার মতো মনে হয়? এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে বার ভিন্নতর চিন্তা করতে লাগল। আমি বাদল—যাদবপুরে পিসিমার বাড়িতে যাচ্ছিলাম। সেখানে আমার জন্যে পায়েস রাঁধা ছিল। এই শীত শীত ভাব—ঠাণ্ডা জমাট পায়েস—নতুন গুড়ের গন্ধ। কিন্তু, আমি বাদল—বাদলের জন্যে পায়েস রেঁধে রাখবার লোক ক'জন আছে? আমি বাদল যাব এই আশা করে কোটি কোটি জনের মধ্যে ক'জন থাকে? বাদল হয়ে আমি কতটুকু আছি? আমি কতটুকু নেই?

সেইক্ষণে বাদল বাদলের জন্য ভীষণ দুঃখ অনুভব করতে লাগল। বাদল অনুভব করল অপমানিত বাদলের জন্যে সে প্রায় কাঁদতে পারে।

এরকম মাঝে মাঝে হয়। 'এ আমার দুঃখ রোগ' সে ভাবে 'এ আমার নিয়তি।'

৩

আজ রাস্তায় খুব ভিড়। এখন সন্ধে। কিন্তু এ সময়েও রোজ এত ভিড় দেখা যায় না। বোধ হয় আজ কোনও উৎসবের দিন। কিন্তু কোন উৎসব তা বাদল ভেবে পেল না। কোনও ছুটির দিন ছিল না আজ। তবু দিনটা বোধ হয় উৎসবেরই ছিল—যে উৎসবের খোঁজ বাদল এখন আর রাখে না। প্রায় সকলেই দল বেঁধে হাঁটছিল। যেন কোনও অচেনা দেশের উৎসবের ভিতরে হঠাৎ এসে পড়েছে সে—এখানকার রীতি নীতি আইন কানুন কিছুই তার জানা নেই—এমনি ভীষণ একা নির্জন পরিত্যক্ত লাগছিল নিজেকে। যেন এখনও চোখের পাশ ত্রি-কোণ, দীর্ঘ রেখা অর্ধবৃত্ত, সরল দণ্ডের মতো আলো আর ছায়া তাকে ঘিরে আছে।

অর্থহীন সবকিছু মনে হয়। দুঃখময় সবকিছু মনে হয়। বাদল সুধাবিন্দু হয়ে বাদলকে ভাবছিল : বাদল যেন দুর্লভ ধাতুর তৈরি কোনও প্রাচীন ঘণ্টার মতো—খুব মৃদু কম্পনও যার মধ্যে অবিরল শব্দের তরঙ্গ তোলে। কোনও কবিতায় যেমন সে কাঁদে, কোনও গানের আসরে বসে যেমন সে কেঁদেছিল। আর সবকিছুই যেন ওলট পালট এলোমেলো হয়ে আছে। যেন চূড়ান্ত একটা টেনশনের মধ্যে সে দিন কাটায়। হয় ভেঙে যাবে, নয়তো ফেটে পড়বে। হয়তো বাদল কারও কারও প্রিয় হতে চেয়েছিল। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই সে কথা বলতে চেয়েছে। সে কথা বলে আস্তে, কথায় কোনও ইংগিত থাকে না এবং হাস্যময় থাকবার চেষ্টাও তার আছে। কিন্তু সম্ভবত তার অত্যন্ত ঘিনঘিনে সাদা রং, নীল শিরা, বাচন ভঙ্গি—এই সব মিলিয়ে সে তার চতুর্দিকে একটা বিরাগের পাঁচিল তুলে রাখে। সাধারণ মানুষের কাছে কোথায় যেন সে প্রিয় হতে

পারে না। এবার বাস-এ টিকিট কাটবার সময়ে ভুল করে দশ টাকার নোট দেওয়াতে কন্ডাক্টার তাকে এমনিতেই যেতে বলেছিল। কিন্তু বাদল যায়নি, নেমে গিয়েছিল। অন্য লোক হলে হয়তো, বাদলের মতো নেমে যেত না। কারণ এই সব ক্ষেত্রে কন্ডাক্টার উপায় নেই যখন তখন ভদ্রতার খাতিরেই যাদের খানিকটা যেতে দেয়, কিন্তু বাস-এ বসে যারা এই ঘটনা লক্ষ করেছিল তাদের মত নিলে বলা যেত যে কন্ডাকটরের মুখে অকারণে যে আক্রোশ ফুটে উঠেছিল তা আশ্চর্য। এবং প্রায় নির্দোষ বাদল নেমে যাওয়ার পর বোধহয় তার মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসির আভাস দেখা গিয়েছি। বাদলের রং অত সাদা না হলে এবং নীল শিরা দেখা না গেলে—ধরা যাক বাদল একজন সুরুচি সুসজ্জিত ভদ্রলোক হলে হয়তো এরকম হত না। মনে হয় এক ধরনের হীনম্মন্যতায় সে অবিরত ভোগে, তাই সে দ্রুত নেমে গিয়েছিল। এও তার দুঃখরোগ সে অবিরত ভোগে, তাই সে দ্রুত নেমে গিয়েছিল। এও তার দুঃখরোগ—খুব সামান্য আঘাতে তার মন অবিরল দুঃখের তরঙ্গ তোলে। সারাটা সময় সে চূড়ান্ত টেনশনের ভিতরে আছে। আলোর অস্তিত্ব যেমন কোন বস্তুর ওপর প্রতিভাত হলেই মাত্র বোঝা যায়, তেমনি বাদলও হয়তো নিজের অস্তিত্বকে বোঝবার জন্যে পরিবেশের ওপর প্রতিভাত হতে চায়। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে এ তার ভীষণ সংকট কেউ তাকে বলে দিক যে সে আছে।

ভিতরে একটা শীতল ভাবকে অনুভব করছিল বাদল। কিছুদিন আগেকার সেই গুমোট গরমের ভাপটা আর নেই। মনে হয় শীত আসছে। এখন একটু শীত। জমাট কুয়াশা। জ্বরগ্রস্ত সবকিছু মনেহয়। সে ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলো টের পাচ্ছে। একটু উত্তেজনার দরকার। সে ভাবল একটা সিগারেট খাবে। পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। উজ্জ্বল দোকান।

'এক সিগারেট।' সে হাত বাড়িয়ে পয়সা দিল। 'ওই তো বাদল' সে প্রায় চমকে উঠে নিজেকে দোকানের আয়নায় প্রতিফলিত দেখল। যেন সে ভিন্নজনকে দেখছে এমনি আগ্রহ নিয়ে নিজেকে দেখতে লাগল। বাদলকে বাদলের ভাল লাগছিল। সে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে লাগা। কোথায় যেন নিজের ওপর তার গভীর বিশ্বাস আসছিল।

'আমি বাদল' সে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, 'আমি সবসময়ে সবকিছুর ওপর যদি নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে পেতাম!'

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার খেয়াল হল যদিও রাস্তাটা তার অচেনা তবু যেন খুব নিশ্চিত অমোঘভাবে সে বেনেটোলা লেন-এর ধুলো, আরশোলা আর ইঁদুরে ভর্তি ঘরটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এই তার নিয়তি—অচেনা রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ছোট রাস্তায় হঠাৎ এসে পড়া। 'আমি এক্ষুণি ফিরব না' সে ভাবল। যেখানে দাঁড়াল সেটা তার সম্পূর্ণ অচেনা অদ্ভুত এক বাস স্টপ। 'এখন মাত্রসন্ধে, আমি এক্ষুণি ফিরব না—' এই ভেবে সে সেই বাস স্টপে দাঁড়িয়ে একটি মেয়েকে লক্ষ করে।

মেয়েটির দেহ উদ্যত, সামনের দিকে একটু ঝুল খাওয়া—গোড়ালি তুলে শুধু পায়ের পাতার ওপর ভর করে আছে। 'এক্ষুণি চলে যাব—যে কোনও মুহূর্তে আছি কি নেই—যাচ্ছি—এমনিভাবে সমস্ত দেহে চলে যাওয়ার আভাষ নিয়ে সবুজ শাড়ির আঁচল চেপে মেয়েটি দাঁড়িয়ে। এক্ষুণি আঁচল ছেড়ে বাস-এর হ্যান্ডেল ধরবে। এত টুকু চিহ্ন রেখে যাবে না। ছিল কি ছিল না—বাদল ভাববে। পানের দোকানি তার উজ্জ্বল দোকানে ম্রিয়মান দৃশ্য দেখে। বাদল ভাবল—কী ভীষণ ভুল চিত্র সব—এ টুকুতেই মুছে যায়—ভাল করে তৈরি হওয়ার আগেই ভাঙে। বাদল তাকিয়ে দেখে দোকানের পর দোকান—এপাশে ওপাশে। অজস্র অসংখ্য অবয়ব জ্যামিতিক

Shahnaz

আকার নিয়ে ঘুরছে ঘুরছে ঘুরছে। নাক মুখ চোখ কিছু বোঝা যায় না। ওয়াশ-এর ছবির মতন। শুধু অপেক্ষমান মেয়েটি স্থির—যেন বহুকাল ধরে দেহে চলে যাওয়ার আভাষ নিয়ে স্থির আছে। অথচ যাবে। মেয়েটির জন্য বাদল দুঃখিত হল। যেন এই দৃশ্যটি মুছে যাওয়া তার পক্ষে মারাত্মক। যেন চলে যাওয়ার মানে মরে যাওয়া—এই অবয়ব বাদল আর কখনও দেখবে না। যেন সে দাঁড়িয়ে কারও মরে যাওয়া দেখছে, কিছু করতে পারছে না। দেহের ভঙ্গি বদলে গেলেই একটা সূক্ষ্ম মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটে—বাতাসে তার কোনও চিহ্ন থাকে না। শুধু মনে ক্ষীণ ক্ষীণতম স্মৃতি কিংবা আভাষের মতো হয়ে থেকে যায়। অতীতে কারও আত্মমগ্ন কোনও গভীর ভঙ্গি তার মনে আছে। ভঙ্গুর দৃশ্য সব—পলকেই পালটায়।

'আমি হাজার হাজার ঘণ্টা এইখানে আছি' বাদল ভাবে, 'কেমন ক্লীবের মতন ঠাণ্ডা হয়ে আছি। কেউ জানেও না আমি আছি কি নেই। কে জানে আমি কতখানি আছি। যতক্ষণ আঘাতে বিরত ততক্ষণ জানব না।

মেয়েটি আলোর থামের নীচে ব্রোঞ্জের মূর্তি হয়ে আছে। বাদল ধানপোকার গমনের মতো ধীর গতিতে মেয়েটির কাছে আসে।

বাদল আপন মনে কয়েকটি সংলাপ তৈরি করে। 'আমি বাদল। কোন সময়ে আছি জানি না। সংশয় নিয়ে আছি সারাক্ষণ, কে আমাকে বলে দেবে আমি আছি কি না।'

বাদল চমকে উঠে নিজের গলার স্বর শুনল। এই প্রথম। যেন সে আপনমনে ভাবতে ভাবতে বলছিল 'আমি আছি কি না।'

মেয়েটি পলকে মুখ তুলল। বাদল দেখল রাস্তার আলো ওর মুখে পড়ে চাঁদের আলোর মতো হয়ে গেল।

'কী বলছেন?' মেয়েটি বলে। সন্দেহ। বাদল ভাবল বোধহয় চোর জুয়াচোর এবং ধর্ষকদের সম্বন্ধে ওর অভিভাবক ওকে সতর্ক করে রেখেছে। ইচ্ছে হল হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে 'দেখ তো আমি আছি কি না।'

বাদল একটু হেসে বলল 'বলছিলাম এই রাস্তায় বাস ভীষণ দেরি করে আসে।'

মেয়েটি কথা বলে না। কুঁচকে যায়। কোনও অস্থিহীন উদ্ভিদ-পোকার মতো। যেন এক্ষুণি ও ওর হাত-পা-মাথা শরীরের ভিতরে টেনে নেবে। বাদল মুহূর্তে সুধাবিন্দু হয়ে নিজেকে দেখছিল—ঘিনঘিনে সাদা রং, নীল শিরা, উগ্র ক্ষুধা এবং অবদমনের ভাব একসঙ্গে ফুটে থাকা মুখ। বাদল ভাবল বাদলের জন্য ভীষণ দুঃখে সে আর্তনাদ করে উঠতে পারে।

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাস্তা দেখছে। সবুজ আঁচলে চিবুক ঢাকা। বাদলের ভীষণ কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। যেন কিছু বলা দরকার—ভয়ঙ্কর দরকার। মেয়েটি ক্ষণভঙ্গুর দৃশ্য হয়ে আছে—এক্ষুণি কোথাও চলে যাবে—কোথায় যাবে বাদল জানে না। জানবে না। বাদলের ইচ্ছা হচ্ছিল এমন কিছু করে যাতে মেয়েটি চিরকাল তাকে মনে রাখে। হয়তো সেই ঘটনার কথা মেয়েটি বিয়ে হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পর পুরনো হয়ে যাওয়া স্বামীর কাছে বলবে। হয়তো হাসির ছলেই বলবে, কিন্তু বলবে, আর তারপর অনেকদিন ধরে তার কথা মনে রাখবে মেয়েটি।

মেয়েটি সতর্ক চোখ দিয়ে বাদলকে দেখল। একটু সরে গেল। অধৈর্য। বাদলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল। 'খুব সেয়ানা মেয়ে' বাদল ভাবে, 'খুব চতুর। তবু আমি সব কথা তোমাকেই বলতে পারি, কেন না তোমাকে বিশ্বাস করবার প্রশ্নই ওঠে না, কে জানে প্রতিটি চুম্বনের জন্য তুমি পয়সা গুণে নাও কি না। হয়তো সেই কারণেই তোমাকে সব কথা বলা

যায়।'

'কিন্তু কী বলব?' ভাবল বাদল, কী বলবার আছে আমার?' অনুভব করে বলবার ভীষণ আবেগমাত্র আছে কিন্তু আসলে সে কিছুই বলবার মতো খুঁজে পেল না। একটি টলটল করা দৃশ্য শুধু চোখের ওপর পদ্মপত্রে জলের মতো কাঁপছে।

মুহূর্তেই সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে বাস এল। চলে গেল। মেয়েটি বাস-এর জানালা থেকে একপলক বাদলকে দেখল। যেন বলল, তুমি কিছু চেয়েছিলে। সব কিছু দিতে পারতাম।

মেয়েটি নিশ্চিহ্ন। পোড়া ডিজেলের গন্ধ, একটু ওড়া ধুলোর গন্ধ। বাদলের মনে হয় তার চারদিকের পরিবেশ, চলন্ত অবয়ব, সাজানো দোকান সবকিছু একটা বিকৃত মুখের মতো যার একটা চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে। পরিবেশের মুখে সেই চোখটা একটা ক্ষণস্থায়ী দৃশ্যমাত্র হয়ে ছিল।

পলকে বাদল বাদলকে নিয়ে একটা ঘটনা তৈরি করতে লাগল। যেন সে বাদলের কেউ না, —বাদল অন্য কেউ—একটি ঘটনার নায়কমাত্র। বাদল আর সেই নিশ্চিহ্ন চতুর মেয়েটিকে নিয়ে ঘটনাটা এইরকম :

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। রাস্তাটা খুব নির্জন। এতক্ষণ যারা কাছাকাছি ছিল তারা যেন বাতাসের সঙ্গে শুকনো অর্থহীন পাতার মতো কোথাও মিলিয়ে গেছে। তারা একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত শহরের নির্জন পথে হাঁটছিল।

'কী নাম তোমার?'

'প্রীতিলতা। তোমার?'

'বাদল। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'যাদবপুর।'

'কোথায় থাকো?'

রিফিউজি কলোনি। বিজয়গড়—যাদবপুর।'

'সেখানে তোমার কে আছে?'

'মা বাবা সবাই।' মেয়েটি—আশ্চর্য—উত্তর দিল।

'আমার পিসিমা যাদবপুরে থাকেন।'

'কোথায়?'

বিজয়গড়। বাদল উত্তর দিল—'আমরাও রিফিউজি।'

'আমরাও।' মেয়েটি উত্তর দিল 'আমি ছেলেবেলা থেকেই ওখানে আছি। তুমি কোথায় থাকো?'

'এইখানে—বেনেটোলা লেন-এ। আমি একা।'

'কেন, তোমার মা বাবা—?'

'বাবা নেই' বাদল কষ্টে বলল—'মা পাকিস্তানে আমাদের বিষয়সম্পত্তি আগলে রাখে। মাকে আমি বহুকাল দেখি না।'

'মাকে আনিয়ে নাও না কেন?'

'মা এখন অন্য দেশের নাগরিক, আমি অন্য দেশের। আইনত আমাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই।'

'ধ্যুৎ' মেয়েটি হাসল।

Shahnaz

'সত্যি। আমার মা এখনও বিশ্বাস করে একদিন পাকিস্তান উঠে গিয়ে সব আবার আগেকার মতো হবে। মা জানে তখন আমি মা'র কাছেই থাকব। মা শুধু সে দিনের অপেক্ষা করছে।'

মেয়েটি বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাদলের চোখদুটো দেখা যায় না। চশমার কাছে আবছা আলো খেলছে। ওর মুখটা করুণ রোগা মনে হয়।

'একা একা মাকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হয় না!'

'হয়। মাঝে মাঝে আমি ভীষণ ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে মার কথা ভাবি। চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাই সন্ধেবেলায় ঝুপঝুপ অন্ধকার হয়ে আসে কুয়োতলার পাশে কালকাসুন্দের ঝোপ, লেবুতলা, ও পাশে কুলবড়ই গাছটায় বাদুর ঝোলা অন্ধকার। মাটি আর জলের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়—যেন এইমাত্র বৃষ্টি হয়ে গেল। আর কচি লেবুপাতার নীচে, কালকাসুন্দের ঝোপে, ঘাসে, পেয়ারা পাতায় চারদিকে চকমক করে জোনাকি পোকা। সেই অন্ধকারে দাওয়ায় ছোট্ট একটু আলো নিয়ে মস্তবড় একটা অন্ধকারে মা বসে আছে। মা যেন সেই ছোট্ট একটু আলো জ্বেলে বহু বহু বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে আমি যাব বলে। মা'র চোখ মনে পড়লেই আমার একটা মস্তবড় ছায়ায় ঢাকা দিঘির কথা মনে পড়ে যার জল ছিল খুব কালো যার থই ছিল খুব গভীর।'

মেয়েটি হাসল ' আমার মা বাবার ভীষণ ঝগড়া হয়। মাঝে মাঝে বাবা মাকে মারে। আমার তখন খুব কষ্ট হয়। ঝগড়া হলেই আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে আসি। আজ যেমন এসেছি।'

দুঃখিত বাদল মেয়েটির পিঠে হাত রাখল, বলল 'থাক। বোলো না। অন্য কথা বলো।'

'বেশ।' মেয়েটি আবার হাসল।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছিল। কেউ কোথাও নেই। এটা ইডেন গার্ডেন। ওরা জলের কাছে বসল। দুজনে পাশাপাশি। বাদল প্রীতিলতাকে চুম্বন করে।

'তুমি কী করো?' মেয়েটি হঠাৎ বলল।

'একটা স্কুলে মাস্টারি করি।'

মেয়েটি চমকে মুখ ফেরাল। বাদলের চশমার ঝাপসা কাঁচ দেখল। শীর্ণ সাদা মুখের আভাষ। তারপর ঘাস থেকে ডাঁটা তুলে মুখে দিল। অন্যমনস্ক হয়ে রইল। খুব হতাশ হল প্রীতিলতা।

'অন্য কিছু করো না কেন?'

'কেন?'

'মাস্টার মানেই তো ইস্কুল, বেঞ্চি, হাইবেঞ্চ, পড়াশুনো—এইসব।'

'তাতে কী?'

'কেমন ভয় ভয় করে।'

'তুমি স্কুলে যাও না?'

'যেতাম। এখন ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'এমনিই। হল না। ইস্কুল ভাল লাগে না।'

'মাস্টারকেও না?'

'মাস্টার মনে হলেই কেমন যেন স্যার স্যার মনে হয়।'

'পাগল!'

কিছুক্ষণ চুপ।

'আমার জ্যাঠামশাই মাস্টার ছিলেন। খুব সরল,আর খুব বোকা মনে হত।'

'বোকা মনে হত?'

'বোকা বোকা ভীষণ বোকা। বিশ্রী।' মেয়েটি হাসল। বাদল শিউরে উঠল।

হেসে ঘাসের ওপর গড়িয়ে গেল মেয়েটি। সমস্ত শরীর ছড়িয়ে দিল।

কাছাকাছি কেউ নেই। শুধু কয়েকটা মাছ পায়ের কাছে খেলছে। শুধু তারা দুজনে একা। প্রীতিলতা অন্ধকারে ব্রোঞ্জের মূর্তি হয়ে আছে। নিচু হয়ে বাদল প্রীতিলতাকে চুম্বন করল। প্রীতিলতা হাসল।

'এই নিয়ে সাতাশবার।' প্রীতিলতা বলল।

'কী গুণছ?

'আমি যা নিই সব গুণে নিই।'

বাদল ভীষণ চমকে উঠল। সোজা হয়ে বসে বলে 'অন্ধকারে তুমি টাকাও কি গুণে নাও?'

'গুণবার মতো টাকা আর পাব কোথায়?' খুব আস্তে যেন অনেকদূর থেকে প্রীতিলতার গলা অন্ধকারে ভেসে এল 'ছেলেবেলায় যখন বাবা পয়সা দিত তখন বার বার গুণতাম।' প্রীতিলতা হাসল।

'কেন, তুমি টাকা পাও না?'

'না।'

কেউ তোমাকে দেয় না? মনে করো আমার মতো কেউ?'

'কেন দেবে?'

বাদল ঘেমে উঠল। বলল 'এমনিই। বন্ধু বলে।'

মেয়েটি হাসল 'কেন নেব?'

'নিলে কী হয়? কিছু দিলে কিছু নেওয়াও উচিত।'

'পরের কাছ থেকে টাকা পয়সা আমি কখনও নিই না। ছেলেবেলা থেকেই বাবা মা নিতে দেয় না।'

'ও।' বাদল চুপ করে থাকে। যেন কেউ তাকে জোরে চড় মেরেছে।

'তুমি কী ভাবছ?' প্রীতিলতা বলল।

'কী যেন, জানি না।'

'মনে হয় তুমি খুব কষ্ট পাও। মনে মনে। তোমার মুখ—।'

'জানি।'

প্রীতিলতা তার হাত বাদলের মুখের ওপর রাখল। কপালে হাত বুলিয়ে দিল।

'এত ভাবো কেন? এইসব কষ্টের কথা ভুলে যাও। দুঃখ কার নেই, পাঁচজন পাঁচরকম দুঃখ নিয়েই তো আছে। তুমি তোমার দুঃখের কথা শোনাতে গেলে তারাও তাদের পাঁচটা দুঃখের কথা শোনাতে পারে।'

'আমি তো কাউকে বলি না।'

'আমি টের পাই। তুমি আপন মনে কষ্ট পাচ্ছ। তোমার একটা কিছু করা উচিত।'

Shahnaz

'কী?'

'কোনও কাজ—খুব পরিশ্রমের কাজ।'

বাদল চুপ করে প্রীতিলতার অন্ধকার মুখের দিকে চোখ রেখে প্রীতিলতার কথাই ভাবছিল। বলল, 'ভাবছি একটা পরীক্ষা দেব।'

'কী পরীক্ষা?'

'এম. এ.।'

প্রীতিলতা হাসল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল 'আবার সেই পড়াশুনো, বেঞ্চি, হাইবেঞ্চ আর মাস্টার মশাই! কী হবে এত পড়াশুনো করে?'

'জানি না।' বাদল ম্লান হয়ে বলল 'একটা কিছু তো করা উচিত।'

'পড়তে পড়তে পড়তে তোমার ক্লান্তি লাগে না!'

অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে রইল।

'এত ভেবো না। এ কষ্ট তৈরি করে কি লাভ! প্রীতিলতা হঠাৎ বলল 'তার চেয়ে বরং মাকে নিয়ে এস।'

'কেন?'

'এমনই' প্রীতিলতা মুখে সবুজ রঙের আঁচল চাপা দিয়ে হাসল 'মা এসেই তোমার বিয়ে দেবে।'

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। বলল 'চলি।'

'এক্ষুণি?'

'এরপর বাড়িতে বকবে।'

'আবার কখন আসবে, এইখানে?'

'আসব না।'

'কেন?'

'এমনিই' হাসল মেয়েটি 'আর কি দরকার!'

'আমি যে ভীষণভাবে তোমাকেই চাই।'

'আমি চাই না' বলল মেয়েটি 'আজ মন খুব খারাপ ছিল তাই তোমার সঙ্গে ঘুরলাম। অন্যদিন মন খারাপ হলে আর কারও সাথে ঘুরব। আমি কাউকে অনেকদিনের জন্যে চাই না।'

'কেন?'

'ভীষণ পুরনো মনে হয়। বলে বলে বলে পুরনো হয়ে যাওয়া কথা, দেখে দেখে দেখে পুরনো হয়ে যাওয়া মানুষ।' বলতে বলতে প্রীতিলতা শ্বাস দীর্ঘ করে।

যেন অন্ধকারে প্রীতিলতা কাঁদল। বাদলের মনে হল কাঁদতে কাঁদতে মোমবাতির মতো গলে গলে যাচ্ছে প্রীতিলতা। ক্ষয় হয়ে হয়ে হয়তো মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

বাদলের মনে হল তার হাত ছেড়ে দিয়ে কেউ চলে গেল। পাখি মাটি থেকে কিছু খুঁটে যাওয়ার সময় যেমনি ভাবে হাঁটে ঠিক তেমনি ভাবে হেঁটে চলে গেল। হয়তো আড়ালে গিয়ে ও চোখে আঁচল দেবে বাদলের জন্য। অসংখ্য অবয়ব তার চোখের সামনে অর্ধবৃত্ত, ত্রি-কোণ অর্থহীন আলো আর ছায়া হয়ে ঘিরে রইল। মনে হয় কথা সব ফুরিয়েছে—বারবার বলে দেওয়া পুরনো সব কথা।

বাদল সচেতন হয়ে দেখল সে একই জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। সেই অদ্ভুত বাসস্টপ। অচেনা রাস্তা। সারি সারি উজ্জ্বল দোকান। সে কতক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে আছে তা ভেবে পেল না।

তার মনে হল অনেকক্ষণ ধরে সে একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল। একটা হাত একটা গাড়ির জানালায় রাখা আছে। অন্ধকারে গাড়ির ভিতরের অবয়ব দেখা যায় না। রাস্তার জোর আলো শুধু হাতটার ওপর পড়েছে। মনে হয় ঠিক যেন কাটা হাত। সেই হাতে ঘড়ি। এতক্ষণ সে আর কিছু দেখেনি—না গাড়িটা না হাতটা, শুধু ঘড়িটাকেই দেখেছে। দুটো কাঁটা একটা নিখুঁত সুন্দর কোণ সৃষ্টি করে আছে। সে অনেকক্ষণ কাঁটা দুটোকে দেখেছে। দেখেছে দুটো কাঁটার তৈরি কোণটা আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে চিকণ থেকে চিকণতর হয়ে গেল। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারেনি ঘড়িতে ঠিক কটা বাজে।

সচেতন হয়ে বাদল ঘড়িতে সময় দেখল। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। মুহূর্তে সে সুধাবিন্দু হয়ে যাচ্ছিল। যখনই নিজের ওপর নিষ্ঠুর হতে ইচ্ছে করে তখনই সে টের পায় সে সুধাবিন্দু হয়ে যাচ্ছে। বাদল সুধাবিন্দু হয়ে বাদলকে ভাবল : বাদলের এও এক দুঃখরোগ—সে মনে মনে ঘটনা তৈরি করতে ভালবাসে। কিন্তু সেই ঘটনাও সে সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারে না। বাস স্টপে একটি মেয়ের ভঙ্গি তাকে আকর্ষণ করেছিল মাত্র। সেই সুন্দর ভঙ্গি থেকে সে যে ঘটনা তৈরি করেছিল তা বাদলকেই আঘাত করেছিল। মেয়েটির নাম সে দিয়েছিল প্রীতিলতা—আশ্চর্য, অন্য কিছু নয়! হয়তো প্রীতিলতা বলতে সে কিছু একটা ধরে নিয়েছিল। মেয়েটি রিফিউজি—বহু পুরুষের সঙ্গ পেয়ে ক্লান্ত—সে মাঝে মাঝে মা বাবার মাঝখান থেকে পালিয়ে আসে। বোঝা যায় প্রীতিলতাও এমন কেউ—যে দুঃখরোগগ্রস্ত। বাদল এর থেকে সুন্দর কিছু যে ভেবে পায়নি তার কারণ হয়তো সে তার সময় এবং পরিবেশের কাছে শৃঙ্খলিত আছে। সে যে রাজকন্যার কথা ভাবতে পারে না তার কারণও হয়তো তার দুঃখরোগ। যেন যে নিজের কল্পনার কাছেও ক্রীতদাস, এবং এমনই অক্ষম যে তার আত্মপ্রতারণাও বেশি দূর যায় না। যেমন সে ভাবে সারা বছর ধরে সে একটি মাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগছে, অথচ সে ভাবতে পারে না যে সে অন্য কিছুতে ভুগছে। যদি সে বুঝতে পারত যে সারাবছর সে—তে ভুগেছে। নইলে তার মনে হবে কেন যে একটা শুধু হাত—কাটা হাতের মতো—একটা ঘড়ি, দুটো কাঁটার একটা নিখুঁত কোণ—এই সবের কোনও অসম্ভব অর্থ আছে! অথচ সারা সময় সে বৃথাই ভাবছিল যে সে হাজার হাজার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে, অথচ মনে হয়েছিল চার পাশের দৃশ্য ভীষণ ভঙ্গুর—পলকে পলকে পালটায়!

'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল ' এ আমার নিয়তি।'

বাদলের ইচ্ছে হল কোথাও যাবে। কিছুক্ষণ সময় কাটাবে। এই ভেবে সে এক বন্ধুর কাছে যাবে বলে হাঁটতে লাগল।

৪

গুহার মতো প্রকাণ্ড ঘর। জানালা নেই, একটা মাত্র দরজা। চারদিকে ঝুলের মতো চাপা অন্ধকার। একটা হলদে আলো জ্বলছে। শ্বাস টানতে কেমন কষ্ট হল বাদলের। হাতের তাস দেখছিল। বরুণ অনেকক্ষণ হাতের তাস ফেলে শুয়ে আছে। অধীর চুপ। শুধু হীরণ খেলছে।

Shahnaz

আবছা শিলালেখ-এর মতো অবয়ব নিচু স্বরে হীরণ বলল 'জোড়া আছে। দুটো বিবি। তোর?'

বাদল অবহেলায় হাতের তাস ফেলে দিয়ে বলল 'দশের। নিয়ে যা।'

দু'টাকার কিছু বেশি গেল।

'এবার উঠব' ঘরের একটা মাত্র দরজার দিকে চোখ রেখে বাদল বলল।

'বোস না।'

'না, অনেক রাত হয়ে গেছে।' বলতে বলতে বাদল দেখল গাছের শুকনো ডালের মতো হাত বাড়িয়ে অমানুষিক ভঙ্গিতে পয়সা গুনল হীরণ—যেন ওর আয়ুর প্রতিটি বছর গুনে নিচ্ছে। অধীর ট্যাক্সি ভাড়া চাইছে, বলল 'ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ভাড়াটা দে।'

উঠতে গিয়ে বাদল হাঁটুর হাড়ে সেই চিনচিনে ব্যথা টের পেল। ব্যথাটা টের পেতেই সে পলকে উঠে দাঁড়ায়। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে হীরণকে বলে 'তোর নোটিসগুলো দিস। ভাবছি পরীক্ষাটা দেব।'

'কেন?'

'একটা কিছু নিয়ে থাকা দরকার। এ ভাবে চলে না।'

হীরণ কোণাকুণি তাকাল। বাদল ভাবল হীরণ তাকে পছন্দ করে না। মুহূর্তে সে তার সাদা রং আর নীল শিরার কথা ভাবছিল।

হীরণ অন্যমনস্ক ভাবে বলে 'ও।'

বাদল নেমে এল। রাস্তায় যখন সে উঠে আসে তখনও অলস একঘেয়ে ভঙ্গিতে আধশোয়া অধীর পুরোটা শুয়ে পড়বার আগে ট্যাক্সি ভাড়া চাইছিল। আর সব চুপচাপ। তখনও বাদলকে ছাড়া ওরা তিনজন। হয়তো সারারাত চলবে। অধীর সকালের বাস ধরবে। কেননা, জুয়ায় জেতা পয়সা হীরণ খরচ করতে চায় না। বাদলকে রাত্রিবেলা থাকতে কেউ বলেনি। বলবে না, বাদল জানত। নিজেকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত মনে হল বাদলের।

'এ আমার দুঃখরোগ' ভাবতে গিয়েই তার মনে হল কেউ সামনেই কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মোড় ঘুরলেই তাকে দেখতে পাবে। পেছনে তাকিয়ে দেখে ঝুপসি ঝুপসি গাছ, রাস্তাটা ভীষণ সোজা—প্রায় জ্যামিতিক, পাথরের মতো কঠিন আলো। কাউকে দেখা যায় না।

বাদল স্থির হয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছিল, যেন কিছু ঘটবে। যা অমোঘ। অথচ সব কিছু স্থির। প্রায় মৃত। যেন সে এক অতি প্রাচীন পরিত্যক্ত শহরে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যবহারে ব্যবহারে ক্ষয় হয়ে যাওয়া সবকিছু। যেন বহু শতাব্দী ধরে এইসব রাস্তা প্রাচীর তারই অপেক্ষায় ছিল।

বাদল অনুভব করে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে—খুব কষ্ট। ভয় পেলে যেমন হয়। মনে হল জোরে নিশ্বাস ফেললেই চারদিকের পরিবেশ গম্ভীর কিছু একটা নষ্ট হয়ে যাবে। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় না। বহু লক্ষ বছরের মৃত ম্যামথ্ প্রাণীদের দেহ প্রাসাদের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল সামনেই কোথাও কেউ অপেক্ষা করে আছে। মোড় ঘুরলেই তাকে দেখতে পাবে। অন্ধকারে হাইড্রেনের ঢাকনা খুলে সে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বহুকাল ধরে সে বাদলের প্রতিটি রাস্তায় গর্ত খুঁড়ছে, অপেক্ষা করে আছে তাকে একা পাবে বলে।

'হয়তো সে আমার নিয়তি, সে আমার ঘাতক' ভাবল বাদল। কে জানে সে হীরণের মতো অমানুষিক ভঙ্গিতে কোথাও অপেক্ষা করছে কিনা, কিংবা হয়তো সে বাদল নিজেই।

বাদল জুতো ঠুকে ঠুকে হাঁটতে লাগল। ভাবল এ সব কিছুই অর্থহীন। কেউ কোথাও কোনওদিন তার জন্য অপেক্ষা করে নেই। জুতোর শব্দ সম্পূর্ণ অন্তঃসারহীন, অর্থশূন্য হয়ে কানে বাজছিল।

বাদল সিঁড়িতে নিজের পায়ের শব্দ শুনল। গতি শ্লথ করে দিল। মনে হল কান পাতলে সে আর একটা পায়ের শব্দও শুনতে পারে। মনে হয় তার সব রাস্তাতেই কেউ আগে আগে যায়।

বাদল দ্রুত উঠে যেতে গিয়ে দেখল বেড়ালটা বলের মতন সিঁড়ির ওপরে পড়ে আছে। ওর শব্দ শুনবে বলে বাদল লাথি ছুড়ল। চিতা বাঘের মতো থাবা ঘুরিয়ে লাফিয়ে বেড়ালটা অন্ধকার থেকে অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল। বাদল মুখ ঘুরিয়ে দেখল বেড়ালটা নেই, শুধু সিঁড়ির পর সিঁড়ি। ক্রমান্বয়। অঙ্কের মতো। মৃদু আলো। স্থির সিঁড়ি। এত স্থির যখন হাজার হাজার বছর একভাবে পড়ে থাকবে। সেই স্থির অচল সিঁড়ির ওপর বেড়ালটার মুহূর্তের বিদ্যুতের মতো দ্রুত স্বচ্ছন্দ বেগ ভাবতে ভাবতে সে স্থির হয়ে রইল। বাদলের মনে হল সে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দেখতে দেখতে সিঁড়ির মতোই কোনও কিছু হয়ে যাচ্ছে। সে স্পষ্ট শুনল তার জুতোর শব্দ তাকে রেখে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরদিকে কোথাও উঠে যাচ্ছে।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে বাদল টের পেল যে সে নিজেই উঠছে। সিঁড়ি ভেঙে। ক্রমান্বয় অঙ্কের মতো স্থির সিঁড়ি। সে উঠছে। যেন মুহূর্তের জন্য মাত্র সে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। এখন সব ঠিক আছে।

সে ঘরের তালা খুলল। শীতল অন্ধকারে দাঁড়াল।

'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাল 'এ আমার নিয়তি।'

তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা আলপিনের মতো যেন বিঁধল। ভীষণ দুঃখের সঙ্গে সে টের পেল তার চারিদিকে কেমন অস্বাভাবিক আবহাওয়া। হয়তো অচিরেই কিছু ঘটবে। এমন কিছু যা মৃত্যুর মতোই অমোঘ—যা ঘটবেই—ঘটবেই—। হয়তো মৃত্যুই—! 'যদি মরে যাই?' বাদল ভাবল 'মৃত্যু বড় দুঃখময়, মনে হয়।'

নিজের ঘরে অন্ধকারে সে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, টের পেল।

এখন রাত্রি। সবাই ঘুমোচ্ছে। পরিবেশ শবদেহের মতো স্থির। সে যেন একা এই ভীষণ, ভারী পরিবেশকে শববাহকের মতো বহন করেছে।

বাথরুমের কল খুলতে গিয়ে বাদল শিউরে উঠল। কলের চাবিটা তীক্ষ্ণ ছক-এর মতো চক চক করেছে। মেঝেটা জলে পিচ্ছিল, শ্যাওলা জমে আছে। 'যদি পড়ে যাই' ভাবল বাদল 'হয়তো আমার একটা চোখ চাবির ওপর পড়বে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দেখব আমার চোখটা বিচ্ছিন্ন হয়ে কলের চাবিটার সঙ্গে আটকে থেকে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি সেই চোখটা তুলে নিতে গিয়ে আবার পড়ব। এবার আমার অন্য চোখ। তারপর কী ভীষণ অস্তিত্বহীনতা—কিছু নেই—কিছু নেই—।'

'যদি মরে যাই?' ভাবল বাদল 'এইখানে এখন আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। অথচ মা জানবে আমি আছি—আছি—যতক্ষণ খবর না যায়। এই খানে আমার কাছে আমি নেই, অথচ ওই খানে

Shahnaz

মা'র কাছে আমি আছি।'

'কী ভীষণ দুঃখময় সবকিছু' সে ভাবল 'কী ভীষণ দুঃখময়। যদি মরে যাই তবে তার আগে আমি কোথাও খুব দূরে চলে যাব। তারপর একদিন আমি ক্লান্ত এক বালকের মতন ঘুমাব।'

অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমালো না। বসে বসে পড়ল। সারাক্ষণ শুধু ধুলো আরশোলা আর ইঁদুরের গন্ধ পেল। যেন ঘরটা বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত। সারাক্ষণ ভাবল খুব কাছেই ঘাতকের মতো কেউ অপেক্ষা করে আছে—মুহূর্তেই মৃত্যু-পরোয়ানা বের করে দেখাবে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তার মনে হল সারা রাত সে যেন কার অপেক্ষায় ছিল। সারাটা রাত।

৫

এখন একটু শীত পড়েছে। আজকাল সকালে বাইরে তাকালে কুয়াশা দেখা যায়। বাদল সকালবেলা চুপচাপ শুয়ে কুয়াশার গন্ধ পাচ্ছিল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। বাদল শরীর নাড়ল না। এই ক্লান্তি কিসের তা জানবার জন্য বাদল-সুধাবিন্দু হয়ে বাদলকে ভাবছিল : শীতকালের গোড়ার দিকেই বাদলের শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে হয় বাদল জানত এমনি কিছু হবে। সারাক্ষণ সে ঘরে থাকে, বাইরে যায় না। স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছে পরীক্ষা দেবে বলে। বই মুখে করে বসে থাকে—হয়তো পড়ে, হয়তো পড়ে না। আমার মনে হয় সে সব সময় তার চারদিকের পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করে। কেননা, কখনও তার দিন অতি দ্রুতলয়ে কাটে। এত দ্রুত যে সে কিছু বোঝে না। দেখতে না দেখতেই যেন ধাবমান গাড়ির জানালা দিয়ে সরে যায়। কখনও তার দিন অতি ধীর লয়ে কাটে। এত ধীর যে সহ্য করা যায় না। এইসব ধীর দিনে তার কাছে নিজের দেহকে বহন করা কি কঠিন মনে হয়! একদিন তার বন্ধু হীরণ এসে বলেছিল 'কিছুতেই পড়তে পারছি না, রাত্রে ভীষণ ঘুম পায়, কী করা যায় বলতো?' বাদল প্রায় চমকে উঠে কিছু বলতে গেল। বলল না। বরং বলা যায় বলতে পারল না। কারণ সেই ক্ষণে তার মনে হয়েছিল যে যার দুঃখরোগ হয়নি সে কখনওই বুঝবে না কী করে সে সারারাত জেগে থাকে। কিংবা হয়তো, এও এক ধরনের ভয় বাদলের। সে বলল না যে সারারাত কোনও অমোঘ—যা হবেই—এমন কিছুর জন্য অপেক্ষা করে থাকি বলে আমার ঘুম আসে না। যেন সারাক্ষণ সে কিছুর জন্য অপেক্ষা করে আছে। জন্মের পর থেকেই যেমন সে জানে মৃত্যু অমোঘ—তেমনি কিছু। হয়তো মৃত্যুই। মনে হয় এই ধরনের আত্মমগ্নতার সে অবিরত ভোগে।

'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।'

বাদল সুধাবিন্দু হয়ে ভাবল : সারাদিন শুয়ে আছে। কেন যেন মনে হয় প্রবল জ্বরের ঘোরে সে রয়েছে। তার শীর্ণ দেহ দেখলে মনে হয় বহু কষ্টে দীর্ঘ দীর্ঘ দিন বেঁচে আছে। যেন সারাক্ষণ তার চোখের পাশে সমস্ত পরিবেশ, সব অবয়ব শুধু অচেতন দীর্ঘরেখা, অর্ধবৃত্ত, ত্রি-কোণের মতো অর্থহীন আলো আর ছায়া হয়ে ঘিরে আছে। সে জানে না এই সব অস্তিত্বের অর্থ কী, যেন তার গভীর সংশয় সে আছে কিনা। কিংবা, কতটুকু আছে? শুয়ে শুয়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনে। কেউ ধীর মন্থর পায়ে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে উঠে যায়। আবার নামে। ছেদহীন, ক্রমান্বয় তার আনাগোনা। সারাদিন কেউ যেন কাজ নিয়ে আছে। চোখ বুজে থাকে। তার ভয় কেউ বুঝি আসে! দরজায় টোকা দেবে কেউ—সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে কিংবা নামছে।

সারাদিন শুধু পায়ের শব্দ শোনে। কারা এল ঘুরল ফিরল চলে গেল। কেউ যেন তার ঘরের কুঁজোটায় জল ভরে রেখে গেল। একটা আলো আঁধারির মধ্যে দিন কেটে যায়। বেলা গড়িয়ে যায়, আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে যায়। বাদল ওঠে না।

বাদল বাদলের জন্য দুঃখ পাচ্ছিল। যেন যে কোনও মুহূর্তে মৃত বাদলের জন্য বাদল শোকে আর্তনাদ করবে।

বাদল দেয়াল ঘেঁষে বসে দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটা দাগ দেখছিল। খয়েরি একটা দাগ—মোটা পেন্সিলের দাগের মতন। প্রথমে বাদল ভেবে পেলনা দাগটা কীসের। তারপর তার মনে পড়ল। কবে যেন বিছানা থেকে একটা ছারপোকাকে খুঁটে এনে সে দেয়ালে পিষে মেরেছিল।

'এখন শুধু দাগ মাত্র' বাদল মনে মনে বলল 'কিছু চেনা যায় না।' প্রায় অস্তিত্বহীন হালকা দাগটার দিকে চেয়ে থাকে।

একটা আঙুল তুলে বাদল দাগটার ওপর রাখে। মসৃন। দেয়ালের সঙ্গে সমতল—যেন এখানে কোনও কিছু নেই শুধু দেয়ালটা ছাড়া।

বাদল দাড়ি কামানোর সাবান থেকে গুঁড়ো তুলে দাগটার ওপর লাগিয়ে দিল।

এখন দাগটাও নিশ্চিহ্ন।

সুধাবিন্দু হয়ে বাদল ভাবছিল : বিকেলের দিকে বাদল সেই দাগটার কথা—কী আশ্চর্য ভুলে গেল। যেন ওইখানে কিছু নেই—নেই—। কিছু ছিল না।

'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।'

নিজেকে ভীষণ অবান্তর মনে হল বাদলের। যেন অণু পরমাণু হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে বাদল। বাদলের জন্য বাদল দুঃখ পেতে লাগল।

জোর করে পড়তে লাগল বাদল। বুঝতে পারল না সত্যিই সে পড়ছে কি না।

৬

পরীক্ষার হলে বসে বাদল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বুঝতে পারল সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে।

রাস্তার ওপাশে একটা লাল রঙের বাড়ির ছাদ। সে ছাদ দেখছিল। তার মনে পড়ল না এই ছাদটা সে আগে কখনও দেখেছে কি না। কিন্তু তার মনে হল এই ছাদটা ভীষণ জরুরি।

সে চারধারে তাকাল। সবাই মাথা নিচু করে আছে। প্রায় স্থির। যেন শোকে স্তব্ধ হয়ে ওরা কারও মরে যাওয়া দেখছে। কিছু করবার নেই। সে মনে করতে পারল না এদের সে কোথাও কখনও দেখেছে কি না। তার মনে হল সে সারা জীবনে কোটি কোটি মানুষ দেখেছে যাদের মুখ অবিকল একরকম। এরা ভিড় করে বাসে উঠে বাস থেকে নেমে উজ্জ্বল সারি সারি দোকানের পাশ দিয়ে নিজেদের ছায়ামুক্ত জ্যামিতিক অর্থহীন অবয়ব নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আবার নামে, অর্থহীন সবকিছু।

বাদল আবার ছাদের দিকে তাকাল। 'ওই তো বাদল'—বাদল চমকে উঠে দেখল ছাদের ওপর—স্পষ্ট পরিষ্কার বাদল—প্রায় অস্তিত্বহীন—জ্যামিতিক আণবিক বাদল—রোদ কিংবা বাতাসের মতো—ত্রি-কোণ, অর্ধবৃত্ত, দীর্ঘরেখার মতো বাদল—অর্থহীন—!

বাদল দ্রুত খাতা টেনে নিল। শেষ বারের মতো—ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার আগের মুহূর্তে কিছু

Shahnaz

বলে নেওয়ার মতো—সে ভাবল কাউকে কিছু জানানো ভীষণ প্রয়োজন।

সে দ্রুত লিখতে লাগল : আমি বাদল। আমি ছিলাম। অথচ আছি কি নেই জানি না। যদি আমার একটা ঘেরা দেওয়া বাগান থাকত আর একটা বাড়ি—আমি সব কিছু থেকে ওদের আলাদা করে নিতাম। যদি নেওয়া যেত আমি প্রীতিলতার কয়েকটা ভঙ্গি সমস্ত প্রীতিলতার কাছ থেকে আলাদা করে নিতাম। তারপর আমি যাদের ভালবাসি—যা ভালবাসি—তাই নিয়েই এই বেলা অবেলাগুলো কাটিয়ে দিতাম। কয়েকটাই তো মাত্র দিন—গুনতে গুনতে কেটে যেত। দুঃখময় সবকিছু—সব কিছু—মনে হয়—তারপর একদিন তীর খাওয়া পাখির মতন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলতে পারতাম এই ছিল আমার জীবন আমি কী সুখেই না ছিলাম! মৃত্যু বড় দুঃখময় মনে হয় দুঃখময় দুঃখময় সব কিছু মনে হয় তাই শেষবারের জন্য আর উঠব না জেনে লুটিয়ে পড়ে বলতে পারব না এই ছিল আমার জীবন বলতে পারি না আমার ভাগে আমি কিছু আলাদা পেয়েছিলাম বলতে পারি না আমার ভাগে যা ছিল আমি তার সবটুকুই পেয়েছিলাম কে যেন আমাকে বলেছিল তুমি সবটুকু আমাকে পাবে না আমি গাছের মতন একটা শিকড় দিয়ে তোমাকে ছুঁয়েছি অন্য শিকড় দিয়ে অন্য কাউকে। আজ তোমার কাছে আছি কাল অন্য কারও সঙ্গে থাকব। ক্ষণভঙ্গুর চিত্র সব দুঃখময় কতটুকু আছি জানি না, এ সব কিছুই খুব দুর্বোধ্য আমি নিজেই তার কতক বুঝি কতক বুঝি না—বুঝতে পারি না জানি না—

বাদল 'জানি না' শব্দটা দু'বার লিখল। শব্দটা ভীষণভাবে তাকে আকর্ষণ করছিল। সে বারবার লিখল 'জানি না জানি না জা জা জা নি নি নি না না না।' দেখল লেখাটা বিশ্রী হয়ে গেছে। লেখাটাকে তুলে ফেলবার জন্য সে আঙুল দিয়ে ঘষল। কালিটা লেপটে একটা লম্বা দাগ হয়ে গেল।

ভীষণভাবে চমকে বাদল দাগটাকে দেখল। তারপর পরের লাইন লিখল : কী ভীষণ অসম্ভব একটা দাগ হয়ে যাওয়া সবকিছু নিয়েও শুধু একটা দাগমাত্র হয়ে যাওয়া বিকেলেই বাদল যে দাগটার কথাও আশ্চর্য ভুলে যাবে—

'শুনছেন?'

ছেলেটি চমকে মুখ তুলল। বাদলের দিকে তাকাল। বলল, 'কিছু বলছেন?'

'দেখুন আমার মনে হয় ওই ও পাশের ছাদে দাঁড়িয়ে কেউ আমাকে ভয় দেখাচ্ছে?'

'কী করছে!' ছেলেটি ভ্রূ কোঁচকাল।

'আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিচ্ছে। কিছু ভাবতে দিচ্ছে না! ভয় দেখাচ্ছে।'

ছেলেটি ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কই! আমি তো দেখছি না।'

বাদল হাসল 'আছে। ভাল করে দেখুন।'

ছেলেটি ভাল করে তাকাল।

'আমি দেখছি না। বরং আপনি ইনভিজিলেটরকে বলুন।'

ছেলেটি মাথা নিচু করে আবার লিখতে লাগল। অনেকগুলো মুখ আলপিনের মাথার মতো উঁচু হয়ে বাদলকে দেখছিল। বাদল দেখছিল মুখগুলো একরকম। কাগজের ওপর মৃদু ক্ষীণ কলমের চলমান শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

'শুনুন!' প্রায় চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বাদল।

'চুপ চুপ, চুপ করুন।' দ্রুত পায়ের শব্দ তুলে কেউ ছুটে এল। অস্বাভাবিক কতগুলো শব্দ, হাড়ের সন্ধির শব্দ, কলমের শব্দ, মেঝের ওপর জুতোর শব্দ।

বুড়ো লোকটা তার কাঁধে হাত রেখে বলল 'কী হয়েছে?

বাদল ভাবতে চাইল এই লোকটাই কখনও কোনওদিন তার নোট ভাঙিয়ে দিতে চেয়েছিল কি না। কিন্তু ভেবে পেল না। কী ক্লান্তিকর মুখ!

'ওই যে দেখুন' বাদল আঙুল তুলে ছাদ দেখাল 'ও আমাকে গাল দিচ্ছে।'

'কে! কোথায়?' লোকটা ছাদের দিকে তাকাল।

'আছে' বাদল গম্ভীরভাবে বলল ভাল করে দেখুন। ও অনেকদিন আমার পিছু নিয়েছে। ভয় দেখিয়েছে। অসহ্য।'

'আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'ও চালাকি করে দাঁড়িয়ে আছে' বাদলের ইচ্ছে হল চড় মেরে লোকটাকে শুইয়ে দেয় 'আমাকে কিছু ভাবতে দিচ্ছে না।'

এবার অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ বাদল শুনতে পাচ্ছিল। কারা যেন তাকে ঘিরে ধরল। বাদল ছাদের ওপর তাকিয়ে স্পষ্ট পরিষ্কার সবকিছু দেখতে পেল। চিৎকার করে বলল 'ওই যে শালা—'

'চুপ চুপ, চুপ করুন।'

'আপনি বাইরে চলুন। আমরা সব দেখছি।'

'চুপ করুন। এটা পরীক্ষার হল।

'ওই লোকটাকে তাড়িয়ে দিন।' বাদল প্রাণপণে চিৎকার করছিল।

'কোথাও কোনও লোক নেই।' কে বলল।

বাদলের ইচ্ছে হল যে এই কথা বলল তার চোখ উপড়ে নেয়।

'আছে। আছে। শালাকে আমি দেখাচ্ছি—' বাদল জোর করে তার চারদিকের শিরাওঠা হাতগুলোকে সরিয়ে দিতে চাইছিল। যেন এরা জোর করে অপমান করে তাকে বের করে দিচ্ছে।

'আমাকে ছাড়ুন।' ভীষণ ভারী মাথাটা অসহায়ভাবে একজনের কাঁধে রেখে সে বলল। সে অসংখ্য অর্থহীন শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। বারান্দায় খুব ভিড়। কী যেন দেখছে সবাই।

বাদলের মুখে চোখে জলের ঝাপটা প্রবলবেগে পড়ছিল। এখনও সবাই তাকে ঘিরে আছে। জলের বিন্দুর মধ্য দিয়ে বাদল ওদের ভাঙাচোড়া অদ্ভুত বিকৃত অবয়ব দেখতে পাচ্ছিল।

'আমার মাথায় জল কেন রে শালারা, নিজেদের মাথায় ঢাল।' বাদল জোরে বলতে চাইল। সে দেখছিল সবাই মিলে খুব ভিড় করে দেখছে। সে ভিড়ের মধ্যে বাদলকে খুঁজছিল। সে জানে এইখানে কোথাও সে মিশে আছে, দেখা যাচ্ছে না। 'আমার ঘাতক' ভাবল বাদল 'আমার নিয়তি।' জল হড় হড় করে তার মাথায় গায়ে পড়ছে। সে জলের গন্ধ নিল।

'আমাকে ছেড়ে দিন' বাদল আবার চিৎকার করে। অদ্ভুত সব শব্দ। অস্বাভাবিক দৃশ্য। ক্ষণ-ভঙ্গুর। যেন এক্ষুণি এই লোকজন অবয়বের চিত্রপট ভেঙে গিয়ে একটা মাঠের দৃশ্য ফুটে উঠবে, যে প্রকাণ্ড প্রায় অন্তহীন মাঠের একটা মাত্র রাস্তা বেয়ে সে মায়ের কাছে যায়।

ছটফট করে সে চিৎকার করতে লাগল 'আমাকে ছেড়ে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন—।'

Shahnaz

কেউ ছাড়ল না। কতগুলো অদ্ভুত কুৎসিত শিরাওঠা হাত তাকে ধরে রইল।

ওরা কোথাও তাকে নিয়ে যাচ্ছে।

টপ টপ করে চুল থেকে কপাল থেকে জল পড়ছে। বুক ভিজে যাচ্ছে ঠাণ্ডা জলে। যেন ক্রমশ বাদল বাদলকে জল হয়ে গলে গলে পড়ে যেতে অনুভব করছে। 'আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে বাদল'—বাদল ভাবল। সে চোখ বুজে জলজ উদ্ভিদের গন্ধ পাচ্ছিল। শিশির পড়েছে ঘাসের ওপর—চকমক করছে জোনাকি পোকা কালকাসুন্দের ঝোপে পেয়ারা পাতায়—কুলবড়ই গাছটার নীচে কুয়োতলায় বাদুড় ঝোলা অন্ধকার। একটা কাচের বাসনের মতো ভঙ্গুর দৃশ্য হয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে—। কী ভীষণ ভঙ্গুর চিত্র সব—ভঙ্গুর জ্যামিতিক অবয়ব—আণবিক অস্তিত্ব—পলকে পলকে পালটায়!

'আমি একদিন ক্লান্ত এক বালকের মতন ঘুমাব' সে বিড় বিড় করে বলছিল।

কারা যেন বাদলকে একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে কোথাও নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

এক্ষণ, ১৯৬৮

দূরত্ব

মন্দার টেবিলের ওপর শুয়ে ছিল। থার্ড পিরিয়ড তার অফ। মাথার নীচে হাত, হাতের নীচে টেবিলের শক্ত কাঠ। বুকের ওপর ফ্যান ঘুরছে। শরীরটা ভাল নেই ক'দিন। সর্দি। ফ্যানের হাওয়াটা তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে ঠিক। শার্টের গলার বোতামটা আটকে সে শুয়ে ছিল। ক্রমে ঘুম এসে গেল। আর ঘুম মানেই স্বপ্ন, কখনও স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয় না মন্দার।

স্বপ্নের মধ্যে দেখল তার বৌ অঞ্জলিকে। খুব ভিড়ের একটা ডবলডেকার থেকে নামবার চেষ্টা করছে অঞ্জলি। অঞ্জলির কোলে একটা কাঁথা-জড়ানো আঁতুড়ের বাচ্চা। নীচের মানুষরা অঞ্জলিকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে, পিছনের মানুষরা নামবার জন্য অঞ্জলিকে ধাক্কা দিচ্ছে, চারদিকের লোকেরা অঞ্জলিকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, সরিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা মারছে, তার মুখখানা কাঁদো কাঁদো, কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে কোনওদিকেই যেতে পারছে না সে। নামতেও না, উঠতেও না, বাচ্চাটা অঞ্জলির শরীর ভাসিয়ে বমি করে দিল, পায়খানা করল, পেচ্ছাপ করছে। চারিদিকে রাগী, বিরক্ত, ব্যস্ত মানুষরা চেঁচাচ্ছে, গাল দিচ্ছে, যেন বাচ্চাশুদ্ধু অঞ্জলি জাহান্নামে যাক, না গেলে তারাই পাঠাবে। ঘুমের মধ্যেই মন্দার ভিড় ঠেলে অঞ্জলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আকুলভাবে। কিন্তু প্রতিটি লোকই পাথর। কাউকে ঠেলে সরাতে পারছে না মন্দার। সে চেঁচিয়ে বলছিল—আমি কিন্তু নেমে পড়েছি অঞ্জলি, তোমাকেও নামতে হবে-এ। নামো শিগগির নামো, বাস্ ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই স্বর এত দুর্বল যে ফিসফিসের মতো শোনা গেল। ক্রুদ্ধ কন্ডাক্টর ডবল ঘণ্টি বাজিয়ে দিচ্ছে...অঞ্জলির কী যে হবে।

দুঃস্বপ্ন। চোখ খুলে মন্দার বুকের ওপর ঘুরন্ত পাখাটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়।

অঞ্জলি এখন আর তার ঠিক বৌ নয়। মাস ছয়েক আগে মন্দার মামলা দায়ের করেছিল। আপসের মামলা। সেপারেশন হয়ে গেছে। অঞ্জলি যখন চলে যায় তখন তার পেটে মাস দুয়েকের বাচ্চা। এতদিনে বোধহয় বাচ্চা হয়েছে, মন্দার খবর রাখে না। দেখেনি। ছেলে না মেয়ে, তা জানতে ইচ্ছেও হয়নি। কারণ, বাচ্চাটা তার নয়।

Shahnaz

বিয়ের সাত দিনের মধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারল মন্দার। তখনই মাস দুয়েকের বাচ্চা পেটে অঞ্জলির। তাছাড়া অঞ্জলির ব্যবহারটাও ছিল খাপছাড়া। কথার উত্তর দিকে চাইত না, ভালবাসার সময়গুলিতে কাঁটা হয়ে থাকত। তবু দিন সাতেক ধরে অঞ্জলিকে ভালবেসেছিল মন্দার। মেয়েদের সংস্পর্শহীন জীবনে অঞ্জলি ছিল প্রথম রহস্য। দিন সাতেকের মধ্যেই বাড়িতে অঞ্জলিকে নিয়ে কথা বার্তা শুরু হয়। মন্দারের কানে কথাটা তোলে তার ছোট বোন। শুনে মন্দারের জীবনে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। অঞ্জলি অস্বীকার করেনি। মন্দার সোজা গিয়ে যখন অঞ্জলির বাবার সঙ্গে দেখা করে তখন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধটি কেঁদে ফেলেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটিও কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন—ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দরকার ছিল, আমি সেটুকুর জন্য তোমাকে এই নোংরামিতে টেনে নামিয়েছি। ওকে তুমি ফেরৎ দেবে জানতাম। যদি একটি কথা রাখো, ওর ছোট বোনের বিয়ে আর দু'মাস বাদে, সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু এই কটা দিন কথাটা প্রকাশ করো না। মামলা তারপর দায়ের করো। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা আমরা লড়ব না।

অঞ্জলি ফেরত গেল বিয়ের দশ দিনের মাথায়। দু'মাস অপেক্ষা করে মামলা আনে মন্দার। অঞ্জলি লড়ল না, ছেড়ে দিল। অঞ্জলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বিয়ের পর আট মাস কি ন'মাস কেটে গেছে। মন্দার এখনও কেমন বেকুবের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশ ফিরে শুতেই দেখা যায়, বইয়ের আলমারি। আলমারির ওপরেই উইপোকার আঁকাবাঁকা বাসা। সেদিকে চেয়ে থেকে সে স্বপ্নটা কেন দেখল তা মনে মনে নাড়াচাড়া করল একটু। আসলে স্বপ্নের তো মানে থাকে না। আর এ তো ঠিকই যে অঞ্জলির কথা সে এখনও ভুলে যায়নি। এসব কি ভোলা যায়?

আজ মঙ্গলবার। আজই দুটো ক্লাশ। একটা সেকেন্ড পিরিয়ডে নিয়েছে, আর একটা ফিফথ পিরিয়ডে নেওয়ার কথা। এ সময়টায় কলেজে ক্লাশ বেশি থাকে না। পি.ইউ-তে এখনও ছেলে ভর্তি হয়নি, পার্ট টু বেরিয়ে গেছে। সপ্তাহে দু'দিন ছুটি থাকে তার, অন্য দিন একটা দুটো ক্লাশ নেয়, বাকি সময়টা শুয়ে থাকে। কেউ কিছু বলে না। সকলেই জেনে গেছে, মন্দার চ্যাটার্জির ডিভোর্স হয়ে গেছে, তার মন ভাল না, সে একটু অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে কলেজে আসে। এসব ক্ষেত্রে একটু-আধটু স্বেচ্ছাচার সবাই মেনে নেয়। মন্দার টেবিলে উঠে শুয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। থার্ড পিরিয়ড চলছে, ঘরে কেউ নেই, মন্দার একা। আবার ঘুমোতে তার ইচ্ছে করছিল না। ওই ঘটনার পর কয়েকটা দিন খুবই অস্বাভাবিক বোধ করেছিল ঠিকই। বোধ হয় তার সাময়িক একটা মাথা খারাপের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। সময়, সময়ের মতো এমন সান্ত্বনাকারী আর কেউ নেই। মন্দারের মনে সময়ের স্রোত তার পলির আস্তরণ দিয়ে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ ওই দুঃস্বপ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেল মন্দার। তারপর ছেলেদের খবর পাঠাল, ফিফথ পিরিয়ডের ক্লাশটা আজ সে করবে না। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি নেই, বাইরের একটা চমকানো রোদ স্থির জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে মন্দারের জন্য কিছু নেই। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এতদিনে তার একটা বাচ্চা হতে পারত। আর তাহলে এখন মন্দার এই ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে সেই শিশুটির কাছেই ফিরে যেত হয়তো বা সেই শিশু শরীরের গন্ধটি শ্বাসে টেনে নিতে।

এতবড় জোচ্চুরি যে টেঁকে না, তা কি অঞ্জলি জানত না? তার বাবাও কি জানত না? তবে তারা খামোখা কেন ওই কাণ্ড করল? কেবল একটু সিঁদুরের জন্য কেউ কি একটা লোকের সারা জীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে? কীরকম বোকামি এটা? দু'মাসের বাচ্চা পেটে লুকিয়ে

রেখে বিয়ে—ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

স্বপ্নে দেখা অঞ্জলির অসহায় ব্যথাতুর মুখখানার প্রতি যে সমবেদনা জন্ম লাভ করেছিল তা ঝরে গেল। জাগ্রত মন্দারের ভিতরটা হঠাৎ আক্রোশে রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রামে বাসে অচল আঙুলি পেয়ে ঠকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। কিছু করার থাকে না। অঞ্জলি আজও তার নামে সিঁদুর পরে কি না কে জানে!

মন্দার বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। গরমের দুপুর রাস্তা ফাঁকা। সে ট্যাক্সিতে বসে ঘাড় এলিয়ে স্বপ্নটার কথা না ভেবে পারে না। ভিড়ের ভিতর একটা ডবলডেকা. থেকে নামতে পারছে না অঞ্জলি, কোলের বাচ্চাটা তার সারা শরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে, নিজের শরীর আভ্যন্তরীণ ময়লায়, কাথে। নিষ্ঠুর মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলছে, ধাক্কা দিচ্ছে গাল এবং অভিশাপ দিচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনও মানে হয় না। অঞ্জলির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। দেখা হওয়ার কথাও নয়। এখন সে কি তার প্রেমিকের ঘর করছে? কে জানে! স্বপ্নে মন্দার অঞ্জলিকে সেই ভিড় থেকে, অপমান লাঞ্ছনা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। জাগ্রত মন্দার কোনওদিনই সেই চেষ্টা করবে না।

ট্যাক্সিওয়ালাটা খোঁচায়। কেবলই ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবেন।

মন্দার বিরক্ত হয়ে বলে—সোজা চলুন বলে দেব।

কিছুক্ষণ দিক ঠিক করতে সময় গেল। কলকাতার কত অল্প জায়গা চেনে মন্দার! তার চেনা মানুষের সংখ্যা কত কম। এখন এই ট্যাক্সিতে বসে কারও কথাই তার মনে পড়ে না যার কাছে যাওয়া যায়। কোনও জায়গাও ভেবে পায় না সে যেখানে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসে থাকবে। বাসায় ফেরার কোনও অর্থ নেই। সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের গাদাগুচ্ছের বইতে আকীর্ণ ঘরখানা বড় রসকষহীন। গত কয়েকমাস সেই বই প্রায় ছোঁয়নি। থিসিসের কিছু পাতা লেখা হয়েছিল, পড়ে আছে। ঘরে কেবল বিছানাটাই মন্দারের প্রিয়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, শুয়েই থাকে মন্দার। ঘুমোয়, ভাবে, সিগারেট খায়। আজকাল কেউ ঘর ঢোকে না ভয়ে।

ট্যাক্সিটা কিছুক্ষণ ইচ্ছেমত এদিক-ওদিক ঘোরালো সে। তারপর অচেনা রাস্তায় এসে পড়ায় চিন্তিতভাবে এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে গেল।

কোথায় নেমেছে তা বুঝতে পারল না, তবু এ তো কলকাতাই! ঘুরে-ফিরে ডেরায় ফিরে যাওয়া যাবে। ভয় নেই। কিছুক্ষণ হাঁটলে বোধহয় ভালই লাগবে।

অচেনা রাস্তা ধরে আন্দাজে সে হাঁটে। বুঝতে পারে, চৌরঙ্গির কাছাকাছি অঞ্চল। নির্জন পাড়া, গাছের ছায়া পড়ে আছে, বাড়িগুলো নিঝুম। কয়েকটা দামি বিদেশি গাড়ি এধারে-ওধারে পড়ে আছে। মন্দার চম্‌কী রোদে কিছুক্ষণ হাঁটে। ভাল লাগে না, কেন ভাল লাগে না, তা বুঝতে পারে না। রোদ বড্ড বেশি। গরম লাগে, ঘাম হয়। শরীরের শ্রম মনের ভার লাঘবে কাজ করে না। মন জিনিসটা বড় ভয়ানক।

আসলে সে বুঝতে পারে, একবার অঞ্জলির সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। গত ছ'মাস ধরে বন্ধনমুক্ত মন্দার সুখী নয়। এই সুখী না হওয়ার কারণ সে খুঁজে পায় না, পাচ্ছে না। সে ঠকে গিয়েছিল বলে আক্রোশ? তাকে একটা চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঘৃণা? সে অঞ্জলিকে ছুঁয়েছিল, ভালবেসেছিল বলে বিবমিষা? উত্তরটা অঞ্জলির কাছে আর একবার না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডবলডেকারের পা-দানির ভিড়ে অঞ্জলিকে স্বপ্ন দেখার কোনও মানে না থাক, গত ছ'মাস মন্দার যে সুখী নয় এটা সত্যি। ভয়ঙ্কর সত্য। বিস্মৃতির পলি পড়েছে

Shahnaz

মনে, ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে সে, এবং এইভাবেই একদিন হয়তো বা সে দার্শনিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান নেই। সে আবার বিয়ে করবে ঠিকই। মেয়ে দেখা হয়েছে। সামনের শ্রাবণে সে খুবই অনাড়ম্বর একটি অনুষ্ঠান থেকে তার নতুন স্ত্রীকে তুলে আনবে। কিন্তু তবু অসুখীই থেকে যাবে মন্দার। অঞ্জলির কাছে একটা রহস্য গোপন রয়ে গেছে।

অঞ্জলিকে দেখতে ভাল, অন্যদিকে খুবই সাধারণ। বি. এ. পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল। খালি গলায় গাইতে পারত। রং চাপা, মাথায় গভীর চুল, ভীরু চাউনি ছিল। আর তেমন কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের সাত দিন বাদে এক রাত্রিতে প্রায় উন্মাদ মন্দার জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি প্রেগন্যান্ট?

অঞ্জলি ভীষণ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুটো হাত সামনে তুলে, ভীরু, খুব ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিল, আমার বাবা এই বিয়ে জোর করে দিয়েছেন, আমি চাইনি—

—তুমি প্রেগন্যান্ট কি না বলো।

—হ্যাঁ।

—মাই গুডনেস!

অঞ্জলি তবু কাঁদেনি, কেবল ভয় পেয়েছিল। কী হবে তা অঞ্জলি বোধহয় জানত। মন্দার যখন অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল তখন ঘরে অঞ্জলির বাক্স গোছানোর শব্দ পেয়েছিল। অর্থাৎ অঞ্জলি ধরেই নিয়েছিল চলে যেতে হবে। মানুষ বরাবর এই সরে-যাওয়াটা বিশ্বাস করে।

ক্লান্ত মন্দার আবার একটা ফুটপাতের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা খায়। গাছের তলায় কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপর, অন্যমনে বসে ভাঁড়টা শেষ করে। অঞ্জলির কাছে যাওয়াটা ভারী বিশ্রী হবে। ভাঁড়টা ছুড়ে ফেলে দেয় সে। অঞ্জলিদের বাড়িতে টেলিফোন নেই।

আবার একটা ট্যাক্সি নেয় মন্দার। এবার সে উত্তর কলকাতার একটা কলেজের ঠিকানা বলে ড্রাইভারকে। তারপর চোখ বুজে পড়ে থাকে। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার কোনও মানে নেই। তবু এখন একটা কিছু বড় দরকার মন্দারের। কী যে দরকার তা ঠিক জানে না। নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় নেই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পারিবারিক যোগাযোগে।

নন্দিনীকে পেতে একটুও কষ্ট হল না। ক্লাস ছিল না বলে কমনরুমে আড্ডা দিচ্ছিল। বেয়ারা ডেকে দিয়ে গেল।

মন্দারকে দেখে নন্দিনী ভীষণ অবাক। লোকটা কী ভীষণ নির্লজ্জ! সামনের শ্রাবণে বিয়ে তবু দেখ তার আগেই কেমন দেখা করতে এসেছে!

—আপনি?

—আমি মন্দার...

—জানি তো!

—একটু দরকারে এলাম, একটা কথা বলতে।

—কী কথা?

—আমার প্রথমা স্ত্রীর সম্পর্কে।

—সেও তো জানি।

—ওঃ।

—আর কিছু?

—না, আর কিছু নয়। ভেবেছিলাম বুঝি তোমাকে আমাদের বাসা থেকে কিছু জানানো হয়নি।

—আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমি ভাবি না।

মন্দার নন্দিনীকে একটু দেখে। চোখা চেহারার মেয়ে। খুব বুদ্ধি আছে মনে হয়। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও জলুশ নেই। রং ফর্সা, লম্বাটে মুখ, ছোট নাক। আলগা সৌন্দর্য কিছু নেই।

মন্দার বলল—কিছু মনে করলে না তো।

নন্দিনী হাসে—এই কথা বলার জন্য আসার কোনও দরকার ছিল না। আজকাল চড়া রোদ হয়।

—ট্যাক্সিতে এসেছি।

—অযথা খরচ।

—আমার খুব একা লাগছিল।

নন্দিনী একটু মাথা নিচু করে ভাবল। নন্দিনীর সঙ্গে মন্দারের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল পাত্রী দেখতে গিয়ে। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে, তবু এতদূর মন্দার না করলেও পারত। তার লজ্জা করছিল।

নন্দিনী মুখ তুলে আস্তে বলল—আমার এখন অফ পিরিয়ড চলছে, শেষ ক্লাশটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের—ওটা তো না করলেও চলবে।

—না করলেও চলবে কেন?

নন্দিনী একটু হেসে বলে—পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফেল করব না।

মন্দারও একটু হাসে। বলে—তাহলে তো তোমার ছুটিই এখন?

—মনে করলেই ছুটি।

—কোথায় যাবে?

—আমি কি জানি। যদি কেউ নিয়ে যেতে চায়।

খুবই চালু মেয়ে তার ভাবী বৌ। এত চালু মন্দার ভাবেনি। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ও খুব কথা বলে। বেশ বুদ্ধির কথা, চটপট কথার জবাব দিতে পারে, রসিকতা করতে জানে,সাধারণ লজ্জা সংকোচ ওর নেই। পাত্রী দেখতে গিয়ে এতটা লক্ষ করেনি মন্দার। তখন অভিভাবকদের সামনে হয়তো অন্যরকম হয়েছিল। একে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছিল না মন্দারের। কথা নয়, চুপচাপ পাশে বসে থাকবে, মানে একজন সঙ্গী দরকার তার। যার মন খুব গভীর, যার স্পর্শকাতরতা খুব প্রখর। যে কথা ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে।

মন্দার ঘড়িটা দেখে বলল—আমার চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ থাক। কোনও দিন আসব।

একটু হতাশ হয় নন্দিনী। বলে—আসার তো দরকার ছিল না।

—ছিল। সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝব না কেন?

—আমি নিজেই বুঝি না।

বলে মন্দার কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

মাত্র গোটা চারেক টাকা পকেটে আছে। তবু মন্দার আবার ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। খানিকদূর হেঁটে পেয়েও গেল একটা। দক্ষিণ দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে আবার ঘাড় এলিয়ে চোখ বোজে

Shahnaz

সে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা দেখতে পায়। সেই ডবলডেকারের পা-দানি, ভিড়, টাল-মাটাল অঞ্জলি, কোলে শিশু।

অঞ্জলিদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল মন্দার। ভাড়া দিতে গিয়ে পকেট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। টাকা আর খুচরো যা ছিল সে দিয়েও পনেরো পয়সা কম হল! ট্যাক্সিওয়ালা হেসে সেটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

দরজা খুললেন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ। অঞ্জলির বাবা। খুলে ভারী অবাক হলেন।

—বাবাজীবন, তুমি?

—আমিই।

—এসো এসো।

মন্দার ঘরে ঢোকে। অঞ্জলির মা নেই। ভাইরা বৌ নিয়ে আলাদা থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িটা একটু অগোছাল।

—বসবে না? বুড়ো তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

মন্দার বসে। জিজ্ঞেস করে—কী খবর?

—খবর আর কি? কোনওরকম। বুড়ো গলা খাঁকারি দেয়।

—আমি অঞ্জলির খবর জানতে চাইছি।

বুড়োর ঠিক বিশ্বাস হয় না। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়। বলে—সে ভিতরের ঘরে আছে।

মন্দার চুপ করে তাকে।

বুড়ো খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করেন—কী চাও মন্দার? ওকে কিছু বলবে?

—হুঁ।

—যাও না, নিজেই চলে যাও ভিতরে। ডাকলেই সাড়া পাবে।

সাত দিনের জন্য এ বাড়িটা তার শ্বশুরবাড়ি ছিল, এই সুন্দর বৃদ্ধটি ছিল তার শ্বশুর। বাড়িটা মন্দারের চেনা। একটু সংকোচ হচ্ছিল, তবু মন্দার উঠল।

বৃদ্ধ বলে—ভিতরে বাঁ দিকের ঘরে আছে।

মন্দার যায়।

দরজা খোলা। অঞ্জলি শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে একটা পুঁটলির মতো বাচ্চা তুলতুল করে। সে ঘুমোচ্ছে।

মন্দার ঘরে পা দিতেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চমকে উঠল কিনা কে জানে! অবাক হল খুব। উঠে বসল খুব ধীরে। কোনও প্রশ্ন করল না। কেবল বাচ্চাটাকে একটা হাত বাড়িয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। চোখে ভয়। মন্দার হাসে। জিজ্ঞেস করে—কবে হল?

—আজ আট দিন।

—ভাল আছ?

—না। খুব কষ্ট গেছে। আমার শরীরে রক্ত ছিল না। বলে শ্বাস ফেলল অঞ্জলি—খুব কষ্ট গেছে। বিকারের মতো হয়েছিল। তুমি বোসো। ওই চেয়ার টেনে নাও। কিছু বলবে?

—বলব।

—কী?

—আমি ভীষণ অসুখী।

—হওয়ার কথাই। এখন কী করতে চাও?

—কয়েকটা ভাইটাল প্রশ্ন করব।

—করো।

—তোমার প্রেমিকটি কে?

বিস্ময়ে চোখ বড় করে অঞ্জলি বলে—প্রেমিক?

—ওই বাচ্চাটার বাবার কথা বলছি।

—সে আমার প্রেমিক হবে কেন? তাকে তো আমি ভালবাসতাম না, সেও আমাকে বাসত না।

—তাহলে সেটা কী করে হল?

—হয়ে গেল। কত কিছু এমনিই হয়ে যায় যা ঠিক বুঝতেই পারা যায় না।

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল। ভুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সে করতে চায়নি। এই প্রশ্ন করতে সে আসেনি। তবে কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন?

সে বলল—তুমি ওর বাবাকে বিয়ে করবে না?

—বিয়ে! ভারী অবাক হয় অঞ্জলি, বলে—তা কি সম্ভব? সে কোথায় চলে গেছে! তাছাড়া আমি তা করতে যাব কেন? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

এও ভুল প্রশ্ন। মন্দার বুঝতে পারে। এবং তারপর সে আবার একটা ভুল প্রশ্ন করে—তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও?

—না। তুমি অনেক দিয়েছ।

—কী দিয়েছি?

—এই বাচ্চাটার একটা পরিচয়।

মন্দার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও কি আমার বাচ্চা হিসেবেই চালু থাকবে নাকি?

—যদি তুমি অনুমতি দাও।

মন্দার একটু ভেবে—থাকুক।

অঞ্জলি খুশি হল। বলল—আমি জানতাম, তুমি আপত্তি করবে না।

—আমি বিয়ে করছি অঞ্জলি।

—জানি। করাই উচিত।

তবু ঠিক প্রসঙ্গটা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দার। এসব কথা নয়, এর চেয়ে জরুরি কী একটা বলার আছে তার। বুঝতে পারছে না। খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাই সে বেকুবের মতো বসে থাকে।

—তোমার শরীরে রক্ত নেই?

—না। কিছু খেতে পারতাম না গত কয়েকমাস। বাচ্চাটা তখন আমার শরীর শুষে খেয়েছে। ওর দোষ নেই। বাঁচতে তো ওকেও হবে। শরীরটা তাই গেছে।

—তোমার অসুখটা কেমন?

—বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ দুর্বল।

—তুমি শুয়ে থাকো বরং। শুয়ে শুয়ে কথা বলো।

—তাই কি হয়! বলে বসে রইল অঞ্জলি একটু কাঁদে, বলে শ্বশুরবাড়িতে এসেছ, তোমাকে কেউ আদর-যত্ন করার নেই। দেখ তো কী কাণ্ডটা।

মন্দার চুপ করে থাকে।

Shahnaz

অঞ্জলি তক্ষুণি নিজের ভুল সংশোধন করে বলে—অবশ্য এখন তো আর শ্বশুরবাড়ি এটা নয়, আমারই ভুল।

মন্দার একটু দুঃখ পায়। অঞ্জলির মুখটা ফোলা ফোলা, শরীরও তাই। বোধহয় শরীরে জল এসে গেছে ওর।

মন্দার জিজ্ঞেস করে—তোমার বাচ্চাটা কেমন হয়েছে?

—ভাল আর কি। আমার শরীর থেকেই তো ওর শরীর। একটা খারাপ হলে আর একটা ভাল হবে কী করে?

কিন্তু কী কথা বলতে এসেছে মন্দার? মনে পড়ছে না, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ এসব সাধারণ কথা নয়; এ ছাড়া আর একটা কী কথা যেন। মন্দার চুপ করে বসে থাকে। ভাবে। অঞ্জলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সেই ভীতু ভাব। বোধহয় সবসময়ে নিজের অপরাধের কথা ভাবে ও, আর সবসময়ে ভয় পায় তার অপরাধের প্রতিফল কোনও না কোনও দিক থেকে আসবেই।

মন্দার জিজ্ঞেস করল—এসব জানাজানির পর তোমার অবস্থা নিশ্চয়ই বেশ খারাপ?

অঞ্জলি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—তা জেনে কী হবে?

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল মাত্র।

সেই শ্বাসের শব্দে অঞ্জলি তার দিকে তাকাল, জলভরা চোখ। বলল—আমি খুব একা। আমার কেউ নেই।

—জানি।

—তুমি ভীষণ দয়ালু। তোমার তুলনা নেই। তুমি আমার ওপর রাগ করতে চাইছ, কিন্তু পারছ না।

মন্দার একটু চমকায়। কথাটা সত্য। সে অঞ্জলির ওপর রাগ ঘৃণা সবই প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তার মনের মধ্যে কিছুতেই রাগের সেই ঝড়টা ওঠে না। উঠলে ভাল হত বোধহয়। মন্দার আবার একটা শ্বাস ফেলে।

বাইরে থেকে অঞ্জলির বাবার গলা পাওয়া যায়—মন্দার!

মন্দার মুখ ফিরিয়ে ভারী অবাক হয়। সুন্দর বৃদ্ধটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে চায়ের কাপ। মন্দারের চোখে চোখ পড়তেই লাজুক মুখে বলে—বাড়িতে কাজের লোক নেই তাই...

মন্দার বিস্মিতভাবে বলে—নিজেই করলেন?

—আমার অভ্যাস আছে। আঁতুড় ঘরে বসে খেতে ঘেন্না করে না তো বাবা! তুমি না হয় বাইরের ঘরে এসো।

—আমি কিছু খাব না।

—খাবে না? বলে বুড়োমানুষ ভারী অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। সাধাসাধি করতে বোধহয় তারা ভয় পায়। মন্দারকে তাদের ভীষণ ভয়।

যেন বা বুড়ো জানত যে মন্দার এবাড়ির খাবার খাবে না, তাই মাথা নিচু করে বলে—আচ্ছা, তাহলে বরং থাক।

অঞ্জলি অবাক হয়ে তার বাবার দিকে চেয়েছিল। মন্দারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—কলেজ থেকে এলে তো?

—হুঁ।

—খিদে পায়নি?

অঞ্জলি চুপ করে থাকে। কিছু বলার নেই। তারা অপরাধীর মতো মন্দারের দিকে চেয়ে আছে। জোর করে খাওয়াবে এমন সম্পর্ক নয়।

অসহ্য। মন্দার উঠে গিয়ে বুড়োর হাত থেকে প্লেট আর কাপ নিয়ে বলে—ঠিক আছে। খাচ্ছি।

বাপ বেটিতে খুব অবাক হয়। তারা একটুও আশা করেনি এটা।

বুড়ো চলে গেল। মন্দার অঞ্জলিকে বলে—এসব ফর্মালিটির দরকার ছিল না। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—ডিভোর্স জিনিসটা বাবা বোঝেন না। সেকেলে মানুষ। ওঁর কাছে এখনও তুমি জামাই, বরাবর তাই থাকবে। ওঁদের মন থেকে এসব সংস্কার তুলে ফেলা ভারী মুস্কিল।

মন্দার উত্তর দেয় না।

অঞ্জলি নিজে থেকেই আবার বলে—বাবার আর দোষ কী! আমি নিজেও মন থেকে সম্পর্ক তুলে দিতে পারিনি। স্বামী জিনিসটা যে মেয়েদের কাছে কী!

—ওসব কথা থাক।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলে—থাকবে কেন! এখন তো আর আমার ভয় নেই। এই বেলা বলতে সুবিধে। আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবও না।

—কী বলতে চাও?

সংস্কারের কথা। মেয়েলি সংস্কার। মন্ত্র, সিঁদুর, যজ্ঞ—এসব কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। তুমি আমার কেউ না, তবু মনে হয়, কেবলই মনে হয়...অঞ্জলি চুপ করে থাকে। একটু কাঁদে বুঝি!

মন্দার তাড়াতাড়ি বলে—অঞ্জলি, তোমাকে আমি কি একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ কথাটা খুব জরুরি।

—বলো।

—বললাম তো মনে পড়ছে না।

—একটু বসে থাকো, মনে পড়বে। যদি ঘেন্না না করে তবে খাবারটা খেয়ে নাও। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে মনে পড়ে যাবে।

মন্দার অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। অঞ্জলি তার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে যেন বুঝবার চেষ্টা করে।

মন্দার একটু-আধটু খুঁটে খায়, চায়ে চুমুক দেয়। মনে পড়ে না।

—তুমি কি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাবো? অঞ্জলি আচমকা জিজ্ঞেস করে।

—ভাবি।

—কেন ভাবো?

—তুমি আমার ওপর বড্ড অন্যায় করেছিলে যে।

—সে তো ঠিকই।

—তাই ভুলতে পারি না। মানুষ ভালবাসার কথা সহজে ভোলে; প্রতিশোধের কথাটা ভুলতে পারে না।

Shahnaz

—আমি এত অসহায় যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কিছু নেই তোমার! আমি তো শেষ হয়েই গেছি।

—কিন্তু আমার তো শোধ নেওয়া হয়নি!

—কী শোধ নেবে বলো?

—কি জানি ভেবেই তো পাচ্ছি না।

—হায় গো, কী কষ্ট!

—খুব কষ্ট। দুপুরে কলেজে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি।

—কীরকম দুঃস্বপ্ন?

—ভীষণ খারাপ। বলে মন্দার চুপ করে স্বপ্নের দৃশ্যটা মনে মনে দেখে। ডবলডেকারে পা-দানিতে অঞ্জলি, কোলে বাচ্চা, চারিদিকে আক্রমণকারী মানুষ। কিছুতেই অঞ্জলির কাছে পৌঁছোতে পারছে না মন্দার।

—বলবে না? অঞ্জলি বলে।

মন্দার শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—অঞ্জলি, আমি হয়তো শ্রাবণে বিয়ে করব। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। তাতে কি তুমি দুঃখ পাবে?

—পাব। তবে এটা আশা করছিলাম বলে সয়ে নেওয়া যাবে।

—শোনো, আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসব, এরকম বসে থাকব একটু দূরে, কথা বলব। কিছু মনে করবে না তো?

—মনে করব! কী যে বলো! তুমি আসবে ভাবতেই কী ভীষণ ভাল লাগছে।

—আসব। কী তোমাকে বলতে চাই তা যতদিন না মনে পড়ছে ততদিন আসতেই হবে।

—এসো। যখন খুশি।

—আসব। অঞ্জলি, ততদিন তুমি ভাল থেকো, সাবধানে থেকো।

অঞ্জলি চুপ করে থাকে।

—চারিদিকে বিশ্রী মানুষজন, তারা তোমাকে ঠেলবে, ধাক্কাবে, ফেলে দেবে। চারিদিকে বিপদ।

—কী বলছ?

—খুব বিপদ তোমার। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কি তুমি বাস থেকে নামতে পারবে! আমি যে কিছুতেই তোমার কাছে যেতে পারছি না!

—তুমি কি বলছ?

—সেইটাই তো বুঝতে পারছি না অঞ্জলি! একটু সময় লাগবে। তোমার বাচ্চাটা কি ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে।

অকারণ প্রশ্ন। মন্দারের জেনে কোনও লাভ নেই! সে বসে রইল। মনে পড়ছে না। কতদিনে মনে পড়বে তার কোনও ঠিক নেই।

যতদিন না পড়ে ততদিন বসে থাকা ছাড়া, অপেক্ষা করা ছাড়া, পরস্পরের মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকা ছাড়া মানুষের আর কী করার আছে?

শারদীয় এক্ষণ ১৯৭২

দেখা হবে

নকশি কাঁথার মতো বিচিত্র এক পৃথিবী ছিল আমাদের শৈশবে। এখনও গায়ের তলায় পৃথিবীর মাটি, চারিদিকে গাছপালা, মাথার উপর আকাশ। বুক ভরে শ্বাস টেনে দেখি। না, শীতের সকালে কুয়াশায় ভেজা বাগান থেকে যে রহস্যময় বন্য গন্ধটি পাওয়া যেত তা আর পাওয়া যায় না। আমাদের সাওতাল মালী বিকেলের দিকে পাতা পুড়িয়ে আগুন জ্বালত। সেই গন্ধ কতবার আমাকে ভিন্ন এক জন্মের স্মৃতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আর মনে আছে মায়ের গায়ের ঘ্রাণ। সে গন্ধে ঘুমের ভেতরেও টের পেতাম, মা অনেক রাতে বিছানায় এল। মা'র দিকে পাশ ফিরে শুতাম ঠিক। তখন নতুন ক্লাসে উঠে নতুন বই পেতাম ফি বছর। কী সুঘ্রাণ ছিল সেই নতুন বইয়ের পাতায়। মনে পড়ে বর্ষায় কদম ফুল কুড়িয়ে এনে বলখেলা। হাতে পায়ে কদমের রেণু লেগে থাকত বুঝি। কী ছিল! কী থাকে মানুষের শৈশবে! বিকেলের আলো মরে এল যেই অমনি পৃথিবীটা চলে যেতে ভূতেদের হাতে। এক ঘর থেকে অন ঘরে যাওয়া ছিল ভারী শক্ত। বিশাল বাড়িতে কয়েকটি প্রাণী আমরা গায়ে গায়ে ঘেঁষে থাকতাম। ভোরের আলোটি ফুটতে না ফুটতে ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটতাম বাইরে। বাইরেটাই ছিল বিস্ময়ের। সূর্য উঠছে, আকাশটা নীল, গাছপালা সবুজ। সব ঠিক আগের দিনের মতোই। তবু অবাক হয়ে দেখতাম, মনে হত, গতকাল ঠিক এরকম দেখিনি তো! সেই আনন্দিত ছেলেবেলায় একটা দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল। আমার ছোটকাকা মৃত্যুশয্যায়। মাত্র দেড় বছর আগে কাকিমা এসেছেন ঘরে। একটি ফুটফুটে মেয়েও হয়েছে! সে তখন হাত পা নেড়ে উপুড় হয়, কত আহ্লাদের শব্দ করে! তবু বৌ মেয়ে রেখে ছোটকাকার মরণ ঘনিয়ে এল। বিকেল শ্বাস উঠে গেছে। দাদু তখন বাইরের বারান্দায় বসে আছেন। বাঁ হাতে ধরা তামাকের নল, কল্কেতে আগুন নিবে গেছে কখন। সন্ধের পর জ্যোৎস্না উঠেছে সেদিন। দাদু সেই জ্যোৎস্নায় প মেলে বসে আছেন। ভিতর বাড়িতে কান্নার শব্দ উঠেছে। বাবা আর জ্যাঠামশাইরা এসে দাদুকে ডাকলেন।

—আসুন, প্রিয়নাথকে একবার দেখবেন না?

দাদু খড়মের শব্দ তুলে ভিতর বাড়িতে এলেন। তার মুখখানা একটু ভার দেখাচ্ছিল, আর

Shahnaz

কিছু নয়। ছোটকাকা তখন বড় বড় চোখে চারদিকে তাকাচ্ছেন। কাকে যেন খুঁজছেন। কী যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। বার বার বলছেন—তোমরা সব চুপ করে আছে কেন? কিছু বলো, আমাকে কিছু বলো।

জ্যাঠামশাই নিচু হয়ে বললেন—কী শুনতে চাও প্রিয়নাথ?

ছোটকাকা ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে বললেন—আমি কী জানি! একটা ভাল কথা, একটা সুন্দর কথা কিছু আমাকে বলো, আমার কষ্ট ভুলিয়ে দাও। আমি কেন এই বয়সে সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছি—আমার মেয়ে রইল, বৌ রইল—আমার এই কষ্টের সময় কেউ কোনও সুখের কথা বলতে পারো না!

বড় কঠিন সেই পরীক্ষা। কেউ কিছু বলতে পারে না। সবাই কেবল মরণোন্মুখ মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কথা খুঁজে পায় না। কিন্তু প্রত্যেকেরই ঠোঁট কাঁপে।

একজন অতি কষ্টে বলল—তুমি ভাল হয়ে যাবে প্রিয়নাথ।

শুনে ছোটকাকা ধমকে বললেন—যাও যাও—।

আর একজন বলল—তোমার মেয়ে বৌকে আমরা দেখব, ভয় নেই।

শুনে ছোটকাকা মুখ বিকৃত করে বললেন—আঃ, তা তো জানিই, অন্য কিছু বলো।

কেউ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

সেই সময়ে দাদু ঘরে এলেন। স্বাভাবিক ধীর পায়ে এসে বসলেন ছোটকাকার বিছানার পাশে। ছোটকাকা মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখে বললেন—বাবা, সারাজীবন আপনি কোনও ভাল কথা বলেননি, কেবল শাসন করেছেন। এবার বলুন।

সবাই নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতায় একটা পাহাড়প্রমাণ ঢেউ অদৃশ্য থেকে এগিয়ে আসছে। ছোটকাকাকে জীবনের তীরভূমি থেকে অথই অন্ধকারের এক সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে বলে ঢেউটা আসছে, আসছে। আর সময় নেই। ছোটকাকার জিভটা এলিয়ে পড়েছে, বার বার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, মুখ প্রবল ব্যথায় বিকৃত!

দাদু একটু ঝুঁকে শান্ত স্বরে বললেন—প্রিয়নাথ, আবার দেখা হবে।

কী ছিল সেই কথায়! কিছুই না। অতিথি অভ্যাগত বিদায় দেওয়ার সময় মানুষ যেমন বলে, তেমনি সাধারণভাবে বলা। তবু সেই কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী ছোটকাকার মুখ হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। তিনি শান্তভাবে চোখ বুজলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন।

এসব অনেকদিন আগের কথা। নকশিকাঁথার মতো বিচিত্র সুন্দর শৈশবের পৃথিবী কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই সুন্দর গন্ধগুলো আর পাই না, তেমন ভোর আর আসে না। মায়ের গায়ের সুঘ্রাণের জন্য প্রাণ আনচান করে! পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে! বুড়ো গাছের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে আমার ডালপালা। খসে যাচ্ছে পাতা। মহাকালের অন্তঃস্তলে তৈরি হচ্ছে একটি ঢেউ। একদিন যে এই পৃথিবীর তীরভূমি থেকে আমাকে নিয়ে যাবে।

বুকের মধ্যে শৈশবের একটি কথা তীরের মতো বিঁধে থরথর করে কাঁপছে আজও। সেই অমোঘ ঢেউটিকে যখনই প্রত্যক্ষ করি, মনে মনে তখনই ওই কথাটি বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। শৈশবের সব ঘ্রাণ, শব্দ ও স্পর্শ ফিরিয়ে আনে। মায়ের গায়ের ঘ্রাণ পেয়ে যেমন ছেলেবেলায় পাশ ফিরতাম তেমনি আবার পৃথিবীর দিকে পাশ ফিরে শুই। মনে হয়, দেখা হবে। আবার আমাদের দেখা হবে।

দৌড়

ভোরবেলা হরিশঙ্করে কাকাতুয়াটা ডাকছিল নিমাই ওঠো, নিমাই ওঠো,—পাখিরা যে কী করে টের পা ভোর হচ্ছে। এখনও আকাশ পর্যন্ত গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে চারদিক, শুধু এ সুন্দর পাতলা বাতাস বইছে পুবের আকাশে, আকাশের গাঢ় নীলে ময়ূরের পেখমের মধ্যে কিছু বেশি উজ্জ্বলতা, কুয়াশাও আছে। মর্ত্যের খুব কাছাকাছি দু একজন দেবতা বা পরি এসে ান এ সময়ে, কবীর তো দেখেছে রায়দিঘিতে ভোরবেলা স্নান করে উড়ে গেল দুটি পরি দেবলে। হাঁটতে হাঁটতে আনমনা কোনও দেবতা একবার পথ ভুল করে এসে পড়েন পালচৌধুরীদের বাগানে। বুড়ি কমললতা ফুল-চোরের ভয়ে স্থল পদ্ম তুলে রাখছিলেন বাগান থেকে। সে সময়ে একদম মুখোমুখি দেখা তার সঙ্গে। সাদা চাদরে ঢাকা শরীর, মুখে কী স্বর্গীয় আভা। ঢি বিড় করে বলেছিলেন স্বর্গের পথটা কি এই দিকে। খড়ম পরা একজোড়া পায়ের শব্দ রায়দিঘি পাশ দিয়ে রাস্তা বেয়ে দৌড়োয় মাঠের দিকে। খুব জোরে নয় অনেকক্ষণ ধরে সেই পদ শব্দ বাজতে থাকে আধোজাগা কিশোরীর হৃদপিণ্ডে। সোহাগ জানে দ্রুত পায়ে পাগল কুন্দন ছাড়া আর কেউ দৌড়োয় না। পাগল? না হলে একে কেউ মানবে কেন? দৌড় কুন্দনের পেশা। দৌড়তে দৌড়তে কুন্দন কাকাতুয়ার দার্শনিক ডাক শোনে, নিমাই ওঠো, নিমাই ওঠো, নিমাই ওঠো। জলে ঘাই দেয় মাছ। গাছ থেকে শিউলি ও শিশির পড়তে থাকে টুকটাক। এই ভোরবেলা পৃথিবীর উপোসি শিশুরাও ঘুমোয়। একটিও পরমাণু অস্ত্র থাকে না জাগ্রত। মরুভূমি থাকে শীতল হয়ে। এই সময় কোথাও নেই কোনও মাতাল, খুনি, বেশ্যা, শুধু দেবলোকের আলো, স্বর্গের গ। দেবলোকে বোধ হয় ভোর ছাড়া অন্য বেলা নেই। সেখানে তো দিন রাত নেই, আছে শু ভোর। কুন্দন যখন দৌড়োয় তখন সে আর সে থাকে না। দৌড়াতে দৌড়াতে সে হয়ে যায় এক গতিময় আনন্দ, শুধুই আনন্দ। আর কিছু নয়। কুন্দন যখন এই গঞ্জে এসে জুটল তখন তার না আছে চাল, না আছে চুলো। দুনিয়ায় আপনজন বলেও কেউ নেই। গরিব পুরুতের ঘরে জন্মেছিল। তারপর কায়ক্লেশে কিছু বড় হয়ে বুঝল, দুনিয়াটা বড় কঠিন ঠাঁই। বারো বছর বয়সে দু বন্ধু মিলে বাড়ি থেকে ভেগে পড়ল। মাঠে ময়দানে, লোকের

Shahnaz

বাড়ির বারান্দায়, হাট খোলার নীচে রাত কাটাত, দিন কাটাত, ভিক্ষে সিক্ষে বা ছোট খাট মজুরি করে। তবে এক জায়গায় নয়। চরৈবেতি চরৈবেতি বলে স্থান থেকে স্থানান্তরে। এইভাবে বাংলা বিহার উড়িষ্যা দেখে নেওয়া গেল। বন্ধুটি জমে গড়ল মধ্যপ্রদেশে। এক রেল স্টেশনের বেঞ্চে শুয়ে ছিল দুজনে। মাঝরাতে কিছু লোক পুলিশ নিয়ে এসে তুলল তাদের। বন্ধুটির বাবা বেশ প্রভাবশালী লোক। তিনি ছেলেকে ফেরত নিয়ে নিলেন। কিন্তু কুন্দনকে কেউ ফেরত চায়নি বলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন আর একা একা ভাল লাগত না। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল এই গঞ্জে। নদীর ধারে একটা একচালার নীচে চক্কোত্তিমশাই বসতেন। দুখানা চোখ যেন বুকের ভিতর অবধি দেখতে পায়। আর কী তেজ সেই দুচোখে। কিছু বললেন না। শুধু কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আর সেই দুই চোখের ভিতর দিয়ে কুন্দন যেন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল অবধি দেখতে পেল। তা চক্কোত্তিমশাইয়ের কাজই লোক নিয়ে। যত মানুষ তত তার আনন্দ। আর মানুষ আসেও তার কাছে ঝেঁটিয়ে। যত ঝামেলা চাপিয়ে দেয় তাঁর মাথায় আর তিনিও হাসিমুখে সব দায় কাঁধে নেন। কুন্দনকে দ্বিতীয় দিন ডেকে বললেন, এখানে কিন্তু খাট জুটবে না, শুতে হলে খড়ের বিছানায়। ভূতের বেগার খাটতে হবে। পারবি? পারব। তা হলে লেগে থাক। কুন্দন লেগে রইল। সুখ কেমন, বিলাসব্যসন কেমন তা কুন্দন জানে না। তবে মাঝে মাঝে তার বুকের মধ্যে এমন উথাল পাতাল আনন্দ ঠেলে উঠে যে সে পাগল-পাগল হয়ে যায়। চক্কোত্তিমশাই ঠিক টের পান। মাঝ রাত্তিরে যখন সে জেগে বসে আনচান করে তখন চকোত্তিমশাই এসে বলেন, আটে কাঠে ছড়তে ঘোড়ার উপর চড়ো। একটু আহ্লাদ হলেই যে বড় উঠে পড়িস। ও রকম করতে নেই। লেগে থাকবি। আরও কত কী হবে। কুন্দনের কোনওকালেই ভবিষ্যৎ চিন্তা ছিল না। যেমন আছে তেমনি সে ভাল থাকে সব সময়। এই যে দৌড়োয় এও একদিন চক্কোত্তিমশাই বলে দিয়েছিলেন। পালাতে-পালাতে স্বভাবটাই পালাই-পালাই হয়ে গেছে। এক জায়গায় বাঁধা পড়লেই মনটা আঁকুপাঁকু করে। একদিন চক্কোত্তিমশাই ডেকে বললেন ওরে, ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে উঠে জপ সেরে উঠে পড়বি, যতদূর অবধি পারবি ভোঁ ভোঁ দৌড় লাগাবি। ওভাবেই পালানোর ইচ্ছাটা চলে যাবে। আর পালাবি বা কোথায় বাবা, সব জায়গাতেই তিনি। কুন্দন তাই রাত তিনটেয় উঠে জপ সারে। তারপর দৌড়াতে লাগে। কী যে আনন্দ। কী যে নির্ভার। আস্তে আস্তে তার শরীর 'নেই' হয়ে যায়। থাকে শুধু গতি, শুধু আনন্দ। বুড়ো তেঁতুলগাছটা পেরিয়ে পালচৌধুরীদের মস্ত ভাঙা বাড়ির ঘের পাঁচিলের পাশ গেঁষে দৌড়োতে দৌড়োতে প্রায়ই সে এক অদ্ভুত গন্ধ পায়। বুড়ি কমললতা এই অন্ধকারে রোজ বাগানে ঘুরে বেড়ান, ওরে ও কুন্দন, দাঁড়া বাবা, একটু দাঁড়া। কী ঠাকুমা? সেই যে একদিন দেখলুম, কই, আর তো দেখি না তাকে, তুই দেখিস? না ঠাকুমা, আমি পাপী তাপী মানুষ। চক্কোত্তি মশাইকে একটু বলবি? আমার যে বড় দরকার তাকে। কীসের দরকার? কত কথা জেনে নেওয়ার আছে। রাঙা গাইটা দু বছর বিয়োয়নি, নারকোল গাছটা মরকুটে মেরে গেল, আমার নাতি গদাই সেই যে শনপুরে গেল, আজও বদলি হয়ে আসতে পারল না সে। ওঃ ঠাকুমা, ভগবানকে পেলে ও সব জিজ্ঞেস করবে? রামোঃ। কেন রে বিটলে, রামোঃ কিসের? সংসারটা কি ভগবনই মাথায় চাপিয়ে দেয়নি? এই সব কথা তার সামনে তুলব না তো কি? ওসব তুই বুঝবি না, চক্কোত্তি মশাইকে বলিস সে বুঝবে। বলব ঠাকুমা। আর শোনো। বলব গো, আমার দৌড়টা যে মাটি হচ্ছে। বিটলে ছোঁড়া, অত দৌড়ঝাঁপ কীসের রে? আলায় সালায় ঘুরিস ঘারিস যদি সেই তেনার দেখা পেয়ে যাস, তবে বলিস কিন্তু, পালচৌধুরীদের বাগানে যেন একবারটি সময় করে আসে বুঝলি? গায়ে সাদা চাদর ছিল। বড়

বড় চোখ ছিল, আর ভারী একটা মিষ্টি গন্ধ। বলবি তো! আমি কি আর দেখব ঠাকুমা? দেখলে বলব। হরিশঙ্কর তার কাকাতুয়াটাকে কালী দুর্গার নাম শেখায়নি, ভাল ভাল কথা কিছু শেখায়নি কিছু, এ এক বুলি, নিমাই ওঠো...নিমাই হল হরিশঙ্করের ছেলে। তা এ গঞ্জে নিমাই-র মতো ছেলে আর নেই। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি তার হাতের ময়লা, তার উপর গাঁজা, চরস, তাড়ি কিছু বাদ নেই। সারারাত নানা কুকর্ম করে এ ভোর রাতে নিমাই বিছানা নেয়। হরিশঙ্কর বুড়ো হচ্ছে। তার ছেলে একবার জীবনে এই ভোরবেলার সৌন্দর্য একটু দেখুক। একটু বসে ভগবানের নাম নিক। নিজে ডাকতে সাহস হয় না বলে কাকাতুয়াকে শিখিয়েছে। সেই হরিশঙ্কর জামতলায় খাটিয়ার উপর বসে এই ভোরবেলায় তুলসীদাসের মানস পড়ছে। রামচরিতমানস পড়তে পড়তে কতবার যে সে কেঁদে ভাসায় তার হিসাব নেই। কিন্তু কুন্দন ভেবে দেখেছে এই ভোরবেলার আধো অন্ধকারে হরিশঙ্কর তার চালসে ধরা চোখে নিশ্চয় বইয়ের অক্ষর দেখতে পায় না। সে বই খুলে মুখস্থ বলে যায়। কুন্দন ভাই। দাঁড়াও। তোমার নিমাই উঠল হরিশঙ্কর দাদা? না ভাই, সে উঠবে বেলা বারোটায়। আমার যেমন কপাল। তুমি রামচন্দ্রকে এত ভালবাসো? তোমার চিন্তা কীসের? হরিশঙ্কর মাথা নেড়ে বলে, অনেক পাপ। মেলা পাপ জমা হয়ে গেছে যে আমার। সুদের কারবার। হবে না পাপ? চক্কোত্তিবাবুকে বলো, হরিশঙ্কর বড়ো পাপী আর এই আধুলিটা নিয়ে যাও, বাবার তামাক কিনে নিয়ো। একটু হাসে কুন্দন। আধুলিটা নিয়ে ফের দৌড়তে থাকে। মোয়াজের জীবনে কোনও দুঃখ ছিল না কোনও দিন। এই যে চারপাশের দিনরাত্রির আকাশ, আলো, লোকজন, জন্ম, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, এই সবই তার কাছে এক অফুরান অভিজ্ঞতা। দুটি চোখ মেলে সে সব দেখে, দুটো কান পেতে সে সব শোনে, চোখ বুজে সে কত কী ভাবে। জীবনে দুঃখের কোনও ছায়া নেই। কিন্তু এবার বুঝি আসে। এবার বুঝি সে কিছুতেই জীবনের একটা মস্ত ফাঁড়া কাটাতে পারে না। এই ভোরে সে খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। কেড্‌স পায়ে, ধুতি আর চাদর পরা কুন্দন পাগল অন্ধকার থেকে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ছায়ার মতো, এক লহমার জন্য শুধু দেখা যায়, লম্বা ও রোগা এক মূর্তিকে। সোহাগ ভাবে, দুঃখ নেই। তাই বলেই কি আর দুঃখ নেই। ভাত জোটে না, টগনা জোটে না। ভাঙা ঘরে জল পড়ে, পুজোয় নতুন কাপড় নেই, রূপটান নেই। তবু সত্যিকারের দুঃখ কিছু টের পায় না সোহাগ। বেশ আনন্দে ডগমগ হয়েই তো কেটে যায় তাদের দিন। তার বাবা যখন চাকরি করত, অনেক টাকা মাইনে পেত, তখন অনেক দুঃখ ছিল। চাহিদা ছিল, সুখ ছিল, আহ্লাদ ছিল, বাবা যেই চাকরি ছেড়ে চক্কোত্তিমশাইয়ের জোয়াল কাঁধে নিল অমনি অভাব এল আর দুঃখ ঘুচল। চক্কোত্তিমশাই বাবাকে বলেছিলেন, পরের কাজ মানেই নিজের কাজ। যত পর তত তুই, তত আমি। বাবা কী বুঝল কে জানে। কিন্তু সব ছেড়ে ছুড়ে দিল। মা প্রথম দিকে খুব রাগারাগি করত। আজকাল মা একদম মাটির মানুষ। ভোর থাকতে উঠে দশ হাতে অভাবের সংসার সামলায়। আগে কাজের লোক ছিল, তখন মার ব্যাধি সারত না। আজকাল ব্যাধি নেই, মুখ ভরা হাসি। রোজই ভোরবেলা গিয়ে চক্কোত্তি মশাইয়ের ঘরখানা ঝাঁট পাট দিয়ে আসে সোহাগ। আর রোজই চক্কোত্তিমশাই তার দিকে চেয়ে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করেন, কী করে, কিছু বলবি? কী আর বলবে সোহাগ। মাথা নেড়ে বলে, না। চক্কোত্তিমশাই গুড়ুক গুড়ুক তামাক খেতে খেতে বলে, যখন যা ইচ্ছা জাগে আমার কাছে এসে বলে খালাস হয়ে যাস। কথা লুকোতে বড় কষ্ট। বলার তো লোক নেই। যা বলতে সাধ যাবে, যা ছাপাতে ইচ্ছা যাবে সব বলে ফেলবি। হালকা লাগবে। সোহাগ অনেকক্ষণ ধরে দৌড় পায়ের আওয়াজটা শুনল। আর মিলিয়ে দেখল, ঠিক ওই রকম তালে তালে তার বুকেও

Shahnaz

হৃদপিণ্ডের শব্দ হচ্ছে। এরকম কেন হয়? সোহাগ। ও সোহাগ। যাই মা। আঁধার থাকতেই তাদের দিন শুরু হয় আজকাল। আগে কত বেলায় উঠত, গা ম্যাজ ম্যাজ করত, আলসেমি ধরত, ঘুম ছাড়তে চাইত না। চোখ থেকে আজকাল শরীর আর মন কত চনমনে থাকে। পুজোপাঠ সারতে সারতে শীতের রোদ উঠল কোমল আর লাবণ্যময়। ঠিক যেন শিউলি বোঁটার বন। বাবা বেরল না কাজে, ঘরে ঘরে যাবে। কত কথা হবে। কত আলোচনা হবে। কত সমস্যার সমাধান, কত রোগের নিদান, কত অভাবের মোচন। চলবে সেই রাত পর্যন্ত। সোহাগ গরু ছাড়ল, গোয়াল পরিষ্কার করল, উঠোন নিকোল, গাছে জল দিল। কাজের কি শেষ আছে। গাছপালা গরুবাছুর, কুকুর পাখি, সব প্রাণবন্ত। সবাই অপেক্ষা করে তার স্পর্শের জন্য, তার আদরটুকুর জন্য। এদের আগে চিনতই না সোহাগ। আজকাল এ বাড়িতে যে কটা কাক আসে তাদের প্রত্যেকটাকে আলাদা করে চেনে সোহাগ। কেমন করে সে জড়িয়ে পড়ল চার পাঁচটার সঙ্গে। এবার চক্কোত্তি মশাইয়ের ঘরটা সেরে আসি মা। বলিস, আমি একটু বেলায় যাব। বলব। সোহাগ কাপড় ছাড়ল, চুল আঁচড়াল, টিপ পরল। চক্কোত্তিমশাই সব নিখুঁত চান। একটু ঢিলেমিও তার সহ্য হয় না। সকালের শীতে একটা সুতীর চাদর গায়ে পথটুকু বেশ হেঁটে চলে এল। ওরে মারে তোর শীত নেই? বলে চক্কোত্তিমশাই খুব দুলে হাসেন। শীত কোথায় চক্কোত্তিমশাই লাগছে না তো। ওরে মারে? শীতে আমি দেখ কেমন থুপথুপে হয়ে গেছি। তাহলে আংরা জ্বেলে দিই? না, তাহলে আর শীতের আরাম কি? তবে শীতের কথা বলেন কেন? তেমন-তেমন শীত লাগলে বসে জপ করিস, শীত কাটবে। আপনি তো শুনি নামময়। সেটা কেমন চক্কোত্তিমশাই? চক্কোত্তিমশাই দুলে দুলে হাসলেন। বললেন, সে যে কীরকম তা বোঝানো যায় না। ভিতরে যেন আর একভাগ কাঁপন বয়ে যায় শরীরে, তোরও হবে। উঃ বাবা আমার তা হলে ভয় করবে। ভয় কি রে? মন যত বস্তু ভাবে তত কম্পন কমে যায়। নামের উপর থাকবি, নামময় হয়ে থাকবি, বস্তু স্পর্শও করবে না। একদিন জপে বসে যা ধপাস ধপাস শব্দ হয়েছিল না বুকের মধ্যে ভয় খেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। ভয় কীরে? তুইও তো শব্দই। সৃষ্টির মূলেই তো এক শব্দ। দেখত লাউ কাঁধে কে আসে। শীতল না? কাঞ্চন ফুলের ঝোপের পাশ দিয়ে মোরামের বাঁকা রাস্তা। সে দিক থেকে আসছে যে, সে শীতলই বটে। রোগা, কালো, দাঁত উঁচু। পরনে এই শীতেও ধুতি আর একখানা গেঞ্জি। কাঁধে একখানা মাঝারি লাউ, চক্কোত্তিমশাই ভারী আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠলেন, জব্বর মাল এনেছিস তো। তোর গাছের বুঝি? শীতল এক গাল হেসে লাউটা নামিয়ে রেখে পেন্নাম ঠুকে বলল, আজ্ঞে। তা কতগুলো হয়েছিল? হয়েছিল মেলা, চক্কোত্তিমশাই লাউটা দুহাতে তুলে ভারী আদর করে বললেন, ওরে আমার শীতলের লাউ রে, কত ভাগ্যি আমার, শেতল লাউ দিয়েছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খুক খুক করে হাসল সোহাগ। তারপর বলল আহা চক্কোত্তিমশাই, লাউ বুঝি আপনাকে কেউ দেয় না। সবজি ঘরে এখনও চার পাঁচটি লাউ পড়ে আছে। তা দেবে না কেন। মেলা দেয়। কিন্তু শীতল যে দিল এ হচ্ছে ওর দেওয়া। দিতে যে শেষ অবধি ইচ্ছে জাগল এটা কি কম কথা। গাছে লাউ হয়েছে মেলা। শীতল তার ছেলেপুলে আর বউ মিলে খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরেছে, তারপর একদিন হঠাৎ মনে পড়েছে। এবার একখানা চক্কোত্তিমশাইকে দিলে হয়। তাই না রে শীতল? শীতল মাথা চুলকে লাজুক লাজুক হাসছিল। সোহাগ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। গোবর জল গুলে ন্যাতা নিয়ে কাজে লেগে গেল। মনটা পড়ে রইল অন্য দিকে। কবীরের কাছে এ পৃথিবীটা একেবারে আনকোরা নতুন। যে দিকে চায় সে দিকেই বিস্ময় আর বিস্ময়। কাক যে ছড়ানো মুড়ি ঠুকরে খায়, রেজী যে করে ছোটে, মাকড়সা যে শূন্যে

ঝুলে থাকে, এ সবই তার কাছে বিশাল বিশাল ঘটনা। রেলগাড়ির মতো তাজ্জব জিনিস সে আর দেখেনি। আকাশে যে এরোপ্লেন ওড়ে সেটা নাকি পাখি নয় তার পেটের মধ্যে মানুষ বসে থাকে, এ কি সত্যি হতে পারে? পাঁচ বছরের কবীরের মাথায় কোনও জিনিসই অসম্ভব মনে হয় না। সে পক্ষিরাজ ঘোড়া, বেঙ্গমা বেঙ্গমীর কথা খুব বিশ্বাস করে। আর রাক্ষস খোক্কস তো আছেই রায়দিঘির ওপাশের জঙ্গলটায়, আর সন্ধে হলে তাদের উঠোনেও ভূত দাপাদাপি করে এসে। কুন্দনদাদাকে সে একবার জিজ্ঞেস করেছিল। রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই লাগলে তুমি পারবে? রোজ তো রাক্ষসের সঙ্গেই লড়াই করি। যা তুমি পারবে না। রাক্ষস তোমাকে বগলে চেপে রেখে দেবে। কেন রে আমি কি থার্মোমিটার? হিঃ হিঃ কী বলে, থার্মোমিটার। বগলে চেপে ধরলে কী করব জানিস, এমন কাতুকুতু দেব যে হাসতে হাসতে দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে। ইস। রাক্ষসের কী বড় হাত, কত বড় বড় দাঁত, আর তাল গাছের মতো লম্বা, তোমাকে খেয়েই তো ফেলবে। অত সোজা নয় রে। রোজ তো রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই করি। ধরে আছাড় মারি। চুলের মুঠি ধরে খুব ওঠবোস করাই! ইঃ অত সোজা নয়। তুই জানিস না। বড় হয়ে তোকেও কত রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। চার দিকে কত রাক্ষস ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখবি। তারা কি তোকে ছাড়বে? কামড়ে দেবে? কামড়ায়ই তো, ভীষণ কামড়ায়। চল তোকে খাল ধার থেকে ঘুরিয়ে আনি। যাত্রার নৌকো এসেছে দেখিগে যাই চল। এটাতে খুব আনন্দ কবীরের। সে কাঁধে চড়ে বেড়াতে ভালবাসে। বিশেষ করে কুন্দনের কাঁধ হলে তো কথাই নেই। রাতে যাত্রার আসর বসবে। রাবণ বধ পালা। কবীর বায়না ধরল যাবে। মা কেবল বলে, না বাপু ওখানে ঘুমিয়ে পড়বি, কে পা মাড়িয়ে দেবে, মশা কামড়াবে, বার বার পেচ্ছাপ করতে যাবি। তুই পিসির কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে থাক। কবীর জানে কান্নার মতো জিনিস নেই। কাঁদলে সব পাওয়া যায়। চড় চাপড় জোটে ঠিকই, কিন্তু বড়রা শেষ অবধি হাল ছেড়ে বায়না মেটায়। শেষ অবধি বাবার কাঁধে চেপে গেলও কবীর। রাবণ রাজাকে শুধু একটা সিনে দেখতে পেয়েছিল, সাধুর বেশে সীতা হরণে এসেছে। তারপর হাতের মোয়াটা খেতে খেতে এমন ঘুম পেল। সে কী বলবে। তবে কবীর রাম রাবণের যুদ্ধটা স্বপ্নেই দেখে নিয়েছে। ওঃ সে যে কী ভীষণ যুদ্ধ। রাবণের দশটা মুণ্ডু খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে কেটে ফেলা হচ্ছে। আর রাবণ সেই মুণ্ডু কুড়িয়ে নিয়ে টুপির মতো পরে নিচ্ছে আর হ্যা হ্যা করে খুব হাসছে। কী কাণ্ড বাবা। তুলসীর সঙ্গে বেলতলায় চোর-পুলিশ খেলতে গিয়েছিল কবীর। তখন রাক্ষস আর ভূত আর রেলগাড়ির অনেক গল্প হল দুজনে। তুলসী বলল তার বাবা রাক্ষসকে দেখেছে। কোথায় রে? বাবা তো রাত ডিউটিতে যায়। হাতে লণ্ঠন থাকে। বাঁ হাতে টিফিনের বাক্স। রোজ একটা রাক্ষস টিফিনের লোভে বাবার পিছু নেয়। সেদিন বাবা পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে চাইতেই রাক্ষসটা কচুবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। লণ্ঠনের আলোয় বাবা কী দেখল জানিস? কী? কুলোর মতো দুটো পা। কবীরের মুখখানা কাচুমাচু হয়ে গেল। তবু গলায় জোর এনে বলল জানিস, কুন্দনদার সঙ্গে রাক্ষসদের কুস্তি হয়? যা কুন্দনদা পারবেই না। পৃথিবী জায়গাটা যেমন ভাল তেমনি আবার ভয়ের। কত কী যে আছে। রাক্ষস, ভূত, ব্রহ্মদত্যি, ছেলেধরা। চক্কোত্তিমশাই যখন বিকেলবেলা গাছে জল দেন তখন কবীর একটা ছোট্ট কাটারি নিয়ে পিছু পিছু ঘোরে। চক্কোত্তিমশাই তুমি সব জানো? কী জানব রে? সবাই বলে তুমি নাকি সব জানো। দূর বোকা, আমি তো মুখ্যু সুখ্যু মানুষ। তোর কোন খবরটা দরকার? আমার অনেক খবর দরকার। আচ্ছা রাক্ষসের সঙ্গে কি কুন্দনদার কুস্তি হয়? সে বলে বুঝি? তা হতে পারে। তুমি রাক্ষসকে দেখেছ? তা দেখতে চেষ্টা করলে দেখা যায়। কামড়ায় না? রাক্ষস ভালও আছে, মন্দও আছে। রাক্ষস কি

Shahnaz

এক রকম রে? মানুষের যেমন ভাল আছে, মন্দও আছে। রাক্ষসের আবার ভাল আছে না কি। থাকবে না? না থাকলে চলে। আমাকে রাক্ষস দেখাতে পারো? তেমন চোখ যদি হয় তো দেখাতে পারি একদিন। তেমন চোখ মানে কী? এই যে ধর তোর দুটো চোখ তুই কতদূর দেখতে পাস? কেন, ওই আকাশ অবধি। বাঃ বেশ। ওই যে ডুমুর গাছে একটা ফিঙে নেচে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস? না তো। ডুমুর গাছ কোথায় বলো তো? ওই যে বাবলা ঝোপটার ওদিকে। ও বাবা, নাঃ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তুমি পাচ্ছ? পাচ্ছি, তুইও পারবি। দূরের জিনিস দেখার চেষ্টা করবি। তবে হবে। এই যে তোর চার দিকের বাতাসে কত ছোট্ট ছোট্ট চুকুন চুকুন পোকা ঘুরে বেড়ায় তাদের দেখতে পাস? না। চেষ্টা কর পারবি। চোখ কখনও হবে দূরবিন, কখনও অনুবীক্ষণ। কান হবে মাইক্রোফোনের মতো টনটনে। নাক হবে কুকুরের নাকের মতো। তবে না! তা হলে রাক্ষস দেখতে পাব? কত কী পাবি। রাক্ষস, ভূত, প্রেত, জীবাণু, নক্ষত্র, সব। তুমি ভূত দেখেছ? কত কী দেখি। আচ্ছা চক্কোত্তিমশাই চাঁদে নাকি মানুষ আছে। বীরুদা বলছিল, থাকবে না কেন। মানুষ বলিস মানুষসত্তা বলিস সত্তা, আছে সব জায়গাতেই আছে প্রাণের খেলা। প্রাণের প্রকাশ। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে, চোখ দিয়ে, বিবেচনা দিয়ে সব বোঝা যায় না। ঝারিতে গাছের গোড়ায় গোড়ায় জল ঢালতে ঢালতে কবীর সব শোনে। আছে তা হলে আছে। সব আছে। তোর কি কিছু বলার আছে রে কুন্দন? আজ্ঞে আছে চক্কোত্তিমশাই। আমার অনেক কথা। কী কথা রে? আজকাল জপে বসলে কেমন যেন একটা হয়। মনটা আটকে থাকে। উঁচুতে নিচুতে যায় না। আর? যখন দৌড়োই তখন আজকাল মাঝে মাঝে ভারী হয়ে যায় পা, চলতে চায় না। আরও আরও যেন কী সব হয়। ঠিক বুঝতে পারি না। চক্কোত্তিমশাই দুলে দুলে হাসলেন। তারপর বললেন, কুষ্টিটা বসন্ত পণ্ডিতকে দিস। দেখে রাখবে। আমার আবার কুষ্টি। যা না বসন্ত পণ্ডিতের কাছে। করে দেবেখন। কুষ্টি দিয়ে হবে কী? রোগের চিকিচ্ছে হবে। যা বলছি করত যা। আমার রাগটা অন্য। আমার সন্ন্যাস নেওয়া লাগবে না। সব কিছু কি সবাইকে সয় রে? ম্যাচ ফোকরে পরে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। দুনিয়ায় জন্মেছিস কি ব্রহ্মচর্যের ব্যায়াম করবি বলে? যা যা...আপনার মতলব ভাল নয় চক্কোত্তিমশাই। ভালমন্দের ভারটা একজনের ওপরেই ছেড়ে দে না। পরদিন দৌড়াতে দৌড়াতে যেখানে পা শ্লথ হয়ে এল সেখানে থামল কুন্দন। চার দিকে চাইল। একটা খোলা জানালা। জানলার ওপাশে আবছায়া ও কে? সোহাগ? একটা শ্বাস ফেলে কুন্দন আবার দৌড়াতে লাগল। হরিশঙ্করের কাকাতুয়া ডাকছে নিমাই ওঠো, নিমাই ওঠো—। সুঘ্রাণ পাতলা বাতাস বইছে। পুবের আকাশে পেখম মেলেছে এক অলৌকিক ময়ূর। পরি ও দেবতাদের নেপথ্য সঞ্চার স্পষ্ট টের পাওয়া যায় এ সময়ে। পালচৌধুরীদের বাগানে বুড়ি কমললতা আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই দেবতার জন্য, যদি পথ ভুলে চলে আসে। চারদিকে শুধু দেবলোকের আলো, স্বর্গের গন্ধ। কুন্দন কেন বাঁধা পড়বে? তার দুখানা দূরগামী পা আছে, আছে বন্ধনমুক্ত ইচ্ছাশক্তি, সে কেন বাঁধা থাকবে এইখানে? সে তো গাছ নয়। চরৈবেতি, চরৈবেতি, চেনা পথ ছেড়ে, গঞ্জের গণ্ডি পেরিয়ে কুন্দন আজ ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপুল পৃথিবীর বুকে। সে আজই গণ্ডি ভাঙবে। ভাঙবেই। কাকাতুয়াটা তীব্র স্বরে ডাকতে লাগল। নিমাই, নিমাই, শচীময়না গলা না। না কি চক্কোত্তিমশাই। না কি তার হৃদপিণ্ডেই ডেকে উঠল এমন। কেউ ডাকল। কুন্দন প্রাণপণ দৌড়োতে লাগল। যখন হাফ্‌সে ক্লান্ত শ্রান্ত কুন্দন থামল, তখন সামনেই চক্কোত্তিমশাই। তাঁর চালাঘরে বসা। দুলে দুলে হাসছেন, জিরো, জিরো, জিরিয়ে নে। আরও কত দৌড় বাকি আছে।

নীলুর দুঃখ

সকালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ। ধারে কাছে কোনও পেমেন্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর—মহা টিকরমবাজ লোক—সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল তখন হাসি-হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতার বাইরে থাকবে বলে বুঝি ওই প্রসন্নতা—ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনদিনের বাজার খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারা বিকেল খচখচ করেছে। আজ সকালেই মশারির মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুলল মা—বাজার যাবি না, ও নীলু?

তখনই বোঝা গেল বুড়ো চাক্কি রেখে যায়নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রানাকে পাঠিয়েছিল কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথড্রয়াল ফর্ম ফেরত দিয়েছে পোস্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিকরকমবাজি। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটা মুদির দোকান দিয়েছিল—অনভিজ্ঞ লোক, তার ওপর দোকান ভেঙে খেত—ফলে দোকান গেল উঠে। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোস্ট-অফিসে রাখে আর প্রতি সপ্তাহে খরচ তোলে। প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভেজে না। মাসের শেষ দিকে টাকা ফুরোলেই টিকরমবাজি শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে তার নাকি দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনও বুড়ার ওপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে আড়ে চায় মাসের শেষ দিকটা। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে বাবার একটা লুকোচুরির খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারির নাড়ুমামা, মামি, ছেলে, ছেলের বৌ—চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন—নীলু নিজে, মা, ছটা ভাই, দুটো ধুমসী বোন, বিধবা মাখনী পিসি, বাবার জ্যাঠতুতো ভাই, আইবুড়ো নিবারণ কাকা—বিশ চাক্কির নীচে বাজার

Shahnaz

নামে?

রবিবার বাজার নামিয়ে রেখে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। কদিন ধরেই পোগো ঘুরছে পিছন পিছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি। ছুরিগুলো তার মায়ের পুরনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোক বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে—কী পোগোবাবু, আজ কটা মার্ডার হল? পোগো হুম হাম করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজবৌদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল—পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায়, নীলু, খবর রাখো?

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল, কয়েকদিন যাবৎ সে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ করেছে পোগো নিঃশব্দে আসছে পিছনে পিছনে। বাস-স্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনও ফিরে তাকালে পোগো ঊর্ধ্বমুখে আকাশ দেখে আর বিড়বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে যাওয়ার নীলুর মেজাজ ভাল ছিল না। নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিল পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না দেখার ভান করে কিছুদূর গিয়েই নীলু টের পেল পোগো পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পোগো উলটোবাগে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু—শালা, বদের হাঁড়ি।

কাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগা। জিভ আর প্যালেটের কোনও দোষ আছে পোগোর, এখনও জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীর তিন বছর বয়সী মগজ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল—খুব ঠাবহান, নীলু, বলে ডিট্টি খুব ঠাবহান।

—ফের! কষাব আর একটা?

পোগো থিতিয়ে যায়। শার্টের ভিতরে লুকনো হাত ছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গিতে রেখে বলে—একডিন ফুটে ডাবি ঠালা।

নীলু আর একবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড়বিড় করতে করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে পোগো। সাত-আটখানা ছুরি বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে ও নিজে মরে—সেই ভয়ে ও ঘুমোলে ওর মা এসে হাতড়ে হাতড়ে ছুরিগুলো সরিয়ে নেয়। মার্ডারের বড় শখ পোগোর। সারাদিন সে লোককে কত মার্ডারের গল্প করে। কলকাতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দুহাত তুলে লাফায়। মার্ডারের গল্প যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তাই সেই শখের ভোজালিটা দিনসাতেক আগে একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেওয়ার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল—ভয় নেই, ভাল করে ঢুয়ে ডিয়েছি।

—কী ধুয়েছিস? জিজ্ঞেস করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুজে নাও কী ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু—শালার শয়তানী বুদ্ধি দেখ। ধুয়ে দিয়েছি—কী ধুয়েছিস আব্বে পোগোর বাচ্চা?

সেই থেকেই বোধহয় নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিস্টে নীলু ছাড়া

আরও অনেকের নাম আছে যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে ব্রিটিশকে খুঁজছে নীলু। কাল ব্রিটিশ জিতেছে। দুশো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল!

গলির মুখ আটকে খুদে প্যান্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধেবেলায়। পাড়ার মেয়ে-বৌ, বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশন যখন জমজমাট, তখন বড় রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে ব্রিটিশ নামল। টলতে টলতে ঢুকল গলিতে, দু বগলে বাংলার বোতল। সঙ্গে ছটকু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশনের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার জন্য দুহাত ওপরে তুলে হাঁকাড় ছেড়েছিল ব্রিটিশ—ঈ ঈ ঈ দ কা চাঁ-আ-আ-দ্। বগল থেকে দুটো বোতল পড়ে গিয়ে ফট-ফটাস করে ভাঙল। হুড়দৌড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশনে। পাঁচ বছরের টুমিরানি তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে 'কাঠবেরালী, কঠবেরালী, পেয়ারা তুমি খাও...' বলে দুলতে দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হাঁ করেছিল মাত্র। সেই সময়ে নীলু, জগু, জাপান এসে দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু ব্রিটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কত জিতেছিস? প্রথমে ব্রিটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল—আব্বে, পঞ্চা-আ-শ হা-জার-আ-র। জাপান আরও দুবার হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু হাজারে। সেটাও বিশ্বাস হল না কারও। পাড়ার বুকি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছে, ঈদ কা চাঁদ হট ফেবারিট ছিল। আরও কয়েকবার ঝাঁকাড় খেয়ে সত্যি কথা বলল ব্রিটিশ—তিনশো, মাইরি বলছি বিশ্বাস কর। পকেট সার্চ করে শ দুয়ের মতো পাওয়া গিয়েছিল।

আজ সকালে তাই ব্রিটিশকে খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। ব্রিটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে ব্রিটিশের টেরিকটনের প্যান্টটা ছাড়িয়ে দিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি। গতকাল নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে ব্রিটিশকে পাওয়া গেল না। ভি. আই. পি. রোডের মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে, সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশিক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা ব্রিটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তারা এমন মনুষ দেখেনি যার পকেটে ফালতু দুশো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল। কে জানে রাতে আবার ওরা ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কিনা! গিয়ে থাকলে ওরা এখনও বিছানা নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। ব্রিটিশের বাড়িতে আজকাল আর যায় না নীলু। ব্রিটিশের মা আর দাদার সন্দেহ ওকে নষ্ট করেছে নীলুই। নইলে নীলু গিয়ে ব্রিটিশকে টেনে তুলত বিছানা থেকে, বলত,—না-হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাই না, আমার হক্কেরটা দিয়ে দে।

নাঃ। আবার ভেবে দেখল নীলু। দুশো টাকা—মাত্র দুশো টাকার আয়ু এ বাজার কতক্ষণ? কাল যদি ওরা সেকেন্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায় তবে ব্রিটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে, বিশ চাক্কি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কীভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়!

অমনি শোভন আর তার বৌ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার। শোভন কাজ করে কাস্টমসে। তিনবারে তিনটি বিলিতি টেরিলিনের শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তার

Shahnaz

একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন—যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে নীলু শোভন, বল্লরী আর ওদের দুটো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভাল করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিন স্টপ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল ন'টা বাজে। আজ ছুটির দিন, বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি! উনুনে আঁচ দিয়ে চা-ফা, লুচি-ফুচি হচ্ছে এখনও। দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরি বোধহয় হয়নি এখনও।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে, বাসটা দখল করে আছে দশ বারোজন ছেলে-ছোকরা। পরনে শার্ট পায়জামা, কিংবা সরু প্যান্ট। বয়স ষোলোর এদিক ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলার আগের গলাখাঁকারির—খ্যা-অ্যা-অ্যা-র মতো শোনাচ্ছিল। লেডিজ সিটে দু-তিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। দু-চারজন ভদ্রলোক ঘাড় সটান করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজদের মধ্যেই চেঁচিয়ে কথা বলছে। উলটোপালটা কথা, গানের কলি। কন্ডাক্টর দুজন দু'দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাড়া চাইবার সাহস নেই!

তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে আর একজনকে ডেকে বলছে—পরমেশ, আমাদের ভাড়াটা দিলি না?

—কত করে?

—আমাদের হাফ-টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।

—এই যে কন্ডাক্টরদাদা, পাঁচ পয়সার টিকিট আছে তো! বারোখানা দিন।

পিছনের কন্ডাক্টর রোগা, লম্বা, ফর্সা। না-কামানো কয়েকদিনের দাড়ি থুতনিতে জমে আছে। এবড়োখেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষণ্ণ দেখায়। সে তবু একটু হাসল ছোকরাদের কথায়। অসহায় হাসিটি।

নীলু বসার জায়গা পায়নি। কন্ডাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

বাইরে কোথাও পরিবার পরিকল্পনার হোর্ডিং দেখে জানালার পাশে বসা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল—লাল ত্রিভুজটা কী বল তো মাইরি!

—ট্রাফিক সিগন্যাল রে, লাল দেখলে থেমে যাবি।

—আর নিরোধ! নিরোধটা কী যেন।

—রাজার টুপি...রাজার টুপি...

—খ্যা—অ্যা-অ্যা-অ্যা-খ্যা-আ-অ্যা...

—খ্যা...

পরের স্টপে বাস আসতে তারা হেঁকে বলল—বেঁধে...লেডিজ...

নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল এবার। সবাই শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা-চোখে যুবা কন্ডাক্টরের দিকে চেয়ে বলল— লাথি দিয়ে নামিয়ে দিতে পারেন না এসব এলিমেন্টকে!

কন্ডাক্টর ম্লান মুখে হাসে।

ঝুঁকে নীলু দেখছিল ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশে টিটকিরি ছুড়ে দিচ্ছে। কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। লাঠি ছোরা বোমা যা হোক অস্ত্র নিয়ে কয়েকটা খুন করে আসতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোগো। স্বপ্ন দেখছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পিছনে লাগে, মাঝে মধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতোই এক তীব্র মার্ডারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর মধ্যেও মাঝে মাঝে। এত তীব্র সেই ইচ্ছে যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যায় মন।

শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে চোখ কপালে তুলল—ওমা, আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলা। অনেকদিন বাঁচবেন।

শোভনের বৈঠকখানাটি খুব ছিমছাম, সাজানো। বেতের সোফা, কাচের বুককেস, গ্রুন্ডিগের রেডিওগ্রাম, কাঠের টবে মানিপ্ল্যান্ট, দেয়ালে বিদেশি বারো-ছবিওলা ক্যালেন্ডার, মেঝেয় কয়েরে কার্পেট। মাঝখানে নিচু টেবিলের ওপর মাখনের মতো রঙের ঝকঝকে অ্যাশ-ট্রে-টার সৌন্দর্যও দেখবার মতন। মেঝেয় ইংরিজি ছড়ার বই খুলে বসে ছিল শোভনের চার আর তিন বছর বয়সের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরিজি কায়দায় থাকতেই ভালবাসে শোভন। মিলিকে কিন্ডারগার্টেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরিজি ছড়া মুখস্থ বলে।

নীলুকে দেখেই মিলি জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল।

মিলি বলে—তুমি বলেছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়। এঁটো কী?

দুজনকে দু'কোলে তুলে নিয়ে ভারী একরকমের সুখবোধ করে নীলু। ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ।

মিলি জুলি তার চুল, জামার কলার লণ্ডভণ্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে—তোমার হাঁড়ি চড়ে গেছে নাকি উনুনে।

—এইবার চড়বে। বাজার এল এইমাত্র।

—হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ। বাপ গেছে বারুইপুরে। সকালেই বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! তোমার এ দুটো পুঁটলি নিয়ে দুপুরের আগেই চলে যেয়ো আমার গাড্ডায়, খুমে লিও সবাই।

বল্লরী ঝেঁঝে ওঠে—কী যে সব অসভ্য কথা শিখেছেন বাজে লোকদের কাছ থেকে। নেমন্তন্নের ওই ভাষা।

বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে—চলে যাস না নীলু, কথা আছে।

—যেয়ো কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে—নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

—বাঃ, আমার যে ডালের জল ছড়ানো হয়ে গেছে। এতবেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ!

নীলু সেসব কথায় কান দেয় না। মিলি জুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল। মেদবহুল শরীরে এঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙা পায়জামা। গত বছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই। চারদিনের নোটিশে। এখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে এত নিশ্চিন্ত আর তৃপ্ত আর সুখী দেখাত না তাকে।

পাছে হিংসা হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নের ব্যাপার শুনে শোভন হাসে—আমিও যাব-যাব করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম। ভালই হল।

এক কাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে—বা মোটে এক কাপ করলে! ছুটির দিনে এ সময়ে আমারও

Shabnaz

তো এক কাপ পাওনা।

বল্লরী গম্ভীরভাবে বলে—বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এক কাপ খেয়েছ।

মিষ্টি ঝগড়া করে দুজন। মিলি জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর-করা গলার স্বর শোনে নীলু। সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

তারপরই হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—চলি রে? তোরা ঠিক সময়ে চলে যাস।

—শুনুন শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বল্লরী তাকে থামায়।

—কী কথা?

—বলছিলুম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা। তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমাদের বাড়ির দেওয়ালে রাজনীতির কথা লিখে যায়? তারা কারা? আপনাদের তো এলাকা এটা, আপনার জানার কথা।

—কী লিখেছে?

—সে অনেক কথা। ঢোকার সময়ে দেখেননি? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাইরেটা রং করালুম। দেখুন গিয়ে, কালো রং দিয়ে ছবি এঁকে লিখে কী করে গেছে শ্রী! তা ছাড়া রাতভর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি।

নীলু উদাসভাবে বলে—বারণ করে দিলেই পারো।

—কে বারণ করবে? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরাল আর ইংরিজিতে আপনমনে গালাগাল দিতে লাগল—ভ্যাগাবন্ডস, মিসফিট্স, প্যারাসাইট্স...আরও কত কী। সাহস নেই যে উঠে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।

—তা তুমি ধমকালে না কেন? নীলু বলে উদাসভাবটা বজায় রেখেই।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল—ধমকাইনি নাকি! শেষমেষ আমিই তো উঠলাম। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম—ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমোব না? আপনার বন্ধু তো আমার কাণ্ড দেখে অস্থির। পিছন থেকে আঁচল টেনে ফিসফিস করে বলছে—চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মতো চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে, হাতে কিছু চটি চটি বই, প্যামফলেট। আমার দিকে হাতজোড় করে বলল—বৌদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই। এখন তো ঘুমের সময় না এদেশে। বললুম—আমার দেয়ালটা অমন নোংরা হয়ে গেল যে! একটা ছেলে বলল—কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেয়ালটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট হল আগের চেয়ে। লোক এখান দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞানলাভ করবে। আমি বুঝলুম খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটা মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল—বৌদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন? আমরা ছ'জন আছি!

নীলু চমকে উঠে বলে—খাওয়ালে না কি?

বল্লরী মাথা হেলিয়ে বলল—খাওয়াব না কেন?

—সে কী!

শোভন মাথা নেড়ে বলল—আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি। একদিন বিপদে পড়বে।

—আহা, ভয়ের কী! এইটুকু-টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়সী। মিষ্টি কথাবার্তা। তাছাড়া এই শরতের হিমে সারা রাত জেগে বাইরে থাকছে—ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম!

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে বলে—তার মানে তুমিও ওদের দলে।

—আহা, আমি কী জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারও দল দেয়ালে লেখে। আমি কী করে বুঝব!

—তুমি ঠিকই বুঝেছ। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা কি আমি জানি না! সেদিন খবরের কাগজে বাবলুর কলেজের ইলেকশনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিমপ্যাথাইজার।

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলে—না, বিশ্বাস করুন। আমি দেখিওনি ওরা কী লিখেছে।

নীলু হাসে—কিন্তু চা তো খাইয়েছ!

—হ্যাঁ। সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ পেয়ালা চা করতে কতক্ষণ লাগে! ওরা কী খুশি হল! বলল—বৌদি দরকার পড়লে আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময়ে পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গেল। ওরা ভাল না?

নীলু শান্তভাবে একটু মুচকি হাসে—কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলছিলে যে! এ তো নালিশ নয়। প্রশংসা।

—না নালিশই। কারণ, আজ সকালে হঠাৎ গোটা দুই বড় বড় ছেলে এসে হাজির। বলল—আপনাদের দেয়ালে ওসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব আলাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থম থম মুখ করে চলে গেল। আপনি ওই ছ'জনকে যদি চিনতে পারেন তবে বলবেন—ওরা যেন আর আমাদের দেয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাই। দু দলের মাঝখানে থাকতে ভয় করে আমাদের। বলবেন যদি চিনতে পারেন।

শোভন মাথা নেড়ে বলে—তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আর একটা বাসা দেখ। এই দেয়ালের লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দূর গড়ায় কে জানে। এর পর বোমা কিংবা পেটো ছুড়ে দিয়ে যাবে জানালা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে। তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে—যদি সে ঘটনার সাক্ষীসাবুদ কেউ থেকে থাকে তবে এখানে থাকাটা বেশ রিস্কি এখন।

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল—বুঝলেন তো! আমাদের কোনও দলের ওপর রাগ নেই। রাতজাগা ছটা ছেলেকে চা খাইয়েছি—সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।

বেরিয়ে আসার সময়ে দেয়ালের লেখাটা নীলু একপলক দেখল। তেমন কিছু দেখার নেই। সারা কলকাতার দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নিঃশব্দে।

কয়েকদিন আগে এক সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু দেখেছিল প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালের সামনে। পড়লেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন—এইসব লেখা দেখেছ নীলু। কী রকম স্বার্থপরতার কথা। আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হত। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে—দেখেছ কীরকম উলটো শিক্ষা!

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন—হেসো না। রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন তার মানে বোঝো?

নীলু মাথা নেড়েছিল। না।

Shahnaz

উনি বললেন—আমি এতদিনে সেটা বুঝেছি। রামকৃষ্ণদেব আমাদের দুটো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডের প্রতীক কামিনী, অপরটা মার্ক্সের কাঞ্চন। ও দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যভিচার আর স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার কী মনে হয়?

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল।

হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন—তবে এর মানে কী? অ্যাঁ! পড়ে দেখ, এ সব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কি না।

তারপর থেকে যতবার সেই কথা মনে পড়েছে ততবার হেসেছে নীলু। একা একা।

বেলা বেড়ে গেছে। বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্টকাট ধরল। বড় রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে মিশেছে সেখানেই দেয়ালে পিঠে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধন—নীলুর চতুর্থ ভাই। কলেজের শেষ ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকোল। পথচলতি অচেনা মানুষের মতো দুজনে দুজনকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না যে তারা এক মায়ের পেটে জন্মেছে, একই ছাদের নীচে একই বিছানায় শোয়! নীলু শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে যাচ্ছে, কেমন তার চরিত্র—কিছুই জানা নেই নীলুর। কেবল মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে, হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে, গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন।

এখন কেন জানে না, সাধনের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন, তুই কেমন আছিস? তোর জামাপ্যান্ট নিয়েছিস তুই? অনার্স ছাড়িসনি তো! এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু। ফিরে আসবে কিনা ভেবে ইতস্তত করছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল সাধন তার দিকেই চেয়ে আছে। একদৃষ্টে। হয়তো জিজ্ঞেস করতে চায়—দাদা, ভাল আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, তোর ঘাড়ের নলী দেখা যাচ্ছে রে! কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হল না শেষ পর্যন্ত, না? ওরা বড়লোক, তাই? তুই আলাদা বাসা করতে রাজি হলি না, তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে—কিন্তু আমরা—ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়, বাবার পর তুই কেমন আগলে আছিস আমাদের! আহারে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি যা। আমার জন্য ভাবিস না—আমি রাতচরা—কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই!

কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে এরকম নিঃশব্দে কথা বলল। তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়িতে কাণ্ড হয়ে গেল খুব। নাড়ুমামি কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোট বোনটা। শোভনের দুই মেয়ে কাণ্ড করল আরও বেশি। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল—ঘুমোতে পারল না। সাধন ছাড়া ভাইয়েরা যে যার আগে খেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ের মতো হয়ে রইল রবিবারের দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুকু আর গায়ের ফর্সা রং রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামি, আর নীলুর দুই বোন। সাধন ঘরে ঢুকতেই নীলু বল্লরীর মুখখানা লক্ষ করল।

যা ভেবেছিল তা হল না। বল্লরী চিনতেও পারল না সাধনকে। মুখ তুলে দেখল একটু, তারপর চালুনির ভিতর ছক্কাটাকে খটাখট পেড়ে দান ফেলল। সাধনও চিনল না।

একটু হতাশ হল নীলু। হয়তো রাতের সেই ছেলেটা সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এখনকার মানুষ পরস্পরের মুখ বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নীলু গলা উঁচু করে বলল—তোমার মেয়ে দুটো বড় কাণ্ড করছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

—আঃ, একটু রাখুন না বাবা, আমি প্রায় ঘরে পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শোতে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামি টিকিটে বাজে একটা বাংলা ছবি দেখল তারা। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে দূরে কোথাও পেটো ফাটবার আওয়াজ ওঠে। মাঝে-মধ্যে গলির মুখে মুখে যুদ্ধের ব্যূহ তৈরি করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ওই দলে। কে জানে একদিন হয়তো তার নামে একটা শহীদ স্তম্ভ উইটিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে।

পাড়া আজ নিস্তব্ধ। তার মানে নীলুর ছোটলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো ব্রিটিশ আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালবাসার বিয়ে। বড় সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষ পর্যন্ত মত করলেন না। এই বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে এসে অথই জলে পড়বে। বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভাল হত তা সে বুঝলই না। একা হলে ঘুরে-ফিরে কুসুমের কথা বড় মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আরও দুদিন তার কিছু চাকি ঝাঁক যাবে। হাসি মুখেই মেনে নেবে নীলু। নয়তো রাগই করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে নীলুর দিকে আড়ে আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে—কুসুমকে—এই চিন্তায় সে কি মাঝে মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে?

একা থাকলে অনেক চিন্তার টুকরো ঝরে-পড়া কুটোকাটার মতো মাথার ভিতরে চক্কর খায়।

বাড়ির ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নিঃশব্দে পিছু নেয়। মনে মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে—পোগো, কী চাস?

পোগা দূর থেকে বলে—ঠালা, টোকে মার্ডার করব।

ক্লান্ত গলায় নীলু বলে—আয়, করে যা মার্ডার।

পোগো চুপ থাকে একটু, সতর্ক গলায় বলে—মারবি না বল!

বড় কষ্ট হয় নীলুর। ধীরে ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—মারব না। আয়, একটা সিগারেট খা।

পোগো খুশি হয়ে এগিয়ে আসে।

নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ির সিঁড়িতে বসে নীলু, পাশে পাগলা পোগো। সিগারেট ধরিয়ে নেয় দুজনে। তারপর—যা নীলু কখনও কাউকে বলতে পারে না—সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প—কুসুমের গল্প—অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে।

পোগো নিবিষ্ট মনে বুঝবার চেষ্টা করে।

Shahnaz

পটুয়া নিবারণ

আমাদের নিবারণ কর্মকার ছিলেন আঁকিয়ে মানুষ। লোকে বলত বটে পটুয়া নিবারণ—কিন্তু তাঁর ছবি-টবি কেউ কিছু বুঝত না। সেই অর্থে পট-টট কখনও আঁকেননি নিবারণ কর্মকার। যদিও ঠিক পটুয়া ছিলেন না নিবারণ, তবু তাঁর আঁকার ধরনধারণ ছিল অনেকটা পটুয়াদের মতোই। তুলির টান, রঙের মিশ্রণ—সব কিছুই ছিল সেই পুরনো ধরনের। শুধু বিষয়বস্তুতেই তাঁর নতুনত্ব কিংবা মতান্তরে নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ত। আমি তাঁর আঁকা একখানা বাঘের ছবি দেখেছিলাম যার পেটটা ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ, আর সেই পেটের ভিতর দেখা যাচ্ছে একটি গর্ভবতী মেয়ে শুয়ে আছে—বাঘের পাকস্থলীর ওপর তার মাথা, বাঘের হৃৎপিণ্ডের ওপর তার পা, বিরাট চাউস পেটটা বাঘের মেরুদণ্ড পর্যন্ত ফুলে আছে, আর মেয়েটির সেই পেটের প্রায় স্বচ্ছ চামড়ার ভিতর দিয়ে কোষবদ্ধ প্রায়-পরিণত ভ্রূণটিকেও দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি ও ভ্রূণ এই দুই জনের মুখেই নির্লিপ্ত, নির্বিকার হাসি। সব মিলিয়ে দেখলে কিন্তু বাঘটার জন্যই দুঃখ হয়। তার গোঁফ ঝুলে গেছে, অকালবার্ধক্যে তার চোখ কোটরগত ও হিংস্রতাশূন্য। ছবির নীচে লেখা 'গর্ভবতী নারীকে ভক্ষণ করিয়াছ, এখন কেমন মজা?'

'পাপের পরিণাম' সিরিজে যে কখানা ছবি এঁকেছিলেন নিবারণ কর্মকার, বাঘের ছবিটা ছিল তার দ্বিতীয় ছবি। সবগুলো ছবি আমি দেখিনি, কিন্তু যে কয়েকটা দেখেছি তার প্রতিটিই ছিল খানিকটা হিংস্র প্রকৃতির ছবি। যেমন মনে পড়ে একটি ছবিতে একটি অতিকায় বানর একটি কুমারী কন্যার সতীত্ব হরণ করেছে—এমনি একটা বিষয়বস্তু এঁকেছিলেন পটুয়া নিবারণ। নীচে লেখা 'সূক্ষ্মদেহীর প্রত্যাবর্তন ও নির্বিকার কাম-অভ্যাস।'

আমাদের নিশি দারোগার মেয়ে শেফালীর একবার অসুখ হল। শক্ত ব্যামো। হরি ডাক্তার এসে বলে গেল 'সর্বনাশ! এ মেয়ে বাঁচলে হয়! অসুখ শরীরের যতটা, মনেও ততটা। মন ভাল রাখা চাই। ওকে কখনও কোনও অভাব দুঃখ কষ্টের কথা বলা বারণ, কোনও মৃত্যুর খবর দেওয়া বারণ। আর ও যা চায় ওকে তাই দিন।'

তাই হল। শেফালীর ঘর থেকে ধুলো ময়লা, কালো ঝুল, পিকদানী, ইঁদুর, আরশোলা দূর

করে দেওয়া হল, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল কালো বেড়ালটাকে। তারপর ডাক পড়ল পটুয়া নিবারণের। মন ভাল থাকে এমন ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিতে হবে ঘরের দেয়ালে।

পট এঁকেছিলেন নিবারণ। খুব পরিশ্রম করেই এঁকেছিলেন। একটা ছবিতে ছিল নদীর তীরে একপাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে পরস্পরের মুণ্ড খেলাচ্ছলে কেড়ে নিয়ে এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে; কারও মুণ্ডই যথাস্থানে নেই। এর মুণ্ড ওর হাতে, ওর মুণ্ড এর হাতে রয়েছে; আর সেই কবন্ধ ছেলেমেয়েদের দেহগুলি নিরানন্দ ও কঙ্কালসার। ছবির নাম দেওয়া ছিল 'একের মুণ্ড অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার পরিণাম।' 'রাক্ষসীর প্রসব' নামে আর একটা ছবিতে ছিল এক বিকট দর্শন রাক্ষসী তার সদ্যোজাত সন্তানকে বৃক্ষচ্যুত ফলের মতো স্বহস্তে ধারণ করছে, আশেপাশে ইতস্তত কয়েকটা রাক্ষসশিশুর কঙ্কাল পড়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় রাক্ষসী ইতিপূর্বে তার পূর্বজাত সন্তানদের ভক্ষণ করেছে এবং আশু সন্তান-ভক্ষণের আনন্দে তার মুখ লোল, চোখ উজ্জ্বল।

এইসব ছবি দেখার ফলেই হোক কিংবা অন্য কোনও কারণেই হোক হরি ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে নিশি দারোগার মেয়ে শেফালী একদিন টুক করে মরে গেল। যতদূর জানা যায় বিকট ছবি এঁকে দারোগার মেয়ের মনে ভীতি উৎপাদনের অপরাধে গোপনে নিবারণের ওপর কিছু অত্যাচার হয়েছিল।

তাইতেই মনমরা হয়ে গেলেন পটুয়া নিবারণ। কেননা ছবি-আঁকা ছিল তাঁর প্রাণ। ছবিতেই কথা বলতে চাইতেন নিবারণ, সংসারের নানারকম মারকে ছবি দিয়েই ঠেকাতে চাইতেন। ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই শেখেননি তিনি। নিশি দারোগা তাঁর সেই ছবি-আঁকা প্রায় বন্ধ করে দেবার জোগাড় করলেন। কেননা কথা ছিল শেফালীর ঘরে গাছপালা, লতা, ফুল, পাখির ছবি এঁকে দেবেন নিবারণ, যাতে ঘরে বসেও শেফালীর মনে হবে যে তার চারিদিকে গাছপালা লতা ফুল পাখি মেঘ ও বাতাস রয়েছে—প্রকৃতি-টকৃতির ভিতরেই রয়েছে সে এবং এইভাবে এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় কিছুকাল প্রকৃতি-ভক্ষণ করলে শেফালীর রোগের উপশম হতে পারত। অন্তত হরি ডাক্তারের এই রকমই ধারণা ছিল।

এদিকে নিবারণের বয়স হয়ে এসেছিল। ছবির দিকেও ভাঁটা পড়ছিল। কেননা জনশ্রুতি শোনা গেল পটুয়া নিবারণের যাবতীয় শিল্পকর্ম তাঁকেই আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ভয়ে তিনি ঘরে ঢুকতে পারেন না। স্বপ্নের ভিতরেও তিনি স্বচ্ছ পেটওয়ালা বাঘ, মুণ্ডহীন ছেলেমেয়ে ও রাক্ষসীর সন্তান ভক্ষণ দেখতে শুরু করেছেন। তাঁর ক্রমশ বিশ্বাস হচ্ছিল একদিন এরা সবাই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এবং রুগ্ন অশক্ত বৃদ্ধ অবস্থার কোনও সুযোগে তাঁকে আক্রমণ করবে। সুতরাং কয়েকদিন তিনি সুন্দর ও স্বাভাবিক কিছু আঁকবার চেষ্টা করে দেখলেন—ছবি ছেড়ে বেরিয়ে এলেও যা তাঁর খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কিছুই আঁকতে পারলেন না। এই সময়ে তিনি শক্ত সমর্থ একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পকর্মের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। আর ছবি-আঁকা ভুলবার জন্য তিনি অন্যদিকে মন দিলেন। কখনও দেখা যেতে লাগল নিবারণ উঠোনের মাটি কোপাচ্ছেন। নয়ত ছাঁচতলা থেকে কন্টিকারির ঝোপ টেনে তুলে সাফ করছেন। যদিও বিয়ে করেননি, তবু মনে হচ্ছিল, সংসারে মন দিয়েছেন পটুয়া নিবারণ। এইবার হয়তো বিয়ে করবেন।

করলেনও।

Shahnaz

মিস কে. নন্দীর নামডাক আজকাল আর শোনা যায় না। শোনবার কথাও নয়। তিনি যে সব খেলা দেখাতেন, আজকাল আর তা চলে না। কিন্তু আমাদের আমলে সেইসব খেলা দেখিয়েই দারুণ নাম হয়েছিল মিস কে. নন্দীর। 'প্রবর্তক সার্কাস' যখন নানা জায়গায় ঘুরছিল তখনই মুখে মুখে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন সর্বভুক মহিলা মিস কে. নন্দীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে পড়ে মিস কে. নন্দীর জন্য প্রবর্তক সার্কাসে একটা আলাদা তাঁবু ছিল—যার চারদিকে সারাদিন ভিড় লেগে থাকত। সার্কাসের খেলা আরম্ভ হলে এই তাঁবু থেকেই একটা চাকাওয়ালা খাঁচায় মিস কে. নন্দীকে নিয়ে আসা হত রিংয়ের পাশে। হই-হই পড়ে যেত চারদিকে। কিন্তু মিস কে. নন্দীকে দেখা যেত না—খাঁচার চারপাশে কালো পর্দা ফেলা। ওর ভিতরে বাস্তবিক কে. নন্দী আছেন কি না বা থাকলেও কী করছেন কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। এদিকে ক্রমে ট্রাপিজের খেলা, দড়ির ওপর নাচ, ভৌতিক চক্ষু এবং বাঘ সিংহের খেলা শেষ হয়ে আসত। তারপর একজন স্যুট টাই পরা লোক পর্দা সরিয়ে একটা গোপন দরজা দিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে যেত। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বলত 'অলরাইট'। দু-তিনজন লোক সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিত। হাততালিতে কানপাতা দায় হত তখন। আর তখন দেখা যেত মিস কে. নন্দীকে। প্রকাণ্ড নয়, বরং রোগাই বলা যায় কে. নন্দীকে। রং কালো। পরনে গোলাপি রঙের সাটিনের হাফ প্যান্ট, বুকে কাঁচুলি—সেও গোলাপি রঙের সাটিনের। মাথার চুল ঝুঁটি করে ওপরে বাঁধা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, পায়ে গোলাপি মোজা, গোলাপি জুতো। কাঠের একখানা ঝকঝকে চেয়ারে নিশ্চল বসে থাকতেন মিস কে. নন্দী—আধবোজা চোখ, মুখে একটু হাসি। হঠাৎ মনে হয় ঘুমিয়ে আছেন, নয়তো সম্মোহিত করে রাখা হয়েছে তাঁকে। একটা মুরগিকে সেই সময়ে ছেড়ে দেওয়া হত খাঁচার ভিতরে—কোক্কর কোঁ করে সেটা ডাকতে থাকত। আর, সেই ম্যানেজার গোছের লোকটা মিস কে. নন্দীকে ডাকতে থাকত, উত্তেজিত করত, হাতের লম্বা সরু লাঠিটা দিয়ে সজোরে খোঁচা মারত কে. নন্দীর পেটে, কোমরে। অবশেষে হঠাৎ কে. নন্দী রক্তবর্ণ একজোড়া চোখ খুলতেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখতেন, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতেন। আর একবার হাততালি পড়ত। সম্ভবত ওই শব্দেই ক্ষেপে যেতেন মিস কে. নন্দী। মুরগিটার সঙ্গে তার প্রাণপণ লড়াই শুরু হয়ে যেত—সেই প্রাণান্তকর পাখা ঝাপটানোর শব্দ, মুরগির অস্ফুট ডাক, আর কে. নন্দীর দাঁত কড়মড় করবার শব্দে আমাদের গায়ের রোমকূপ শিউরে উঠত। মুরগিটা ধরা পড়ত অবশেষে—ততক্ষণ মিস কে. নন্দীর কৌশলে বাঁধা-চুল খুলে পিঠময় মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে—ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাঁকে। প্রথমেই দুহাতে টেনে মুরগির মুণ্ডুটাকে ছিঁড়তেন কে. নন্দী—মুরগিটার গলা থেকে হঠাৎ হঠাৎ শ্বাস নির্গত হতে থাকত বলে তখন তার অস্ফুট ডাক শোনা যেত। পট করে ছিঁড়ে যেত গলাটা—মুণ্ডুটা ছুড়ে ফেলে কে. নন্দী ধড়টাকে দুহাতে ধরতেন—কাটা গলাটা মুখের কাছে নিয়ে ডাবের জল খাওয়ার ভঙ্গিতে রক্তপান করতেন মিস কে. নন্দী। তখন কষ বেয়ে, গোলাপি কাঁচুলি বেয়ে, তলপেট থেকে চুঁইয়ে গোলাপি জুতো পর্যন্ত নেমে আসত রক্তের কয়েকটা ধারা। তারপর মুরগিটাকে খেতে শুরু করতেন—দুহাতে পালক ছাড়াচ্ছেন আর ভিতরের মাংসের জঙ্গলে কামড় বসাচ্ছেন—এ দৃশ্যের কোথাও শিল্প ছিল কি না বলতে পারি না।

মুরগি খাওয়া হয়ে গেলে রক্তমাখা দেহে মুরগির পালক, নাড়ীভুঁড়ি ইত্যাদি ভুক্তাবশিষ্টের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতেন মিস কে. নন্দী। তখনও তাঁর অভিনয় কেউ ধরতে পারত না। এই সময়ে একটা সাপের ঝাঁপি সেই খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। স্যুট পরা ম্যানেজার

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেন 'লেডি গণপতি দেখু-উ-উ-ন্-ন্—'। তার অবাঙালি টানের কথাটা বিটকেল শোনাত। দেখা যেত ঝাঁপির চারধারে কে. নন্দী লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন আর ম্যানেজার হাতের সরু সাদা লাঠিটা খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাঁপির ঢাকনাটা খুলে দিতেই ছিটকে উঠত সাপ। পেখমের মতো ফণা মেলে দিয়ে কে. নন্দীর দিকে তাকাত। প্রথমটায় ভয় পাওয়ার ভান করতেন তিনি—কয়েক পা পিছিয়ে যেতেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিতেন সাপের দিকে। সাপ ততক্ষণে ঝাঁপি ছেড়ে খানিকটা নেমে এসেছে—ছোবল দিতেই হাত সরিয়ে নিতেন কে. নন্দী। সারা তাঁবুতে শুধু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যেত তখন। দ্বিতীয় ছোবলের মুখেই সাপের গলাটা চেপে ধরতেন—আর সারা হাত জুড়ে লিকলিক করে উঠত সাপ, কিলবিল করে জড়িয়ে ধরত তাঁর হাত। অনেকক্ষণ সময় নিতেন কে. নন্দী। খুব আস্তে আস্তে হাতটাকে মুখের কাছে নিয়ে আসতেন—যেন সাপের ঠোঁটে চুমু খাবেন তিনি। এই সময়ে তাঁর শিল্পকর্ম বোঝা যেত—ভঙ্গিতে পেলবতা ফুটিয়ে তুলতেন, তাঁর চোখে মুখে বন্য হরিণের সরল কৌতূহল ফুটে উঠত। পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড হাঁ করলে তাঁর রক্তাক্ত মুখাভ্যন্তর দেখে বাচ্চা ছেলেরা ভয়ে চিৎকার করে উঠত, আমরা চোখ বুজে ফেলতাম। ওইটুকুই ছিল কৌশল। হয়তো চোখ চেয়ে ঠিক মতো দেখলে দেখা যেত বাস্তবিক সাপের মুণ্ডুটাকে খাচ্ছেন না তিনি। পরমুহূর্তেই চোখ চেয়ে দেখা যেত মুণ্ডহীন সাপের দেহ একখণ্ড দড়ির মতো ঝুলছে, আর সাপের মুড়োটা আরামে চিবোচ্ছেন মিস কে. নন্দী।

বাইরে থেকে দেখে বোঝা যেত না, কিন্তু কে জানে, হয়তো ওই জীবন মিস কে. নন্দীর আর ভাল লাগছিল না। তাঁর খেলার মধ্যে অনেকটাই অভিনয় ছিল সত্য, কিন্তু কেন যেন সন্দেহ হত ম্যানেজারের লাঠির খোঁচাটা ওর মধ্যেই ছিল খাঁটি। কেননা যখন চেয়ারে এলিয়ে না-ঘুম না-সম্মোহনের ভিতর থাকতেন কে. নন্দী তখন মনে হত তিনি বড়ই ক্লান্ত। মানুষের স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসে প্রত্যাবর্তন করতে না পারার সেই ক্লান্তিকে দূর করতে যখন কে. নন্দীকে ম্যানেজার সেই সরু লাঠির ডগায় খোঁচা দিতেন, তখন মিস কে. নন্দীর জন্য আমি আমার যৌবনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম।

মিস কে. নন্দীর নামডাক এখন আর থাকবার কথা নয়। কেননা সময় পালটে যাচ্ছিল। মানুষ আর পুরনো ধরনের খেলা পছন্দ করছিল না। ধীরে ধীরে প্রবর্তক সার্কাসের অবস্থাও খারাপ হয়ে এল।

অবশেষে একদিন সব গোলমাল করে দিলেন মিস কে. নন্দী। ম্যানেজারের ডাক, অনুনয় লাঠির খোঁচা নিঃশব্দে হজম করে তিনি আধখোলা চোখে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। মুরগিটা খাঁচার ভিতরে দাপিয়ে বেড়াল। উপায় না দেখে ম্যানজার সাপের ঝাঁপিটাও ঢুকিয়ে দিলেন খাঁচার মধ্যে। ঢাকনাটাও খুলে দেওয়া হল। সাপটা ফণা মেলে লাফিয়ে উঠল, মুরগিটা খাঁচার ছাদে পা আটকে রেখে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল। আর ঠিক এই সময়ে তাঁবু ভর্তি লোককে স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন কে. নন্দী। খেলা ভেঙে গেল।

কিন্তু মাত্র একদিনের জন্যই। তারপর থেকে মিস কে. নন্দী আবার খেলা দেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু ওই একদিনেই তাঁর বাজার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, লোকে ধরে ফেলেছিল মিস কে. নন্দীকে। আর ভিড় জমল না। কে. নন্দীর খেলা শুরু হওয়ার আগেই তাঁবু ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে সার্কাস থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময় হয়ে এল।

আমাদের পটুয়া নিবারণ এই সময়েই একজন মজবুত সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর

Shahnaz

শিল্পের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রবর্তক সার্কাসের ম্যানেজারের কাছে একদিন দরবার করলেন নিবারণ, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কে. নন্দীকে ছাড়িয়ে আনলেন, তারপরে একবারে বিয়ে করে ঘরে তুললেন।

এই সময়ে আমি একদিন নিবারণ কর্মকারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। একখানা ছবির সামনে নিবারণ কর্মকার বসেছিলেন। আমাকে দেখে সম্ভবত বিরক্ত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ আমরা মুখোমুখি চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুই বলার ছিল না। নিবারণ তাঁর ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে মনোযোগ দিয়ে কিছু লক্ষ করছিলেন। মনে হল তিনি তাঁর ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা মিলিয়ে দেখছেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমার দুটো আঙুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

আমি কিছু না বুঝে প্রশ্ন করলাম, 'কোন আঙুল!'

উনি ওঁর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী আমায় দেখালেন 'কিছু বুঝতে পারছেন?

আমি বললাম, 'না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। কিন্তু আঙুল দুটো ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে।'

আমি আঙুল দুটো দেখলাম। স্বাভাবিক বলে মনে হল। রোগটা ওঁর মানসিক সন্দেহ করে আমি বললাম, 'শুনেছিলাম আপনি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। আর আঁকছেন না!'

'ছেড়ে দিইনি। তবে দেব।' দীর্ঘশাস ফেললেন নিবারণ, 'আঙুল দুটোর জন্যেই ছেড়ে দিতে হবে।'

আমি চুপ করে রইলাম। উনি নিজেই বললেন, 'এখন থেকে খেতখামারের কাজ করব ভাবছি।'

আমি ওঁর সামনের সদ্য-আঁকা ছবিটা দেখছিলাম। পালঙ্কের ওপর মিথুনবদ্ধ নগ্ন নর-নারীর ছবি এঁকেছেন তিনি; আর দেখা যাচ্ছে একটা সাপ পালঙ্কের শিয়রে ফণা তুলে পুরুষটিকে দংশন করতে উদ্যত; মেয়েটি সাপটাকে দেখছে—অথচ কিছুই করছে না; তার চোখ সম্পূর্ণ নির্বিকার। কিংবা এও হতে পারে যে মিথুন তখন এমন পর্যায়ে যে বাধা দিলে তার মাধুর্য নষ্ট হয়—তাই মেয়েটি যা নিয়তি তাকে মেনে নিচ্ছে।

হঠাৎ খুক খুক করে হাসলেন নিবারণ। আমি উঠে পড়লাম।

চলে আসবার সময় কে. নন্দীকে দেখা গেল—ঘোমটা মাথায় সারা বাড়ি ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছেন। মনে হল সম্মোহন কেটে গেছে—সেই আধোঘুম ও অর্ধস্বপ্ন থেকে ম্যানেজারের লাঠির খোঁচায় জেগে উঠেই অমানুষিক-খাদ্যবস্তুর সম্মুখীন হতে হচ্ছে না বলে তিনি বোধহয় সুখী। কিংবা কে জানে—আমার দেখার ভিতরে ভুলও থাকতে পারে।

গ্রামে জনশ্রুতি ছিল, নানারকম গল্প প্রচলিত হচ্ছিল। কিন্তু সার্কাসের সর্বভুক মহিলার সঙ্গে পটুয়ার যৌথ জীবন ঠিক কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল তা বোঝা যাচ্ছিল না। কেননা, নিবারণ আমাদের আর ডাকতেন না, গেলে বিরক্ত হতেন। কে. নন্দীও পাঁচজনের সামনে কদাচিৎ বের হতেন। ক্রমশ বাইরের জগৎ থেকে দুজনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। এরকম ভাবে তাঁরা আর পাঁচজনের মনোযোগ থেকে আত্মরক্ষা করে রইলেন।

দীর্ঘদিন পর আমাকে আর একবার ডেকে পাঠালেন নিবারণ। গিয়ে দেখি আঁকবার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন নিবারণ। আমি যেতেই প্রশ্ন করলেন, 'আমার স্ত্রীকে আপনি চিনতেন?'

থতমত খেয়ে উত্তর দিলাম, ঠিক কী বলছেন বুঝতে পারছি না। তবে মিস কে. নন্দীকে

আমরা অনেকেই দেখেছি।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে উনি ডাকিনী কিংবা পিশাচ-সিদ্ধ?'

'না।'

'তবে?'

'তবে কী?'

খুব চিন্তিত দেখাল নিবারণকে। কুঞ্চিত কপালে ছোট চোখে উনি ওঁর চারদিকে স্তূপাকৃতি পটগুলোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন। সেই চেয়ে দেখার ভিতর খানিকটা ভয়ের ভাব ছিল। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে উনি বললেন, 'কুসুম সার্কাসে যা করত তাকে লোকে কী বলে! সেটা শিল্প, না খেলা?'

'কে কুসুম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কুসুম মানে—' হতচকিত হয়ে উত্তর দিলেন নিবারণ—'আমার স্ত্রী।'

'কে. নন্দী?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়লেন নিবারণ, 'আমার সন্দেহ ছিল কাঁচা মুরগি ও সাপের মাথা খাওয়ার ভিতর কোনও শিল্প নেই; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখন আমার মনে হয় ধারণাটা ভুল।'

আমি কিছু না বুঝে চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বললেন, সার্কাসে আপনারা কুসুমকে দেখেছেন, আমি দেখিনি। আমি ওর কথা শুনেছিলাম, ওকে বলা হত পিশাচ-মহিলা।' আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন নিবারণ, 'কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কী?'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ। আর কোনও কথা বললেন না। দেখলাম উনি স্থির দৃষ্টিতে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি কুসুমকে বুঝবার চেষ্টা করছি।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'হয়তো একটা জীবন-সময় অনেক কিছুর জন্যই যথেষ্ট নয়।'

নিবারণ কর্মকার সামান্য পটুয়া—তাঁর চিন্তায় কিছু উদ্ভট ব্যাপার ছিল—এইটুকুই আমরা জানতাম। সব মিলিয়ে মানুষটা আমাদের কাছে ছিল মজার। কিন্তু এখন কেমন সন্দেহ হল—নিবারণের গলার স্বরে, চোখের চাউনিতে অন্যরকম কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। হঠাৎ উঠে গেলেন নিবারণ, দরজার বাইরে মুখ বার করে কী দেখে নিলেন, ফিরে এসে নিজের ডান হাতের দিকে পূর্ববৎ চেয়ে থেকে নিচু গলায় বললেন, 'কিছুদিন আগে এক দুপুরবেলা দেখি কুসুম ছাঁচবেড়ার ওপর এসে বসা একটা মোরগের দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে। আমি ওকে ডাকলাম, সাড়া দিল না।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

আমি মাথা নাড়লাম—জানি না।

নিবারণ বললেন, 'আমার মনে হয় স্বাভাবিক মানুষ যা খায়—তা খেয়ে কুসুমের তৃপ্তি হয় না। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম—না। আমার গা শিউরে উঠছিল।

নিবারণ বললেন, 'একদিন আমি ওর খেলা দেখতে চাইলাম। ও প্রথমে রাজি হল না। বলল—সার্কাসে যা দেখাত তার সবটাই ছিল কৌশল। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল। অবশেষে একদিন আমার সাধ্য-সাধনায় রাজি হল। গভীর রাত্রে আমার সামনে একটা কাঁচা মুরগি খেল ও।

Shahnaz